একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন

কৃষ্ণনগর—১৩৪৪

একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন

প্রকাশক

শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি.

সম্পাদক, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন

কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

নিবেদন

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও নানাকারণে ইহাকে নির্ভুল করিয়া মনের মতন করিয়া ছাপাইতে না পারায় এবং ছাপার কার্য্য শেষ হইতে এতদিন বিলম্ব হওয়ায় ইহার সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী মার্জ্জনা জন্য বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।

কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপ্যালিটী সম্মেলনের শিল্পপ্রদর্শনীতে একশত টাকা অর্থ সাহায্য করার বিষয় কার্য্য বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে কিন্তু অন্য সংগৃহীত অর্থের দ্বারা সম্মেলনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাওয়ায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক ঐ একশত টাকা আর প্রদত্ত হয় নাই।

অধিবেশনের আয় ব্যয়ের তালিকায় কোষাধ্যক্ষের নিকট যে পঞ্চাশ টাকা মজুত উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে তাহা কিভাবে রাখা বা খরচ হইবে তাহা অভ্যর্থনা সমিতির শেষ অধিবেশনের সভায় স্থির হইবে ও তদনুসারে কার্য্য হইবে।

সুধানিলয়
কৃষ্ণনগর
১লা চৈত্র, ১৩৪৫

শ্রীললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি।

সূচী।

ম দিক হইতে :—

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্মেলনের সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী।

নদীয়ার মহারাজ কুমার—শ্রীযুক্ত সৌরিশচন্দ্র রায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য।
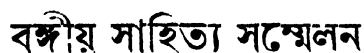
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

একবিংশ অধিবেশন—কৃষ্ণনগর

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনকে চন্দননগরে উহার বিংশ অধিবেশনে নদীয়াবাসীর পক্ষ হইতে আহ্বান করিয়া উহার একবিংশ অধিবেশন নদীয়াতে কৃষ্ণনগরে সম্পাদিত হয়। ১৩৪৪ সালের ২৯শে মাঘ ১লা ফাল্গুন ও ২রা ফাল্গুন এই তিন দিনে সম্মেলনের ঐ একবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। এই একবিংশ অধিবেশন সম্পাদন উদ্দেশ্যে গত ১৩৪৪ সালের ১লা আষাঢ় তারিখে কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন হলে একটী সাধারণ সভা আহুত হয় এবং তাহাতে ৩০ জন সভ্য লইয়া সাময়িক ভাবে একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সাময়িক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র বাগচী মহাশয়গণ উহার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল উহার সাধারণ সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী মৌলভী এস এম জহুরুদ্দীন মৌলবী ফজলুর রহমন শ্রীযুক্ত স্মরজিৎ বন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মোহন আচার্য্য উহার সহযোগী সহকারী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় উহার কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন এবং নদীয়ার মহারাণী মহোদয়াকে পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করা হয়। পরে ১৩৪৪ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখে কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন হলে পুনরায় যে সভার অধিবেশন হয় তাহাতে ঐ সাময়িক ভাবে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির স্থলে তৎকালে ৮০ জন সভ্য লইয়া একটী স্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশনের ঐ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র চন্দ্র মৌলিক বি এল শ্রীমতী অমিয়া দাসগুপ্তা বি, এ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম, এ, বি, এল, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, রায়সাহেব সুধেন্দু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সীতেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল. বিদ্যাবিনোদ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ সরকার বি, এল, মৌলবী ফজলুর রহমান এম, এ, বি, এল উহার সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় উহার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে লইয়া

এবং সাধারণ সভ্য স্বরূপে শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল মৌলবী জহুরুদ্দীন বি, এল শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাত্র শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মোদক শ্রীযুক্ত স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ শ্রীযুক্ত অনন্ত প্রসাদ রায় বি এ, ও শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন সিংহ সাহিত্যরঞ্জনকে লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে প্রয়োজন মত উহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদকের কার্য্য করিতে অপারগতা জানাইয়া ঐ পদ ত্যাগ করিয়া পত্র দেন তাহাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১৩৪৪ সালের ১৮ই আশ্বিন তারিখের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টা-চার্য্য মহাশয়কে সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচন করা হয় এবং শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল মহাশয়কে যুগ্ম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ তরফ-দার বি. এ ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী বি. এ. মহাশয়গণকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করা হয়। এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দ্বারাই সম্মেলনের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৪টী অধিবেশন হইয়াছিল। উহার পরপর অধিবেশনে সম্মেলনের মূল এবং শাখা সমূহের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং সম্মেলনের কার্য্য পরিচালন জন্য উহার ১৩৪৪ সালের ২৮শে পৌষ তারিখের অধিবেশনে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি আহার ও বাসস্থানসমিতি প্রদর্শনীসমিতি মণ্ডপসমিতি প্রমোদোৎসবসমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক সমিতি এই ছয়টি অধীন সমিতি গঠিত হইয়া তাহাদিগের উপর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষগণের ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের ও ভিন্ন ভিন্ন অধীন কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণে নাম এই কার্য্যবিবরণের (ক) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

খ্যাতনামা সাহিত্যস্রষ্টা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে সম্মেলনের মূ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার সহি ১৩৪৪ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে সাক্ষাৎ করায় তিনি এই সভাপতি পদ গ্রহণে মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মে-লনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই তিনি সংশয়াপন্ন পীড়িত হওয়ায় এবং তাঁহার দ্বারা মূল সভাপতির কার্য্য পরিচালন অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার স্থলে নূতন করি শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধরী এম এ, বার এট্ ল মহোদয়কে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি

১৩৪৪ সালের ১৮শে পৌষ তারিখের অধিবেশনে সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ তারিখে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনের পর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী মহাশয় মূল সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে বিশেষরূপে বাধিত করেন।

সম্মেলনের অধিবেশন সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস অর্থনীতি ও চারুকলা এই কয়েকটী শাখায় বিভক্ত থাকিবার নিয়ম থাকিলেও অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১৩৪৪ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের অধিবেশনে সাহিত্য শাখার অধীনে কথাসাহিত্য কাব্য পদাবলীকীর্ত্তন ও সাংবাদিক শাখা অতিরিক্ত যোগ করিয়া এবং ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি চারুকলা ও তাহার সহিত সঙ্গীত শাখা রাখিয়া মোট ১১টী শাখায় সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় বিভাগ করা স্থির করেন। এই বিভাগানুসারে অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট চিন্তাশীল সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে সাহিত্য শাখার সভাপতি বঙ্গলক্ষ্মী কাগজের সম্পাদিকা বিদুষী লেখিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (ঠাকুর)কে কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রী ব্রজমাধুরী কীর্ত্তন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী স্বনামধন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীকে পদাবলীকীর্ত্তন শাখার সভানেত্রী শনিবারের চিঠির সম্পাদক বিখ্যাত সমালোচক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়কে কাব্যশাখার সভাপতি আনন্দ বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে সাংবাদিক শাখার সভাপতি ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটার ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়কে ইতিহাস শাখার সভাপতি ঢাকা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দর্শন শাখার সভাপতি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপক ডক্টর কুদরত-এ-খুদা মহাশয়কে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অর্থনীতি শাখার সভাপতি বাংলার বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী পকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে চারুকলা শাখার সভাপতি এবং সঙ্গীতজ্ঞ মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় নাটোরাধিপতিকে সঙ্গীত শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এই সকল সভাপতি নির্ব্বাচন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন পরিচালন সমিতির অনুমোদন অনুসারে শেষ স্থির হইয়াছিল এবং অভ্যর্থনা সমিতির গত ১৩৪৪ সালের ১০ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক উপরোক্ত সভাপতি নির্ব্বাচন ও সম্মেলনের কার্য্য

পরিচালন জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধীন সমিতি গঠন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য অভ্যর্থনা সমিতি অনুমোদন করিয়া লয়েন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার অন্যূন তিন টাকা করিয়া প্রত্যেকের দেয় চাঁদা ধার্য্য হইয়াছিল। নদীয়াবাসী যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নামের তালিকা তাঁহাদিগের প্রদত্ত চাঁদার সংখ্যাসহ এই কার্য্য বিবরণীর (খ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্রগণ এবং লেডি কারমাইকেল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারূপে সম্মেলনের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবিকাগণের সংখ্যা ২০জন মাত্র ছিল। তাঁহারা শুভ্র বসনে ও স্বতন্ত্র উপলক্ষণে সুশোভিত হইয়া লেডি কারমাইকেল বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা অমিয়া দাসগুপ্তা ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্তা মলিনা চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশাধীন ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের সংখ্যা ২৫০ ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকে জাফরান্ বর্ণের টুপি ও শুভ্র সার্ট পরিহিত হইয়া তাহাদিগের অগ্রনী শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর পরিচালনে সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুহৃদকুমার চট্টোপাধ্যায় এই স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ম অধিনায়ক ছিলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১৩৪৪ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের অধিবেশনে নদীয়ার পরলোকগত ও জীবিত গ্রন্থকার ও লেখকগণের নাম ও তাঁহাদিগের রচিত পুস্তকের নাম তাঁহাদিগের প্রতিকৃতি হস্তাক্ষর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নাদির এবং নদীয়ার নিজস্ব শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শন জন্য সম্মেলনের এই একবিংশ অধিবেশনের সহিত একটী শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রদর্শনী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহাতে পুরাতন পুঁথী পুস্তক মানচিত্র বস্কল মৃৎশিল্প ও চারুশিল্পের দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীকে প্রধানত নদীয়ার ঐতিহাসিকতার সহিত সংশ্লিষ্ট রাখা হইয়াছিল। নদীয়ার যে সকল লেখকগণের নাম ও পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছিল তাহার তালিকা এবং প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে বিশেষ কয়েকটীর পরিচয় এই কার্য্য বিবরণের (গ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

সম্মেলনে পঠিত হইবার উপযুক্ত প্রবন্ধাদির জন্য যে সকল বিশিষ্ট বঙ্গসাহিত্যিকগণকে অনুরোধপত্র দেওয়া হইয়াছিল ও সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য যে সকল সুধী সাহিত্যিক লেখকগণকে ও বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হইয়াছিল ঐ সকল ব্যক্তিগণের ও প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা যথাক্রমে এই কার্য্য-

বিবরণের (ঘ) ও (ঙ) পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। এতদ্ব্যতীত বাংলার ইংরাজী বাংলা সমুদয় দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণকে সম্মেলনে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সম্মেলনকে পূর্ণ সাফল্য প্রদান করিবার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে সম্মেলনে তাঁহার উপস্থিতি ও সম্মেলনের প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাণী প্রার্থনা করিয়া সানুনয় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তদুত্তরে তিনি শান্তিনিকেতন হইতে গত ১৩৭৪ সালের ১৫ই মাঘ তারিখে, "কৃষ্ণনগরে আহূত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সম্পূর্ণ সফলতা কামনা করি" -স্বহস্তলিখিত এই একটীমাত্র ছত্রে তাঁহার আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সম্মেলনের অধিবেশনস্থানের জন্য নদীয়ার মাননীয়া মহারাণী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদের নাটমন্দির গৃহ এবং তাহার সংলগ্ন সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে নূতন করিয়া সভামণ্ডপ নির্ম্মাণের ব্যয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সম্মেলন যাহাতে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহার জন্য মহারাণী বাহাদুরা সর্ব্বদা আগ্রহান্বিতা ছিলেন। নাটমন্দিরের বিরাট গৃহটী পদ্ম ও অন্যান্য পুষ্পে ও পত্রে এবং সাহিত্যসম্মেলনমুদ্রিত গৈরিক পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া সভামণ্ডপে পরিণত হইয়াছিল। মণ্ডপের চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভে স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে "বন্দে মাতরম" এবং "দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ" মুদ্রিত বাণী শোভা পাইতেছিল। মণ্ডপের পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে মূল সভাপতি শাখা সভাপতি ও সভানেত্রীগণ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক অতিথিগণের বসিবার জন্য একটী সুসজ্জিত মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার সম্মুখে পশ্চিম পার্শ্বের সম্পূর্ণ বারান্দাটী মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সভামণ্ডপ গৃহের মাটীতে আগাগোড়া সতরঞ্চ চাদর বিছাইয়া প্রতিনিধিগণের সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণের দর্শকবৃন্দের এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মণ্ডপের চতুঃপার্শ্বে স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং মহিলাপ্রতিনিধি ও মহিলা দর্শকগণের নিকট স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সর্ব্বদার জন্য আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত ছিলেন। মণ্ডপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'লাউড স্পীকার' দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বক্তৃতা শুনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদের প্রথম প্রবেশপথে একটী চিত্রিত তোরণশীর্ষে "স্বাগতম্" সূচিত হইতেছিল এবং সভামণ্ডপের প্রাঙ্গণদ্বারে একটী গৈরিকবসনাচ্ছাদিত স্বল্পকলা-সৌষ্ঠবসম্পন্ন তোরণ নির্ম্মিত হইয়া তাহার দুইপার্শ্বে মাঙ্গলিক কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। সম্মেলনের প্রথম দিবসের সাধারণ অধিবেশন ও সাহিত্য শাখাদির অধিবেশন এই সমগ্র মণ্ডপে হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে ও তৃতীয়

দিনে ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধিবেশন জন্য এই সভামণ্ডপকে তিনটী বিভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর এই সভামণ্ডপ সুসজ্জিত করিবার ও ইহার অন্যান্য ব্যবস্থার যে ভার ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা তিনি সুন্দর ও সন্তোষজনকরূপে পালন করিয়াছিলেন।

সম্মেলনের প্রতিনিধিগণের প্রত্যেকের দুইটাকা করিয়া দেয় চাঁদা ধার্য্য হইয়াছিল। সমবেত সাহিত্যিক ও সুধীজন মধ্যে যাঁহারা প্রতিনিধিশ্রেণীভুক্ত হইয়া দু'টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নামের তালিকা এই কার্য্য-বিবরণে (চ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। ঐ সকল নাম ব্যতীত শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীযুক্ত সুধীর রায় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল শ্রীযুক্ত মনোজ বসু শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় প্রভৃতি আরও বহু সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী শ্রীযুক্তা সুধা সেন শ্রীযুক্তা ইলা হোম শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুর শ্রীযুক্তা চারুপ্রভা ঠাকুর শ্রীযুক্তা ইনা মিত্র শ্রীযুক্তা চিত্রা ঠাকুর শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ সিস্টার সরস্বতী শ্রীমতী বেলা ব্যানার্জ্জী শ্রীমতী নীলিমা মুখার্জ্জি শ্রীমতী সবিতা মুখার্জ্জি শ্রীমতী আরতি মুখার্জ্জি শ্রীমতী শোভাদেবী শ্রীমতী তারা দেবী শ্রীমতী আশা দেবী শ্রীমতী মায়া দেবী শ্রীমতী আশা ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি মহিলাগণ প্রতিনিধি ও দর্শকরূপে সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য দর্শক এবং প্রতিনিধিগণ লইয়া দুই সহস্রাধিক লোক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন।

সঙ্গীত শাখার মনোনীত সভাপতি নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার ভাগিনেয়র বিবাহ জন্য তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় সঙ্গীত শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।
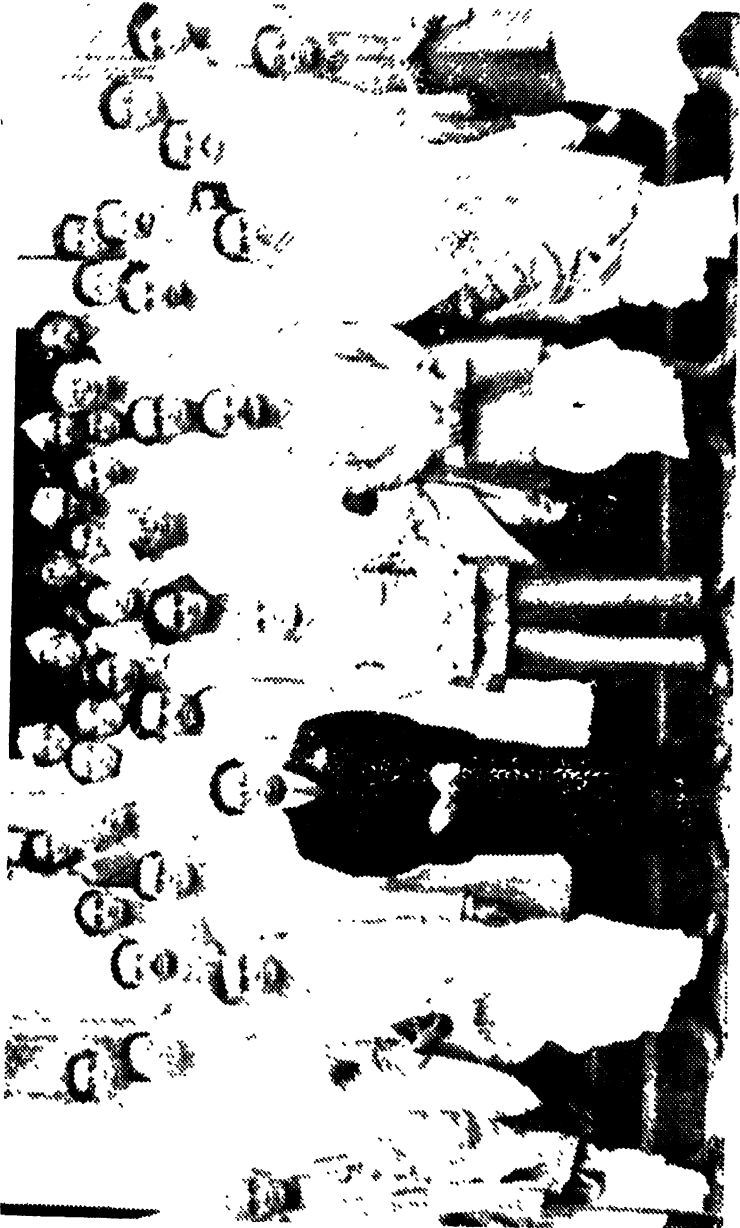
অধিবেশনের প্রথম দিবস।

২৯শে মাঘ ১৩৪৪—ইংরাজী ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ শনিবার।

অদ্যকার অধিবেশনে বেলা মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটার সময় সম্মেলনের মনোনীত মূলসভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সমবেত নরনারীর সসম্মান সম্বর্দ্ধনার মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ও সম্মেলন পরিচালন সমিতির সম্পাদকের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত দ্বারা সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার মিত্রের পরিচালনে কারমাইকেল বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকটি বালিকা ও স্থানীয় কয়েকটী বালক ছাত্রদ্বারা বন্দেমাতরম গানটী সম্পূর্ণরূপে গীত হয়। ঐ গান হইবার সময়ে সম্মেলনস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নিস্তব্ধ পূতচিত্তে বাণীর মন্দিরে এই মাতৃবন্দনায় যোগদান করেন। গান শেষ হইলে সকলে আসন গ্রহণ করিবার পর নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল তর্কতীর্থ ও শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ দেবভাষায় রচিত দুইটী মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। তৎপরে পূর্ব্ব অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কৃষ্ণনগর কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের জন্মস্থান, তাঁহার একটী নাটিকা "পুনর্জন্ম"র কথা যে তাঁর মনে পড়ছে সেটা বোধ হয় স্থানমাহাত্ম্য। "পুনর্জন্ম" নাটকে যেমন দুইভাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে, আজ যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে তারও পুনর্জন্ম হয়েছিল গত বৎসর চন্দননগরে। তার পূর্ব্বে কয়েক বৎসর কাল এই সাহিত্য সম্মেলন মৃতপ্রায় হয়েছিল। কোথাও তার অধিবেশন হতে পারে নাই। গত বৎসর চন্দননগরের অধিবেশনের মধ্য দিয়ে এই মৃতপ্রায় সাহিত্য সম্মেলনের পুনর্জন্ম হয়েছিল। এই যে পুনর্জন্ম হয়েছে এটা যেন অমর হয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে পুষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে। এই বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তা যেন অজর অমর হয়ে বাংলা সাহিত্যের চিরদিন শ্রীবৃদ্ধি করতে থাকে। এই যে এর পুনর্জন্ম হয়েছে তা যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারিত হয়ে সুপুষ্ট হয়ে বড় হবে এই তিনি আশা করেন। বীজ হতে বৃক্ষের পুষ্টি নির্ভর করে মালীর উপর। আজ এই সম্মেলনে যে পোক্তমালীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাঁর জলসেচনে এই সাহিত্যবৃক্ষ যে পুষ্টিত পুষ্পিত ও প্রতিপালিত হবে তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর যত্নে বৃদ্ধ তাঁহারা তাঁদের মধ্যেও সাহিত্য রসের পুনর্জন্ম হবে এটাও তিনি আশা রাখেন এবং বাগবাণীর অর্চ্চনা হ'ল—যিনি অচলা

অমলা ধবলা ও কমলা তাঁর কথা স্মরণ করে ও বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করে তিনি প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে এই সম্মেলনের মূল সভাপতি পদে বরণ করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপরোক্ত উদ্বোধন ও মূল সভাপতি বরণের বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত সাহিত্যিকগণকে সাদরসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণ এই কার্য্য বিবরণের (ছ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর সম্মেলন পরিচালন সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় কর্ত্তৃক শাখাসভাপতি ও সভানেত্রীদিগের বরণের পর তাঁহাদিগকে ও মূলসভাপতিকে সমবেত সকলের আনন্দ ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে পুষ্পমালা প্রদান করা হয়। এইরূপে সভাপতি বরণের পর কৃষ্ণনগর সুধানিলয়ের শ্রীমতী শোভা দেবী রচিত একটী উদ্বোধন সঙ্গীত পূর্ব্বোক্ত বালকবালিকাগণ কর্ত্তৃক গীত হয়। ঐ উদ্বোধন সঙ্গীতটী এবং কৃষ্ণনগরের শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী লিখিত অপর একটী অভিনন্দন কবিতা (ছ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার ঐ অভিভাষণ এই কার্য্যবিবরণীর (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ সকলে উদগ্রীব হইয়া নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করেন।

সভাপতির অভিভাষণের পর শ্রীযুক্ত নিত্যনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় সম্মেলনের গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী উপস্থিত করিলে তাহা গৃহীত হয় এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্মেলন পরিচালন সমিতির বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পঠিত হইয়া তাহা গৃহীত হইবার পর সম্মেলনে অনুপস্থিত সাহিত্যিকগণ রায় জলধর সেন বাহাদুর মহম্মদ হেমায়েতআলী কবিশেখর কালিদাস রায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রবাসীবঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী প্রভৃতি দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করা হয়।

অতঃপর স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন ও শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল মহাশয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন ও শোক প্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যুতে
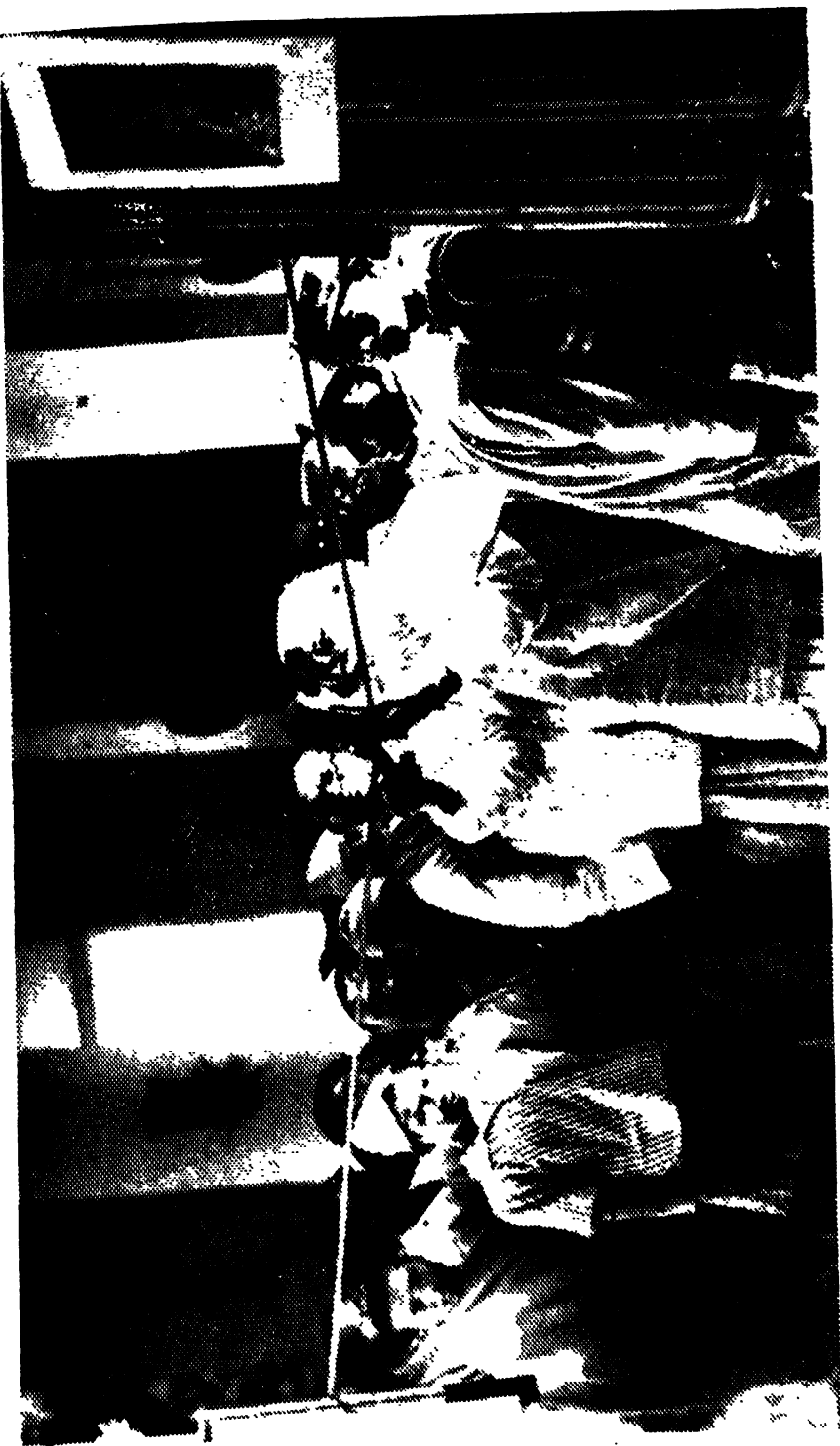
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্মেলনের প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন

শোক প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন ও শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব তিনটী গ্রহণ করেন। তাহার পর রায় যতীন্দ্র নাথ সিংহ বাহাদুর রায় বিহারী লাল সরকার বাহাদুর রঞ্জন বিলাস রায় চৌধুরী কুলদা প্রসাদ মল্লিক যোগীন্দ্র নাথ সরকার ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি ললিত মোহন কর ডাঃ রমেশ চন্দ্র রায় মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন বৈকুণ্ঠ নাথ সান্যাল সারদা চরণ ঘোষ ডাঃ সুরেশ চন্দ্র রায় রায় বিজয় কৃষ্ণ বসু বাহাদুর রমানাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ প্রসাদ বসাক হরেন্দ্র নারায়ণ কবিরঞ্জন অমৃত কৃষ্ণ মল্লিক ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ব্রজমোহন বর্ম্মন রেভাঃ বি, এ, নাগ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুগণ যাঁহারা গত এক বৎসরের মধ্যে পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য শোক প্রকাশ করা হয় ও শোকপ্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর বিষয়নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হয় ও বেলা ৩॥০ ঘটিকার সময় এই দিনের মত সাধারণ সভার কার্য্য শেষ হইয়া সাহিত্যশাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তাঁহার সুচিন্তিত প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কথাসাহিত্য শাখার অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে সভামণ্ডপের উত্তরপার্শ্বে নাটমন্দিরের অপরাংশে সাহিত্য ও শিল্পসম্বন্ধীয় যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া একটি বক্তৃতা করেন ও উহার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন হইলে সভাস্থ সকলে প্রদর্শনীর তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বেকার পুরাতন পুঁথি কাঠের পুঁথি পদকল্পতরুর দুইখানি পাটার ছবি নদীয়ার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি হস্তাক্ষর পাণ্ডুলিপি চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের হস্তাক্ষর ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রাচীন মানচিত্র প্রাচীনকালের মহাশঙ্খ মালা বল্কল গৌরাঙ্গ পদাঙ্কপূত ভারতের মানচিত্র নদীয়া জেলার অতীত এবং বর্ত্তমান লেখকগণের নামের তালিকা ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে আনীত তাঁহাদিগের রচিত দুই শতাধিক পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে আনীত অন্নদামঙ্গলের ১৭৬১ শকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কৃষ্ণনগরের নানাপ্রকার মৃৎশিল্প ও চিত্রাদি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

অতঃপর অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সভামণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিগণের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জলযোগের ব্যবস্থা ও একটি প্রীতি-সম্মেলন হয়। তাহাতে পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় ও ক্লান্তি অপনোদনের পর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় পুনরায় পদাবলীকীর্ত্তনশাখার অধিবেশন আরম্ভ হইয়া পদাবলী-কীর্ত্তন শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী তাঁহার সাধনার তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর সুললিত কণ্ঠস্বরে এবং বিষয়ের সুন্দর বিশ্লেষণে সকলেই আনন্দের সহিত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ শ্রবণ করেন। ইহার পর চারুকলাশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্যে জগতের বিখ্যাত চিত্রকরদিগের অঙ্কিত বিভিন্ন রকমের ছবির ও তাঁহার নিজের অঙ্কিত একটী ছবির আলোকচিত্র প্রদর্শনে তৎসহ মৌখিক অভিভাষণে চিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতা অতীব আনন্দপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। রাত্রি ৮॥০ ঘটিকাতে চারুকলা শাখার অধিবেশন এবং অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবস

১লা ফাল্গুন ১৩৪৪—১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ রবিবার

এইদিন প্রাতঃকাল হইতে শাখা সভাগুলির অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রাতে ৭॥০ ঘটিকায় প্রথমে দর্শন শাখার সভাপতি ডাঃ হরিদাস ভট্টাচার্য্য তাঁহার দার্শনিক অভিভাষণ পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। তাঁহার অভিভাষণ পাঠের পর স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কন্যা শ্রীযুক্তা মায়া দেবী কবিবরের ভ্রাতুষ্পুত্র-গণকে লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত "জননী বঙ্গভাষা" শীর্ষক সঙ্গীতটি গান করেন। শ্রীযুক্তা মায়া দেবীর নেতৃত্বে ও মধুর কণ্ঠে সঙ্গীতটি অপূর্ব্বভাবে সভাস্থলকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। ইহার পর সভামণ্ডপের একটি বিভাগে অর্থনীতি শাখার সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জ্ঞান ও উপদেশপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। তাঁহার অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে অর্থনীতিশাখার প্রবন্ধ পাঠ হইয়া উহার অধিবেশন শেষ হয়। সভামণ্ডপের অপর বিভাগে ইতিহাস শাখার সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী নদীয়া সম্বন্ধে তাঁহার নূতন তথ্য সম্বলিত গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন এবং বাংলার

ও নদীয়ার পুরাতন মানচিত্র সাহায্যে তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। তাঁহার অভিভাষণ পাঠের পর বিজ্ঞানশাখার সভাপতি ডাঃ কুদরত-এ-খুদা তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। তাঁহার অভিভাষণ পাঠের পর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ হইয়া বিজ্ঞানশাখার অধিবেশন শেষ হয় এবং বেলা ১১টার সময় সম্মেলনের কার্য্য বন্ধ হয়।

মধ্যাহ্নে ১২টার সময় প্রতিনিধিগণের আবাসস্থানের হলগৃহে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হয় এবং তাহাতে সম্মেলনে যে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে তাহা আলোচনান্তে স্থির হইয়া তাহার খসড়া প্রস্তুত হয়।

বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনের পর বেলা দেড়টা হইতে পুনরায় সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং সাংবাদিকশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণের অভিনবত্বে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই শাখায় কোন প্রবন্ধ না থাকায় ইহার অধিবেশন শেষ হইবার পর কাব্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক সমালোচনামূলক অভি-ভাষণ পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই অভিভাষণ পাঠের পর প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ হইয়া কাব্যশাখার অধিবেশন শেষ হয়। সভামণ্ডপের অপরাংশে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সভানেতৃত্বে কথাসাহিত্য শাখাতে প্রবন্ধ পাঠ হয় ও ঐ শাখার অধিবেশন শেষ হয়।

অতঃপর পদাবলীকীর্ত্তন শাখায় শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর সভানেতৃত্বে কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। সভানেত্রীর আহ্বানে শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় ডাঃ মহম্মদ সহীদুল্লা ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই আলো-চনায় যোগদান করেন। আলোচনায় বাসুলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এবং প্রাচীন পদাবলীর রচয়িতাকবি একই কবি চণ্ডীদাস কিনা এই লইয়া যে সমস্যার অবতারণা করা হয় তাহার সন্তোষজনক কোন মীমাংসা না হইলেও আলোচনাটী বহু তথ্য এবং গবেষণাপূর্ণ হওয়ায় সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই আলোচনার পর পদাবলীকীর্ত্তন শাখার অধিবেশন শেষ হয়।

অদ্য অপরাহ্ণে নদীয়ার মহারাজকুমারের পক্ষ হইতে সম্মেলনে উপস্থিত সমুদয় প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং অভ্যর্থনাসমিতির সভ্যগণকে রাজপ্রাসাদে জলযোগের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ঐ জলযোগ ও বিশ্রামের পর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মেলনের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে আগামী বৎসরের জন্য সম্মেলনপরিচালনসমিতির শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদক এবং ডাক্তার সত্যচরণ লাহা কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। সম্মেলনের অদ্যকার এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচারণ (Circulating) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরাজী স্কুল ও কলেজ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গলা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন।

(২) বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে এই সম্মেলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ কি নিম্ন সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মেলন বিবেচনা করেন যে শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।—(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গলা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গলা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। (খ) দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। (গ) উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি ও ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত। (ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। (ঙ) দেশের প্রাচীন

ইতিহাস, আচার ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধারসাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত। (চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বঙ্গভাষায় পঠনপাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করায় বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অচিরে এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করেন।

(৩) বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল ইঞ্জিনীয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপন ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

(৪) বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলন প্রস্তাব করিতেছেন যে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষি-কথা, ব্রত-কথা, উপ-কথা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ, হস্তলিখিত পুঁথি, এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া সমিতি গঠন করা হউক।

(৫) এই সম্মেলন স্থির করিতেছেন যে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলনের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

(৬) এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের পৃষ্ঠপোষক এবং অকৃত্রিম বন্ধু এবং বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলনের প্রথম উদ্যোক্তা অমরকীর্ত্তি পুণ্যশ্লোক দানবীর কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের নামে কলিকাতায় একটি সরকারী রাস্তার নামকরণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হউক।

(৭) ফুলিয়ায় অমর কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে কবি কৃত্তিবাস ওঝার দান অসামান্য। বঙ্গীয়সাহিত্য সম্মেলন শান্তিপুরসাহিত্যপরিষদকে প্রতি বৎসর কবির জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে কবির জন্মতিথি উৎসবের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৮) এই সম্মেলনের কার্য্য আলোচ্যবিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত হইবে, ইহার অতিরিক্ত আর কোন শাখা হইতে পারিবে না,—(ক) সাহিত্য-শাখা (খ) দর্শন-শাখা (গ) ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান-শাখা (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা। সম্মেলন-পরিচালন সমিতি উক্ত শাখা চতুষ্টয়ের প্রত্যেক শাখায়

আলোচ্য একটী বিশিষ্ট বিষয় ছয় মাস পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ই আলোচিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অভ্যর্থনা সমিতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আর একটী শাখার অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

উপরোক্ত প্রস্তাবাদি গৃহীত হইবার পর বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের ত্রিপুরা শাখার সম্পাদকের তারযোগে আমন্ত্রণে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলনের আগামী অধিবেশন কুমিল্লায় হইবে স্থির হয় এবং অদ্যকার মত সম্মেলনের কার্য্য শেষ হয়।

অতঃপর সম্মেলনে আগত প্রতিনিধি প্রভৃতিগণের চিত্তবিনোদনের জন্য অভ্যর্থনাসমিতি কর্তৃক "শকুন্তলা" নাটকের মূকঅভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় সিনেমাহলে রাত্রি ৯টা হইতে ঐ মূকঅভিনয় প্রদর্শিত হয়। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের দৌহিত্রী বঙ্গবাসীসম্পাদক ৺যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রীগণ ৺রামতনু লাহিড়ীর পুত্র শরৎ কুমার লাহিড়ীর পৌত্রী প্রভৃতি কুমারীবালিকাদিগের দ্বারা বিশেষ পারদর্শিতার সহিত ঐ অভিনয় ও নৃত্যাদি যন্ত্র সঙ্গীত সহ সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সকলেই সাগ্রহে এবং বিশেষ আনন্দের সহিত তাহা উপভোগ করিয়াছিলেন।

অধিবেশনের তৃতীয় দিবস।

২রা ফাল্গুন ১৩৪৪ সাল—১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ সোমবার

এইদিন প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকা হইতে সাহিত্য ইতিহাস ও দর্শন শাখার অধিবেশন সভামণ্ডপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন সান্যাল মহাশয় অদ্য সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন; তথায় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতাদি পাঠের পর ঐ শাখার অধিবেশন শেষ হয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইতিহাস শাখাতে প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় নদীয়ার পুরাকীর্ত্তি বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনার দিকে স্থানীয় ঐতিহাসিকদিগকে মনোযোগী হইতে বলেন কেননা বাংলার অতীত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের তথ্য নদীয়াতেই পাওয়া যাইবার সম্ভব। সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্যের পর ইতিহাস শাখার অধিবেশন শেষ হয়। দর্শন শাখার অধিবেশনে

শকুন্তলা নাটকের মঞ্চ-অভিনয়ে কুমারী বালিকাগণ

ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন এবং তাহাতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় "সাংখ্যের রূপ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সাংখ্য দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদয় আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেন। অন্যান্য দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠের পর দর্শন শাখার অধিবেশন শেষ হয়। কাব্য সাহিত্য পদাবলী ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবন্ধাদি সম্মেলনে আসিয়াছিল তাহার পঠিত এবং পঠিত বলিয়া গৃহীত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি এই কার্য্য বিবরণের (ঝ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

শাখা সভাগুলির অধিবেশন শেষ হইবার পর সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। মূল সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়া সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত করেন তাহার মর্ম্ম এই যে সাহিত্যসম্মেলন হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা হয় তাহা দ্বারা বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণালব্ধ ফলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। মানুষের জ্ঞানের পরিধি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, প্রত্যেকেরই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। সাহিত্য সম্মেলন এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে।

মূল সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর সম্মেলনপরিচালনসমিতির শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দকে ও কৃষ্ণনগরবাসীগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির ও কৃষ্ণনগরবাসীর পক্ষ হইতে সম্মেলনে সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা-গণকে এবং সম্মেলনপরিচালনসমিতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাঁহার এই ধন্য-বাদের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া নদীয়ার একাদশ বর্ষীয় সুকুমার মহারাজকুমার সৌরীশ চন্দ্র রায় নদীয়াবাসীর পক্ষ হইতে ও তাঁহার পক্ষ হইতে সম্মেলনে সমাগত সকলকে সুন্দর একটী বক্তৃতাদ্বারা ধন্যবাদ দিয়া মুগ্ধ ও আপ্যায়িত করেন। অতঃপর অদ্য বেলা ১১ ঘটিকাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলনের কৃষ্ণনগরে একবিংশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

সম্মেলনের আয় ব্যয়ের হিসাব তালিকা (ঞ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

উপসংহার।

কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল যাহা স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষের বাড়ী ছিল ঐ সুন্দর সুবৃহৎ ভবন এবং কৃষ্ণনগর এ, ভি স্কুল গৃহ দুই স্কুলেরই কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিগণের বাসের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। সম্মেলনের অধিবেশনের কয়দিন ঈদের ছুটী থাকায় স্কুল বন্ধ ছিল। প্রতিনিধি-গণের বাসস্থান এবং আহারাদির স্থানের ব্যবস্থা স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষের বাটীতেই হইয়াছিল। কর্ম্মী শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার গুপ্ত মহাশয়দিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে আহারাদি সম্বন্ধে সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে এবং উপরোক্ত দুই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার সহায়তার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

সম্মেলনের শিল্প প্রদর্শনীতে নদীয়ার জেলাবোর্ড তিনশত টাকা এবং কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপ্যালিটী একশত টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। নদীয়ার জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এবং কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র চন্দ্র মৌলিক এবং নদীয়ার কালেক্টর মিঃ এম এম ষ্টুয়ার্ট ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়গণ সম্মেলনের কার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তা করায় তাঁহাদিগের নিকট অভ্যর্থনা সমিতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

মহিলাদিগের বাসের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাত্র কলিজিয়েট স্কুলের সন্নিকটে তাঁহার একটী বাড়ী ছাড়িয়া দিলেও সম্মেলনে যে সকল মহিলা প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন স্থানীয় মোক্তার অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র নাথ রায় তাঁহার নিজ বাসবাটীতে তাঁহাদিগের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করায় অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা সুধা সেন সম্মেলনের মূল সভাপতি ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে তাঁহাদিগের বাটীতে রাখিয়াছিলেন ও সম্মেলনের কার্য্যে নানারূপ সাহায্য করিয়া-ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

অভ্যর্থনাসমিতি সম্মানিতঅতিথিদিগের যথাসম্ভব অসুবিধা নিবারণ জন্য স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন ভদ্র মহোদয়দিগের গৃহে সম্মেলনের শাখা সভাপতিগণের

ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী নদীয়ার মহারাণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহীতোষ বিশ্বাস তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্তের, শ্রীযুক্ত করুণাকুমার ভট্টাচার্য্য তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও তাঁহার কয়েকটী সঙ্গিনীর, শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর, শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাটীতে ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের, মৌলবী মহম্মদ হালিম তাঁহার বাটীতে ডাঃ কুদরত-এ-খুদার, মৌলবী এস, এম আকবরউদ্দীন তাঁহার বাটীতে ডাঃ মহম্মদ সহীদুল্লার, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ও শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাসস্থানের ও আহারাদির বিশেষ ব্যবস্থা করায় অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী শ্রীযুক্তা মায়া দেবী শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ দফাদার তাঁহাদিগের কুমারী কন্যাগণ দ্বারা "শকুন্তলা" মূকঅভিনয় করিবার অনুমতি দেওয়ায় অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

নদীয়ার সহৃদয়া মহারাণী সভামণ্ডপের জন্য রাজপ্রাসাদের নাটমন্দিরগৃহ ব্যবহার করিতে দেওয়ায় এবং অভ্যর্থনা সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করায় তিনি অভ্যর্থনা সমিতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন।

সম্মেলনের এই একবিংশ অধিবেশনের বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলনপরিচালন সমিতি বিশেষ করিয়া তাহার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সভ্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতিকে নানা প্রকারে সাহায্য করায় এবং কৃষ্ণনগর সুধানিলয়ের শ্রীমতী আশালতা দেবী সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন সময়ে ও প্রারম্ভে কার্য্যালয়ের পত্রাদি লিখিবার ভার লইয়া ও অভ্যর্থনাসমিতিরসভ্য আগত প্রতিনিধি ও সভাপতিগণের কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষণ (Badge) হইবে তাহার পরিকল্পনা করিয়া ও কতক উপলক্ষণ নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়া অভ্যর্থনা

সমিতির কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা সমিতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

সর্ব্বশেষে নদীয়াবাসী যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের উৎসাহে ও অর্থদানে এবং কর্ম্মীগণের চেষ্টায় সম্মেলনের কার্য্য সুসম্পন্ন হইল তাঁহাদিগের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভগবানের নিকট প্রার্থনা—বঙ্গীয়সাহিত্য সম্মেলনের একবিংশ কৃষ্ণনগর অধিবেশন সফল হউক—জন্মভূমির উন্নতিপথে বাণীর মন্দিরে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রদীপ চিরদিন জ্বলিতে থাকুক।

পরিশিষ্ট (ক)

কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সভ্যগণের নাম।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল

ঐ সহকারী সভাপতি—রায় সাহেব সুধেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক বি, এল

„ ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

„ লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম, এ, বি, এল

শ্রীযুক্তা অমিয়া দাশ গুপ্তা বি, এ

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল

যুগ্ম সহযোগীসম্পাদক—শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল

„ বিনায়ক সান্যাল এম, এ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল

মৌলবী ফজলুর রহমান এম, এ, বি, এল

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যান্য সভ্য—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল

শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

„ বৈদ্যনাথ পাত্র

„ পাঁচুগোপাল মদক

„ স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

„ অনন্তপ্রসাদ রায় বি, এ

„ নীহাররঞ্জন সিংহ সাহিত্যরঞ্জন

„ বিনয়কৃষ্ণ তরফদার বি, এ

„ ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী বি, এ

মৌলবী জহুরুদ্দীন বি, এল

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধীন ভিন্ন ভিন্ন সমিতি ও তাহার সভ্যগণের নাম-

প্রবন্ধনির্ব্বাচকসমিতি—শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল, আহ্বানকারী

শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
,, রাধারমণ গোস্বামী
,, সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, দেবনারায়ণ গুপ্ত

আহার ও বাসস্থান সমিতি—শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আহ্বানকারী
,, বৈদ্যনাথ পাত্র
,, সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
রায় সাহেব সুধেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌলবী জহুরুদ্দীন
,, ফজলুর রহমান
শ্রীযুক্তা অমিয়া দাশ গুপ্তা, আহ্বানকারী
" সুধা সেন
" হীরণবালা দাস
" নির্ম্মলনলিনী ঘোষ
" শৈলবালা মজুমদার
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ধর

প্রদর্শনী সমিতি—মৌলবী ফজলুর রহমান, আহ্বানকারী
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
" বিনায়ক সান্যাল
" নীহাররঞ্জন সিংহ
" শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিনয়কৃষ্ণ তরফদার
" দেবনারায়ণ গুপ্ত
" বীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

মণ্ডপসমিতি—রায় সাহেব সুধেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,
আহ্বানকারী
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাত্র
" সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দাক্ষী
" বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" কান্তিভূষণ চৌধুরী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মৌলবী আকবরউদ্দিন

প্রমোদোৎসব সমিতি - শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আহ্বানকারী
" ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" অনন্তকুমার মিত্র
" অনন্তপ্রসাদ রায়
" শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বীরেন্দ্র লাল রায়
" বিনায়ক সান্যাল
" বিনয়কৃষ্ণ তরফদার

স্বেচ্ছাসেবক সমিতি—শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আহ্বানকারী
শ্রীযুক্ত সুকুমার গুপ্ত
" স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ননী গোপাল চক্রবর্ত্তী
" সুহৃদকুমার চট্টোপাধ্যায়
" আনন্দচন্দ্র দাস
" গৌরচন্দ্র পাল
" জগন্নাথ মজুমদার
" নারায়ণচন্দ্র সরকার

পরিশিষ্ট (খ)

অভ্যর্থনাসমিতির সভ্যগণের নাম ও তাঁহাদিগের প্রদত্ত চাঁদা

১।	শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী	...	...	৫০৲
২।	„ বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	...	...	৫০৲
৩।	শ্রীযুক্তা শ্যামরঙ্গিনী রায় চৌধুরাণী শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী	}	...	৫০৲
৪।	” খগেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	...	২৫৲
৫।	” বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়	...	...	২৫৲
৬।	” বীরেন্দ্রমোহন মিত্র	...	...	২৫৲
৭।	” সুরেশচন্দ্র মজুমদার	...	...	২৫৲
৮।	” জিতেন্দ্রমোহন সেন	...	...	২০৲
৯।	” রবীন্দ্রকুমার মিত্র	...	...	২০৲
১০।	” শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২০৲
১১।	” শৈলেন্দ্রনাথ ধর	...	...	২০৲
১২।	” ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৫৲
১৩।	” নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৫৲
১৪।	” এম এম ষ্টুয়াট	...	...	১৫৲
১৫।	” সি ব্লোমফিল্ড	...	...	১৫৲
১৬।	” তপোগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	...	১৫৲
১৭।	” পাঁচুগোপাল মদক	...	...	১০৲
১৮।	” বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়	...	...	১০৲
১৯।	” মণিলাল কুণ্ডু	...	...	১০৲
২০।	” রামেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	...	১০৲
২১।	” রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	...	...	১০৲
২২।	” গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	...	...	১০৲
২৩।	” জ্ঞানদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	...	...	১০৲
২৪।	” লক্ষ্মীচাঁদ আগরওয়ালা	...	...	১০৲
২৫।	” মনোমোহন রায় চৌধুরী	...	...	১০৲
২৬।	” হরিরাম আগরওয়ালা	...	...	১০৲

২৭।	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	...	...	১০৲
২৮।	" নির্ম্মলচন্দ্র কুণ্ডু	...	...	১০৲
২৯।	" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	১০৲
৩০।	" পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী রায় বাহাদুর	...	...	১০৲
৩১।	" চুণীলাল মুখোপাধ্যায়	...	...	১০৲
৩২।	" প্রসাদচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	...	১০৲
৩৩।	" পশুপতি মুখোপাধ্যায়	...	...	১০৲
৩৪।	" সলিলনাথ ভট্টাচার্য্য	...	...	১০৲
৩৫।	" দুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	...	...	১০৲
৩৬।	" কুমারনাথ বাগ্‌চী	...	...	১০৲
৩৭।	" পঞ্চানন ঘোষ	...	...	১০৲
৩৮।	" বগলাপ্রসন্ন বসু	...	...	১০৲
৩৯।	" সত্যপ্রসন্ন মজুমদার	...	...	১০৲
৪০।	" প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	...	১০৲
৪১।	" জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী	...	...	১০৲
৪২।	" অমরেন্দ্রনাথ রায়	...	...	১০৲
৪৩।	" দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৮৲
৪৪।	" সত্যেন্দ্রকুমার বসু	...	...	৮৲
৪৫।	" হেমেন্দ্রকুমার বসু	...	...	৬৲
৪৬।	" জগৎবন্ধু মুখোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৪৭।	" তারকনাথ তালুকদার	...	...	৫৲
৪৮।	" হাজারীলাল বিশ্বাস	...	...	৫৲
৪৯।	" ভবেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৫০।	" লালজী মৌজী	...	...	৫৲
৫১।	" যজ্ঞেশ্বর সর	...	...	৫৲
৫২।	" জ্ঞানদানন্দ দাসগুপ্ত	...	...	৫৲
৫৩।	" সতীশচন্দ্র সাহা	...	...	৫৲
৫৪।	" মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য	...	...	৫৲
৫৫।	" অমিয়নাথ রায়	...	...	৫৲
৫৬।	" কুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৫৲

৫৭।	শ্রীযুক্ত শক্তিপদ লাহিড়ী	...	...	৫
৫৮।	" রাধাবল্লভ সরকার	...	...	৫৲
৫৯।	" বিনায়ক সান্যাল	...	...	৫৲
৬০।	" বিনয়কৃষ্ণ সাহা	...	...	৫৲
৬১।	" সুবিমল ঘোষ	...	...	৫৲
৬২।	" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৬৩।	" শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৬৪।	" নন্দলাল ভট্টাচার্য্য	...	...	৫৲
৬৫।	" সত্যশরণ কাহালী	...	...	৫৲
৬৬।	" প্রফুল্লকুমার হালদার	...	...	৫৲
৬৭।	" ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত	...	...	৫৲
৬৮।	" শিবেন্দ্রনাথ সিংহ	...	...	৫৲
৬৯।	" সতীনাথ রায়	...	...	৫৲
৭০।	" রায় মল্লিনাথ রায় বাহাদুর	...	...	৫৲
৭১।	" রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৭২।	" প্রবোধকুমার ঘোষ	...	...	৫৲
৭৩।	" ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৭৪।	" রাধাবিনোদ পাল	...	...	৫৲
৭৫।	" নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য	...	...	৫৲
৭৬।	" সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৭৭।	" শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	৫৲
৭৮।	" দ্বিজদাস মজুমদার	...	...	৫৲
৭৯।	" ক্ষিরোদচন্দ্র পাল চৌধুরী	...	...	৫৲
৮০।	" কালিপদ দাস	...	...	৪৲
৮১।	" বিরিঞ্চিকুমার মদক	...	...	৪৲
৮২।	" নিমাইচন্দ্র গড়াই	...	...	৪৲
৮৩।	" ভজনলাল আগরওয়ালা	...	...	৪৲
৮৪।	" মহাদেব আগরওয়ালা	...	...	৪৲
৮৫।	" বদ্রিনারায়ণ বেনারসিয়া	...	...	৪৲
৮৬।	" ভগীরথ ডুপওয়ালা	...	...	৪৲

৮৭।	শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দোপাধ্যায়	...	...	৪৲
৮৮।	মহম্মদ কাছের চৌধুরী	...	...	৪৲
৮৯।	শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	...	...	৪৲
৯০।	" অমূল্যনারায়ণ রায় রায়বাহাদুর		...	৪৲
৯১।	" মোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৲
৯২।	" সুহৃদকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৲
৯৩।	" কালীকুমার মৈত্র	...	...	৩৲
৯৪।	" বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
৯৫।	" পাঁচুগোপাল রায়	...	...	৩৲
৯৬।	" শচীন্দ্রনাথ সেন	...	...	৩৲
৯৭।	" বঙ্কেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
৯৮।	" তারাপদ রায়	...	...	৩৲
৯৯।	" নারায়ণচন্দ্র সরকার	...	...	৩৲
১০০।	" অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১০১।	" শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১০২।	" নীহাররঞ্জন সিংহ	...	...	৩৲
১০৩।	" মণীন্দ্রনাথ সরকার	...	...	৩৲
১০৪।	" কান্তিভূষণ দাস গুপ্ত	...	...	৩৲
১০৫।	" মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১০৬।	" পাঁচু দাস বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১০৭।	" করুণাময় লাহিড়ী	...	...	৩৲
১০৮।	" নিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১০৯।	" সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১১০।	" রমেশচন্দ্র সিংহ	...	...	৩৲
১১১।	" বসন্তকুমার প্রামাণিক	...	...	৩৲
১১২।	" নৃসিংহ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী	...	...	৩৲
১১৩।	" অনন্তকুমার মিত্র	...	...	৩৲
১১৪।	" রণেন্দ্রকুমার মিত্র	...	...	৩৲
১১৫।	" প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য	...	...	৩৲
১১৬।	" বিনয়কৃষ্ণ তরফদার	...	...	৩৲

১১৭।	শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত	...	...	৩৲
১১৮।	,, সুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলী	...	...	৩৲
১১৯।	,, সুধেন্দুমোহন বন্দোপাধ্যায় রায়সাহেব		...	৩৲
১২০।	,, নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১২১।	,, কামাখ্যাচরণ সেন	...	...	৩৲
১২২।	,, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১২৩।	,, মণীন্দ্রনাথ মিত্র	...	...	৩৲
১২৪।	,, বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত	...	...	৩৲
১২৫।	,, নলিনী মোহন সান্যাল	...	...	৩৲
১২৬।	,, গোপেন্দ্রনাথ সরকার	...	...	৩৲
১২৭।	,, মহীতোষ বিশ্বাস	...	...	৩৲
১২৮।	,, হৃদয় গোপাল বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১২৯।	,, নগেন্দ্র নাথ সরকার রায়সাহেব	...	...	৩৲
১৩০।	,, মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৩১।	,, শৈলেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৩২।	,, মহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	...	৩৲
১৩৩।	,, ননীগোপাল পাল	...	...	৩৲
১৩৪।	,, কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	...	৩৲
১৩৫।	,, কালীনাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৩৬।	,, মদনমোহন তত্ত্বনিধি	...	...	৩৲
১৩৭।	,, ভবপতি মৈত্র	...	...	৩৲
১৩৮।	,, সুধীরঞ্জন মিত্র	...	...	৩৲
১৩৯।	,, তারেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৪০।	,, অমর নাথ সিংহ	...	...	৩৲
১৪১।	,, নন্দলাল দাস	...	...	৩৲
১৪২।	,, বিজয় চন্দ্র আচার্য্য	...	...	৩৲
১৪৩।	,, সত্যেন্দ্রনাথ ধর	...	...	৩৲
১৪৪।	,, করুণা কুমার ভট্টাচার্য্য	...	...	৩৲
১৪৫।	,, সতীজীবন চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৪৬।	,, বিজয়কুমার বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲

১৪৭। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৪৮। „ ক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৪৯। „ মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৫০। মৌলবী জহুরুদ্দীন মহম্মদ ... ... ৩৲
১৫১। শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৫২। ” দ্বিজেন্দ্র নাথ সরকার ... ... ৩৲
১৫৩। ” লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ... ... ৩৲
১৫৪। ” অসীমানন্দ বন্দোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৫৫। ” জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৫৬। ” ভূপতি ভূষণ দে ... ... ৩৲
১৫৭। ” খগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৫৮। ” মাখন লাল সরকার ... ... ৩৲
১৫৯। ” সৌরীন্দ্র কুমার মিত্র ... ... ৩৲
১৬০। ” বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৬১। ” অতুল চন্দ্র কুণ্ডু ... ... ৩৲
১৬২। ” রমেন্দ্র নাথ রায় ... ... ৩৲
১৬৩। ” মোহিতকুমার কুণ্ডু ... ... ৩৲
১৬৪। ” হরিচরণ ঘোষ ... ... ৩৲
১৬৫। ” নন্দলাল ভট্টাচার্য্য ... ... ৩৲
১৬৬। ” উমাপদ ভট্টাচার্য্য ... ... ৩৲
১৬৭। ” বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া ... ... ৩৲
১৬৮। ” কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৬৯। ” বৈদ্যনাথ পাত্র ... ... ৩৲
১৭০। ” কালীপদ পাত্র ... ... ৩৲
১৭১। ” কানাইলাল দত্ত ... ... ৩৲
১৭২। ” প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ... ... ৩৲
১৭৩। ” সুধীন্দ্র চন্দ্র মৌলিক ... ... ৩৲
১৭৪। ” রোহিণী কুমার মিত্র ... ... ৩৲
১৭৫। ” সুধীর কুমার ঘোষ ... ... ৩৲
১৭৬। ” হারাধন দত্ত ... ... ৩৲

১৭৭।	মোল্লা মহম্মদ আবদুল হালিম	...	...	৩৲
১৭৮।	শ্রীযুক্ত করুণাময় মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৭৯।	মৌলবী ফজলুর রহমন	...	...	৩৲
১৮০।	শ্রীযুক্তা অমিয়া দাশগুপ্তা	...	...	৩৲
১৮১।	মৌলবী আব্বাছ্ আলি খাঁ	...	...	৩৲
১৮২।	শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৮৩।	„ কালীনাথ রায়	...	...	৩৲
১৮৪।	„ বিষ্ণুপদ বিশ্বাস	...	...	৩৲
১৮৫।	„ রাধারমণ গোস্বামী	...	...	৩৲
১৮৬।	„ ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	...	...	৩৲
১৮৭।	„ কাশীপ্রসাদ রায়	...	...	৩৲
১৮৮।	„ অনন্ত প্রসাদ রায়	...	...	৩৲
১৮৯।	„ সূর্য্যকান্ত সাহা	...	...	৩৲
১৯০।	„ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৯১।	মৌলবী মহম্মদ সুলেমান	...	...	৩৲
১৯২।	শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৯৩।	" বামাচরণ বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
১৯৪।	" তারকনাথ পালচৌধুরী	...	...	৩৲
১৯৫।	" বিশ্বনাথ পালচৌধুরী	...	...	৩৲
১৯৬।	শ্রীমতী বীণাপাণি পালচৌধুরী	...	...	৩৲
১৯৭।	শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহা	...	...	৩৲
১৯৮।	„ হেমন্ত কুমার সরকার	...	...	৩৲
১৯৯।	„ সর্ব্বরঞ্জন পালচৌধুরী	...	...	৩৲
২০০।	„ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
২০১।	„ অনুকূল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	.	৩৲
২০২।	„ বিধুভূষণ সেন	...	...	৩৲
২০৩।	„ বিমলা প্রসন্ন সেন	...	...	৩৲
২০৪।	„ সত্য গোপাল দত্ত	...	...	৩৲
২০৫।	„ রমেশ চন্দ্র রায়	...	...	৩৲
২০৬।	„ নির্ম্মল চন্দ্র ভদ্র	...	...	৩৲

২০৭। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত ... ... ৩৲
২০৮। " ভূপেন্দ্র নাথ সরকার ... ... ৩৲
২০৯। " প্রমথ ভূষণ পালচৌধুরী ... ... ৩৲
২১০। শ্রীযুক্তা মল্লিনা চট্টোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২১১। শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত চন্দ্র ... ... ৩৲
২১২। " শচীনন্দন তরফদার ... ... ৩৲
২১৩। " সুশীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২১৪। " দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২১৫। " শিশির কুমার হড় ... ... ৩৲
২১৬। শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা হড় ... ... ৩৲
২১৭। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মোহন আচার্য্য ... ... ৩৲
২১৮। " সুরেশ চন্দ্র ঘোষ ... ... ৩৲
২১৯। " দেবেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২২০। " নিশীথ রঞ্জন আচার্য্য ... ... ৩৲
২২১। " অনন্ত কুমার দত্ত ... ... ৩৲
২২২। " শৈলেন্দ্র নাথ সাহা ... ... ৩৲
২২৩। " দেবেন্দ্র কুমার সেন ... ... ৩৲
২২৪। " কৃষ্ণপদ বন্দোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২২৫। " বিষ্ণুপদ বন্দোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২২৬। " হরিপদ মুখোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২২৭। " জীবনানন্দ দাসগুপ্ত ... ... ৩৲
২২৮। " প্রভাস চন্দ্র প্রামাণিক ... ... ৩৲
২২৯। " বি সি চাটার্জ্জি ... ... ৩৲
২৩০। " অশ্বিনী কুমার মৈত্র ... ... ৩৲
২৩১। " মাখন গোপাল বন্দোপাধ্যায় ... ... ৩৲
২৩২। " ভোলা নাথ সরকার ... ... ৩৲
২৩৩। " আনন্দময় লাহিড়ী ... ... ৩৲
২৩৪। " অমরেশ ভট্টাচার্য্য ... ... ৩৲
২৩৫। " গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ... ... ৩৲
২৩৬। " স্মরজিৎ বন্দোপাধ্যায় ... ... ৩৲

২৩৭।	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ বিশ্বাস	...	...	৩৲
২৩৮।	" সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়	...	...	৩৲
২৩৯।	" বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
২৪০।	" নগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	...	...	৩৲
২৪১।	" ললিত মোহন মল্লিক	...	...	৩৲
২৪২।	" সত্যেন্দ্র ভূষণ মল্লিক	...	...	৩৲
২৪৩।	" ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য	...	...	৩৲
২৪৪।	" ডবলিউ বিন	...	...	৩৲
২৪৫।	" বঙ্কেশ্বর বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
২৪৬।	" ত্রিপুরা প্রসাদ পালচৌধুরী	...	...	৩৲
২৪৭।	" শৈলেন দাস	...	...	৲
২৪৮।	" মণীন্দ্র কুমার ঘোষ	...	...	৩৲
২৪৯।	" যতীন্দ্র নাথ দে	...	...	৩৲
২৫০।	শ্রীযুক্তা মায়া দেবী	...	...	৩৲
২৫১।	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র নাথ গোস্বামী	...	...	৩৲
২৫২।	" অনিল কুমার বিশ্বাস	...	..	৩৲
২৫৩।	" প্রভাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	...	৩৲
২৫৪।	মৌলবী মহম্মদ এলাহী	...	...	৩৲
২৫৫।	শ্রীযুক্ত অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৲
২৫৬।	" গোপাল চন্দ্র ঘোষ	...	...	৩৲
২৫৭।	" কান্তি ভূষণ চৌধুরী	...	...	৩৲
২৫৮।	" নলিনাক্ষ সান্যাল	...	...	৩৲
২৫৯।	" অমরেশ চন্দ্র রায়	...	...	৩৲
২৬০।	" দ্বিজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৲
২৬১।	" জিবেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত	...	...	৩৲
২৬২।	" কার্ত্তিক চন্দ্র দাসগুপ্ত	...	...	৩৲
২৬৩।	" তারক নাথ ভট্টাচার্য্য	...	...	৩৲
২৬৪।	" সতীশ চন্দ্র মৈত্র	...	...	৩৲
২৬৫।	" বিজয় কুমার দাস	...	...	৩৲
২৬৬।	" তিনকড়ি বাগচী	...	...	৩৲

২৬৭।	,, জনরঞ্জন রায়	...	...	৩৲
২৬৮।	” কল্যাণ কুমার দাসগুপ্ত	...	...	৩৲
২৬৯।	” শ্রীমন্ত দাসগুপ্ত	...	...	৩৲
২৭০।	মৌলবী এস্ এম আকবর উদ্দিন	...	...	৩৲

পরিশিষ্ট (গ)

১। নদীয়ার অতীত এবং বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণের নাম ও লিখিত গ্রন্থ—

নাম—	জন্মস্থান—	পুস্তক
৺অক্ষয় কুমার দত্ত	চূপী (পূর্ব্বে নদীয়ার মধ্যে ছিল)	চারুপাঠ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি
৺অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়	নওপাড়া থানার অধীন শিমলাগ্রাম	শিরাজদৌলা, মীরকাশিম প্রভৃতি
৺অবনীকুমার বসু	বীরনগর উলা	কবিতা লেখক
অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন	শান্তিপুর	কবিতা ও প্রবন্ধ
৺অঘোর নাথ গুপ্ত (সাধু)	শান্তিপুর	শাক্যমুনি
অনিল চক্রবর্ত্তী	দামুড়হুদা	মানসবীনা
৺অনুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বিল্লগ্রাম	উপনিষদ সম্বন্ধে গ্রন্থ
৺অনুকূল চন্দ্র বিশারদ	আম্মুলিয়া	আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ
আনন্দগোপাল গোস্বামী	নবদ্বীপ	সাধের বীণা
মোঃ আজিজুল হক খান বাহাদুর	শান্তিপুর	প্রবন্ধ লেখক
ইন্দুভূষণ সেন (কবিরাজ)	হরিপুর	বাঙ্গালীর খাদ্য পারিবারিক চিকিৎসা বাংলাদেশের গাছপালা, নেশা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	কাঁচড়াপাড়া পূর্ব্বে নদীয়ার অন্তর্গত	প্রভাকর পত্রিকা সম্পাদক কবিতা লেখক
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিচিত্রা সম্পাদক)	রাণাঘাট	শশীনাথ, রাজপথ, অভিজ্ঞান প্রভৃতি উপন্যাস
ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	রায়নগর বল্লভপুর	ভারতের ইতিহাস
এস এম আকবরউদ্দীন	কৃষ্ণনগর	সিন্ধুবিজয়, মাটির মানুষ
৺কৃত্তিবাস ওঝা (মুখোপাধ্যায়)	ফুলিয়া	বাংলা রামায়ণ
৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজা)	কৃষ্ণনগর	সাধন সঙ্গীত
৺কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর	নদীয়ার রাড়ে বাঁচাগ্রাম শেষ বয়সে শান্তিপুর	পাদপূরণ কবিতা
৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী	ভাজনঘাট	বিচিত্রবিলাস, রাই উন্মাদিনী
৺কৃষ্ণানন্দ বন্দোপাধ্যায়	রাণাঘাট	সুলেখা উপন্যাস
৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	শিবনিবাস	বঙ্গবাসী সম্পাদক
৺কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ	নবদ্বীপ	তন্ত্রসার প্রণেতা
৺কৃষ্ণচন্দ্র সরস্বতী	ধর্ম্মদহ	নাট্যপরিশিষ্ট
৺কালীময় ঘটক	রাণাঘাট	ছিন্নমস্তা, কৃষিশিক্ষা, চরিতাষ্টক, সুরেন্দ্র-জীবনী প্রভৃতি
৺কান্তি চন্দ্র রাঢ়ি	নবদ্বীপ	নবদ্বীপ মহিমা
৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (দেওয়ান)	কৃষ্ণনগর	ক্ষিতীশ-গ্রন্থাবলী চরিত, গীত মঞ্জরী, আত্মজীবন চরিত,
৺কুমুদনাথ মল্লিক (রায় বাহাদুর)	রাণাঘাট	নদীয়া কাহিনী, সতীদাহ
ডাঃ কালীকান্ত মুখোপাধ্যায়	মোল্লাবেলিয়া সুবর্ণপুর	চিকিৎসা প্রণালী ঔষধসার সংগ্রহ
করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়	শান্তিপুর	ঝরাফুল, শান্তিজল, প্রসাদী শতনারী প্রভৃতি গীতিকাব্য
কমলকৃষ্ণ মজুমদার	রাণাঘাট	গৃহানল-নাটক
কালাচাঁদ দালাল	শান্তিপুর	ব্রহ্মপ্রবাসীর পত্র

৺কালপ্রসন্ন প্রামাণিক	শান্তিপুর	বঙ্গাখ্যায়িকা
৺কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় (ঘটক)	রাণাঘাট	মালতীমাধব
৺কালিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	লোকনাথপুর	হিতবাদী সম্পাদক, সোলজার্স ওয়াইফ
৺কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ	স্বরূপগঞ্জ	জৈবধর্ম্ম, শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, প্রেমপ্রদীপ, ভাবুক লেখক, সন্ন্যাসী প্রভৃতি
৺কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হরিপুর	চপলা, কবিতা গ্রন্থ
কানুপ্রিয় গোস্বামী	ভাজনঘাট	বৈষ্ণবসাহিত্য গ্রন্থ
কুমার নাথ ভট্টাচার্য্য	বানপুর মাটিয়ারী	প্রভাবতী
৺কবি কর্ণপুর চৈতন্য	কাঁচড়াপাড়া	চন্দ্রোদয় নাটক
৺কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী	(মহারাজ গিরীশ চন্দ্রের সভার রসসাগর)	বাড়েবাঁকাগ্রাম
ক্ষীরোদ বন্দোপাধ্যায়	শান্তিপুর	বেগ ও উদ্বেগ
৺ক্ষেত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়	শান্তিপুর	ঐতিহাসিক উপন্যাস
ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু	উলা, বীরনগর	লালকাল, ইত্যাদী
গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়	কুষ্টিয়া	দীপিকা সম্পাদক পরিবর্ত্তন নাটক
পণ্ডিত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ	নবদ্বীপ	নবদ্বীপ পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক
৺গোপাল চন্দ্র গোস্বামী	শান্তিপুর	অমৃতবিন্দু
গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়	চুয়াডাঙ্গা	উষার আলো সম্পাদক ও লেখক
৺গিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়	গরিবপুর রাণাঘাট	অর্পণ, পরিমল, বেলা পত্র পুষ্প-কাব্য গ্রন্থ
গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	রাণাঘাট	ছোটগল্প লেখক
৺ঘনুরাম পণ্ডিত	আঁইসতলা	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কবির গান, পাঁচালী লেখক

৺চন্দ্র শেখর কর	কৃষ্ণনগর	অনাথ বালক, পাঁচ আনাজ, পাপের পরিণাম
৺চন্দ্র শেখর বসু	উলা, বীরনগর	অধিকার তত্ত্ব সৃষ্টি, বেদান্ত প্রকাশ, বেদান্তদর্শন, প্রলয়তত্ত্ব, বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি, পরলোক তত্ত্ব, হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ
৺চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়	বাগআঁচড়া	ভুতের খেলা, স্বদেশরেণু বাগ্দেবী মাহাত্ম্য, বিদ্য.- সাগর জীবন চরিত
চণ্ডীচরণ দে	শান্তিপুর	বীর আশানন্দ
৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	বজরাপুর (পূর্ব্বে নদীয়াতে ছিল)	কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ সংশোধক, কবিতা লেখক, পারসী অভিধান
৺জগদীশ্বর গুপ্ত	মির্জ্জাপুর (মেহেরপুর)	লীলাস্তবক, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
৺জগদানন্দ রায় (রায় সাহেব)	কৃষ্ণনগর	পোকামাকড় বৈতালিকী, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ
৺জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী	মাজদিয়া	জ্বর চিকিৎসা, চিকিৎসাতত্ত্ব, সহজ চিকিৎসা প্রভৃতি
৺জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়	রাণাঘাট	কবির গীত
৺জীবানন্দ মল্লিক	রাণাঘাট	অভিষেক কবিতা পুস্তক ও ডিটেকটিভ গল্প
৺জ্ঞানেন্দ্র লাল রায়	কৃষ্ণনগর	পতাকা নবপ্রভার সম্পাদক, সুলেখক
জ্ঞানেন্দ্র মোহন বাগচী	জামসেদপুর	বাঘের বাচ্চা
৺জয়গোপাল গোস্বামী	শান্তিপুর	সীতাহরণ, শৈবলিনী, রত্নযুগল, কাব্যদর্পণ, গোবিন্দ দাসের কড়চার সম্পাদক

জলধর সেন রায় বাহাদুর	কুমারখালি	ভারতবর্ষ সম্পাদক হিমালয় ভ্রমণ, নৈবেদ্য, প্রবাসচিত্র পথিক, ছোট কাকী প্রভৃতি
জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত	কুষ্টিয়া	তাতল সৈকতে প্রভৃতি
জগত্তারিণী দেবী	শান্তিপুর	কবিতা মালা
তরলিকা দেবী	শান্তিপুর	কবিতা লেখিকা
তারাপদ রায়	কৃষ্ণনগর	ভদ্রার্জ্জুন নাটক
তারাশঙ্কর তর্করত্ন	কাঁচকুলী	রাসেলাস কাদম্বরী
তারাপদ সান্যাল	হরিনাথপুর	স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রণেতা
৺তারপদ বন্দোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর	দার্জ্জিলিং প্রবাসীর পত্র
৺তারিণী চরণ চট্টোপাধ্যায়	নবদ্বীপ	ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল বিবরণ, ভূগোল প্রবেশ
৺দীনবন্ধু মিত্র	চৌবেড়িয়া গ্রাম (পূর্ব্বে নদীয়ার মধ্যে ছিল)	নবীন তপস্বিনী, নীলদর্পণ সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই-বারিক, লীলাবতী প্রভৃতি
৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়	কৃষ্ণনগর	চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, মেবার পতন, পরপারে, পুনর্জ্জন্ম, সীতা প্রভৃতি নাটক, হাসির গান ইত্যাদী
৺দামোদর মুখোপাধ্যায়	শান্তিপুর	মৃন্ময়ী, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, বিমলা, দুই ভগিনী, মা ও মেয়ে নবাব নন্দিনী প্রভৃতি উপন্যাস. শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা জ্ঞানাঙ্কুর প্রবাহ প্রভৃতির সম্পাদক।
দীনেন্দ্র কুমার রায়	মেহেরপুর	পল্লীচিত্র নন্দনে নরক জালমহস্ত, পিশাচ পুরোহিত, বাসন্তী ইত্যাদী

৺দীননাথ সান্যাল রায়বাহাদুর	কৃষ্ণনগর	মেঘনাথবধকাব্য সমালোচনা, সীতা প্রভৃতি গ্রন্থ
দ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী	শান্তিপুর	বিশ্ববৈতালিক
দীলিপ কুমার রায়	কৃষ্ণনগর	মনেরপরশ. দুধারা, দোলা প্রভৃতি
৺দ্বারিকা নাথ অধিকারী	গোস্বামী দুর্গাপুর	সুধীরঞ্জন
৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	উলা বীরনগর	গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী
৺দীন দয়াল প্রামাণিক	শান্তিপুর	পদ্যমালা
দেব নারায়ণ গুপ্ত	রাণাঘাট	গল্পে গীতা, ঋণ শোধ প্রভৃতি
দেবকণ্ঠ বাগচী	নবদ্বীপ	সঙ্গীত রচয়িতা
৺নরোত্তম দাস ঠাকুর	নবদ্বীপ	বৈষ্ণবপদাবলী
নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	আড়বান্দী	স্কুলপাঠ্য পুস্তক
নরেন্দ্র কুমার বসু	কৃষ্ণনগর	ইউরোপ ভ্রমণ
নিরুপমা দেবী	ভালুকা	দিদি, অন্নপূর্ণার মন্দির
নলিনী মোহন সান্যাল	শান্তিপুর	সুভদ্রাঙ্গী. গ্রীক পুরাণ ইত্যাদি
নলিনীকান্ত মজুমদার	রাণাঘাট	বেদের ঐতিহাসিকতা
নীহার রঞ্জন সিংহ	কৃষ্ণনগর	কল্লোলোক, বারোদোল, উপনিবেশে হিন্দু প্রভৃতি
৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	নারায়নপুর	গ্রীক ও হিন্দু, বাল্মিকী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ
৺প্রিয় কুমার চট্টোপাধ্যায়	আন্দুলিয়া	নীলাম্বর, অহোম্ ইত্যাদি উপন্যাস
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	গোঁড়পাড়া	ভারত পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	রাণাঘাট।	আকাশ প্রদীপ গল্পগ্রন্থ
৺প্রেমদাস বা পুরুষোত্তম মিশ্র	কুলিয়া নবদ্বীপ	চৈতন্য চন্দ্রোদয় অনুবাদক, বংশীশিক্ষা

৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসন	ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসবলী
ফজলুর রহমান	কামারী (কালীগঞ্জ)	জেবুন্নেসা কাব্য
৺ভারতচন্দ্র রায় (রায় গুণাকর)	কৃষ্ণনগর মহারাজার সভাকবি	অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর
ভূদেব শোভাকর (রায় সাহেব)	হরিপুর	সপ্তচিরজীবি কাব্য সঙ্গীত রচয়িতা
ভোলানাথ মজুমদার	কুমারখালি	অশ্রু কাব্য
৺মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	নবদ্বীপ	ন্যায়শাস্ত্রের টীকা
৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার	বিল্বগ্রাম	বাসবদত্তা, রসতরঙ্গিনী, শিশুশিক্ষা, সর্ব্বশুভঙ্করী পত্রিকার প্রচারক
৺মদন গোপাল গোস্বামী	শান্তিপুর	চৈতন্যচরিতামৃত
৺রাম মোহন বন্দোপাধ্যায়	মাটীয়ারী	রামায়ণ অনুবাদক
৺মধুসূদন কিন্নর	বনগ্রামের অধীন উলসী (পূর্ব্বে নদীয়ায় ছিল)	অক্রুর সংবাদ, কলঙ্ক ভঞ্জন, মাথুর কীর্ত্তন গানের পুস্তক
৺মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	নবদ্বীপ	পদার্থ দর্শণ, বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক
মীর মোসারফ হোসেন	কুষ্টিয়া লাহিণীপাড়া	বিষাদসিন্ধু
মহম্মদ দাদআলি	আটীগ্রাম (ছাতিয়ান পোঃ)	ভাঙ্গাপ্রাণ, আশক্কে রসুল প্রভৃতি
মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	রাণাঘাট	প্রশান্ত, চির-অপরাধী, বেলা, পরিমল, ইত্যাদি
মহম্মদ আজাহারউদ্দিন	কুষ্টিয়া	আলোকের পথে
৺মতিলাল রায়	নবদ্বীপ	রামবনবাস, ভীষ্মের শরশয্যা, নিমাইসন্ন্যাস, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ কর্ণবধ, রাবণবধ, ইত্যাদি

মোজাম্মেল হক	শান্তিপুর	ফেরদৌসী চরিত, জাতীয় মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ সাহনামার বঙ্গানুবাদ
মেঘেন্দ্রলাল রায়	কৃষ্ণনগর	গল্পলেখক
মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়	আন্দুলিয়া	গল্পলেখক
৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	সুবর্ণপুর	আর্য্যদর্শন সম্পাদক, হৃদয়োচ্ছ্বাস, চিন্তাতরঙ্গিনী, আত্মোৎসর্গ, কীর্ত্তিমন্দির, শান্তি পাগল, সমালোচনা-মালা, মদনমোহন তর্কা-লঙ্কারের জীবনী, গ্যারিবল্ড ম্যাটসিনী মিল ওয়ালেসের, জীবনবৃত্ত জ্ঞানসোপান, শিক্ষাসোপান প্রভৃতি গ্রন্থ
৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	গরীবপুর	যাত্রীবিদ্যা, সরল শরীর-পালন, ইত্যাদি
৺যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	হরিপুর	ধাত্রীশিক্ষা
যতীন্দ্র মোহন বাগচী	যমশেরপুর	অপরাজিতা. নাগকেশর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা
যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শান্তিপুর	জীবনসঞ্চার, নারীরত্নমালা
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	হরিপুর	মরীচিকা প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা
৺রঘুনাথ শিরোমণি	নবদ্বীপ	নবন্যায় ইত্যাদি
৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য (স্মার্ত্ত)	নবদ্বীপ	শাস্ত্র প্রণেতা
৺রামচন্দ্র দাস গোস্বামী	নবদ্বীপ কুলিয়া	বৈষ্ণবপদ রচয়িতা
৺রামপ্রসাদ (সাধক)	কৃষ্ণনগর মহা-রাজার সভাকবি	সাধন সঙ্গীত
৺রাম মোহন বন্দোপাধ্যায়	মাটিয়ারী	রামায়ন অনুবাদক
৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	গোস্বামী দুর্গাপুর	মিত্রবিলাপ, কাব্যকলাপ, রাজবালা, যৌবনোদ্যান, বাংলার ইতিহাস, প্রমথশিক্ষা প্রভৃতি

রাধাময় দে চৌধুরী	রাণাঘাট	নবোপাখ্যান
৺রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	গোস্বামী দুর্গাপুর	ভূবিদ্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি
রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় রায়বাহাদুর	কুড়ুলগাছি	অদ্ভুত রামায়ণ
৺রমণী মোহন মল্লিক	মেহেরপুর	চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস
৺রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (কবিরাজ)	কুমারখালি	হিতকথা, প্রকৃতি শিক্ষা, নীতিস্তবক, দ্রব্যগুণবারিধি ঋষি মাসিকপত্রিকার সম্পাদক
৺রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	হরধাম	বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু
৺রামনাথ তর্করত্ন	শান্তিপুর	বসুদেববিজয়, প্রভাতস্বপ্ন
রাধারাণী লাহিড়ী (কুমারী)	কৃষ্ণনগর	বামাবোধিনী পত্রিকার লেখিকা
রাজশেখর বসু (পরশুরাম)	উলা, বীরনগর	কজ্জলী, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্নভঙ্গ, চলন্তিকা অভিধান
রামপদ মুখোপাধ্যায়	শান্তিপুর	আবর্ত্ত
রঘুমণি বিদ্যাভূষণ	বহিরগাছি	দত্তচন্দ্রিকা
৺লোহারাম শিরোরত্ন	কৃষ্ণনগর	গীতিপুষ্পাঞ্জলি, মালতী মাধব, শিশুবোধ ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ, মুগ্ধবোধসার।
৺লাল মোহান বিদ্যানিধি	শান্তিপুর	কাব্য নির্ণয়, সম্বন্ধ নির্ণয়, আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা
৺লালনসাহী ফকির	ভাড়ারা কুষ্টিয়া	সাধন সঙ্গীত
৺ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায়	কাঁচকুলি	ফোয়ারা পাগলাঝোরা, অনুপ্রাস, ব্যাকরণ বিভিষিকা, বানান সমস্যা, কাব্যসুধা, কপালকুণ্ডলা তত্ত্ব
ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর	সুধাস্মৃতি, সুধাকণা, দুর্গোৎসব, প্রভৃতি
৺বাসুদেব সার্ব্বভৌম	নবদ্বীপ	ন্যায়শাস্ত্র ও কুসুমাঞ্জলী শ্লোকাংশ

৺বৃন্দাবন দাস	নবদ্বীপ	চৈতন্য ভাগবত,' নিত্যানন্দ বংশ লীলা
৺বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	দেবগ্রাম	অলঙ্কার কৌস্তুভ, শ্রীমদ্ভাগবত, স্বপ্নলীলামৃত মাধুর্য্য, কাদম্বিনী
৺বংশী বদন দাস (চট্টোপাধ্যায়)	কুলিয়া নবদ্বীপ	পদাবলী
৺বিষ্ণুরাম চট্টো াাধ্যায়	মেটিয়ারী	রামলীলামৃত গ্রন্থ. সঙ্গীত গ্রন্থ
৺বেচারাম লাহিড়ী	শান্তিপুর	সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ
৺বিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী	মায়াপুর	সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুবাদক, বঙ্গে সামাজিকতা. দিন কৌমুদি, ভৌম সিদ্ধান্ত, আর্য্যভট্টের আর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি।
বিনোদ বালা দেবী	কয়া (কুষ্টিয়া)	কবি ও লেখিকা
৺বেনোয়ারী লাল গোস্বামী	শান্তিপুর	খিঁচুড়ি পোলাও প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ
বিজয় লাল (চট্টোপাধ্যায়)	কৃষ্ণনগর	ডমরু প্রভৃতি
বীরেন্দ্র মোহন আচার্য্য	কৃষ্ণনগর	নদীয়ার ইতিহাস লেখক
বীনায়ক সান্যাল	শান্তিপুর	কবিতা লেখক
বিনয়কৃষ্ণ তরফদার	রাণাঘাট	কবিতা, প্রবন্ধ লেখক
৺বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী	নবদ্বীপ	ছাত্রশিক্ষা
বিভূতি ভূষণ ভট্ট	ভালুকা	গল্প লেখক
৺শিবচন্দ্র মহারাজা	কৃষ্ণনগর	সাধন সঙ্গীত
৺শ্রীশ চন্দ্র মহারাজা	”	”
৺শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম	নবদ্বীপ	পদাঙ্কদূত
৺শরত চন্দ্র শাস্ত্রী	নবদ্বীপ	দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, রামানুজ চরিত, শঙ্করাচার্য্য চরিত
৺শিবনারায়ণ শীরোমণি	নবদ্বীপ	শব্দার্থ মুঞ্জুরি, সংস্কৃত কণিকা

৺শ্যামাধব রায়	কৃষ্ণনগর	কবি রসসাগরের জীবন চরিত
৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	কুমারখালি	শৈবী গীতাবলী, তন্ত্রতত্ত্ব
৺শিবনাথ শাস্ত্রী	নবদ্বীপ	মেজবৌ, নয়নতারা প্রভৃতি
৺শ্যামাচরণ সরকার	মামজোয়ানী গ্রাম	ব্যবস্থাসার সংগ্রহ, ব্যবস্থা চন্দ্রিকা
৺শরৎশশী দেবী	কয়া (কুষ্টিয়া)	কবিতা রচয়িত্রী
শচীন্দ্র নাথ সান্যাল	শান্তিপুর	বন্দী জীবন
শশাঙ্ক কুমার পাত্র	রাণাঘাট	কবিতা লেখক
শচীন্দ্র নাথ মল্লিক	রাণাঘাট	গল্পলেখক
শৈলেশ নাথ মুখোপাধ্যায়	ধর্ম্মদহ	অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন
শ্যামাচরণ সান্যাল	শান্তিপুর	বহুরূপী কাব্য
ষষ্ঠী চরণ সেন	শান্তিপুর	কুসুম হার
সতু রায়	বৈঁচি (শান্তিপুর সন্নিকট)	গান রচয়িতা
৺সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ	নবদ্বীপ	আত্মতত্ত্ব প্রকাশ, ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি
সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	লোকনাথপুর	পল্লিকথা, মনোমুকুর
সরোজ কান্ত মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর	ছোট ২ গ্রন্থকয়েকখানি
সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য	অনন্তপুর (চুয়াডাঙ্গা মহকুমা)	মিলন মন্দির, ভিখারিনী, হেমচন্দ্র, ছিন্নমস্তা, ভবানীপাঠক জাহানারা, দীক্ষা ও সাধনা দেবতা ও আরাধনা প্রভৃতি উপন্যাস লেখক
সরোজ রঞ্জন চৌধুরী	খোকসা	কবিতা লেখক
৺সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি	আঁইসমাণি গ্রাম	সাজি, ছিন্নহস্ত, বঙ্গানুবাদিত কল্কিপুরাণ
সুশীলা সুন্দরী দেবী	নবদ্বীপ	কবিতা রচয়িত্রী

সুনীতি বালা ব্রহ্মচারী	শান্তিপুর	কবিতা রচয়িত্রী
সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী	ভাজনঘাট	স্নেহময়ী, ইত্যাদি
সেখ মহম্মদ জমিরুদ্দিন	গাঁড়াডোবা বাহাদুরপুর	বাংলা গজল, ইসলামের সত্যতা ইত্যাদী
সুজন মিত্র	বীরনগর উলা	মুস্তাফী বংশের পরিচয়
৺হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)	কুমারখালি	গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক, বিজয় বসন্ত, ব্রহ্মাণ্ড বেদ, ফিকির চাঁদ ফকির, বাউল সঙ্গীত, মাতৃমহিমা, পরমার্থগাথা, কবিকল্প, ভাবোচ্ছ্বাস প্রভৃতি
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	চৌগাছা (পূর্ব্বে নদীয়ায় ছিল)	বিপত্নিক ইত্যাদি
হরি মোহন সেন	কাঁচড়াপাড়া	শকুন্তলা, তুলসীদাসের রামায়নের লেখক
হেমন্ত কুমার সরকার	কৃষ্ণনগর	যুগশঙ্খ, ছায়াবাজি, উল্টাকথা, বন্দীর ড[illegible]
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর	সঙ্গীত সুধা
হরিপদ মুখোপাধ্যায়	হরিপুর	বসন্ত উৎসব কাব্য
৺হরনাথ মিত্র	কৃষ্ণনগর	রহস্য সন্দর্ভ
৺হরি মোহন মুখোপাধ্যায়	শান্তিপুর	টডের রাজস্থান
৺হরি সাধন মুখোপাধ্যায়	বিল্বগ্রাম	রূপের মোহ
হেমচন্দ্র মিত্র	উলা	"বীরাঙ্গনার পত্রোত্তর কাব্য", দেবব্রত
হেমচন্দ্র বাগচী	কৃষ্ণনগর	দীপান্বিতা, তীর্থপথে
হরিবালা দেবী	নবদ্বীপ	সতীসংবাদ কাব্য
যোগীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত শিরোমণি	নবদ্বীপ	ব্যবস্থাকল্পদ্রুম
ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার	নবদ্বীপ	শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদানের ঐতিহাসিক বিচার

কাশীনাথ চন্দ্র	রাণাঘাট	গল্প ও কবিতা লেখক
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	শান্তিপুর	সাহিত্যে শান্তিপুরের দান
কুমারেশ ঘোষ	কুষ্টিয়া	গল্প লেখক
কৃষ্ণলাল সরকার	রাণাঘাট	উপন্যাস ও কবিতা লেখক
ক্ষেত্র কুমার গুপ্ত	ভাজনঘাট	শিশু সাহিত্যের লেখক
গুরু চরণ মুখোপাধ্যায়	আম্বুলিয়া	গল্প ও কবিতা লেখক
গোপাল ভাঁড়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ সভার রস রচয়িতা	
দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	শান্তিপুর	কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক
দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দৌলতপুর	প্রবন্ধ লেখক
ননী গোপাল চক্রবর্ত্তী	কৃষ্ণনগর	প্রবন্ধ লেখক
নীতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	আম্বুলিয়া	শিশুসাহিত্য রচয়িতা
নলিনীকান্ত মজুমদার	রাণাঘাট	বেদের ঐতিহাসিকতা, দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্য জাতি
যোগানন্দ প্রামাণিক	শান্তিপুর	ব্রহ্মসংহিতা
রাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায়	রাণাঘাট	
৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী	শান্তিপুর	ধর্ম্মগ্রন্থ লেখক
৺জীতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	মুড়াগাছা	অনাথা, অভিসপ্ত
৺মধুসূদন তর্ক পঞ্চানন	বহিরগাছি	বামোনোপাখ্যান রামরাজ্যাভিষেক
নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বহিরগাছি	বাঙ্গালীর খাদ্য বিজ্ঞান
মাখন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বহিরগাছি	পরতত্ত্ব
বিমলেন্দু ধর	কুমারখালি	প্রবন্ধ লেখক
রামলাল চক্রবর্ত্তী	শান্তিপুর	নলিনী ইত্যাদী উপন্যাস
বিরেশ্বর প্রামাণিক	শান্তিপুর	অদ্বৈত বিলাস
ব্রজনাথ চন্দ	শান্তিপুর	পদ্যলতিকা

এই পরিশিষ্টে গ্রন্থকারগনের নাম যতদুর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে মাত্র তাহাই অন্তর্ভূক্ত করা হইল।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ

	নাম—	গ্রন্থ—
১ ।	বাসুদেব সার্ব্বভৌম (বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৪৪৫ খৃঃ অঃ	সার্ব্বভৌমনিরুক্ত ন্যায়গ্রন্থ
২ ।	রঘুনাথ শিরোমণি	আত্মতত্ত্ববিবেক প্রামাণ্যবাদ ইত্যাদি
৩ ।	রঘুনন্দন স্মার্ত্ত	স্মৃতিতত্ত্ব, আহ্নিকতত্ত্ব ইত্যাদি
৪ ।	কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ	তন্ত্রসার, শ্রীতত্ত্ববোধিনী
৫ ।	রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি	
৬ ।	হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার	চিন্তামণির আলোকের টীকা
৭ ।	জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি	ন্যায়সিদ্ধান্ত মঞ্জরী
৮ ।	মথুরানাথ তর্কবাগীশ	রঘুনাথের দীধিতির টীকা ইত্যাদি
৯ ।	রামভদ্র সার্ব্বভৌম	সমাসবাদ, তত্ত্বদীপিকা প্রকাশ ইত্যাদি
১০ ।	ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ	সারমঞ্জরী-কারকচক্র ইত্যাদি
১১ ।	মধুসূদন বাচস্পতি—	
১২ ।	রুদ্রাম তর্কবাগীশ	অধিকরণ চন্দ্রিকা, চিত্ররূপ পদার্থ ইত্যাদি
১৩ ।	বাসুদেব সার্ব্বভৌম (গঙ্গোপাধ্যায়) ১৬০০ খৃঃ	অদ্বৈতমকরন্দ, বেদান্ত গ্রন্থের টীকা
১৪ ।	দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ	কবিকল্পদ্রুমের টীকা
১৫ ।	হরিরাম তর্কবাগীশ	অনুমিতি বিচার, রত্নকোষ ব্যাখ্যা নব্যমতরহস্য ইত্যাদি
১৬ ।	কাশীশ্বর বিদ্যানিবাস—	
৭ ।	রুদ্রনাথ ন্যায় বাচস্পতি	ভ্রমরদূত খণ্ডকাব্য
৮ ।	বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন	ভাষাপরিচ্ছেদ, অবলোক, গুণনিরূপণ
৯ ।	জগদীশ তর্কালঙ্কার	ন্যায়দর্শন, মঙ্গলবাদ, মুক্তিবিচার
০ ।	রঘুনাথ (ঐ পুত্র)	সাংখ্যতত্ত্ব বিলাস
১ ।	রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ	সুবোধিনী
২ ।	গদাধর ভট্টাচার্য্য	প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যবাদ, সাদৃশ্যবাদ, শক্তিবাদ মুক্তিবাদ
২৩ ।	গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ	ন্যায় রহস্য
২৪ ।	[illegible]দেব ন্যায়ালঙ্কার	ঈশ্বরবাদ, নিরুক্তিপ্রকাশ, হেতুত্বখণ্ডন

২৫।	শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার	ভাবদীপিকা
২৬।	রাম ন্যায়পঞ্চানন	ব্যাখ্যাসুধা
২৭।	জয়রাম তর্কালঙ্কার	শক্তিবাদের টীকা
২৮।	শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি	দায়ভাগের টীকা
	১৫০০ খৃঃ অঃ	
২৯।	রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার (ঐ পুত্র)	দায়ভাগ টীকা
৩০।	রামেশ্বর তান্ত্রিক	তন্ত্রপ্রমোদন
৩১।	রঘুমণি (ঐ পুত্র)	আগমসার দত্তক চন্দ্রিকা
৩২।	শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম	কৃষ্ণপদামৃত এবং পদাঙ্কদূত কাব্য
	১৮০০ খৃঃ অঃ	
৩৩।	চন্দ্রশেখর বাচস্পতি	স্মৃতি প্রদীপ, ধর্ম্মবিবেক
৩৪।	শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার	জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের টীকা এব দায়ক্রম সংগ্রহ
	১৮০০ খৃঃ অঃ	
৩৫।	রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (বুনো)	ন্যায়েরটীকা ও গ্রন্থ
৩৬।	কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ	চৈতন্যচিন্তামৃত, কামিনীকামকৌতুক কাব্য এবং ন্যায়রত্নাবলী, তন্ত্ররত্নাবলী ইত্যাদি
৩৭।	হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত	
৩৮।	শঙ্কর তর্কবাগীশ	
৩৯।	শরণ তর্কালঙ্কার (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত)	
৪০।	শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি	
৪১।	কাশীনাথ চূড়ামণি	
৪২।	শ্রীরাম শিরোমণি	
৪৩।	মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	শক্তিবাদের টীকা
৪৪।	গোলকনাথ ন্যায়রত্ন	
৪৫।	হরমোহন চূড়ামণি	
৪৬।	প্রসন্ন তর্করত্ন	
৪৭।	হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত	
৪৮।	সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম	
৪৯।	মঃ মঃ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন	রাধাপ্রেমতরঙ্গিনী কাব্য

৫০।	মঃ মঃ রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন	
৫১।	মঃ মঃ যদুনাথ সার্ব্বভৌম	
৫২।	মঃ মঃ কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ	সাংখ্যদীপনী, ন্যায়তত্ত্ববোধিনী
৫৩।	মঃ মঃ আশুতোষ তর্কভূষণ	
৫৪।	মঃ মঃ সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি	বহু সংস্কৃত বাংলা গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর সংস্কৃত অনুবাদক
৫৫।	মঃ মঃ চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ	
৫৬।	গোপাল ন্যায় পঞ্চানন	
৫৭।	দেবী তর্কালঙ্কার	
৫৮।	রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (গেঁয়ে।	
৫৯।	শ্রীনাথ শিরোমণি	
৬০।	বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন (মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সময়ে)	
৬১।	রামানন্দ বাচস্পতি	ঐ
৬২।	লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ (মহারাজ গিরিশচন্দ্র সময়ে)	
৬৩।	ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন	চৈতন্য চন্দ্রোদয়
৬৪।	শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি	স্মৃতিবিচারসার কৌমুদী
৬৫।	মঃ মঃ মধুসুদন স্মৃতিরত্ন	
৬৬।	মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন	বাদদূত কাব্য
৬৭।	হরিশচন্দ্র তর্করত্ন	
৬৮।	যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ	
৬৯।	শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি	ভারতের দণ্ডনীতি, অলঙ্কার দর্পণ
৭০।	কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন	সৎকাব্যকল্পদ্রুম
৭১।	মঃ মঃ অজিত নাথ ন্যায়রত্ন	সংস্কৃত শ্লোক রচয়িতা
৭২।	শিবনারায়ণ শিরোমণি	সংস্কৃত কলিকা প্রথম পাঠ্য পুস্তক
৭৩।	দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন	বিল্বপুষ্করনী
৭৪।	মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	ঐ
৭৫।	প্রাণগোপাল তর্কতীর্থ	
৭৬।	ত্রিপথ নাথ স্মৃতিতীর্থ	
৭৭।	গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ	
৭৮।	আশুতোষ তর্কসিদ্ধান্ত	

৭৯। মনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ

৮০। কেদারনাথ কাব্য সাংখ্যতীর্থ

৮১। শিবনাথ তর্কতীর্থ

৮২। যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ

প্রদর্শনীতে সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যে বিশেষ কয়েকটীর পরিচয়—

১। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের স্বহস্ত লিখিত মহাভারতের আদিপর্ব্বের পুঁথি লিপিকাল—১৩৯০ শকাব্দ।

২। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাধুভজনতত্ত্ব

৩। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু,

৪। গীত গোবিন্দের বঙ্গানুবাদ (দাসীনন্দনকৃত)

৫। পদকল্পতরুর তুইখানি পাটার ছবি

৬। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীআমলের তুইখানি প্রাচীন মানচিত্র

৭। শ্রীচৈতন্যচরণপূত ভারতবর্ষের ম্যাপ

৮। ভোজরাজকৃত অর্থনীতি শাস্ত্রের পুরাতন পুঁথি

৯। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর কতকাংশের সরল সংস্কৃত কবিতা রচনা

১০। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন পণ্ডিতের ফটোচিত্র ও ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

১১। একখানি সচিত্রতন্ত্রের পুঁথি—তন্ত্রোক্ত প্রত্যেক যন্ত্রের চিত্রাদি সহ—

১২। অতি প্রাচীন তালপত্রের চণ্ডী

১৩। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্রের হস্তাক্ষর সম্বলিত পত্রাদি

১৪। মুদ্রারাক্ষসের সচিত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

১৫। ফকিরলালন সাই ও কাঙাল হরিনাথের পাণ্ডুলিপি

১৬। কবি ভারতচন্দ্রের হস্তাক্ষর

১৭। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পাণ্ডুলিপি

১৮। প্রাচীন ঋষিগণের পরিধেয় সুদীর্ঘ বৃক্ষজাত বল্কল

১৯। ইঙ্গুদিফল

২০। চণ্ডালাহি নির্ম্মিত মহাশঙ্খের মালা

পরিশিষ্ট (ঘ)

নিমন্ত্রিত সুধী সাহিত্যিক ও লেখকগণের নামের তালিকা

(* চিহ্নিত ব্যক্তিগণকে প্রবন্ধ ও রচনাদির জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল)

নাম	ঠিকানা
অদ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৮এ সদানন্দ রোড, কালীঘাট
অধ্যাপক অমূল্য চন্দ্র সেন	হিন্দু একাডেমী, দৌলতপুর, খুলনা
অশোক চট্টোপাধ্যায়*	20, Mullen St, Cal.
অনুরূপা দেবী*	১৬৯এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিঃ
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ*	৫ যদু মিত্র লেন, কলিঃ
অনাথবন্ধু দত্ত*	১৬ পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিঃ
অমল চন্দ্র হোম*	৯৯।১-এন্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিঃ
অনঙ্গ মোহন সাহা	৭ ঈশ্বর মাল লেন, কলিঃ
অক্ষয় কুমার নন্দী	Economic Jewellery, ১০ চৌরঙ্গী রোড, কলিঃ
অবনী নাথ রায়	Military account office, Allahabad
অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়*	১ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিঃ
অতুল চন্দ্র গুপ্ত*	১২৫ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ
ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর	২৯ সদানন্দ রোড, কালিঘাট, কলিঃ
অক্ষয় কুমার দত্ত গুপ্ত	Librarian, Bengal Library, Writers' Building.
অম্বুজ নাথ বন্দোপাধ্যায়	১৬৯-এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিঃ
অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার	Translater, Bengal Govt. Writers' Building.
অনাথ গোপাল সেন*	৩০১ আপার সার্কুলার রোড কলিঃ
অনাথ নাথ বসু	৩ ন্যায়রত্ন লেন, কলিঃ
অজিত ঘোষ	৪১ শ্যামবাজার ষ্ট্রিট, কলিঃ
অজর চন্দ্র সরকার	কদমতলা, চুঁচুড়া
কবিরাজ অমরেন্দ্র নাথ রায়	৩৫।১ গুলু ওস্তাগার লেন, কলিঃ
অরবিন্দ দত্ত	[illegible] রাজেন্দ্র লাল ষ্ট্রিট, কলিঃ
অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর	৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিঃ

অসিত কুমার হালদার	...	Principal, Govt. School of Arts & Crafts, Lucknow.
অন্নদা শঙ্কর রায়* I. C. S	...	রাজশাহী
অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ	...	১৫ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা
অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	...	৯ নন্দ রাম সেন ষ্ট্রীট
অখিল নিয়োগী	...	৭৬।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিঃ
অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত	...	৩০ গিরীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ
অক্রুর চন্দ্র ধর	...	লালপুর, কালীনগর, ঢাকা
কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ	...	৪, রস্তমজী পার্শী ষ্ট্রীট, কলিঃ
মিসেস অমিয়া রাও	...	C/o S. D. O. Midnapur
অপূর্ব্ব কুমার চন্দ	...	৭ [illegible] রোড
অনিল কুমার চন্দ	...	শান্তিনিকেতন, বোলপুর
অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়
অময় কুমার সেন	...	৭৫ বালিগঞ্জ প্লেস
ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর*	...	২৮ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কালীঘাট
অশোক নাথ ভট্টাচার্য্য	...	৪১ বাগবাজার ষ্ট্রীট
অরুণচন্দ্র দত্ত*	...	প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর
অমূল্য ধন মুখোপাধ্যায়*	...	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
শ্রীমতী অমিয়া দেব	...	১০ মহানির্ব্বাণ রোড
আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়*	...	১১১-বি হরিতকী বাগান লেন, কলিঃ
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	...	অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী
আশুতোষ সান্যাল	..	৫৯।১এ পটুয়াটোলা লেন, কলিঃ
ডঃ আদিত্য নাথ মুখোপাধ্যায়	..	১০ মোহন লাল ষ্ট্রীট, কলিঃ
আবু সৈয়দ আয়ুব	..	১৪ ওয়াইলউল্লা লেন, কলিঃ
আক্রাম খাঁ	..	৯১ আপার সাকুলার রোড, কলিঃ
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ*	.	সুচক্রদণ্ডী, পটীয়া, চট্টগ্রাম
আশালতা দেবী*	..	ভাগলপুর
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী	..	৫৬ আপার সাকুলার রোড
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	...	১৭ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার
আশামঞ্জু মল্লিক	...	২৬।১ লেক রোড

আশা চাটার্জ্জি	...	২০।১ মদন মিত্র লেন
আসিমা খাতুন এল-এম-এফ	...	রাজসাহী
আব্দুল কাদির	...	৯১ আপার সার্কুলার রোড
কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন	...	৯১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ
ইন্দিরা দেবী	...	২।১ ব্রাইট ষ্ট্রীট
অধ্যাপক উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী
ডাঃ উপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	...	৯৭ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ
উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় জ্যোতিরত্ন	...	কোন্নগর, হুগলী
ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল*	...	২১ বাদুর বাগান রো কলিঃ
উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	বিচিত্রা সম্পাদক, ২৭।১ ফড়িয়াপুকুর লেন, কলিঃ
উপেন্দ্র নাথ সেন	...	১৭ মদন বড়াল লেন, কলিঃ
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ
স্যর উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী	...	১৯ লাউডন ষ্ট্রীট
উমাদেবী কাব্যনিধি*	...	পিত জওহর কোয়ার্টার্স, মিরাট
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	এ ভি স্কুল, শ্যামবাজার, কলিঃ
মহম্মদ এ, কে এম, শামসুদ্দিন	...	৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ
ডক্টর এ, পি, দাশগুপ্ত	...	১১১ রসারোড কলিঃ
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্	...	১৯ সার্কাস্ রোড, পার্কসার্কাস, কলিঃ
ওয়াজিদ আলি বি এ (ক্যানটাব)	..	৫২ লোয়ার সার্কুলার রোড
রায়বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	৪ পঞ্চাননতলা লেন, শ্রীরামপুর
পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী	...	১১এ অপূর্ব্ব মিত্র রোড, কালীঘাট
কালিদাস রায় কবিশেখর*	...	৯ সাহানগর রোড, কালীঘাট, কলিঃ
কিরণ ধন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	উত্তর পাড়া হুগলী
কেশব চন্দ্র গুপ্ত	...	পি-২৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিঃ
কুমুদ রঞ্জন মল্লিক	...	মাথরুন, কৈচর, বর্দ্ধমান
কুমুদ বন্ধু রায়	...	৪৬ ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ
কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	...	১১৬ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ
কালাচরণ মিত্র	...	৬এ ভীম ঘোষ লেন
কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়*	...	প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ

কান্তি চন্দ্র ঘোষ	...	'সৈকত', খড়দহ, ২৪ পরগণা।
কান্তি চন্দ্র ঘোষ	...	পি ৭৬ লেক রোড
ডক্টর কালিদাস নাগ*	...	পি-২৮৩ দরগা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিঃ
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	...	১।৩ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর,
কিরণ কুমার রায়	...	'বঙ্গশ্রী' সম্পাদক, ৯০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিঃ
কিরণচন্দ্র দত্ত*	...	লক্ষ্মীনিবাস, ১ লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার
কুমুদিনী বসু*	...	কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ
করুণাকণা গুপ্তা	...	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
কল্যাণী মল্লিক	...	৫৪ হাজরা রোড, কলিঃ
কমলা ঠাকুর	...	৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিঃ
কল্যাণী গুপ্তা	...	২০ বি হাজরা রোড, কলিঃ
কল্যাণী চক্রবর্ত্তী	...	৭৮ বি, আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিঃ
কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	পি ২৫ ল্যান্স্ডাউন রোড এক্স্টেনশন
ডক্টর কৃষ্ণ বিনোদ সাহা	...	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কার্ত্তিক চন্দ্র দাস গুপ্ত	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ক্ষিতিমোহন সেন	...	শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম
ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী*	...	পাটনা বাজার, মেদিনীপুর
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ক্ষণপ্রভা দেবী	...	৪ গোবরা রোড
রাজা কমলা রঞ্জন রায়	...	কাশিম বাজার
কুমার হেমপুর	...	হেমপুর
রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর*	...	৬ বালীগঞ্জ প্লেস্, কলিঃ
অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ সেন	...	বিদ্যাসাগর ভবন, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিঃ
মৌলবী খাঁ মহম্মদ মৈনুদ্দিন	...	৯১ আপার সার্কুলার রোড
ডক্টর গিরীন্দ্র শেখর বসু*	...	১৪ পার্শী বাগান লেন কলিঃ
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	বসু বিজ্ঞান মন্দির, ৯৩ আপার সার্কুলার রোড

গোপাল চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ... ৯৩ই বৈঠকখানা রোড, কলিঃ
ডাঃ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিঃ
গিরিজা কুমার বসু ... ৩৩ সিমলা ষ্টিট, কলিঃ
গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী ... পি ২২২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ
গোপাল দাস চৌধুরী ... সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ
গুরুদাস রায় ... বলাগড়, হুগলী
গুরুদাস সরকার ... Dy. Magt., বসিরহাট
গজেন্দ্র সরকার ... ১০ সন্তোষ দত্ত রোড, কালীঘাট
গুরুদাস ভড় ... ১৫ পেয়ারা বাগান ষ্টিট, কলিঃ
গায়ত্রী দেবী ... ৮০-এক ল্যান্সডাউন রোড, কলিঃ
গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য ... Principal, Training College বরোদা
গুরুসদয় দত্ত I. C. S ... ১২ লাউডন ষ্টিট কলিঃ
গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... ৬৯ বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিঃ
গীতা চাটার্জ্জি বি এ, বি টি ... ২৬ ম্যাকলিয়ড ষ্টিট, কলিঃ
মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ ... দেবগ্রাম আখৌড়া, পোঃ ত্রিপুরা
মহম্মদ গোলাম মুস্তাফা ... মাদ্রাসা, কলিকাতা
গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ* ... ১৩ চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার
জ্ঞানাঞ্জন পাল ... সি পিয়ারি মোহন সুর লেন
বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস ... ৫৮ পদ্মপুকুর রোড
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ১৫ দিলখুসার ঢাকা
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য* ... ১১ স্যর কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট
চারুচন্দ্র দাস গুপ্ত* ... ৩এ জনক রোড
চন্দ্রকুমার সরকার* ... ১৭বি গোপীমোহন দত্ত লেন
চামেলি দত্ত* এম, এ ... ব্রাহ্ম গার্ল স্কুল, কলিঃ
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ... রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল
জীবনময় রায় ... ২১০১ কর্ণওয়ালিস ষ্টিট
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ* ... ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা
রায় জলধর সেন বাহাদুর ... ১৭০এ কেশব সেন ষ্টিট, কলিঃ
জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার সি, ই, বি, এস, সি ... ১ রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিঃ

জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী	...	৯০ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিঃ
ডঃ জে এন মুখার্জ্জি ডি এস সি	..	৯২ আপার সার্কুলার রোড—
অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	..	৩৮২ রাসবিহারী এভিনিউ
" জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২১৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক বেদান্ততীর্থ		২৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
মৌলবী মহম্মদ জসিমদ্দিন	...	P G Research Scholar আশুতোষ বিল্ডিং, কলিঃ
জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	...	বঙ্গবাসী কলেজ, কলিঃ
জ্যোতিপ্রভা দাশ গুপ্ত* এম এ বি টি	.	৪৩ হাজরা রোড
জিতেন্দ্রশঙ্কর দাস গুপ্ত	...	২৭ মনোহর পুকুর রোড
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	লাভপুর বীরভূম।
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	...	২৪ শ্রীকৃষ্ণ লেন, কলিঃ
তারাদাস মুখোপাধ্যায়	...	৬০বি মৃজাপুর ষ্ট্রীট
তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	...	অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী
তারকেশচন্দ্র চৌধুরী	...	নর্ম্মরাপুর, ডুমরা গ্রাম, বগুড়া।
তারাপ্রসন্ন ঘোষ	...	৬ যদুনাথ সেন লেন, কলিঃ
তমাল লতা বসু*	...	৫৩ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিঃ
তটিনী দাস	...	Principal Bethune College. কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিঃ
তিনকড়ি দত্ত	...	ই আই আর, লিলুয়া.
তমোনাশ দাসগুপ্ত	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিদিবনাথ রায়	...	১৯ শ্রীনাথ মুখার্জ্জি লেন, ঘুঘুডাঙ্গা দমদম, ২৪ পরগণা
তেজময়ী সরকার	...	Inspectress of Schools, ঢাকা
তরুবালা সেন বি. এ*	...	৩০২ আপার সারকুলার রোড
খান বাহাদুর তছদ্দক আহম্মদ	...	১০ সার্কাশরেঞ্জ
তারকনাথ গাঙ্গুলী	...	৬।৫।১ডি একডালিয়া রোড বালীগঞ্জ
মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ*	...	২১এ গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিঃ
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন*	...	বেহালা, ২৪ পঃ
অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ*	...	১২এনর্থান বাগান লেন,

দেবপ্রসাদ ঘোষ* কিউরেটার	...	আশুতোষ মিউজিয়াম, সিনেট হাউস, কলি
অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য	...	২৫ নিলমণি মিত্র রোড, টালা, কলিঃ
দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়,	...	কান্দী স্কুল, কান্দী, মুরশিদাবাদ
অধ্যাপক দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়*	...	৯৮ লেকরোড, বালীগঞ্জ, কলিঃ
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	...	পি ৭৭ লেক রোড, কলিঃ
দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য	...	সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা
দ্বিজেন্দ্রনাথ বড়ুয়া,	...	৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিঃ
দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল	...	১৮এ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর
দ্বিজপদ ভট্টাচার্য্য,	...	বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর
দীনেন্দ্রকুমার রায়,	...	C/o বসুমতী কার্য্যালয়, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রিট কলিঃ
দিলীপকুমার রায়*	...	অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচারী
দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়*	...	৩৩ ম্যাক্লাউড ষ্ট্রিট, কলিঃ
দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	এলাহাবাদ
দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার	...	নহাটী, বীরভূম
ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র	...	১২ থিয়েটার রোড
কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	লালগোলা, মুরশিদাবাদ
ডক্টর ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	অধ্যাপক লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ,
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,	...	অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ, স্কট্স্ লেন, কলিঃ
ধীরেন্দ্র নাথ রায়	...	৫১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিঃ
ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন	...	শান্তিনিকেতন, বীরভূম
রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব,		৯ বিশ্বকোষ লেন, কলিঃ
নলিনীকান্ত সরকার	...	৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিঃ
নলিনীকান্ত সরকার	...	১ গরষ্টীন প্লেস, কলিঃ
নিখিলেন্দ্র নাথ অধিকারী	...	দুবলহাটী রাজসাহী।
ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত*	...	৮৮এ ল্যান্সডাউন রোড
নরেন্দ্র দেব* ভালোবাসা,	...	৭১।২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিঃ
ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	...	৯৯।১বি মাণিকতলা স্পার, কলিঃ

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত*	...	৪৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রিট, কলিঃ
নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ,	...	৩৫এ সিমলা ষ্ট্রিট কলিঃ
নীরদচন্দ্র চৌধুরী	...	২২২।২২৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ
নির্ম্মলকুমার বসু	...	৬।১ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রিট, কলিঃ
ঐ	...	১২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট
নরেন্দ্রনাথ বসু	...	৩৭ বাদুড়বাগান ষ্ট্রিট, কলিঃ
নিত্যধন ভট্টাচার্য্য	...	এড়িয়াদহ, ২৪ পঃ
রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর		সিউড়ী, বীরভূম
নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	সিউড়ী, বীরভূম
নলিনীমোহন সান্যাল	...	শান্তিপুর, নদীয়া
নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	...	৮বি ঈশ্বরমিল লেন, কলিকাতা
নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত	...	Indian Research Home, ১৭০ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ
নির্ম্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ
অধ্যাপক নির্ম্মল কুমার সিদ্ধান্ত	...	লক্ষ্ণৌ
ননীগোপাল মজুমদার	...	Indian Museum, কলিকাতা
ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী*	...	Dacca Museum, রমণা, ঢাকা।
অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রী	...	এম সি কলেজ, শ্রীহট্ট
নরেন্দ্রনাথ দেব	...	৭৮ বীডন ষ্ট্রিট কলিঃ
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	...	খনিগানি, চন্দননগর।
স্যর নীলরতন সরকার	...	৭ সর্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ
নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	...	Govt. Epigraphist of India, Ootcamond, Nilgiri hills.
নিরুপমা দেবী	...	বহরমপুর
নীলিমা মুখার্জ্জি	...	৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড
ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন	...	92, Upper Circular Road
নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়	...	"বার্ত্তাবহ" সম্পাদক, চুঁচুড়া
নলিনীকান্ত গুপ্ত	...	অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী।
নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী	...	"কেশবধাম" সোণারপুরা, বেনারস্ সিটি,

নজরুল ইস্‌লাম কাজী ... ৭৩ডি, হর্‌ঘোষ ষ্ট্রিট, কলিঃ

নীরেন্দ্রনাথ রায় ... ৭ রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রিট, কলিঃ

নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় .. Indian Press, এলাহাবাদ।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ... ৩০ তারক চাটুর্য্যের লেন, কলিঃ

ডাঃ নীলরতন ধর* ... Allahabad University

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... সৌরভ কার্য্যালয়, ময়মনসিংহ

নৃপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৪ চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার

নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ ... কুচবিহার কলেজ, কোচবিহার।

ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ... ৮ প্রিটোরিয়া ষ্ট্রিট, কলিঃ

নিবারণ চন্দ্র রায় ... অধ্যাপক স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার, কলিঃ

প্রোঃ এন মিত্র এবং মিসেস মিত্র ... ১০৮।১৩ বকুলবাগান রোড

নারায়ণ চন্দ্র মৈত্র ... বনহুগলী, বরানগর

নীহাররঞ্জন রায় ডি লিট* ... ৯৩ হরিশ মুখার্জ্জি রোড

আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সায়েন্স কলেজ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ

ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী* ... ২১ কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া, কলিঃ

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র . ২২ গড়পার রোড, কলিঃ

" প্রফুল্লকুমার বসু* ... ৯২ আপার সার্কুলার রোড

প্রমথ নাথ চৌধুরী* ... ১।১ ব্রাইট ষ্ট্রিট, বালীগঞ্জ, কলিঃ

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ... ৯ হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রিট, কলিঃ

প্রমথনাথ সরকার ... ৬।২বি একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ গৌহাটী।

প্রফুল্লকুমার সরকার ... ১৪বি রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রিট, কলিঃ

প্রফুল্লময়ী দেবী .. ২৭ মনোহরপুকুর রোড

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ২৭ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলি

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১০বি নলিন সরকার ষ্ট্রিট, কলিঃ

প্রিয়রঞ্জন সেন* কাব্যতীর্থ ... ১ ডোভার লেন, বালীগঞ্জ, কলিঃ

প্রভাসচন্দ্র সেন, .. বগুড়া

প্যারীমোহন সেন গুপ্ত ৫ ক ডা যাউ লেন, কলিঃ

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি	...	রিপণ কলেজ, ১৪ হ্যারিসন রোড, কলিঃ
শ্রীমতী পূর্ণপ্রভা দাস গুপ্তা	...	৩ রায় ষ্ট্রিট কলিকাতা
শ্রীমতী প্রতিভা নাগ	...	আনন্দময়ী গার্লস্ স্কুল, ঢাকা
" প্রতিভা দেবী বি এ বি টি	...	বেথুন কলেজ কলিঃ
" প্রতিভা সেন বি এ বি টি	...	৬০বি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রিট, কলিঃ
পশুপতি ভট্টাচার্য্য	...	১৬ বাগবাজার ষ্ট্রিট
মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ	..	২ বি অন্নদা ব্যানার্জি লেন, ভবানীপুর
পঞ্চানন তর্করত্ন	...	ভাটপাড়া ২৪ পরগণা
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	বসুমতী ১২৬ বউবাজার ষ্ট্রিট
প্রবোধ চন্দ্র সেন	...	৭৪ সার্পেনটাইন লেন, কলিঃ
প্রবোধ চন্দ্র সেন	...	অধ্যাপক, হিন্দু একাডেমী, দৌলতপুর, খুলনা
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী*	...	৩৯।৪সি মাণিকতলা স্পার
ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী*	...	৯ রুস্তমজী ষ্ট্রিট, বালীগঞ্জ, কলিঃ
প্রমথ নাথ ঘোষ	...	পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ
পূর্ণ চন্দ্র দে উদ্ভটসাগর	...	১০ নেবুতলা লেন, বাগবাজার, কলিঃ
পি কে আচার্য্য*	...	এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়
পুলিন বিহারী সেন	...	প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ
প্রমদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কটন কলেজিয়েট স্কুল, গৌহাটী
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	...	৩৩ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রিট, কলিঃ
পি, এন, ব্যানার্জ্জি	...	১৪ ক্যামাক্ ষ্ট্রিট, কলিঃ
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	...	শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম
প্রকাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১২ মুকুলেশ্বর তলা লেন
প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৫৭ হরিশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রিট, কলিঃ
প্রমদ কুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১১ দেবেন্দ্র সেন রোড, কসবা ঢাকুরিয়া
প্রমথ রঞ্জন দত্ত	...	মতিঝিল কলোনি, দমদম, ২৪ পঃ
প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কৃষ্ণপুর রোড, পোঃ দমদম
প্রভাবতী রায়	...	ইডেন গার্লস্ স্কুল ঢাকা

প্রভাময়ী গুহ	...	দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, ১০৯ আপার সার্কুলার রোড
প্রতিমা ঘোষ	...	৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড
প্রতিভা দেবী	...	C/o Sj. Anupam Banerjee. George Town, Allahabad.
প্রমিলা চৌধুরাণী	...	৪২ ঝাউতলা রোড
প্রমোৎপল বন্দোপাধ্যায়	...	৪ প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী লেন, আলমবাজার, ২৪ পঃ
প্রভাতকিরণ বসু	...	২।১ রাজা বাগান জংশন রোড
পাঁচুগোপাল ঘোষ	...	কাঁথী, মেদিনীপুর
প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়	...	৬৯এ হরিশ মুখার্জ্জি রোড
রায়বাহাদুর প্রমোদা চরণ দত্ত	...	শিলং
প্রবোধচন্দ্র সান্যাল	...	১।১ ভানসিটাট রো
মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ*	...	৮০।৫ হ্যারিশন রোড, কলিঃ
ফণীন্দ্র নাথ পাল	...	২৬।৩ স্কটস্ লেন, কলিঃ
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	ভারতবর্ষ কার্য্যালয়, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিঃ
ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ডি এস সি	...	৮ গড়পার রোড
বেগম ফাজিলতুন্নেছা জোহা এম এ	...	বেথুন কলেজ
ফরাজুল হোসেন	...	ময়েসুদ্দিন ইনষ্টিটিউট বগুড়া
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়	...	১১ আরপুলি লেন
বিমল ঘোষ	...	৪৩ চক্রবাড়িয়া রোড সাউথ
বীনাপানী বসু এম এ বি টি	...	বীনাপাণী পর্দ্দা গার্ল্স হাই স্কুল কলিঃ
বিজয় চন্দ্র মজুমদার*	...	৩৩।১সি ল্যান্সডাউন রোড, কলিঃ
মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী*	...	৬৩ সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ কলিঃ
বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ*	...	বোড়াইচণ্ডীতলা, চন্দননগর
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়*	...	Flat E-2, ১১১।১১৩ আপার সার্কুলার রোড
বিশ্বপতি চৌধুরী	...	অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার*	...	ব্রজেন্দ্র মোহন দাস রোড, বাঁকীপুর পাটনা।
ডক্টর বিমান বিহারী দে ডি এস সি	..	প্রেসিডেন্সি কলেজ, মাদ্রাজ
বিষ্ণু দে*	...	অধ্যাপক পি-২৪১-ডি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ
শিশু মুখার্জ্জি	...	৮ দীনবন্ধু লেন
ব্রজ মাধব রায়	...	পাটনা বাজার, মেদিনীপুর
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য*	...	১৬ টাউনশেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিঃ
বিশ্বেশ্বর দাস	...	১।১ ভানসিটার্ট রো
ডঃ ব্রজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	...	সায়ান্স কলেজ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড
ডক্‌টর বিভুতি ভূষণ দত্ত*	...	ধর্ম্মসিন্ধু আশ্রম, গুজরা নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম
ডক্‌টর বিমলা চরণ লাহা	...	৪৩ কৈলাস বসু ষ্ট্রিট, কলিঃ
ডক্‌টর বেণীমাধব বড়ুয়া	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য	...	৬৪ বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিঃ
বিনয়কুমার সরকার*	...	৪৫ পুলিশ হাসপাতাল রোড, কলিঃ।
বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ	..	৯৫।১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ।
শ্রীমতী বিভূবালা বকসী	...	বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় ময়মনসিং
ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য	...	Oriental Institute, বরোদা।
ব্রজমোহন দাস,	...	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ, কামখিয়া, হাওড়া।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	...	১ গরষ্টীন প্লেস, কলিঃ
অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য	...	২ বি অন্নদা ব্যানার্জ্জি লেন, ভবানীপুর।
বিভাস রায় চৌধুরী	...	৩বি, জনক রোড, কালীঘাট, কলিঃ
বনমালী বেদান্ততীর্থ	...	৮।৪ নেপাল ভট্টাচার্য্য ২য় লেন, কালীঘাট।
ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়	..	১৩২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ।
ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	...	Station Road, ভাগলপুর।
ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন,	...	বেহালা, ২৪ পঃ
রায়বাহাদুর বিহারীলাল সরকার	...	পি-৩৭৭এ মনোহরপুকুর রোড, কলিঃ।
ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিঃ।

মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ	...	চতুষ্পাঠী বৰ্দ্ধমান।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রিট, কলিঃ।
বিভূতি ভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	খিলাতচন্দ্র ইন্‌স্‌টিটিউসন ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
বুদ্ধদেব বসু অধ্যাপক	...	রিপণ কলেজ ২০১ রাসবিহারী এভিনিউ
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	'দেশ' কার্য্যালয়, ১বর্ম্মণ ষ্ট্রিট, কলিঃ।
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	পি ৬১ একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ।
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	সম্পাদক দিপালী ১ অবিনাশ মিত্র লেন.
ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়	...	৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিঃ।
বি এম সেন	...	২০ মে ফেয়ার বালীগঞ্জ।
ডাঃ বিনদবিহারী দত্ত*	...	মতিঝিল দমদম।
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	৯ তালতলা লেন।
স্যর বদরীদাস গোয়েঙ্কা	...	১৪৫ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ	...	১৩৯।৩ রসা রোড।
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য	...	১৭ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার।
ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত*	...	৩ গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিঃ।
ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র,	...	প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিঃ।
ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী	...	কৃষ্ণপুর, কালীতলা, হুগলী।
ভূপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী	...	৯৩ই বৈঠকখানা রোড, কলিঃ।
ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	...	বসিরহাট, ২৪ পঃ
শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ	...	দেশবন্ধু গার্ল স্কুল।
স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৮।১ হারসি ষ্ট্রিট।
মহারাজা স্যার এম এন রায় চৌধুরী	..	১ রাজা সন্তোষ রোড।
মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ.	..	২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার, কলি.
মন্মথমোহন বসু	...	১৯ গোকুলমিত্র লেন, বাগবাজার কলিঃ।
মনোমোহন ঘোষ	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
মতিলাল রায়*	...	'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ', চন্দননগর।
মাধবদাস চক্রবর্ত্তী	..	অধ্যাপক বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।
মোতিলাল মজুমদার	...	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
মহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডক্টর)	...	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
মহম্মদ কুদরত-এ খুদা (ডক্টর)	..	৭ কাটুয়াখাঁটি লেন, ভবানীপুর।

মণীন্দ্রমোহন বসু*	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
মহেন্দ্রনাথ দাস	...	মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর।
মনীষিনাথ বসু সরস্বতী*	...	কেরানীটোলা, মেদিনীপুর।
মণীন্দ্রলাল বসু	...	১৮১ কংগ্রেস একজিবিসন রোড, কলিঃ।
মনোজ বসু	...	১২ লাউডন ষ্ট্রীট, কলিঃ।
মনোজ বসু	...	১ অভয় সরকার লেন,
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যার	...	'শরৎকুটীর', প্রিন্স রহিমুদ্দিন লেন, টালীগঞ্জ, কলিঃ।
মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়	...	২১ এফ্ রাণীশঙ্করী লেন, কালীঘাট কলিঃ
ডঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য	...	৭২।৬৭ চণ্ডেল রোড বালিগঞ্জ।
মন্মথনাথ ঘোষ,	...	৩ কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট, কলিঃ
মৃগাঙ্কনাথ রায়	...	৩৫ কাঁকুড়গাছী ৩য় লেন, কলিঃ
মনোরঞ্জন রায়	...	৮ ইন্দ্ররায় ষ্ট্রীট, কাশীপুর
মহম্মদ মনসুর উদ্দীন,	..	শিক্ষক হাওড়া জেলা স্কুল, হাওড়া।
মৈত্রেয়ী দেবী	..	৪৮।৮ মনোহরপুকুর রোড
মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	..	বেথুন কলেজ, কলিকাতা।
মীরা দত্ত গুপ্ত এম এ এম এল এ.		বিদ্যাসাগর কলেজ, ঐ
ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার*	...	প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।
ডক্টর মেঘনাথ সাহা*	...	এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।
মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	..	D' 50/66 A, Laski kundu, Benares city
মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	...	২৭ শ্যামানন্দ রোড, ভবানীপুর।
মানকুমারী বসু	...	ফেরিঘাট, খুলনা।
মমতা ঘোষ	..	৬এ ভীম ঘোষ লেন
মনীষ ঘটক,	...	Income tax officer, মেদনীপুর।
মনীষ মুখার্জ্জি	...	২৫।২সিএ কাঁকুলিয়া রোড, বালীগঞ্জ।
মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা
মণীন্দ্র দত্ত	...	১।১ ভানসিটার্ট রো
মেঘেন্দ্রলাল রায়	...	৭১ বালীগঞ্জ প্লেস্, কলিঃ
মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার	...	অধ্যাপক বাঁকীপুর পাটনা কলেজ, পাটনা

রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর	···	সন্ত পুষ্করিনী, শ্যামপুর, রংপুর।
মণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	···	জালিয়াতলা লেন, কলিঃ।
শ্রীমতী মালতী সেন এম এ	···	৫৭।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
মনসুরুদ্দিন	···	২২৯ বেলিলিয়স রোড, হাওড়া।
মহম্মদ মোদাব্বর সাহেব	···	৯১ আপার সাকুলার রোড।
মহম্মদ মুজিবর রহমান খাঁ এম-এ	···	ঐ

রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর···বাঁকুড়া

স্যার যদুনাথ সরকার*	·	সরকার আবাস, ৯টাঙ্গা রোড, দার্জ্জিলিঙ
রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	·	৭৫ পীতাম্বরপুরা, বেনারস সিটি।
যতীন্দ্রমোহন বাগচী*	··	ইলাবাস, হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিঃ
ডক্টর যদুনাথ সিংহ	··	অধ্যাপক মীরাট কলেজ, মীরাট।
যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত	·	পি-৬৫১ মহানির্ব্বাণ রোড, বালীগঞ্জ, কলিঃ
যতীন্দ্রমোহন রায় বিদ্যার্ণব,	··	২রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিঃ
যোগেশচন্দ্র বাগল,	··	'দেশ' কার্য্যালয়, ১বর্ম্মন ষ্ট্রীট, কলিঃ
যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,	··	গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
যোগানন্দ দাস,	··	৫৭।১।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট, কলিঃ
যতীন্দ্রনাথ বসু	··	১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিঃ।
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	··	রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিঃ।
যতীন্দ্র কুমার সেন*	··	আনন্দ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	··	শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়*	··	প্রবাসী সম্পাদক, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড।
রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর*	··	পি-৪৬৩ মনোহরপুকুর রোড, কলিঃ।
ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়*	··	৬ একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিঃ।
,, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়*	··	ঐ ঐ
রাধাগোবিন্দ বসাক	··	অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রমেশচন্দ্র মজুমদার	··	Vice Chancellor Dacca University, Dacca
রাজশেখর বসু*	··	৭২ বকুল বাগান রোড, কলিঃ
রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ*	··	অধ্যক্ষ, রিপণ কলেজ, ৬০।১ হরিশ মুখার্জ্জি রোড

রঙ্গীন হালদার	...	অধ্যাপক, পাটনা কলেজ, পাটনা।
রমেশ বসু*	...	৮ প্রাণনাথ সেন লেন, কলিঃ।
রাধারাণী দেবী* ভালোবাসা	...	৭২।২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিঃ
রেণুপ্রভা ঘোষ এম এ টি ডি	...	স্যর রমেশ মিত্র গার্ল স্কুল।
রমা দেবী	...	৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিঃ।
ডক্টর শ্রীমতী রমা বসু	...	৩ ফেডারেশন ষ্টিট, কলিকাতা।
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ।
বিচারপতি রূপেন্দ্র কুমার মিত্র	...	পি ২৪ সেণ্ট্রাল এভিনিউ
অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ	...	সিটি কলেজ।
ডক্টর রাসবিহারী দাস	...	Institute of research-Amalnai East Khandesh. Bombay.
মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ		কৃষ্ণপুর, ঢাকা।
স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	এলাহাবাদ।
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়,	...	অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী।
লীলা মজুমদার	...	C/o S. K. Mojumdar-Chourangi mansions
লালবিহারী দত্ত	...	১ শিকদারপাড়া লেন. বড়বাজার কলিঃ
লতিকা ঘোষ	...	১৩৯।৩ রসা রোড,
লাবণ্য লেখা চক্রবর্ত্তী*	...	৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট।
লেখা দেবী	...	১১ বেলভিডিয়ার রোড।
বেগম শ্যামসুর নেহের বি-এ	...	বুলবুল সম্পাদিকা, ২৩ ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট
শশধর রায়	...	পাবনা।
ডক্টর শিশির কুমার মৈত্র	...	Hindu University, Benares.
অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়	..	রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী।
শরৎলাল বিশ্বাস	...	Geological Laboratory. প্রেসিডেন্সী কলেজ. কলিঃ।
শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়	...	উকীল, মুঙ্গের।
শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার	...	২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিঃ
শান্তা দেবী	...	পি ২৮৩ দরগা রোড. পার্কসার্কাস, কলিঃ
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ,	...	ভাটপাড়া, ২৪পঃ।

কুমার শরৎকুমার রায়*	...	দয়ারামপুর, রাজসাহী।
শরৎচন্দ্র পণ্ডিত	...	জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।
ডক্টর শিশির কুমার মিত্র	...	৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ।
শিবরতন মিত্র	...	সিউড়ী, বীরভূম।
শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তি পাল	..	৫১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিঃ।
শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	..	সৈদাবাদ, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	..	C/o বসুমতী, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রিট।
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	..	" "
শচীন সেন গুপ্ত	...	৮৪।১।২ গ্রে ষ্ট্রীট।
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	১১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিঃ।
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ।
শৈলবালা ঘোষজায়া	...	C/o ভারতবর্ষ, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ
শরচ্চন্দ্র রায় রায়বাহাদুর*	...	Editor—The man, রাঁচী।
শিবরাম চক্রবর্ত্তী		
কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়	...	১১ ব্রনফেল্ড রো, আলিপুর, কলিঃ।
শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা*	...	৪৩ ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি ষ্টিট, কলিঃ।
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী	...	৩০১ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ।
শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি	...	৪৯ মালঙ্গী লেন, কলিঃ।
শোভা দেবী	...	C/o দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লালবাগ মুর্শিদাবাদ।
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	৭৭ আশু মুখার্জ্জি রোড কলিঃ।
শেফালিকা সেন	...	শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা।
শোভা সেন এম এ	...	কমলা গার্লস স্কুল কালীঘাট, কলিকাতা।
শুভ ঠাকুর	...	৬ দ্বারকা নাথ ঠাকুর লেন,
ডক্টর সুশীল কুমার দে	...	ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়*	.	১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিঃ
ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ সেন*	...	৬।৩ একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিঃ।
ডক্টর সত্যচরণ লাহা	...	৫০ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিঃ

ডক্টর সুকুমার রঞ্জন দাস*	...	২৪ দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী
ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়	...	১।২ এ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিঃ।
ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১৩০ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া।
ডক্টর সুহৃদচন্দ্র মিত্র	...	৬।১ কীর্ত্তি মিত্র লেন, কলিঃ।
ডাক্তার সরসীলাল সরকার	...	১৭৭ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ।
" সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়		৪৪ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিঃ।
" সুন্দরীমোহন দাস*	...	৫৭।১।১এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিঃ।
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	সমবায় বিল্ডিংস, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড, কলিঃ।
সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র,	...	১৪ নিউ রোড, আলিপুর, কলিঃ।
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।
সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী	...	২৩।১ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিঃ বঙ্গবাসী কলেজ
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	...	হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেনারস।
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী*	...	আলমনগর, রঙ্গপুর।
ডক্টর সুকুমার সেন*	...	২৭ গোয়াবাগান লেন, কলিঃ।
সজনীকান্ত দাস*	...	২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিঃ।
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য	...	১।১ ভ্যানসিটার্ট রো।
সুধাংশু কুমার হালদার I. C. S.		
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	১ বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিঃ, সম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকা।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	...	১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিঃ।
সীতা দেবী,	.	C/o প্রবাসী, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ।
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	১৫।১ চক্রবেড়িয়া লেন, কলিঃ
সন্তোষ কুমার বড়ুয়া	...	গৌরীপুর, আসাম।
সরোজনাথ ঘোষ	...	বসুমতী অফিস, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিঃ।
সতীশচন্দ্র ঘোষ	...	১৩।১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা।
সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	..	৯০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিঃ।

ডাঃ সতীশচন্দ্র বাগচী এল. এল. ডি	..	ইউনিভারসিটি ল কলেজ, কলিঃ।
সুধাকান্ত দে	...	৪১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট, কলিকাতা।
সুশীলকুমার মজুমদার	...	১৬ চক্রবেড়িয়া রোড, নর্থ কলিকাতা।
সতীশচন্দ্র আঢ্য	...	কর্ণেল গোলা, মেদিনীপুর।
ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	...	১২৭ হরিশ মুখার্জ্জির রোড, কলিকাতা।
সতীশচন্দ্র রায়	...	কটন কলেজ, গৌহাটী।
সরলাবালা সরকার*	...	১৭৭ আপার সার্কুলার রোড কলিঃ।
সরলা দেবী	...	২০ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিঃ।
সুরমা সুন্দরী ঘোষ	...	১৪ পুলিশ হাসপাতাল রোড।
সুশীল প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	...	১৩৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ।
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	উত্তরা সম্পাদক, বাঙ্গালীটোলা, কাশী।
সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	...	C/o Hindusthan Co-operative Insurence Co. Ltd করপোরেশন ষ্ট্রিট
সুরেশ চক্রবর্ত্তী	...	অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী।
সুহাসচন্দ্র রায়	...	পি ১১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, হাটখোলা।
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়*	...	৭৬।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
সুধীরচন্দ্র সরকার	...	C/o M. C. Serkar & sons. ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ।
সুকুমার দত্ত*	...	রামজস কলেজ, দিল্লী।
সত্যানন্দ রায়	...	Principal Teachers Training College, Cal. Corporation.
ডাঃ সুশীল কুমার দত্ত	...	৫ আশুবিশ্বাস রোড।
সুবিনয় রায় চৌধুরী	...	৩১ বি শ্যামানন্দ রোড, এলগিন রোড, কলিঃ।
সরসী কুমার সরস্বতী*	...	২৯।৩ গ্রে ষ্ট্রীট কলিঃ।
সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ*	...	পি ৪৫ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট কলি।
সুনীতী বালা গুপ্ত*	...	Inspectress of schools. Presidency Division নর্টন বিল্ডিং।
সুনীতি সরকার	...	৩৩১ সি আপার সার্কুলার রোড।
ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ রায়	...	২৯ এলেনবি রোড কলিঃ।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত* পি, এইচ ডি ... ৪৮।৮ মনোহরপুকুর রোড, কলিঃ
ডাক্তার সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় ...১।১ উড ষ্ট্রীট কলিঃ।
মিসেস সরলা রায় এম, বি, ই ... ১।২ হরিশমুখার্জ্জি রোড।
শ্রীমতী সুখলতা দাস এম, এ, বি, টি ... এসাইলাম হাউস আগরা।
ডকটর এস কে দাস ... ২৮ বেনিয়াটোলা লেন।
শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরাণী এম এ, ভি, এম গারল্স স্কুল বগুড়া।
" সুহাসিনী রায় চৌধুরাণী ... পি ১৩৬ বেগ বাগান লেন পোঃ সার্কাস কলিকাতা।
" সুনীতিবালা চক্রবর্ত্তী ... বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।
" স্বর্ণপ্রভা সেন বি এ বি টি ৪০ মহানির্ব্বান রোড কলিকাতা।
" সুরমা মিত্র* ... আশুতোষ কলেজ কলিকাতা।
" সুজাতা রায় ... ঐ
" সুনীতিবালা রায় ... ৭৮ বি আপার সার্কুলার রোড।
ডক্‌টর মুহম্মদ সহীদুল্লা ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সুবাসচন্দ্র বসু ... ১ উডবারণ পার্ক।
সরোজিনী দত্ত* এম এ ... বেথুন কলেজ।
সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী* ... সম্পাদক 'সংহতি' মুরলিধর সেন লেন।
শান্তি কবির এম এ* ... ৩৬ আহিরীপুকুর রোড।
সুফিয়া এন্ হোসেন ... ৯১ আপার সার্কুলার রোড।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ... ১৩৯ বি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট কলিঃ।
অধ্যাপক হরিপদ মাইতি ... ১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিঃ।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ... কুরমিঠা, বাতিকার পোঃ, বীরভূম
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ... ১২।১০ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিঃ।
ডকটর হেমচন্দ্র রায় ... ১৯ এ মানিকতলা স্পার
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ১৬ বি রামরতন বসু লেন কলিঃ।
ডক্‌টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী .. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
হুমায়ুন কবির* ... ৩৬ আহিরিপুকুর রোড বালিগঞ্জ।
হেদায়তউল্লা এম এস সি, পি এইচ ডি . তেজগাঁ পোঃ, ঢাকা।
হেমেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ... ১২৪।৫ বি রসা রোড, কলিঃ।
ডক্‌টর হেমেন্দ্রকুমার সেন* ... রাঁচী।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	...	৭৪।১ সিকদার বাগান লেন, কলিঃ।
হরিহর শেঠ*	...	পালপাড়া, চন্দননগর।
হরিসত্য ভট্টাচার্য্য*	...	১ কৈলাস বসু লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।
হিরণকুমার সান্যাল	...	১৩।৩ একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ কলিঃ।
হেমলতা দেবী*	...	33 Mc Leod street কলিঃ।
প্রফেসর হরিচরণ ঘোষ	...	Calcutta University.

হেমলতা সরকার C/o ডাঃ বিজলীকুমার সরকার ... ৩৩।১ সি লান্সডাউন রোড, কলিঃ।

হিমাংশুবালা ভাদুড়ী C/o মেজর ভাদুড়ী ... মাউন্ট ভিলা হোটেল, শিয়ালকোট পাঞ্জাব।

ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি	...	১ এবং ২ ডিহি শ্রীরামপুর রোড।
অধ্যাপক হিরণ্ময়কুমার ব্যানার্জ্জি	...	৭০ হ্যারিসন রোড।
„ হারানচন্দ্র শাস্ত্রী	...	সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা।
ডকটর হীরালাল হালদার	...	পি ৪৯ মানিকতলা স্প্যার।
„ হীরেন্দ্রলাল দে	...	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীস* ... ৪১ স্মরিলেন কলিকাতা।

পণ্ডিত হিমাংশু নাথ মুখুটি	...	জিলা স্কুল, বগুড়া।
স্যর হাসান সুবরদ্দি	...	৩ সুরবর্দ্দি এভিনিউ পার্কসার্কাশ কলিকাতা।
ডকটর হরিদাস ভট্টাচার্য্য*	...	ঢাকা।
হারানচন্দ্র চাকলাদার*	...	১৮।৪ শ্রীমোহন লেন
হরেন্দ্রনাথ সিংহ	...	১১।৪ হাজরা রোড।
হারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১৭ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রিট।
হরগোবিন্দ সেন	...	৯৪ গ্রে ষ্ট্রিট।
মহম্মদ হবিবুল্লা	...	বুল বুল সম্পাদক ২৩ ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রিট।

পরিশিষ্ট (৬)

নিমন্ত্রিত সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম—

অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী ... তেলেনীপাড়া, হুগলী

অরবিন্দ আশ্রম ... পণ্ডিচেরি।

অমৃত সমাজ ... ৬, মুরলীধর লেন, কলিকাতা।

অমিয় স্মৃতি গ্রন্থাগার ... রায়গ্রাম, পোঃ ও জেলা যশোহর।

অমৃত চক্র ... এ, ভি, স্কুল শ্যামবাজার, কলিকাতা।

অমরগড় পাবলিক লাইব্রেরি ... অমরগড মানকর (বর্দ্ধমান)

অল ইস্‌লাম লাইব্রেরী ... শান্তিপুর

অধ্যয়ন সমিতি ... পাইকপাড়া (ঢাকা)

অম্বিক মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী ... ফরিদপুর

আরতি সাহিত্য সম্মিলনী ... বাঙ্গালী টোলা, বেনারস সিটি

আর্য্য লাইব্রেরী ... ঘুটিয়া বাজার, হুগলী

আলোক তীর্থ ... কলিকাতা

আদি ব্রাহ্ম সমাজ ... ৫৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিঃ

আবদুল হোসেন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ... চুয়াডাঙ্গা

আনন্দ গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী... পাবনা।

আয়দা জলধর পাঠাগার ... আয়দা গুপ্তিপাড়া (হুগলী)

আশুতোষ স্মৃতি মন্দির ... জিরাট (হুগলী)

ইয়ং ম্যানস এ্যাসোসিয়েসন ... বৈদবাটী, হুগলী

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ... কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন... কেশব ভবন; ২২ আর, জি, কর রোড, কলিকাতা।

ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট ... ১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ইটাচোনা পাবলিক লাইব্রেরী ... ইটাচোনা, হুগলী

ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট ... লিলুয়া হাওড়া।

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ... হাওড়া।

ইয়ং ম্যানস্ ইনষ্টিটিউট ... গিরিশ পার্ক, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট ... ১৭০ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী	...	নৈহাটী
ইষ্টবেঙ্গল সারস্বত সমাজ	...	ঢাকা
ইষ্টবেঙ্গল সাহিত্য সমাজ	...	ঢাকা
ঈশান গোপাল লাইব্রেরী	...	ঈশানপুর (ফরিদপুর)
উন্মেষ সাহিত্য চক্র	...	৪০ রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা।
উত্তরপাড়া লাইব্রেরী	...	উত্তরপাড়া (সেয়াখোলা) হুগলী
উত্তরপাড়া পাবলিক্ লাইব্রেরী	...	উত্তরপাড়া, হুগলী।
উমেশচন্দ্র লাইব্রেরী	...	খুলনা
উইসেল মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী		পাবনা
উডবারণ পাবলিক লাইব্রেরী	...	বগুড়া
উডহেড পাবলিক লাইব্রেরী	...	রাজবাড়ি (ফরিদপুর)
এলগিন্ সাহিত্য পরিষদ	...	এলগিন রোড, কলিকাতা।
এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি	...	বাঁকুড়া
এগরা ইউনিয়ন বোর্ড লাইব্রেরী	...	এগরা (বর্দ্ধমান)
এডওয়ার্ড সেভেন্থ এংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী	...	নবদ্বীপ
এডওয়ার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব	...	বহরমপুর
ওয়াই এম এ লাইব্রেরি	...	পাইকপাড়া
ওয়েষ্ট কোটালিপাড়া লাইব্রেরী	...	কোটালিপাড়া (ফরিদপুর)
করনেশন পাবলিক লাইব্রেরি	...	গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর)
কনকসার পাবলিক লাইব্রেরী	...	কনকসার (ঢাকা)
কাজলপুর অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী	...	কুকুটিয়া (ঢাকা)
কালিপাড়া লাইব্রেরী	...	ধুনাট (বগুড়া)
কোন্নগর সাধারণ পাঠাগার	...	কোন্নগর।
কর্ণওয়ালিশ ইউনিয়ন	...	৬ আর জি কর রোড, কলিকাতা।
কে সি দে ইনষ্টিটিউট	...	চিটাগং
কোন্নগর পাঠচক্র	...	কোন্নগর
কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরী	...	কক্সবাজার
কলিকাতা সারস্বত সঙ্ঘ	...	৪৫।১বি বিডন ষ্ট্রিট, কলিকাতা
কুচবিহার সাহিত্য সভা	...	কুচবিহার
কৈলাশচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার	...	হরিপাল, হুগলী।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি

পোষ্ট গ্রজুয়েট বিভাগ	...	কলিকাতা
কৃষ্টি পরিষদ	...	কনকশালী, চুঁচুড়া
কমলা পাঠাগার	...	নর্থ এণ্টালি, কলিকাতা
কেন্দ্রীয় অধ্যয়নাগার	...	পাইকপাড়া (ঢাকা)
কান্দী রামেন্দ্র সুন্দর স্মৃতি পাঠাগার	..	কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
কলিকাতা লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন	...	(সম্পাদক, সুখেন চট্টোপাধ্যায়)
কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির	...	চন্দননগর
কাশিয়াণী সাহিত্য সমিতি	...	কাশিয়াণী (ফরিদপুর)
কাশীশ্বরী লাইব্রেরী	...	দার্জ্জিলিং
কসবা পাবলিক লাইব্রেরী	...	ঢাকুরিয়া
কোদালিয়া বীণাপাণী লাইব্রেরী	...	সোনারপুর (১৪ পঃ)
কাটোয়া শ্যামলাল লাইব্রেরী	...	কাটোয়া (বর্দ্ধমান)
কাটোয়া টি, এম লাইব্রেরী	...	,,
কুলটীক্লাব লাইব্রেরী	...	কুলটী (বর্দ্ধমান)
কুমারবাজার সাহিত্য মন্দির	...	রাণীগঞ্জ
কুমারখালি দরিদ্র ভাণ্ডার পুস্তকালয়	...	কুমারখালি (নদীয়া)
ক্রেসেণ্ট লাইব্রেরী	...	উলকারাম চিটাগং
কাইসার মেমোরিয়াল বিল্ডিংক্লাব	...	সিঙ্গারবিল (ত্রিপুরা)
ক্ষেত্রগোপাল পাবলিক লাইব্রেরী	...	বগুড়া।
গিরিশ লাইব্রেরী	...	
গৌতম লাইব্রেরী	...	রাজমাহেন্দ্রী
গোপীনাথ সেন লাইব্রেরী	...	২২ রামকান্ত সেন লেন, উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা।
গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী	...	গরলগাছা চণ্ডীতলা (হুগলী)
শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী	...	১১এ চালতা বাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ	...	বাগবাজার কলিকাতা ও মায়াপুর, নদীয়া।
গীতা সোসাইটী	...	৩ চালতা বাগান লেন, কলিকাতা।
(স্যর) গুরুদাস ইনষ্টিটিউট্	...	২৭ স্যর গুরুদাস রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ	...	শালিখা হাওড়া,

গার্ডেনরিচ লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম	...	গার্ডেনরিচ, কলিঃ।
গোবিন্দপাল পাবলিক লাইব্রেরী	...	দক্ষিণ গোবিন্দপুর (২৪ পঃ)
গোপালনগর সারস্বত পাঠাগার	...	পারগোপালনগর (হুগলী)
গোপালপুর কহিনুর লাইব্রেরী	...	গোপালপুর (ফরিদপুর)
ঘুসুরি যুব সম্মিলন	...	ঘুসুরি, হাওড়া।
চৈতন্য লাইব্রেরী	...	৪।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চব্বিশ পরগণা ছাত্র সমিতি	...	৩৩ ওয়েলেশলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চোরবাগান কিশোর সঙ্ঘ	...	১১ ভুবন ব্যানার্জ্জি লেন, কলিকাতা।
চন্দননগর পুস্তকাগার	...	চন্দননগর
চাতরা রিডিং রুম	...	চাতরা শ্রীরামপুর
চিনসুরা ইনস্টিটিউট	...	চুঁচড়া, হুগলী
চিনসুরা পাবলিক লাইব্রেরী	...	,, ,,
চন্দ্রনাথ পরিষৎ	...	বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চঞ্চল ব্রাজ লাইব্রেরী	...	চঞ্চল মালদা
চিত্তরঞ্জন পাঠ মন্দির	...	শ্রীখণ্ড (বৰ্দ্ধমান)
চিত্তরঞ্জন লাইব্রেরী	...	দীঘিরপাড়া (ঢাকা)
চাঁদপুর বয়স্কাউট্স্ লাইব্রেরী	...	চাঁদপুর।
জলপাইগুড়ি পাবলিক রিডিং রুম	...	জলপাইগুড়ি
জলপাইগুড়ি ইনষ্টিটিউট	...	জলপাইগুড়ী
জুবিলি লাইব্রেরী	...	ফেণী (নোয়াখালি)
জুবিলি মুসলিম ট্রাষ্ট	...	দার্জ্জিলিং
জনাই পাবলিক লাইব্রেরী	...	জনাই
জগজ্জ্যোতিঃ লাইব্রেরী	...	
জয়পুর লাইব্রেরী	...	জয়পুর মগরা (হুগলী)
জ্যোৎস্না লাইব্রেরী	...	৩৭ পদ্মপুকুর রোড, কালিঘাট, কলিকাতা,
জ্যোতিষ পরিষৎ	...	৬।১ রাম ব্যানার্জ্জি লেন, কলিকাতা।
জ্যোতির্বালয়	...	১৪১।১সি রসা রোড, কালিঘাট, কলিকাতা
জারা পাবলিক লাইব্রেরী	...	জারা মেদিনীপুর
জারাগ্রাম মাখমলাল পাঠাগার	...	জারাগ্রাম (বৰ্দ্ধমান)
জনগ্রাম জে এ লাইব্রেরী	...	জনগ্রাম (বৰ্দ্ধমান)

টাউন ক্লাব লাইব্রেরী	...	মেদিনীপুর
টাউন ক্লাব লাইব্রেরী	...	ফরিদপুর
টাকি সাধারণ পুস্তকালয়	...	টাকি।
টাউনহল পাবলিক লাইব্রেরী	...	সোনদ্বীপ (নোয়াখালী)।
টাজপুর লাইব্রেরী	...	বেগমপুর (হুগলী)।
ডায়মণ্ড ক্লাব ও লাইব্রেরী	...	ডায়মণ্ড হারবার।
ডিউক লাইব্রেরী	...	চার্চ্চরোড হাওড়া।
ঢাকা বান্ধব সমিতি	...	৩০।১ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রিট, **ভবানীপুর।**
ঢাকুরিয়া লাইব্রেরী	...	ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	...	রমনা, ঢাকা।
তমলুক ক্লাব	...	তমলুক মেদিনীপুর।
তিলক লাইব্রেরী	...	রাণীগঞ্জ।
ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী	...	ত্রিবেনী।
তেজপুর সাধারণ পাঠাগার	...	তেজপুর (ঢাকা)।
দিনাজপুর ইনষ্টিটিউট	...	দিনাজপুর।
দাসঘর ক্লাব	...	দাসঘর (হুগলী)
দেশবন্ধু পাঠাগার	...	১৩০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট।
দেশবন্ধু লাইব্রেরী	...	ঘুর্ণী কৃষ্ণনগর।
দশঘরা এ্যাসোসিয়েশন	...	দশঘরা।
দশভুজা সাহিত্য মন্দির	...	মানকুণ্ডু, চন্দননগর।
দেশবন্ধু পাঠা[illegible]র	...	লালবাগান চন্দননগর।
দিব্যজ্যোতি সমিতি	...	রাজসাহী।
দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগার	...	ঘুঘুডাঙ্গা।
দমদম লাইব্রেরী ও লিটারেরি ক্লাব	...	দমদম।
দুর্গা পুস্তকাগার	...	হলদিয়া (ঢাকা)।
নর্থব্রুক হল	...	ঢাকা।
নবজীবন সঙ্ঘ	...	২২৩।ডি আপার চিৎপুর রোড, কলিঃ
নন্দা লাইব্রেরী	...	জামগ্রাম।
নিউ রিডিং ক্লাব	...	হুগলী।
নিষ্ক গ্রন্থাগার	...	বর্দ্ধমান।

নারীশিক্ষা সমিতি ... বৰ্দ্ধমান।
নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ .. বৰ্দ্ধমান।
নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির ও পাঠাগার ... চন্দননগর।
নারায়ণী বাণীমন্দির ... নৈহাটী।
নিত্যানন্দ লাইব্রেরী ... মালকুরাপুর (২৪ পরগণা)।
নারায়ণগঞ্জ মুসলিম সোশাল ক্লাব ... নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)।
নাজিমুদ্দিন লাইব্রেরী ... দিনাজপুর।
নাটোর রিক্রিয়েশন ক্লাব ... নাটোর (রাজসাহী)
ননীবালা লাইব্রেরী ... খাঁদার পাড়া (ফরিদপুর)
পল্লী পাঠাগার .. বন্দীপুর, হুগলী।
প্রেমানন্দ পাঠাগার ... কলমা (ঢাকা)।
প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন ... বুড়াশিবতলা, চুঁচুড়া।
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ লাইব্রেরী ... গোস্বামী ঘাট, চন্দননগর।
প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী লাইব্রেরী ... রাধানগর, হুগলী।
পল্লী সেবক সমিতি ... দেবানন্দপুর, হুগলী।
পালপাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়ন লাইব্রেরী ... পালপাড়া, হুগলী।
পঞ্চানন লাইব্রেরী ... চাতরা, শ্রীরামপুর।
পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম ... মহেশ, শ্রীরামপুর।
পুরাণ পরিষৎ ... শান্তিপুর, নদীয়া।
প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ... চন্দননগর, বড়বাজার, হুগলী।
প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ... শ্রীহট্ট।
প্রভাতী সঙ্ঘ ... পাটনা।
প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ... শ্রীরামপুর, হুগলী।
পীতাম্বর লাইব্রেরী ... সেনহাটী, খুলনা।
প্রবুদ্ধ সমিতি ... শ্রীকৃষ্ণ লেন, শ্যামবাজার।
পালপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী .. বরাহনগর, ২৪ পরগণা।
পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, বহিরগাছি ... বহিরগাছি, মুড়াগাছা, নদীয়া।
পুরী সাহিত্যপরিষদ ... পুরী, কটক।
পাঁজিয়া সংসদ পাঠাগার ... পাঁজিয়া, যশোহর।
পূর্ণিমা সম্মিলন ... নবদ্বীপ।

পুরবী সাহিত্য পরিষৎ	...	খড়দা।
পিপলস্ লাইব্রেরী	...	বরাহনগর।
পানিত্রাস ইউনিয়ন লাইব্রেরী	...	পানিত্রাস (হাওড়া)।
পূর্ণন্দন স্মৃতি মন্দির	...	সোনারপুর (২৪ পঃ)।
পাণ্ডুয়া লাইব্রেরী	...	পাণ্ডুয়া (হুগলী)।
পাবলিক লাইব্রেরী	...	সাতগাছিয়া (বর্দ্ধমান)।
,,	...	কৃষ্ণনগর।
,,	...	কুষ্টিয়া।
,,	...	মেহেরপুর।
,,	...	রাণাঘাট।
,,	...	শান্তিপুর।
,,	...	বরিশাল।
,,	...	রংপুর।
,,	...	চুঁচুড়া।
,,	...	নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
,,	...	যশোহর।
,,	...	ঝিকরগাছা (যশোহর)।
,,	...	কক্সবাজার (চিটাগং)।
,,	...	বেলুড় (হাওড়া)।
,,	...	আগরতলা।
,,	...	নবীননগর।
,,	...	জামালপুর (বর্দ্ধমান)।
,,	...	রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।
,,	...	উখ্ড়া (বর্দ্ধমান)।
,,	...	বীবনগর (নদীয়া)।
,,	...	বনগ্রাম, (যশোহর)।
,,	...	রিসড়া।
,,	...	কোননগর।
,,	...	ভদ্রেশ্বর।
পাবলিক লাইব্রেরী	...	গুপ্তিপাড়া।

”	...	আগরতলা (ত্রিপুরা)।
”	...	চুন্টা।
”	...	কলিকাতা।
”	...	বৈঁচী, বর্দ্ধমান।
”	...	বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।
”	...	শ্রীরামপুর, হুগলী।
”	...	দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পঃ।
”	...	বলাগড় হুগলী।
”	...	মালপাড়া, হুগলী।
”	...	তেলিনীপাড়া।
”	..	ঢাকা।
”	..	চট্টগ্রাম।
”	...	বিক্রমপুর।
”	.	বহরমপুর।
”	...	কুমিল্লা।
”		মেদিনীপুর।
”	...	রাজসাহী।
”	...	বীরভূম।
”	...	বাঁকুড়া।
”	...	গড়বেতা, মেদিনীপুর।
”	...	বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।
”	...	মালদা
”	...	বেহালা।
ফ্রি রিডিং রুম এণ্ড লাইব্রেরী	...	শ্রীরামপুর।
ফরিদপুর সেবক সমিতি	...	ফরিদপুর।
ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী	...	ফরিদপুর।
ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী	...	হুগলী।
ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী	...	পাণিহাটী।
ফেণী টাউন ক্লাব	...	ফেণী (নোয়াখালী)।

ফুলবাড়ি পল্লীমঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরী ... বগুড়া।

ফকিরপাড়া লাইব্রেরী	...	ধুলাট (বগুড়া)।
ফ্রি রিডিং রুম	...	পোস্ত ঢাকা।
ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী	...	খুরুট রোড, হাওড়া।
বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী	...	কুমিল্লা।
বালিয়াদীঘি লাইব্রেরী	...	রুপাহাটা (বগুড়া)।
বরিষা ষ্টুডেণ্টস এ্যাসোসিয়েশন		বরিষা।
বরিষা রিডিং ক্লাব ও লাইব্রেরী	...	বরিষা।
বাইশাড়ী মিলন সমিতি	...	
বয়েজ ওন লাইব্রেরী	..	কনকশালি চুঁচুড়া (হুগলী)।
বাবুগঞ্জ ফ্রী রিডিং রুম	...	বাবুগঞ্জ (হুগলী)।
বিশ্বেশ্বরী লাইব্রেরী	...	কেকালা।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ	...	২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
বাগবাজার লাইব্রেরী	...	২৫।১ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বেলেঘাটা সান্ধ্য সমিতি	...	কালিতারা বোস লেন, বেলেঘাটা।
বৃহত্তর ভারত সোসাইটী	...	২৮৩ দুর্গারোড, পার্ক সার্কাস।
বাকুলিয়া পাবলিক লাইব্রেরী	...	বাকুলিয়া (বাঁকুড়া)।
বগুলা ভিলেজ লাইব্রেরী	...	বগুলা (নদীয়া)।
বিক্রমপুর সাহিত্য পরিষৎ	...	গৌরগঞ্জ (ঢাকা)।
বজরা বীনাপাণি লাইব্রেরী	...	চন্দননগর।
বেলেঘাটা লাইব্রেরী	...	৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।
বিবেকানন্দ সোসাইটী	...	৭৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।
"বনফুল" সাহিত্য সমিতি	...	শ্রীরামপুর।
বিশ্বদেব মেমোরিয়াল ক্লাব	...	৪০।ডি, পটারী রোড, ইটালী।
বানী পাঠাগার	...	হাবাসপুর (ফরিদপুর)।
বাণী মন্দির লাইব্রেরী	...	খুলনা।
বাণীভবন পাবলিক লাইব্রেরী	...	বগুড়া।
বান্ধব সমিতি	...	ঢাকা।
বান্ধব লাইব্রেরী	...	বান্ধব, দৌলতপুর।
বর্দ্ধমান লাইব্রেরী	...	বালী, হুগলী।
বান্ধব লাইব্রেরী	...	সোমড়া।

বান্ধব লাইব্রেরী	...	কণ্টাই, মেদিনীপুর।
বীণাপানি লাইব্রেরী	...	বেজড়া, চন্দননগর।
বীণাপানি লাইব্রেরী	...	কাঁথি, মেদিনীপুর।
বীণাপানি লাইব্রেরী	...	বাঁকুড়া।
বালী সরস্বতী পাঠাগার	...	বালী, (হুগলী)
বীণাপানি পাঠাগার	...	গরিফা, ২৪ পরগণা
বীণাপানি লাইব্রেরী	...	পাণিহাটী।
বয়েজ ওন লাইব্রেরী	...	শ্রীরামপুর।
বেলঘরিয়া প্যারিমোহন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী	...	বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।
বোলপুর সাধারণ পাঠাগার	...	বোলপুর।
বিবেকানন্দ স্মৃতি সমিতি পাঠাগার	...	বাগবাজার কলিকাতা।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ উত্তরপাড়া শাখা	...	উত্তরপাড়া, (হুগলী)
” গৌহাটী শাখা	...	গৌহাটী, আসাম।
” রংপুর শাখা	...	রংপুর।
” মীরাট শাখা	...	মীরাট।
” মেদিনীপুর শাখা	...	মেদিনীপুর।
” নদীয়া শাখা	...	কৃষ্ণনগর
” দিল্লী শাখা	..	দিল্লী
” চট্টগ্রাম শাখা	...	চট্টগ্রাম
” ত্রিপুরা শাখা	..	ত্রিপুরা
” কটক শাখা	...	কটক
” কালনা শাখা	...	কালনা
” ভাগলপুর শাখা	...	ভাগলপুর
বঙ্গীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটী	...	৪।৩এ কলেজ স্কোয়ার
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন	...	কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা
বিশ্বভারতী লাইব্রেরী	...	শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি	...	রাজসাহী
বান্ধব সম্মিলনী	...	মালোপাড়া, কৃষ্ণনগর
বিদ্যাসাগর বাণী ভবন	...	কলিকাতা

বিবুধ জননী সভা ... নবদ্বীপ, নদীয়া
বাগান পরিষৎ সারস্বত সম্মেলন... দেচৌধুরী ষ্ট্রীট, রাণাঘাট, নদীয়া
বরিশাল শান্তিসংসদ পাঠাগার ... হবিবপুর, বরিশাল
বড়িশা মিলন সঙ্ঘ ... বড়িশা, ২৪ পরগণা
বৈষ্ণব সাহিত্য পরিষৎ .. ১৪ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা
বৈদ্যবাটী ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন . শেওড়াফুলি।
বঙ্কিম লাইব্রেরী ... গোরাবাজার, বহরমপুর
বাটরা পারিজাত সমাজ ... ১৭ নরসিং দত্ত লেন, হাওড়া
বাকলিয়া হাট পাবলিক লাইব্রেরী চিটাগং
ব্লুমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী ... কার্সিয়াং
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ ... বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা
বেলুড় মঠ ... বেলুড়, হাওড়া
বাসন্তী লাইব্রেরী (ঢাকা) ... ঢাকা
বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী .. বরাহনগর
বরাহনগর ডিবেটিং ক্লাব ... বরাহনগর
বেগমপুর লাইব্রেরী ... বেগমপুর (হুগলী)
বাজেশিবপুর সাহিত্য সঙ্ঘ ... শিবপুর, হাওড়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোস্লেম ক্লাব ... ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রিডিং ক্লাব ... ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
বিদ্যাস্ ও টুইলসন পাবলিক লাইব্রেরী .. ঘাটাল (মেদিনীপুর)
বঙ্কিম পাঠাগার ... নৈহাটী
বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী ... নৈহাটী
বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী ... চাংড়িপোতা, সোণারপুর
বনহুগলী পাবলিক লাইব্রেরী ... বনহুগলী, বরাহনগর
বৰ্দ্ধমান রাজ পাবলিক লাইব্রেরী .. বৰ্দ্ধমান
বগিলা বঙ্কিম লাইব্রেরী ... বগিলা (বৰ্দ্ধমান)
বেনেট ক্লাব লাইব্রেরী ... আসানসোল
বসন্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ... চাকদা
ভারতীয় শিল্প পরিষৎ ...
ভিলেজ ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটী লাইব্রেরী

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী	...	উলুবাড়িয়া হাওড়া
ভদ্রেশ্বর পাবলিক লাইব্রেরী	...	ভদ্রেশ্বর
ভোলা ডায়মণ্ড জুবিলি ক্লাব	...	ভোলা
ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী	...	নাটোর (রাজসাহী)
ভিলেজ সারকুলেটিং লাইব্রেরী	...	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মাদারিপুর পাবলিক লাইব্রেরী	...	মাদারীপুর (ফরিদপুর)
মহামতি দেবেন্দ্র সাহিত্য মন্দির	...	নওনা (ঢাকা)
মতিডালি পল্লীমঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরী	...	বগুড়া
মহামায়া সাহিত্য মন্দির	...	শেওড়াফুলি
মাজু পাবলিক লাইব্রেরী	...	মাজু হাওড়া
মিশন লাইব্রেরী	...	শ্রীরামপুর কলেজ
মুসলমান সাহিত্য সমিতি	...	৩ টারনার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
মাগুরা ডিগুসে লাইব্রেরী	...	মাগুরা, যশোহর
মাইকেল লাইব্রেরী	...	খিদিরপুর
মুক্তকেশী পাবলিক লাইব্রেরী	...	মির্জ্জাবাজার, হুগলী
মৃগী পাবলিক লাইব্রেরী	...	ঘিকোমলা (ফরিদপুর)
মানভূম সাহিত্য সমিতি	...	মানভূম
মৈমনসিং সাহিত্য সমিতি	...	মৈমনসিংহ
মুসলিম লাইব্রেরী	...	জলপাইগুড়ি
মুসলিম লাইব্রেরী	...	মেদিনীপুর
মুসলিম লাইব্রেরী	...	রাণীগঞ্জ
মুসলিম ইনস্টিটিউট	...	ময়মনসিং
মুসলিম ইনষ্টিটিউট	...	রাজসাহী
মুসলিম ট্রষ্ট	...	কিশোরগঞ্জ ময়মনসিং
মুদিয়ালি লাইব্রেরী	...	গার্ডেনরিচ
মুসলিম লাইব্রেরী	...	জয়পুর হাট (বগুড়া)
মুলাযোড় ভরতচন্দ্র লাইব্রেরী	...	শ্যামনগর
মহাকালী লাইব্রেরী	...	কুবেরপুর বারাসত
মেমারি মিলনসঙ্ঘ লাইব্রেরী	...	মেমারি (বর্দ্ধমান)
মেয়ো লাইব্রেরী	...	কালনা

ম্যাকফারসন লাইব্রেরী ... বাগের হাট।
মুসলিম ইউথ এসোসিয়েশন ... মুসলমান পাড়া, বহরমপুর।
যুবক সম্মিলনা ... উত্তর পাড়া, হুগলী।
যুগসন্ধি ... চুঁচুড়া, হুগলী।
যতীন্দ্র পাঠাগার ... শ্রীরামপুর।
রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল...কলিকাতা।
রবিবাসর ... ৩৭ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রামকৃষ্ণ মঠ ... বাগবাজার।
রামকৃষ্ণ সারদা মঠ ... বিবেকানন্দ মিশন।
রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী ... বারাসত।
রামকৃষ্ণ মঠ লাইব্রেরী ... বেলুড়।
রামপ্রসাদ লাইব্রেরী ... হালিসহর (২৪ পরগণা)।
রতন লাইব্রেরী ... শিউড়ি।
রামকৃষ্ণ সমিতি ... ৮৯ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
রাজলক্ষ্মী পাবলিক লাইব্রেরী ... চাতরা, শ্রীরামপুর।
রাজপুর পল্লীমঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরী .. বগুড়া।
রামপ্রসাদ পাবলিক লাইব্রেরী ... খানাকুল, কৃষ্ণনগর।
রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী ... ১৩ বি রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রংপুর রামমোহন লাইব্রেরী ... রংপুর।
রেন বো ক্লাব ... কলিকাতা।
রামমোহন লাইব্রেরী ... ২৬৭ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ।
রসিদপুর ইউনিয়ন লাইব্রেরী ... রসিদপুর।
রিসড়া বয়েজ লাইব্রেরী ... রিসড়া।
রিসড়া বস্তি লাইব্রেরী। ... রিসড়া।
রসচক্র ... কলিকাতা।
রমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী ... টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
রাধামনিয়া ফ্রি রিডিং রুম ও লাইব্রেরী ... শান্তিবাড়ি, বসিরহাট।
রায়না পাবলিক লাইব্রেরী ... রায়না (বর্দ্ধমান)।
রামমোহন লাইব্রেরী ... ঢাকা।
রামেন্দ্র সুন্দর স্মৃতি পাঠাগার .. কাঁদি (মুর্শিদাবাদ)

রামমোহন লাইব্রেরী ... কুমিল্লা।

লিটারেরি এসোসিয়েশন ও লাইব্রেরী...ভাটপাড়া।

লোহাগঞ্জ ভিলেজ লাইব্রেরী ... লোহাগঞ্জ (ঢাকা)।

লেবুতলা ইউ বি লাইব্রেরী ... লেবুতলা (ঢাকা)।

লিণ্ডসে লাইব্রেরী ... মাগুরা (যশোহর)।

লালগোলা লাইব্রেরী ... লালগোলা।

শান্তি ইনষ্টিটিউট ... ২৬ শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শতদল সাহিত্য সংসদ ... শ্রীরামপুর।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ... শ্রীরামপুর।

শ্রীপুর বেনাভোলেণ্ট এসোসিয়েশন... শ্রীপুর বাজার।

শ্রীপুর ডেভালপমেণ্ট এসোসিয়েশন ... শ্রীপুর বলাগড় (হুগলী)।

শ্রীগীতা সভা ... ৩বি যুনাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ... ১০ সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা।

শিশির কুমার ইনষ্টিটিউট ... ৭।১।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শান্তিপুর সাহিত্য পরিষৎ ... শান্তিপুর, নদীয়া।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ... শ্রীহট্ট।

শ্রীরামনারায়ণ সার্ব্বজনীন পুস্তকালয় ... খিদিরপুর।

শিলিগুড়ি পাবলিক লাইব্রেরী ... শিলিগুড়ি।

শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির ... পাঠবাড়ী, আলমবাজার।

শশীপদ ইনষ্টিটিউট ... বরাহনগর।

শ্যামাচরণ লাইব্রেরী ... ধান্যকুরিয়া (২৪ পরগণা)।

শোভাবতী লাইব্রেরী ... ধান্যকুরিয়া (২৪ পরগণা)।

শচীনাথ পাঠ মন্দির ... তুলাসার, পালং (ফরিদপুর)।

সম্মীলনি পাবলিক লাইব্রেরী ... সেরপুর, বগুড়া।

সুহৃদ সঙ্ঘ ... পাইকপাড়া।

সমাজপতি স্মৃতি সমিতি ও লাইব্রেরী ... শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহিত্য সঙ্ঘ ... শিবপুর, হাওড়া।

সরোজ নলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি ... ৬০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সানডেস্ ডিবেটিং ক্লাব ... ১০ ভেলেণ্টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সারস্বত সম্মেলন ... উত্তরপাড়া।

সন্তান সঙ্ঘ লাইব্রেরী	...	বক্সির বেড়, চন্দননগর।
সাহিত্য সেবক সমিতি	...	১১৮ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রিট, কলিকাতা।
সিঁথি বনমালী বিপিন পাবলিক লাইব্রেরী	...	সিঁথি।
সাহিত্য সম্মেলন		শ্রীরামপুর।
সাধনা সাহিত্য কুটীর		দীঘ খুট।
সাহাগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী		সাহাগঞ্জ।
সাহিত্য সমিতি		ভদ্রকালি, কোতরং।
সেণ্ট্রাল এ্যাসোসিয়েশন		হুগলী।
সাউলী বালক সঙ্ঘ		সাউলী, চন্দননগর।
সরস্বতী পাঠাগার		বালী, হুগলী।
সাহিত্য সংসদ		৩৩ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরী		ঢাকা।
সরস্বতী লাইব্রেরী		জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)।
সারস্বত সম্মিলন,		শিবপুর, হাওড়া।
সংস্কৃত সাহিত্য সমিতি		১৭ আর, জি, কর রোড, শ্যামবাজার, কলিঃ
সারস্বত সমিতি		মেদিনীপুর।
সাহিত্য সংসদ		৩৫ স্কটস্ লেন, কলিকাতা।
সুধারবান রিডিং রুম		তালপুকুর রোড, কলিকাতা।
সবুজ লাইব্রেরী		৩১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সচ্চিদানন্দ পাঠাগার		১০০ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থলবাণী মন্দির		স্থল, পাবনা।
সাহিত্য সভা,		খুলনা।
সাগরকান্দি বান্ধব পাবলিক লাইব্রেরী	...	সাগরকান্দী, জেলা পাবনা।
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গ্রন্থাগার	..	কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।
সুরেন্দ্র মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী	...	রাণাঘাট, নদীয়া।
সাধন সমর আশ্রম সাহিত্য সঙ্ঘ		সাধন সমর আশ্রম, বরাহনগর।
সাহিত্য পরিষৎ	..	শান্তিপুর।
সেরপুর টাউন লাইব্রেরী	..	সেরপুর, ময়মনসিং।
সুরবালা লাইব্রেরী	..	বারাসাত।
সরস্বতী লাইব্রেরী	..	রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

সাধনা লাইব্রেরী	...	কৃষ্ণনগর।
সরিফ লাইব্রেরী	...	২০ বংশাল রোড, ঢাকা।
সারদাভবন পাঠাগার	...	হিলি (দিনাজপুর)।
সমিতি লাইব্রেরী	...	নওগাঁ (রাজসাহী)।
সমাজ সেবা সঙ্ঘ	...	রাজসাহী।
হিরন্ময়ী লাইব্রেরী	...	সেরপুর, ময়মনসিং।
হেমচন্দ্র পাঠাগার	...	রাজবলহাট (হুগলী)।
হাতিবাঁধা লাইব্রেরী	...	রুগাহাটা, বগুড়া।
হরেন্দ্রলাল পাবলিক লাইব্রেরী	...	মুন্সিগঞ্জ (ঢাকা)।
হাবাসপুর ইসলামিয়া লাইব্রেরী	...	হাবাসপুর (ফরিদপুর)।
হাজিগঞ্জ ভিলেজ লাইব্রেরী	...	হাজিগঞ্জ (ত্রিপুরা)।
হাজিগঞ্জ হলাণ্ড লাইব্রেরী	...	হাজিগঞ্জ (ত্রিপুরা)।

পরিশিষ্ট (চ)

প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা—যাঁহারা প্রত্যেকে ২৲ করিয়া চাঁদা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার স্মৃতিরত্ন ... বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু
„ অনাথ সেন
„ অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য
„ অমল হোম ... প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
„ অমিতাভ দাসগুপ্ত
„ অমৃতলাল বিদ্যারত্ন ... হাওড়া মাজু।
„ অমলাধন মুখোপাধ্যায়
„ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় . ২নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা
„ আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়... বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা
„ আশুতোষ দাস ... চন্দননগর পুস্তকাগার
শ্রীমতী ইলা হোম ... কলিকাতা
শ্রীযুক্ত উদ্ধব চন্দ্র মল্লিক ... কলিকাতা সুবর্ণ বণিক সমাজ
„ উমাকান্ত পাইক ... ঐ
„ উপেন্দ্রনাথ সেন ... কলিকাতা পরিষৎ
„ কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী
„ কৃষ্ণকান্ত চতুর্ব্বেদী ... শান্তিনিকেতন
খবিরুদ্দিন আমেদ এম এ
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর... কলিকাতা
গণেশ রায় .. শান্তিনিকেতন
যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানি .. চন্দননগর
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ .. ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড কলিকাতা,
জিতেন্দ্রনাথ বসু .. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাদ্দার
তারকেশচন্দ্র চৌধুরী
তিনকড়ি দত্ত

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মল্লিক	...	সুবর্ণবণিক সমাজ
,, ত্রিদিবনাথ রায়		
,, দেবনারায়ণ গোস্বামী	...	নবদ্বীপ এডওয়ার্ড লাইব্রেরী
,, দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য		
,, ননীগোপাল বসু	...	নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলন
,, নন্দগোপাল কুণ্ডু	...	কুমারখালি
,, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		চন্দননগর
,, নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়		
,, নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ	...	কুচবিহার রাজকলেজ
,, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়		
,, নারায়ণ চন্দ্র দে	...	চন্দননগর পুস্তকাগার
,, প্রসন্নকুমার সমাদ্দার	...	কলিকাতা
,, পূর্ণচন্দ্র রায়		
শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী সেন		
শ্রীযুক্ত পি মুখার্জ্জি	...	রাণাঘাট টিচার্স কাউন্সিল
,, ভোলানাথ মজুমদার	...	কুমারখালি
ডাঃ মহম্মদ সহিদুল্লা এম-এ বিএল	...	ঢাকা ইউনিভারসিটি
শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়	...	সম্পাদক বেহালা লাইব্রেরী
,, মহেন্দ্রনাথ আঢ্য	...	কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ
,, মৃণালকুমার ঘোষ	...	চন্দননগর
,, মণীন্দ্রনাথ নায়েক	...	,, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	...	রামমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা
,, যতীন্দ্রমোহন মজুমদার	...	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
,, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড
,, রবীন্দ্রনাথ সাহা	...	কুমারখালি
,, রেবতীমোহন সাহা	...	,,
,, রবীন্দ্র ঘটক চৌধুরী	...	শান্তি নিকেতন
,, রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল	...	বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ
,, রামপদ মুখোপাধ্যায়		
,, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	..	চন্দননগর

শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ দে ... চন্দননগর, পুস্তকাগার
,, বসন্তকুমার ভৌমিক রায়বাহাদুর ... রংপুর
,, বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বিজয় ভট্টাচার্য্য
,, বীরেশচন্দ্র দাস ... ১নং উমেশদাস লেন, পঞ্চাননতলা, হাওড়া
,, বিভাস রায় চৌধুরী
,, বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়
,, বিপীনবিহারী সেন রায় সাহেব ... বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
,, সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ... কালিঘাট, কলিকাতা, ১২৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
,, সুশীলকুমার ঘোষ
,, সতীশচন্দ্র বসু ... ৮।১ সাহিত্য পরিষৎ ষ্ট্রিট
,, সুধীরকুমার বসু
শ্রীমতী সবিতা ঠাকুর
শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার কুণ্ডু
,, সতীকান্ত ঘোষ রায়
,, সুশীল কুমার বাগচী
,, হরিহর শেঠ ... চন্দননগর
,, হরিদাস মোদক ... দশভূজা সাহিত্য মন্দির, চন্দননগর

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সদস্যগণের নাম।

ইঁহাদের অনেকে সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সাধারণ সদস্য।

১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ... ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন কলিকাতা
২। " রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বিএল, ... ৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা
৩। " উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ-বিএল "
৪। " জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ... ৩।১ পদ্মপুকুর রোড, কলিঃ
৫। " প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল...১২ নকুলেশ্বরতলা লেন, কলিঃ

৬। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় ... ১১২ই হরিতকী বাগান লেন, কলিঃ

৭। " ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এইচ ডি... ২১ কুণ্ডু লেন বেলগেছে কলিঃ

৮। " কিরণচন্দ্র দত্ত ... ১ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিঃ

৯। " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এল সি ... ৯৭ লেক রোড, কলিঃ

১০। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল ... ১৩৯বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ

১১। " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ৫ যজ্ঞমিত্র লেন, কলিঃ

১২। " কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম এ. ১১ রণফেল্ড রোড, আলিপুর কলিঃ

১৩। " নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় .. লাভপুর, বীরভূম।

১৪। " মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম এ ..কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ

১৫। " লাল বহারা দত্ত ... ১এ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৬। " মন্মথমোহন বসু এম. এ. ... ১৯ গোকুল মিত্র লেন. কলিঃ

১৭। " বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ .. ১৬ টাউনসেণ্ড রোড, কলিঃ

১৮। " রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর ... সদপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

১৯। " অনাথবন্ধু দত্ত এম এ ... ২৬ পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর কলিকাতা।

২০। " ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী . ১২৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ

২১। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন .. ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিঃ

২২। " মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার এম এ ভারতীভবন, বাঁকিপুর।

২৩। " জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার বি ই এম সি এস ... ২ রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা।

২৪। " লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ... অধ্যাপক, কটনকলেজ, গৌহাটী।

২৫। " কুমার শরৎকুমার রায় এম এ দয়ারামপুর, রাজসাহী।

২৬। " প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ... ১ ডাক্তার লেন, বালীগঞ্জ।

২৭। " ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পি এচ্ ডি ..৬।৩ একডালিয়া রোড।

২৮। " রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ ... ৬ বালীগঞ্জ প্লেস

২৯। " নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, ... অধ্যাপক স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা

৩০। " যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, ... রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩১। ” ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, পি এচ্ ডি ... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩২। ” প্রবোধচন্দ্র সেন এম এ,... অধ্যাপক, হাই একাডেমি, দৌলতপুর, খুলনা।

৩৩। ” সতীশ চন্দ্র আঢ্য ... কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর।

৩৪। ” ডক্টর ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি, এচ্ ডি ডাইরেকটার অব ইন্‌ফরমেশন ইউ পি, এলাহাবাদ।

৩৫। ” ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল, কৃষ্ণনগর।

৩৬। ” উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ ... ২৭ মদন বড়াল লেন, কলিকাতা।

৩৭। শ্রীযুক্তা মানকুমারী দাসী ... খুলনা।

৩৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ... ৪৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৯। ” কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় ... ২১ এ রাণীশঙ্করী লেন, কলিঃ

৪০। ” ডক্টর সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি, ৫০ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট।

৪১। ” ডক্টর নরেন্দ্র নাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ্ ডি, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৪২। ” শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল, ৪৩ ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট,

৪৩। ” যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল এ ১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট

৪৪। ” রায় জলধর সেন বাহাদুর ... ১৪০ এ কেশব সেন ষ্ট্রীট,

৪৫। ” কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ ... ৪ রস্তমজীপার্শী ষ্ট্রীট, কাশীপুর, কলিকাতা

৪৬। ” অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম এ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

৪৭। ” নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, ... ৪৮ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।

৪৮। ” হরিহর শেঠ ... পালপাড়া, চন্দননগর।

৪৯। ” অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ৯ নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০। ” ডাক্তার এস কে মুখার্জ্জি... ১১ উড ষ্ট্রীট, কলিঃ।

৫১। শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী ... দার্জ্জিলিঙ্।

সাময়িক সদস্য।

১। ” শ্রীযুক্ত মনীশ ঘটক ... বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২। ” কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪ এ রাণী রোড, পাইকপাড়া, কলিকাতা।

৩। ” কেশবচন্দ্র অধিকারী ... ৭৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ”

৪। ” সুশীলকুমার বাগচী ... সাঁতরাগাছি, হাওড়া,

৫। ” মুরারি মোহন সেন ... ৭৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। ” সতীশচন্দ্র বসু ... ৮।২ সাহিত্য পরিষৎ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৭। ” রমণী মোহন দাস ... ৭৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ”

৮। ” জিতেন্দ্র নাথ বসু গীতারত্ন বি এ সলিসিটার ... ৬৪ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট।

৯। ” অনাথ নাথ ঘোষ ... বেলঘড়িয়া, ২৪ পঃ

১০। ” বীরেশচন্দ্র দাস বি এ ... উমেশচন্দ্র দাস লেন, পঞ্চাননতলা হাওড়া.

১১। ” বিভূতি ভূষণ দাস .. ঐ

১২। ” অমৃতলাল বিদ্যারত্ন ... মাজু, হাওড়া,

১৩। ” অমলচন্দ্র হোম ... ৯৯।১ এন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১৪। ” ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার এম এ. পি এচ ডি, পাটনা।

১৫। ” নির্ম্মল নাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৭৩ এ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

১৬। ” রামকমল সিংহ ... কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

১৭। শ্রীযুক্তা চারু বালা দেবী (ঠাকুর) ... ৬ দ্বারকা নাথ ঠাকুর লেন।

১৮। শ্রীযুক্তা চিত্রা ঠাকুর ... ”

১৯। ” কমলা ঠাকুর ... ”

২০। ” প্রতিমা ঘোষ ... ৩৫।১০ পদ্মপুকুর লেন

২১। শ্রীযুক্ত ত্রিদিব নাথ রায় এম, এ বি এল

সম্মেলনের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ

নদীয়া প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর

পরিশিষ্ট (ছ)

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের
অভিভাষণ

সমবেত সাহিত্যিকগণ,

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সসম্মান অভিবাদন জানাইতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ন্যায় মহাযজ্ঞকে সৌষ্ঠব সম্পন্ন করা আমাদিগের ক্ষুদ্র সাধ্য ও সামর্থ্যের অতীত হইলেও বাণীর মন্দিরে এই মিলনানুষ্ঠানে যে পুণ্য ও অসীম প্রীতি আছে তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে চাহিনা বলিয়াই এবং একমাত্র আপনাদিগের মহানুভবতার ও সৌহার্দ্দ্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই আমরা আজ ন্যায়দর্শনের ঐতিহাসিকভূমি অতীতগৌরব এই নিঃস্ব নদীয়াতে আপনাদিগকে আহ্বান করিতে সাহসী হইয়াছি। নদীয়া এককালে বাংলার মনীষার কেন্দ্রস্থল এবং সকল শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎস স্বরূপ ছিল কিন্তু তথাপি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ইতঃপূর্ব্বে এখানে কখন না হওয়ার কারণেও আমরা এই একবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমরা জানিতেছি এই অনুষ্ঠানে আমাদিগের অনেক ভুলভ্রান্তি ত্রুটি ঘটিয়াছে ও ঘটিবে কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদিগের আন্তরিকতার বা ঐকান্তিকতার কোন অভাব নাই—ইহা জানিয়া আশা করি আপনারা আমাদিগের সকল ভুল ও ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া আমাদিগের আমন্ত্রণের এই দীন অর্ঘ্য উদার হৃদয়ে গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গবাণীর অদ্বিতীয় সাধক ও সেবক সর্ব্বজনপ্রিয় লেখক সম্প্রতি পরলোকগত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা প্রথমে মূল সভাপতি করা স্থির করিয়াছিলাম। তাহার নিকট যখন এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হই—'সাহিত্যে তাঁহার কত কথাই বলিবার আছে এবং তিনি নিশ্চয়ই সভাপতিত্ব করিতে আসিবেন'—বলিয়া কত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন জানিতাম না তাঁহার জীবনের ও প্রতিভার এত শীঘ্র এমন শোচনীয় অবসান হইয়া যাইবে, তাঁহার সে আকাঙ্খিত বক্তব্য আর আমরা শুনিতে পাইব না। যে যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য-স্রষ্টাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া মাল্যদান করিব ভাবিয়াছিলাম, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে কত দুঃখের সহিত সেদিন চিরনিদ্রিত তাঁহাকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপে সে মাল্য প্রদান করিয়া আসিলাম। এ বেদনার স্মৃতি মনে চিরদিন জাগিয়া থাকিবে। শরৎ চন্দ্রের অভাবে বাংলার সাহিত্যাকাশ সুধাংশু শূন্য হইয়া

গেল। তাঁহার সে অভাব আর পূর্ণ হইবে কিনা জানি না। আজিকার এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদিগের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

এই সম্মেলনের মূল সভাপতি মহাশয় এবং বিভিন্ন শাখার সভাপতি মহাশয়গণ আমাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অশেষ অসুবিধা সত্বেও এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যে মহিলাগণ এই সম্মেলনে আজ উপস্থিত হইয়া ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং সমবেত প্রতিনিধিগণকে আমার কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তব্য এই স্থানে শেষ হইলেই ভাল হইত কিন্তু তাহা না করিয়া অন্য কথাও কিছু বলিবার প্রয়োজন মনে করিতেছি। আপনাদিগকে কোন নূতন কথা শুনাইতে পারিব সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে নদীয়াতে সাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশনে নদীয়ার পুরাতন পরিচয় কিছু আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত না করিলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

নবদ্বীপ হইতেই আমাদিগের এই নদীয়ার নাম। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর উপর অবস্থিত বলিয়া বাংলার প্রথম হিন্দুরাজা আদিশূর নবদ্বীপে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে কৃষ্ণনগরের নাম বুঝি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। ভট্টনারায় বংশোদ্ভব ইতিহাস বিখ্যাত ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে মহারাজা উপাধি ও চৌদ্দখানি পরগণা প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার মেটিয়ারী নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র মহারাজা রাঘবচন্দ্র এই স্থানে রেউই নামক গ্রামে আসিয়া এক বৃহৎ রাজভবন নির্ম্মাণ ও দীঘিকা খনন করান। তাঁহার পুত্র মহারাজা রুদ্র রায় নবদ্বীপে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং রেউই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামে উহার কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন—সেই হইতে এই কৃষ্ণনগরের উৎপত্তি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই মহারাজা রুদ্র রায় হইতে নিম্ন ষষ্ঠপুরুষ।

ঐতিহাসিক নদীয়া

পূর্ব্বকালের নদীয়া বর্ত্তমান নদীয়া হইতে ভৌগলিক পরিধি ও আয়তনে অধিক বিস্তীর্ণ ও প্রসারিত ছিল। নবদ্বীপ প্রাচীন বাঙ্গালা হিন্দু সম্রাটের শেষ রাজধানী এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম ও লীলানিকেতন বলিয়াই ইতিহাসে বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস বাংলার

ইতিহাসের অনেক খানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের ইতিহাস লইয়াই নদীয়ার সমুদয় ইতিহাস। এই নদীয়াতেই বল্লাল সেন কর্ত্তৃক হিন্দু সমাজ সংস্কার ও কৌলিন্যপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, এই নদীয়াতেই মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ্য হৃত হইয়াছে। বাংলার অনেক মর্ম্মান্তিক কাহিনী এই নদীয়ার সহিত গ্রথিত রহিয়াছে। এই নদীয়ার সংশ্রবেই মহারাজা প্রতাপাদিত্যের মানসিংহের নিকট পরাজয় হইয়াছে—এই নদীয়া হইতেই দেশের ভাগ্যলক্ষ্মীর কত বিচিত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অবশেষে এই নদীয়াতেই পলাশী প্রাঙ্গণে শুধু বাংলার নয় ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আমি সে সকল সামাজিক বা রাজনৈতিক কথার আলোচনা না করিয়া শুধু সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দিক হইতে নদীয়া এতকাল ধরিয়া বাংলাকে কি দান করিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে আপনাদিগকে বলিব।

এই দান দেখিতে হইলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি।

নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ও সংস্কৃত বিশ্ব-বিদ্যাপীঠ।

তাঁহারা যেন ভাস্বর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর ন্যায় আজিও জগতের জ্ঞানাকাশে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। কি অসাধারণ তাঁহাদিগের স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি, কি মহান তাঁহাদিগের জীবনের আদর্শ ও জ্ঞানচর্চ্চার স্পৃহা। তাঁহাদিগের জীবনী আলোচনা করিলে বিস্ময়ে ও ভক্তিতে তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হয়।

দর্শন স্মৃতি সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চায় এক সময়ে মিথিলা ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং গৌতম কনাদ জয়োধর বা পক্ষধর মিথিলার পণ্ডিতগণ সারস্বতসমাজে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন। বেদবেদান্ত ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞান আহরণ করিতে হইলে মিথিলার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। এই সময়ে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গিয়া তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে ন্যায়শাস্ত্রেরগ্রন্থ "চিন্তামণি চতুষ্টয়" যাহা মিথিলার পণ্ডিতগণের করতলগত হইয়া চিররুদ্ধ অবস্থায় ছিল সেই সমগ্র গ্রন্থখানি কণ্ঠস্থ করিয়া একমাত্র স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তাহা মনের মধ্যে বহন করিয়া নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন ও সেই হইতে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রচলন করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ঘটনা হইতেই নবদ্বীপের জ্ঞানগৌরবের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা। তাহার পরে বাসুদেবের প্রধান শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি বিদ্যার্থীরূপে পুনরায় মিথিলায় গিয়া তথাকার জ্ঞানসম্রাট পণ্ডিত প্রবর অজেয় জয়োধর মিশ্র যিনি পক্ষধর বলিয়া বিদিত, তর্কে

তাঁহার জ্ঞানপক্ষ ছেদন করিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের ন্যায়ের উপাধি প্রদান করিবার ক্ষমতা লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সময় হইতে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত হয় এবং মিথিলার প্রাধান্য ও গর্ব্ব এককালীন খর্ব্ব হইয়া যায়। সেই সুদূর অতীত হইতে নবদ্বীপে আজিও দেশ-দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থীগণ অধ্যয়ন করিতে আসিয়া থাকেন।

রঘুনাথের পর রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও পণ্ডিত মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ, রামনাথ, গদাধর, ভুবনমোহন প্রভৃতি পরবর্ত্তী অদ্বিতীয় পণ্ডিত-গণ উজ্জ্বল প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপকে ও নবদ্বীপের দেবভাষার বিদ্যাপীঠকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের এই জ্ঞানগরিমা কেবলমাত্র নবন্যায়ের তর্কশাস্ত্রেই পর্য্যবসিত ছিল না। ঐ তর্কশাস্ত্র দ্বারা দেশে নাস্তিকতার সূচনা হইতে লাগিল—মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রভাবে জাতিভেদে আঘাত পড়িল তাই বোধ হয় হিন্দুসমাজকে নূতন করিয়া বাঁধিবার জন্য সংস্কারক স্মার্ত্ত রঘুনন্দ-নের আবির্ভাব এই নবদ্বীপেই হইয়াছিল। তিনিও চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সামাজিক বিধি বিধানের বিধাতারূপে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া তিনি যে সকল বিধান দিয়া গিয়াছেন বাংলার হিন্দু সমাজ আজিও তাহার দ্বারাই চালিত হইতেছে।

একদিকে যেমন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অপরদিকে আবার তেমনি তন্ত্রোক্ত মতের অন্তরালে দেশে যে ব্যাভিচারের ছায়া পড়িয়াছিল তাহা অপসারিত করিবার জন্য এই নদীয়াতেই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অভ্যুদয়। তিনিই সাকার শ্যামামূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এই নবদ্বীপ হইতেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় জীমূত-বাহন কৃত দায়ভাগেরটীকা ও "দায়ক্রম সংগ্রহ" রচনা করেন। Colebrook সাহেব তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা আজিও হিন্দুবাঙ্গালীর উত্তরাধিকার ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে।

পর পর এতগুলি মহাপুরুষের জন্মে ও প্রতিভাবলে নদীয়া একদিন জ্ঞানেধর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে সমগ্রবাংলাদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু যাহা ছিল তাহা আর আজ নাই—তাহা না থাকিলেও তাহার প্রভাব যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে একথা বলিতে পারি না। এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রদত্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি আজিও হিন্দুর জাতীয়তাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সমাজেরই একটা বৈশিষ্ট আছে। হিন্দুবাঙ্গালীর জাতীয় সভ্যতা ও হিন্দুসমাজের

নিজস্ব বৈশিষ্ট বর্ত্তমান সময়ের প্রলয়ঙ্করী পরিবর্ত্তন ও আবর্ত্তনের মধ্যে যদি কিছু দ্বারা অক্ষুন্ন থাকিয়া থাকে তবে তাহা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের এই শিক্ষাসংস্কৃতি ও বিধি বিধান দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। তাহা না হইলে বর্ত্তমান সর্বতোমুখী প্রতিক্রিয়ার মুখে হিন্দুবাঙ্গালী আজ কোথায় ভাসিয়া যাইত। সমগ্র বাংলাকে নদীয়ার এই সংরক্ষণ দান বড় কম কথা নহে।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামও সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাহা আমি পূর্ব্বে করি নাই, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য ও গৌরব কাব্যব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বা জ্ঞানে নহে, তাঁহার মাহাত্ম্য ও গৌরব তাঁহার দেবত্বে। তিনি নবদ্বীপের উষর বক্ষে প্রেমভক্তির যে নূতন রসপ্লাবন আনিয়া দিয়াছিলেন ও যাহার আস্বাদনে সমগ্র বঙ্গ ধন্য হইয়াছিল এবং যাহা বাংলার ভাষাসাহিত্যের তটে পদাবলীর এক অভিনব তরঙ্গ তুলিয়াছিল, মহাপ্রভুর সেই প্রেমভক্তির নবধর্ম্ম ও সুরের সহিত তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে যে কবিতাসাহিত্যের সৃষ্টি তাহাই সমগ্র বাংলাকে নবদ্বীপের অন্য শ্রেষ্ঠতম দান।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

বাংলা ভাষার দিকদিয়া নদীয়া বাংলাকে কি দান করিয়াছে দেখিতে হইলে দেখিতে পাই দেশের সেই প্রাচীন অন্ধতমসার মধ্যে বাংলাভাষার সাহিত্যাকাশে প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল এই নদীয়ায় এবং বঙ্গবাণীর চরণতলের শ্বেতশতদল প্রথম বিকাশিত হইয়া উঠিয়াছিল এই নদীয়ায়। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্ম বীরভূম জেলাতে অজয়তীরে কেন্দুবিল্বে হইলেও তিনি নবদ্বীপে রাজা লক্ষণ সেনের রাজ-সভায় পঞ্চরত্নের একরত্ন স্বরূপেই শোভা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সরল সংস্কৃত রচনার সুকোমল ছাপ নবদ্বীপের রাজসিংহাসনের ছায়াতল হইতেই বাংলার মাতৃভাষার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে নবদ্বীপের পণ্ডিত গণের দেবভাষার অনুশীলনের ফল ও প্রভাব বাংলাভাষার প্রতি বহুল পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস এই নদীয়াতেই জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার জন্মভূমি শান্তিপুরের সন্নিকট তৎকালে জাহ্নবীর তীরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে বসিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বাল্মীকির রামায়ণ বাংলা কবিতায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের যে উন্নতিকল্পে আজ সমগ্র বাঙ্গালী স্বদেশে প্রবাসে জাগিয়া উঠিয়াছেন ও নানাস্থানে সম্মিলিত হইতেছেন সেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এই নদীয়াতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্য

বাংলা সাহিত্যে নদীয়ার স্থান।

দিয়া সূচিত হইয়াছিল। নদীয়ার পক্ষে ইহা কম শ্লাঘা ও সৌভাগ্যের কথা নহে। তাহার পরেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের ফলে নবদ্বীপে যে ভক্তির উৎস উঠিয়াছিল ও নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল বাংলার শিশুপদ্যসাহিত্য তাহাতে নবকলেবর ধারণ করিয়াছিল। আমার মনে হয় মহাপ্রভু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষাকেই ভালবাসিয়াছিলেন—কেননা তাঁহার পূর্ব্ব অবধি দোহা আদির রচনা সব সংস্কৃত এবং মৈথিলি ভাষাতেই হইয়াছে দেখিতে পাই। মহাপ্রভুর সময় হইতেই বাংলা ভাষাতে প্রথম পদাবলীর রচনা আরম্ভ হইল এবং মহাপ্রভুর পার্শ্বচর ও ভক্তগণ তাঁহাদিগের রচিত প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসময় পদাবলীতে বাংলার পদ্যসাহিত্যকে নূতন শ্রীসম্পন্ন পরিপুষ্ট ও রসপরিপ্লুত করিয়া তুলিলেন এবং ইহা হইতেই নদীয়াতে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হইল।

অতঃপর নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণনগরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র-বাংলার বিক্রমাদিত্য—এই নবগঠিত বাংলা সাহিত্যকে সাদরে তাঁহার রাজ-সিংহাসনের পার্শ্বে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং এই নদীয়াতে যে স্থানে আমরা আজ সম্মিলিত হইয়াছি কৃষ্ণনগরের এই রাজবাটীতেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়া বঙ্গবাণীর কম্বু কণ্ঠে অপূর্ব্ব কল্পনার ও অভিনব ছন্দ রাজির রত্নমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার পদ্যসাহিত্য এই নদীয়া হইতেই প্রথম সম্পদ-শালী হইয়া উঠিল এবং পরে বাংলার যে সকল বরেণ্য কবিগণ তাহাকে বিশ্ব-আরাধিতা করিয়া তুলিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে এই নদীয়ারই উজ্জলরত্ন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যতম।

মাতৃভাষা গদ্যসাহিত্য ঠিক কোন সময়ে প্রথম কি অবয়ব ধারণ করিয়া-ছিল তাহা বলা কঠিন, তবে তৎকালে নবদ্বীপের এই সংস্কৃত আলোচনার মধ্য হইতেই যে মাতৃভাষা তাহার প্রথম অঙ্গআবরণ ও আভিজাত্য সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাংলার আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টা বাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় ও তৎপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি যে সকল মনীষীগণ বাংলাভাষাকে লালন-পালন করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে এই নদীয়ার মদন মোহন তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। তিনিই বাংলার বর্ত্তমান শিশু-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। জয় গোপাল তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শ্যামাচরণ

সরকার, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেরই জন্মভূমি ছিল এই নদীয়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বঙ্গ দর্শনের মধ্য দিয়া ও নানা উপন্যাস লিখিয়া এই সাহিত্যশিশুর অঙ্গে যৌবনশ্রী আনিয়া তাহাকে রূপ রসান্বিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতেছিলেন ও ভবিষ্যতের কথা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন এই সময় নদীয়ায় আর এক প্রতিভাবান লেখক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ আর্য্যদর্শনের মধ্য দিয়া ও দেশ বিদেশ হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে তেজ ও শক্তির সঞ্চার করিতেছিলেন। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া জন্মভূমির সেবায় নিজেকে আজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গবাণীর পাদপীঠে স্বদেশপ্রীতির মহার্ঘ্য অঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বদেশপ্রেমের একমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার লেখা ও ভাষা মৌলিক চিন্তায় ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। মাতৃভাষাতে একটী নূতন শক্তি ও অভিনব গতি তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আনিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শন সম্পাদকদ্বয়ের যুগপৎ সাধনায় এবং অন্যান্য মনীষীগণের চেষ্টায় বঙ্গ সাহিত্য বর্দ্ধিত হইবার পরে তাহা বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে বিশ্বের সাহিত্যমন্দিরে সমাসীন হইবার সময়েই এই নদীয়ার প্রিয়পুত্র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাহাকে বেদনাকরুণ হাস্যরসে নূতন নাট্যাকারে ও স্বদেশ প্রেমের সঙ্গীতগানে যে পরিমাণ সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সে সাহিত্য সাধনা ও কাব্যপ্রতিভা বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমাদিগের দুঃখ এই যে তাঁহার এই জন্মভূমিতে আমরা আজিও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত কিছুই করিতে পারি নাই। বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাস বা বিকাশ দেখান এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে অথবা সেই উন্নতি ও বিকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট এই নদীয়ার বা সমগ্র বাংলার সমুদয় কৃতবিদ্য লেখকদিগের সকল নামের যথাযোগ্য উল্লেখ করাও এখানে সম্ভবপর নহে। এই সম্মেলন উপলক্ষে আমরা যে সামান্য একটী প্রদর্শনী করিবার চেষ্টা করিয়াছি—নদীয়ার পরলোকগত ও জীবিত লেখকদিগের ও তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থের যথাসম্ভব নামের সহিত আপনারা সেইখানেই পরিচিত হইতে পারিবেন।

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধনকল্পে নদীয়ার আর একটী বিশেষত্ব এই যে এখানে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকগণ বাংলাভাষাকে মাতৃভাষাজ্ঞানে সমভাবে তাহাকে সেবা ও কল্পনার কুসুমে সুসজ্জিত করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নদীয়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি মোসলেম ভারতের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শান্তিপুরের

মোজাম্মেল হকের নাম ও বিষাদসিন্ধু রচয়িতা কুষ্ঠিয়া লাহিনীপাড়া নিবাসী মীর মোসারফ হোসেনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থান এই নদীয়াতে। নদীয়ার এই বাউল সঙ্গীত ও নদীয়ার অনেক সাধকের সাধন সঙ্গীত বাংলা ভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। কুষ্ঠিয়ার ফকির লালনসাহী কুমারখালীর কাঙাল হরিনাথ ইঁহাদিগের গান সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। সাধক রামপ্রসাদ এই কৃষ্ণনগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ সভায় থাকিয়া তাঁহার সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র অনেক সাধন সঙ্গীত লিখিয়া গিয়াছেন। যাত্রা গানের প্রথম উৎপত্তি বাংলার কোন্ স্থান হইতে তাহা ঠিক বলিতে পারি না তবে নবদ্বীপ হইতে যে বাংলায় যাত্রা গানের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নবদ্বীপের মতিলাল রায়ের যাত্রার দল বৌমাষ্টারের যাত্রার দল প্রসিদ্ধ ছিল। মতিলাল রায় মহাশয় একজন কবি ও প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। যাত্রার অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাউল ও সাধন সঙ্গীত ও যাত্রা গান

নদীয়ার নীলবিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কবি দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নদীয়ার সেই নীল বিদ্রোহেরই জ্বলন্ত চিত্র। কবি দীনবন্ধু মিত্রের জন্মভূমি এই নদীয়াতেই কাঁচড়াপাড়ার নিকট চৌবাড়িয়াতে। চাকরী উপলক্ষে এই কৃষ্ণনগরে থাকিয়াই তিনি তাঁহার অনেক কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্য এই নদীয়ার একপ্রান্তে শিলাইদহে পদ্মাতীরে বসিয়া রচিত হইয়াছে।

১৮৪৭ খৃঃ অঃ হইতে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হইয়া ঐ সময় হইতে এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হয় এবং তাহার ফলে এই কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ বাংলার প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা বাগ্মী লালমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগরের উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ ছিলেন। কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় সমাজসংস্কারক ধর্ম্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ী শিক্ষাবিৎ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্র দত্ত রায়বাহাদুর যদুনাথ রায় শান্তিপুরের সাধু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী কুমারখালির তন্ত্রোপাসক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এবং সিরাজদ্দৌলা প্রণেতা বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র ও

স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় প্রভৃতির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের বীর আশানন্দ মুখোপাধ্যায় (ঢেঁকি), কৃষ্ণগঞ্জের নিকট নাথপুরের কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম এখন ইতিহাস বিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী আশাননগরের বিশ্বনাথ বাগদী ও তাহার সঙ্গী "বদে বিশে ডাকাত" বলিয়া বিখ্যাত হইলেও তাহাদের বীরত্ব এমনি অসাধারণ ছিল যে তাহাদিগকে দমন করিতে তৎকালে কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টকে কলিকাতা হইতে ফৌজ আনিতে হইয়াছিল।

নদীয়ার শিল্প মেলা প্রভৃতি

নদীয়ার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও দেব দেবীর প্রতিমা গঠন শান্তিপুরের বয়নশিল্প প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ বারদোল এবং জগদ্ধাত্রী পূজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া আজিও সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। শান্তিপুরের রাস, নবদ্বীপের পটপূর্ণিমা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ—এই সব উপলক্ষে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নদীয়াতে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান

নদীয়ার ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থানের মধ্যে স্বয়ং নবদ্বীপ এবং নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুর যাহাকে বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী যেখানে সুবৃহৎ মঠ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গলার গৌড়ীয়মঠ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটে বল্লাল দীঘি ও বল্লাল ঢিপী রাজা বল্লাল সেনের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। শান্তিপুরে এক সময়ে য গড় ছিল তাহা আর না থাকলেও ঐ স্থানের নাম গড় আজিও আছে। এই সহরের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণ বিহার গ্রামের নাম হইতে বুঝা যায় এখানে এক সময়ে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এইস্থানে পুরাতন ভবনাদির ভগ্নাবশেষ ও তাহার ইষ্টকের কারুকার্য্য দেখিয়া উহা যে এক সময়ে বৌদ্ধ রাজাদিগের আবাসস্থান ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। নিকটবর্ত্তী পানশিলা গ্রামেও একটী উচ্চ ঢীবি ও তাহাতে প্রস্তরখণ্ডে খোদিত লিপি হইতে অনুমান হয় তক্ষশিলা বিক্রমশিলার ন্যায় এখানেও বৌদ্ধ মঠ ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর এক সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া বিদিত। এই সহরের সন্নিকটে জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম ও তাহার সংলগ্নে তাঁহার স্থাপিত 'বাগে রমনা' যাহাকে এক্ষণে কোম্পানীর বাগান বলা হয় তাহাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক মহারাজাকে যে সকল উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু

এবং পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত কতকগুলি কামান এখনও এই রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচ্য বিদ্যার পণ্ডিত Sir William Jones, Dr. Curey Dr. Lyden, Dr. H. H. Wilson, Prof Cowell সকলেই নবদ্বীপের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন। বাংলার গভর্ণর Lord Ronaldshay তাঁহার নবদ্বীপ দর্শনের স্মৃতি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নবদ্বীপের সে সংস্কৃত শিক্ষার গৌরব বর্ত্তমানে নবদ্বীপের "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে এবং তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিত বিখ্যাত বুনো রামনাথের সেই পুরাতন ভিটাতে ও টোলবাড়ীতে "নবদ্বীপ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ" নূতন করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। নবদ্বীপের এক নির্জ্জনপ্রান্তে এই নূতন স্থাপিত বিদ্যাপীঠগৃহটী ও তাহার দুইপার্শ্ব দিয়া বিদ্যার্থীদিগের শ্রেণীবদ্ধ ছোটছোট গৃহগুলি সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের উপর আজিও ভগ্নাবস্থায় রামনাথের পূতস্মৃতি বক্ষে ধরিয়া জগতে অভ্যুত্থান ও পতনের ও পুনরুত্থানের দৃষ্টান্তস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপে ইহা একটী দ্রষ্টব্যের মধ্যে।

নবদ্বীপ

নদীয়া চিরদিনই ভাষার আভিজাত্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ও রক্ষা করিবার পক্ষে কিন্তু তাহাই বলিয়া কথা কহিবার সরল চল্‌তি ভাষাকে রচনার ভাষা করিয়া লইয়া বর্ত্তমানে লিখিত বাংলা ভাষার যে নূতন ধরণ প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ দেখি না। রচনার আধুনিক প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে অভিনবত্ব আছে প্রাণ আছে বৈচিত্র আছে ও তাহার একটা অবাধ গতি আছে। মাতৃভাষার প্রসার এবং উন্নতি সব দিক দিয়াই বাঞ্ছনীয়। মাতৃভাষার পক্ষে ইহা খুবই আশাপ্রদ শুভলক্ষণ যে দেশের শিক্ষিত তরুণ হৃদয়—পুরুষ এবং নারী—সকলেই প্রাণ দিয়া মাতৃভাষাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহার আদর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমুদয় শিক্ষণীয় বিষয় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমি এতক্ষণ ধরিয়া আপনাদিগের ধৈর্য্যকে পীড়ন করায় দুঃখিত। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আপনাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আমাকে মুখপাত্র করিবার সম্মান আমাকে নানা কারণে বিশেষতঃ নিজের সর্ব্বপ্রকার

অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া অতিকুণ্ঠিতচিত্তেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমার প্রতি আমার সহকর্ম্মীদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির জন্য এবং তাঁহারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং তাঁহাদিগের সহিত নদীয়াবাসীর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে পুনরায় সাদর অভিনন্দন জানাইয়া আজিকার নির্দ্দিষ্টকর্ম্মে আহ্বান করিতেছি। নদীয়ার পরলোকগত পুণ্যশ্লোক পণ্ডিতগণের মহানাদর্শ স্মরণ করিয়া আপনারা সম্মেলনের কার্য্যে ব্রতী হউন। পরস্পরের মধ্যে আলাপে পরিচয়ে ও ভাব বিনিময়ে সাহিত্যের আলোচনায় এবং মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সম্মেলনের উদ্দেশ্য সফল হউক।

কৃষ্ণনগর —
২৯শে মাঘ, ১৩৪৪।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন-সঙ্গীত

(১)

আজি নদীয়ার পূণ্যদিবসে এস বরেণ্য মনীষীগণ !
আজি তোমাদের প্রতিভায় হোক্ হারানো দিনের উদ্বোধন।
অতীত স্মৃতির সায়র মথিয়া
বাণীর কমল উঠুক্ ফুটিয়া,
কবি 'দ্বিজেন্দ্র', 'ভারতচন্দ্র', ভারতীর বরপুত্রগণ
উঠুক্ জাগিয়া 'শ্রীকৃত্তিবাস' পূর্ণ হোক্ এ সম্মেলন।

কোরাস্—

পূর্ণ করেছ বাঙ্গালীর আশা গৌরবে সে যে দীপ্তিমান্—
ঝঙ্কৃত আজি সাম্যবীণায় মুক্তির মহামন্ত্রগান।

(২)

চলেছ তোমরা নিত্যপূজারী সত্যপথের যাত্রিদল,
তোমাদের জয়কেতনে ভরেছে নির্ম্মল নীল গগনতল ;
নব বিজ্ঞানে নব দর্শনে
নব কাব্যের পুণ্য-বোধনে
সরস্বতীর দেউল তোমরা গড়েছ রত্ন সমুজ্জ্বল,—
অর্চ্চিলে নব নব উপচারে জ্ঞান-জননীর পদকমল।

কোরাস্—ঐ

(৩)

প্রেমিক গোরার অঙ্গ-লাবণি প্রতি ধূলিকণা করেছে আলো,
করুণার তাঁর শাশ্বত সুর দীন নদীয়ারে বেসেছে ভালো ,
আজি সে প্রেমের তীর্থ-নগরে
বরি তোমাদের প্রীতি সমাদরে,
হে নবযুগের ভাগ্যবিধাতা ! নাশি' অজ্ঞান অমার কালো
ভরে' দিলে প্রাণে কত নব দানে নব বিধানের জ্বালিয়া আলো।

কোরাস্—ঐ

(৪)

স্বদেশে বিদেশে বিশাল বিশ্ব জ্ঞান-বৈভবে দিয়েছ ভরি',
কর্ম্মদেবীর ভাঙালে নিদ্রা নব প্রভাতের হর্ম্ম্যোপরি ;

নব সাহিত্যে নূতন তত্ত্বে
গড়েছ বাঙলা নব দেবত্বে,
চিরস্মরণীয় বরণীয় দিনে এস সুধীজন প্রীতিতে ভরি',
আজি এ মহান্ মিলন-তীর্থে এ শির লুটায়ে প্রণাম করি ॥

'সুধা-নিলয়'
কৃষ্ণনগর
২৯এ মাঘ, ১৩৪৪

শ্রীমতী শোভা দেবী।

অভিনন্দন

শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী

বন্দি স্বাগত! মনীষীবৃন্দ, তোমাদের পায়ে প্রণাম করি
অতীতের বহুসুধীকুলস্মৃতি-বিজড়িত এই নগর' পরি।
শ্রদ্ধা-প্রীতির চন্দনমাখা মালিকা গেঁথেছি শেফালি ফুলে,
আশার প্রদীপে পুলকের শিখা জ্বালায়েছি পূজা বেদীর মূলে।
গুরু বরণের অগুরু গন্ধ জাগিয়া উঠিছে আরতি ধূপে
ভগ্ন প্রাচীন তোরণ আবার সাজায়ে তুলেছি নবীনরূপে।
কণ্ঠে কণ্ঠে মঙ্গল গীতি ঝঙ্কারি' ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
'কল্যাণ হোক্, কল্যাণ হোক্' পুরনারী সনে শঙ্খ স্বনে।

একদা হেথায় বাণীর পূজারী রচেছিল বেদী পূজার তাঁর!
আপন ছন্দে গাহিয়া গিয়াছে কত মত গীতি বন্দনার।
বিবুধজনের চরণ পরশে শুদ্ধ নদীয়া-পথের ধূলি
চন্দন সম নৃপতি আপনি শ্রদ্ধায় নিল মাথায় তুলি;
বাণীর সেবায় জ্ঞান চর্চ্চায় ডুবেছিল যাঁরা জগৎ ভুলি'
তুচ্ছ করিয়া ধনের দর্প কুটীরে যাপিল দিবস গুলি।
তিন্তিড়ি শাক ব্যঞ্জন করি' আহারে অরুচি যাদের নহে,
রাজ-আহ্বানে অবহেল' সুখে পুঁথি রচনায় মগ্ন রহে।
হেথাকারই ছেলে বহু বাধা ঠেলে প্রবাসে শাস্ত্র শিক্ষা শেষে
যা কিছু তাহার কণ্ঠে ধরিয়া ফিরিয়া আসিল আপন দেশে।
গরবী গুরুর গর্ব্ব টুটিয়া শিষ্যের স্মৃতি উজলি' ভায়
বিদ্যা-বিভব অর্থ নহে তো, তারে কেড়ে' কভু রাখা কি যায়?
এমনি কতনা গুণী জ্ঞানী জনা অতুল জীবন গিয়াছে যাপি'
শুনি' সে কাহিনী রূপ-কথা সম বিস্ময় নারি রাখিতে চাপি'।

কে জানে সে যুগে সরসী ঢাকিয়া ফুটেছিল কত পদ্ম-কলি
গেয়ে উঠেছিল কি সুরে পাপিয়া প্রীতি-বেদনার রসেতে গলি',
পল্লী কি হ'ল তপোবন? বহি' বিস্মৃত কোন্ যুগের বায়
ভাবুক হৃদয় উথলি' উঠিল কাব্য-লক্ষ্মী হাসিয়া চায়?

প্রথম-কবির চরণ স্মরিয়া, স্মরি' তারি মধু কল্পনায়,
কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি যখন বাজিল ছন্দ মূর্চ্ছনায়।
সহজ সরল আপন ভাষায় রামায়ণ-গান বাঙালী শোনে
সীতার ব্যথায় মথিয়া হৃদয় জল জমে' ওঠে চোখের কোণে।

কিশোর নিমাই পণ্ডিত যেথা গৌরবে করে অধ্যাপনা
ধন্য সে দেশ, পুণ্য সে যুগ, বিস্মিত হ'ল সর্ব্বজনা।
জাতি-বিজাতির বিভেদ ভুলিয়া কোল দিল প্রেমে আচণ্ডালে
অবাক্ জগৎ, জ্যোতির তিলক নিরখিল তাঁর পূণ্য-ভালে।
জীর্ণ-প্রথারে চূর্ণ করিয়া প্রচারিয়া গেল নবীন বাণী
পরম-প্রীতির রস-হিল্লোলে ভাসাল অর্দ্ধ ভারতখানি।

ভারতীর বরপুত্র হেথায় কবি গুণাকর ভারত রায়
কবিতা রসের উৎস যাহার মধুর ছন্দে উছলি' যায়;
রাজার সভারে মাতায়ে তুলিল কবিতা রসের সুধার ধারা
রসিক জনের হৃদয় মজিল পান করি' রস আপনা-হারা।
সে দিনের সেই রাজসভা নাই, নাই সেই কবি আজিকে আর
তবু আছে মধু-রচনা তাহার অমিয় নিঝর ঝরিছে তার।
সভার সীমানা লঙ্ঘি' গিয়াছে তার সেই দান ছড়ায়ে দূরে,
কবিতা চলেছে কত ঘরে ঘরে কবি র'ল তার গোপন পুরে।

আজি এ নদীয়া হৃত-গৌরব সঙ্কোচ-দীন, মলিন সাজে
সরিয়া রয়েছে গোপন ব্যথায় মরমে মরিয়া গভীর লাজে।
অতীতের স্মৃতি এখনো কি তার বক্ষে জাগায় হর্ষ তবু?
কে বলিবে হায় দীর্ঘ-নিশাস্ বায়ু সনে মিশে যায় বা কভু!
আজও মধু সুরে গাহে কত গুণী হেথাকার দ্বিজু রায়ের গীতি,
গুণিগণ-সখা দিলীপ এখনও সুর সাধনায় যাপিছে নিতি।
মাঝে মাঝে আজও সাড়া দেয় যারা বাণীর সেবক দু'চারি জন
পৌর্ণ-মাসীর অবসান-প্রাতে ভগ্ন কুঞ্জে কুহু স্বন!
হো'ক্ যত ছোট উপচার তার, তুচ্ছ নহে সে প্রাণের সেবা
হৃদি-মন্দিরে আরতির দীপ নিভৃতে জ্বালায়ে রেখেছে যেবা।

তোমাদের পূত আসন আজিকে স্থাপিত হয়েছে অনেক সাধে
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলুক হেথায়, পুনঃ তোমাদের আশীর্ব্বাদে।
বিগত দিনের গৌরব রাশি মনে এনো ওগো ক্ষণেক তরে
আজিকার এই দীনতার লাজ দূর হ'য়ে যাবে পুলক-ভরে।
ওগো পণ্ডিত, ওগো জ্ঞানিজন, বাংলা মায়ের গরব-মণি,
আগমন আজ তোমাদের হেথা, নদীয়ার মহা ভাগ্য-গণি।
আজি বাঙালীর সকল কুণ্ঠা, সকল দৈন্য তমসা নাশি'
চির ভাস্বর সূর্য্যের সম দূরদিগন্ত সমুদ্ভাসি'—
বঙ্গ-ভাষার মধ্য গগনে আলো বিকিরণ করিছে রবি,
কাব্য-গরিমা দেশের ভাগ্যে অক্ষয় হ'ক তাঁহারে লভি'।
বাঙ্গালীর চির সুখ-দুঃখের কথা রচনার শিল্পী মরি
শারদ শুক্ল শশীর মতন দীপ্ত প্রতিভা বক্ষে ধরি'
ভাষা-জননীর প্রাণের দুলাল দরদী শরৎচন্দ্র তাঁর
দুই-হাত ভরি' উপহার রাশি ভাণ্ডারে কত দিল যে মার
অকালে সে হায়, লয়েছে বিদায় সে কথা স্মরণে বেদনা লাগে,
এ মিলন মাঝে বিচ্ছেদ তাঁর বার বার করি' মরমে জাগে।

কত এসে' কত চলে গেল হায়, দিয়ে গেল ধরি' কত যে দান
কিছু বা গিয়েছে ধূলি হ'য়ে তার, কিছু বা কখনো পেয়েছে মান।
আসা যাওয়া পথে, ঘাটে বাটে জোটে চকিতে কখনো সে সন্ধান
ধূলির তলায় মাণিকের কুচি জ্যোতি তবু তার অনির্ব্বাণ।
বাদল-নিশীথে গভীর নিশুতি কাঁপায়ে তুলি' যে উতলা সুর
ক্ষেপনী-ক্ষেপণে তালে তাল রাখি' তরী চলে কোন্ সাগর পুর!
কখনো উদাস মধ্য-দিবসে উদার সুনীল আকাশ-তলে
গোচারণমাঠে রাখাল বালক আপনার মনে গাহিয়া চলে,
তারি মাঝে বাজে হারাণো গীতির অতি সকরুণ কি সুরখানি
ভাবের বিভবে তুলা মেলা ভার, ভুলে' যাওয়া সেই কত যে বাণী!
অসীমের গান শোনাল যাহারা, কোথা গেল সেই বাউল দল
ভাবুক সাধক, পথচারী চির উদাসীন্ প্রাণ সুনির্ম্মল।
খুঁজে নাহি মিলে নিশানা তাদের, তবু শুনি সেই বিভল তান
একতারা সনে কণ্ঠ মিলায়ে রচিত যে সব মোহন গান।

এমনি করিয়া হারা-সম্পদ পথ-পাশ হতে কুড়ায়ে আনি,
অদেখা জনের দেখা পাই মনে, দেখি যেন তার হৃদয়খানি।

ক্ষুদ্র আগুনে দীন আয়োজন, ক্ষীণ আবাহন উঠেছে বাজি'
এনেছে ডাকিয়া দূরের বন্ধু! তোমাদের সবে নিকটে আজি।
ভুলি' অতিথির অভিমান যত, ক্ষমা কোরো আজ সকল ত্রুটি,
লহ এ মাল্য, অর্ঘ্যের থালি, প্রীতি হাসি মুখে উঠুক ফুটি'।
পুণ্য-পরশ তোমা-সবাকার মনে হয় শুভ সূচনা বলি'
আশার দোলায় দোলে চিত, বুঝি সোণার স্বপন উটিছে ফলি'।
সার্থকহোক্, হোক্ সুখময় বিদ্বজ্জন সম্মিলন।
নতি-নিবেদন করে বারবার বিদ্যাহীন এ অকিঞ্চন।

পরিশিষ্ট (জ)

সভাপতি ও সভানেত্রীগণের অভিভাষণ

মূল সভাপতির

অভিভাষণ

আজ থেকে ২৩ বৎসর আগে, ঠিক এই সময়ে, আমি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির আসনগ্রহণ করি। সে সভায় আমি উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সমাজে এই কথা নিবেদন করি যে ঃ

"এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্রনাথের জন্যই রচিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবং স্বয়ং রবিন্দ্রনাথের অভিপ্রায়-মত তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

আর আজও "এ সভার পতির" আসন শরৎচন্দ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তিনি অকস্মাৎ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি আপনাদের অনুরোধ-মত এই শূন্য আসন গ্রহণ করেছি। অবশ্য এ স্থলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, এমন কথা বলা চলে না। কেন-না এ ক্ষেত্রে আমি স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ-চিত্তে—যদিচ সুস্থ শরীরে নয়—এ পদ গ্রহণ করেছি। কেন, তা পরে বলব।

ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, এ ঘটনা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এবং আমার পক্ষেও অতিশয় দুঃখের বিষয়; কারণ আমি ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলুম। বোধ হয় আপনারা জানেন যে, আমি একাধিক বার শরৎ-সংবর্দ্ধনায় পৌরোহিত্য করেছি, এবং বহু ক্ষেত্রে শরৎ-সাহিত্যের হয়ে ওকালতি করেছি;—অবশ্য সেই সময়ে, যখন শরৎ-সাহিত্য-সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের মনে 'কিন্তু কিন্তু' ছিল।

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তাঁর রচনার তুল্য লোকপ্রিয় সাহিত্য এ যুগে আর দ্বিতীয় নেই। আমরা যারা লিখি—অর্থাৎ কলম দিয়ে কাগজের উপর কালির আঁচড় কাটি—আমরা যে কেন লিখি, সে বিষয়ে বহু লোকের মতভেদ আছে। যাঁরা লেখেন না, তাঁরাও লেখবার প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে একমত নন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

বাঙলার নবাবী আমলের কবিরা বলতেন যে, তাঁদের কলমের ঘাড়ে দেবতারা ভর করতেন, এবং তাঁদের রচিত কাব্য সেই সব দেবদেবীরাই রচনা করতেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন, অন্নদার আদেশে ও প্রসাদে; কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনা করেছেন চণ্ডীর আদেশে। তারপর ইংরাজী আমলের প্রথম কবি মাইকেল প্রথমেই বলেছেন, "কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি" ইত্যাদি। এই অমৃতভাষিণীটি যে কোন্ দেবী, তা ঠিক জানিনে—বোধ হয় স্বয়ং সরস্বতী। এ যুগে দেবদেবীদের সঙ্গে আমাদের তেমন মাখামাখি নেই। তাই আমরা বলি—সাহিত্য-রচনার মূলে আছে 'প্রেরণা'। কার প্রেরণা? বোধ হয় লেখকের অন্তরস্থিত কোনরূপ ঐশী শক্তির। আবার কেউ বলেন যে, লেখকের করকণ্ডূয়নই লেখার মূল। কারও কারও পক্ষে যে তাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ যুগে দেবতারা আমাদের স্কন্ধে আর ভর করেন না।

সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কি, সে বিষয়ে মূলান্বেষীদের মতভেদ থাক্‌লেও, এ বিষয়ে আমরা লেখকেরা সকলেই একমত যে, আমরা লিখি অপরে সে লেখা পড়বে বলে। চিঠিও আমরা লিখি ঐ একই উদ্দেশ্যে। চিঠি আমরা লিখি একটী পরিচিত ব্যক্তিকে; আর যাকে আমরা সাহিত্য ব'লি তা লিখি, যে পড়বে তার জন্য। সে ব্যক্তি যে কে, তা আমরা জানিনে।

আমাদের লেখা চিঠি যেমন Dead Letter আপিস থেকে ফেরৎ এলে আমরা খুসী হইনে; তেমনি আমাদের রচিত সাহিত্য অপঠিত অবস্থায় পড়ে থাক্‌লেও আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হই। আমাদের লেখা পড়ে সমাজ যদি আনন্দিত না হন, তাহলে আমরা হতাশ হই। পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করতে না পারলে আমাদের এ মার্গে ক্লেশ নিষ্ফল হয়ে পড়ে। আমাদের রচিত সাহিত্য লোকমান্য হোক আর না হোক, আমারা সকলেই চাই যে তা লোকপ্রিয় হয়। কিন্তু সকল লেখকের লেখা লোকপ্রিয় হয় না। ফলে আমরা কলম গুটিয়ে না বসলেও-এই বলে নিজেদের প্রবোধ দিই যে, পাঠকদের রুচি-অরুচির উপর সাহিত্যিক গুণ নির্ভর করে না। এখন জিজ্ঞাসা করি—সাহিত্য, বড় সাহিত্য বলে গণ্য হয় কার ভোটে?—majorityর না minorityর?

একটু অতীতের দিকে চোখ ফেরালেই দেখা যায় যে, বড় সাহিত্যিকদের গড়েছে লোকমত। শরৎ-সাহিত্য যে এ যুগে অত্যন্ত লোকপ্রিয়, এই হচ্ছে সে সাহিত্যের প্রধান certificate. আজকের দিন শরৎ-সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করবার দিন নয়, সুতরাং তার স্পষ্ট গুণেরই উল্লেখ করলুম মাত্র।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক্। কোনও সভার সভাপতির কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রথমে বিনয় প্রকাশ করা; অর্থাৎ তিনি যে উচ্চ আসন অধিকার করবার অযোগ্য,—সেই কথাটা সভ্য-সমাজের সুমুখে ইনিয়ে-বিনিয়ে নিবেদন করা। আমি এ কর্ত্তব্য পালন করতে পরাঙ্মুখ। বহুকাল পূর্ব্বে এই কৃষ্ণনগর সহরে ভারতচন্দ্র বলেছিলেন—"যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।" যদি কেউ সত্যসত্যই মনে করেন যে, তাঁর পক্ষে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করা সাজে না, তাহলে উক্তরূপ অনধিকার চর্চ্চা না করাই সাবধানী লোকের পক্ষে শ্রেয়।

সভাপতির দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে একটী অভিভাষণ পাঠ করা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখ্তে পাই যে, অভিভাষণ অতি-ভাষণ হয়ে ওঠে। আমি যা বলব, তা অনতিভাষণ হবে; কারণ কোনরূপ অত্যুক্তি করবার বাধা আমার অন্তরের মধ্যেই আছে। তাছাড়া ভারতচন্দ্র আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।" আমার বিশ্বাস, আমি সাহিত্যক্ষেত্রে ইচ্ছা করে কখনই ছুয়ে ছুয়ে পাঁচ করিনি। তবে হয়ত কখনও ঠিক নামাতে ভুল করেছি। যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ। তারপর আমার spirit যদিও-বা অভিভাষণ করতে willing হত, তাহলেও আমার weak flesh সে ইচ্ছাতে বাদ সাধ্ত। আমি কলমের মুখ দিয়ে অনেক কথা বলেছি, হয়ত দু-চারিটী নূতন কথাও বলেছি, কিন্তু পুরনো কথাকে ফোলালে-ফাঁপালে তা যে বড় কথা হয়, এ ভুল করিনি।

সাহিত্য যে কি বস্তু, সে বিষয়ে এ সাহিত্য-সম্মিলনে আমি কোন কথা বলব না; কারণ এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত কথা কেউ বলতে পারে না। আর যদিও পারত, তাহলেও সে কথা শুনে কারও কোন লাভ হ'ত না; কারণ সাহিত্য বস্তুটি কি, আগে থাকতে তা জেনে কেউ লিখতে বসেন না, বা পড়তেও বসেন না। ব্যাপার ঠিক উল্টো। আগে একজন সাহিত্য-সৃষ্টি করেন, পরে আমরা পাঁচজন তার ধর্ম্ম আবিষ্কার করবার প্রয়াস পাই। এ ক্ষেত্রে নেতি নেতিরও বিশেষ সার্থকতা নেই। কোনও লেখা যে সাহিত্য নয়, তাও বলা কঠিন। কোনও বস্তুর definition দেওয়ার অর্থ তার চৌহদ্দি দেওয়া, অর্থাৎ ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করা। আমি আশা করি এ সভার সাহিত্য-শাখার সভাপতি এ বিষয়ে কতকগুলি সত্য কথা শোনাবেন; কারণ আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত একজন

বিশেষজ্ঞ। এ বিষয়ে তাঁর রচিত "কাব্যজিজ্ঞাসা"র তুল্য পুস্তিকা বাঙলা ভাষায় দ্বিতীয় নেই।

আমি এ ক্ষেত্রে ভাষার বিষয় দু-চার কথা বলব। আমি ভাষা-সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলেছি। ভয় নেই এ ক্ষেত্রে সে সব কথার পুনরুল্লেখ করব না; করবার কোন আবশ্যকও নেই। আমি তথাকথিত চল্‌তি ভাষার হয়ে ইতিপূর্ব্বে দেদার ওকালতি করেছি। আর ওকালতি করতে হলে এক কথা বার বার বলতে হয়, নইলে জজসাহেবেরা ঘুমিয়ে পড়েন। এখন এ বিষয়ে আর ওকালতির প্রয়োজন নেই; কারণ রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে নব্যসাহিত্যিক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই এই ভাষাই অঙ্গীকার করেছেন। তা ছাড়া বাঙালীর শিক্ষা যে বাঙালা ভাষাতেই হওয়া উচিত, এ আরজি আজ থেকে ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহীতে শিক্ষিত সমাজের কাছে পেশ করেন, এবং আমি একটি রসিকতা করে তাঁর প্রস্তাবের সমর্থন করি। উক্ত সমাজ সেকালে বিনা বিচারেই আমাদের প্রস্তাব ডিস্‌মিস্ করেন। তৎসত্ত্বেও আমরা এ বিষয়ে অরণ্যে রোদন করতে বিরত হইনি। ইংরাজী ভাষার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদের প্রতি নানারূপ অপ্রিয় কথাও প্রয়োগ করেছেন। সে সব কথা এতই হাস্যকর যে, তাদের পুনরুল্লেখ করলে আপনাদের শুধু হাসানো হবে। যে সত্য অতি স্পষ্ট, সেই সত্যই অনেকের চোখে সহজে পড়ে না। কিন্তু আজকের দিনে এ মামলায়ও আমরা জিতেছি। এখন থেকে ছাত্রদের শিক্ষা বাঙলা ভাষাতেই হবে। আমি পূর্ব্বে এক সময় বলি—সাহিত্যিকের কথা বাসি হলে খাটে। উক্ত ব্যাপার তার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

আমি এ সব পুরনো কথার উল্লেখ করলুম দুই উদ্দেশ্যে। প্রথমত, আপনাদের মধ্যে যে সকল যুবকের সাহিত্যিক হবার লোভ আছে, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, সাহিত্যের পথ নিষ্কণ্টক নয়। যদি কেউ কোন মতকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে সে মত তাঁকে প্রচার করতে হবে; সমাজের অবজ্ঞা তাঁকে উপেক্ষা করতে হবে। সমাজের বিরুদ্ধতায় তিনি যেন ভগ্নোদ্যম না হন। আজ হোক্ কাল হোক্, সত্য জয়লাভ করবেই। যাঁরা কস্মিনকালে কোনও বিষয়ে চিন্তা করেননি, তাঁদের পক্ষে সব বিষয়ে প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, আমি আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে বহুকাল ধরে বহু কথা বলেছি। ভাষা বাদ দিয়ে সাহিত্য নেই। আর ভাষা জিনিষটে চোদ্দ-আনা পড়ে-পাওয়া হলেও, বাকী দু আনা আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

মনোভাব প্রকাশ করবার আরও অনেক উপায় আছে, যথা—অঙ্গভঙ্গী' মুখবিকৃতি ইত্যাদি। আমরা ছবি এঁকেও আমাদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারি, গান গেয়েও তা করা যায়। তবে এ সব উপায়ের গণ্ডী অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ভাষার শক্তি বিশ্বব্যাপী, এমন কি ভাব ও ভাষা একই বস্তু বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কোনও দার্শনিক বলেন যে, ও-দুই এক বস্তু নয়, তাহলে বলি ভাষা ও ভাব যে একাত্ম, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। ভাষার মাহাত্ম্য আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছিলেন। স্বনামধন্য প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁর গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে. "বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রাং প্রবর্ত্ততে।" লোকযাত্রা অর্থাৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করবার প্রধান উপায় হচ্চে ভাষা। এ কথা অবশ্য সকলেই মানেন। তারপর তিনি বলেছেন যে,

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥

অর্থাৎ শব্দরূপ জ্যোতি যদি সংসারকে আলোকিত না করত, তাহলে ত্রিভুবন অন্ধকার হ'য়ে যেত। এমন বাক্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করি। যে ভাষায় লোকযাত্রা চলে, তাকেই আমি পড়ে-পাওয়া চোদ্দ-আনা বলেছি; আর যে দু আনা আলোক দেয়, তাকেই আমি সাহিত্যিক ভাষা বলি।

এখন আমি নিজের ভাষা-সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই, যা শুনে আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার নাকি একটী ভাষা আছে, যার নাম বীরবলী ভাষা। অবশ্য বীরবলী ভাষা বলে কোনও বিশেষ ভাষা নেই, বীরবলী ঢং বলে একটী বিশেষ ঢং থাকতে পারে। সে যাই হোক, আমার লেখার ভাষা কারও কাছে অতি প্রশংসিত, আবার কারও কাছে অতি নিন্দিত। এখন সেই ভাষারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। বছর দশবারো পূর্ব্বে আমি শান্তিপুরে একটি সাহিত্য-সভায় বলেছিলুম—এই দেশই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে, অর্থাৎ এ দেশে আমি যখন আসি তখন ছিলুম আধ-আধভাষী বাঙ্গাল আর এ দেশ ত্যাগ করি স্পষ্টভাষী বাঙ্গালী হয়ে। কিন্তু সে দেশ শান্তিপুর নয়, কৃষ্ণনগর। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসি; এখানে আমার প্রথম জ্ঞানোদয় হয়; আর তেরো বৎসর বয়সে ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় এ নগর ত্যাগ করি। এই আট বছরে আমি অনেক বিদ্যা

শিখি, যথা—গাছে চড়তে, নদীতে সাঁতার কাটতে এবং সেই সঙ্গে ভাল কথা কইতে। লোকে বলে আমি আসলে যে দেশের লোক, সে দেশের লোকে, গঙ্গাজলের কাঙ্গাল, আর ভাল কথার কাঙ্গাল। কথাটা ঠিক, কারণ নির্ভয়ে বলা যায় যে, কৃষ্ণনগরের কথা ভাল কথা। তার সেই ভাল কথাই আজ পর্য্যন্ত আমার মৌখিক ভাষা। আর ভাষার এই মূলধন কালক্রমে সুদে বেড়েছে। সুতরাং আমার ভাষার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। আমি এখন কলিকাতাবাসী, কিন্তু আজও কলকত্তাই ভাষা আমার মুখের ভাষা নয়।

এই সূত্রে আমি আর একটী কথা আপনাদের বলতে চাই। লিখিত ভাষার সঙ্গে আমি এই কৃষ্ণনগরেই প্রথম পরিচিত হই। আমার বাল্যকালে এ সহরে Charity School নামে একটি স্কুল ছিল। সেটি ছিল একটি খাঁটি বাঙলা স্কুল, অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তির স্কুল। আমার ভাইদের মধ্যে আমি একা সেই স্কুলের ছাত্র ছিলুম। ফলে প্রথমে আমি মাতৃভাষা শিখি; আর সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ রকম বিদ্যা, যথা—পাটীগণিত, ভারতবর্ষ ও বাঙলার ইতিহাস, ভূগোল, শিকলের জরিপ, উপরন্তু জমিদারী ও মহাজনী শাস্ত্র। আমার বিশ্বাস যে, এই স্কুলের কাছে আমি যথার্থ ঋণী; কারণ এই বাঙলা স্কুলের প্রসাদেই আমার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়েছিল। পরে আমি অবশ্য ইংরাজী স্কুল কলেজে পড়েছি এবং নানা বিদ্যা অর্জ্জন করেছি; কিন্তু সে সব আবশ্যক ও অনাবশ্যক বিদ্যা অর্জ্জন করেছি আমার ঐ জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তিরই সাহায্যে। আমার বিশ্বাস আট বৎসর বয়সে ও স্কুল ত্যাগ করে Collegiate Schoolয়ে ভর্ত্তি হই এবং অবলীলাক্রমে বিলাতী শিক্ষার সব বেড়া টপ্‌কে যাই। কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগ আমার মনে এক দিনের জন্যও বিরাগে পরিণত হয়নি।

আমি ঐ বাঙলা স্কুলে কি কি বই পড়েছিলুম জানেন? কাশীরাম দাসের মহাভারত আর সম্ভবত সীতার বনবাস -কেন-না সে বয়সেই "সতত-সঞ্চরমাণ নবজলধরপটল সংযোগে"—এ বাক্য আমার মুখস্থ ছিল। আর "পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি"—কাশীরামের এ উক্তি আমার কানে আজও লেগে আছে। তাই আমি সংস্কৃত শব্দের এত ভক্ত। এ স্থলে আমি উক্ত স্কুলের মাষ্টার মহাশয়দের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই, যদিচ তাঁরা সকলেই ছিলেন শূদ্র, অর্থাৎ, কুরী, সূত্রধর প্রভৃতি, আর আমি ব্রাহ্মণসন্তান।

আমি এই ভাষা-শিক্ষা-সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলতে চাই। আমি যখন তেরো বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করি তখন আমি Entrance ক্লাসের

ছাত্র ছিলুম, অতএব ইংরাজী ভাষাও জানতুম। আমি রুগ্ন অবস্থায় পশ্চিমের কোন সহরে যাই, আমার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। অতি অল্প দিনেই আমার দেহ আবার সচল ও সবল হয়ে ওঠে। তারপর একদিন আহারান্তে দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে একখানি ইংরাজী বই পড়তে চেষ্টা করে আবিষ্কার করলুম যে, আমি ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি,—এমন কি সে ভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল ও সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে দরবিগলিতধারে ঘাম পড়তে লাগল—যেমন জ্বর ছাড়বার সময় হয়। বাবা সেই ঘরেই ছিলেন ও আমার দেহের এ অবস্থা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি হে প্রমথবাবু, তোমার হয়েছে কি, এত ঘামছ কেন? এতো গ্রীষ্মকাল নয়।" আমি যথার্থ অবস্থা গোপন ক'রে কাষ্ঠহাসি হেসে বললুম, "কৃষ্ণনগরের জ্বরের জেরটুকু হয়ত আমার শরীরে লুকিয়ে ছিল, আজ তাই বেরিয়ে যাচ্ছে।" এ কথা শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু আমি হলুম না। আমি মনে মনে স্থির করলুম যে, দিন সাতেক ধরে আর কোনও ইংরাজী বই স্পর্শ করব না, তারপর দেখব আমার ইংরাজী জ্ঞান মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে কিংবা ষোল-আনা লুপ্ত হয়েছে। এ সাত দিন যে ভীষণ দুর্ভাবনায় কেটেছিল, তা বলাই বাহুল্য। সাতদিন পরে দেখলুম যে, আমার ইংরাজী ভাষার জ্ঞান পূরো ফিরে এসেছে।

আমার এই ব্যক্তিগত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে উল্লেখ করলুম এই জন্য যে, ব্যাপারটা আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে একটি রহস্য হয়ে রয়েছে। ডাক্তারবাবুরা—এমন কি যাঁরা aphasia (স্মৃতিলোপের) কারণ অনুসন্ধান করেন, তাঁরাও—এর কোন সন্তোষজনক নিদান ঠিক করতে পারবেন না। তাঁরা হয়ত বলবেন যে মস্তিষ্কের যে অংশে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে, সেই অংশ বিগড়ে গিয়েছিল। তথাস্তু। কিন্তু আমার মস্তিষ্কের যদি ওরূপ বিভ্রাট ঘটে থাকে, তাহলে বাঙলা ভাষা কেন পূরো মনে ছিল, শুধু ইংরাজী ভাষাই ভুলে গেলুম? মস্তিষ্কের কি এক খোপে বাংলা ভাষা সঞ্চিত থাকে—আর এক খোপে ইংরাজী ভাষা?

আমার দার্শনিক গুরু Bergson বলেন—"Our whole past exists subconsciously." সম্ভবত এই কথাই ঠিক, কারণ এ যুগে psychologyর কারবার শুধু unconscious মন নিয়ে।

আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের আসল ভাষা বাঙলা,—আমি আগে যাকে বলেছি আমাদের ভাষার মূলধন। আর যে সব ভাষা আমরা

কষ্ট করে শিখি, সে সব ভাষা আমাদের মনে আলগা হয়ে থাকে, কখন যে খসে পড়বে তা আমরা কেউ বলতে পারিনে। সুতরাং আমার মনের আদিম ভাষা এ দেশেরই ভাষা। অবশ্য সেই আদিম ভাষা কতকটা পরের মুখে শুনে, কতকটা বই পড়ে পুষ্ট করেছি। আর একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। লোকে বলে—আমার লেখায় রস নেই, কিন্তু বীরবলের লেখায় রসিকতা আছে! অর্থাৎ আমার লেখা পড়ে পাঠকের চোখে জল আসে না —কিন্তু ঠোঁটে হাসি ফোটে। এ গুণও এই কৃষ্ণনগরবাসের গুণ। দ্বিজেন্দ্রলালেরও শ্রেষ্ঠ রচনার নাম "হাসির গান।" সেকালে বোধহয় কৃষ্ণনগরের হাওয়ায় ইলেক্‌ট্রিসিটি ছিল।

ভাষা-সম্বন্ধে আমার এসব কথা শুনে লোকে সন্দেহ করতে পারেন যে, এ সভার সভ্যদের খুসী করবার জন্য আমি এসব কথা বলছি। আমি অবশ্য আপনাদের সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় কথা বলতে এখানে উপস্থিত হইনি; তবে আপনাদের মুখের কথার স্তুতিপাঠ করতেও আসিনি। আমি জানি যে, আমার মুখের স্তুতি আপনাহতেই ব্যজস্তুতি হয়ে পড়ে। আমার যথার্থ উদ্দেশ্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, কোনও বিশেষ প্রদেশের মৌখিক ভাষা সহজেই লিখিত ভাষায় promotion পায়। আমাদের বড় বড় অতীত সাহিত্যিকদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। মাইকেলের দেশ যশোরে। যশুরে ভাষায় "মেঘনাদবধ" লেখা চলে না। "যাদঃপতি-রোধ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে।"—এ কোন দেশের ভাষা? নবীনচন্দ্র সেনের দেশ চট্টগ্রাম। চাটগেঁয়ে ভাষায় কিন্তু "পলাশীর যুদ্ধ" লেখা চলে না। তারপর গদ্যে আসা যাক্। কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৌখিক ভাষা ছিল ঢাকাই বাঙলা; সেই কারণেই তিনি নীরব কবিদের—অর্থাৎ যারা কথা কয় না, তাদের বড় প্রশংসা করেছেন। অপরপক্ষে কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" কলকাতার ঠোঁটকাটা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে এই বইখানি আজিও সাহিত্য সমাজে একঘরে হয়ে রয়েছে, যদিও "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" একখানি brilliant পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নৈহাটির লোক। আমার বিশ্বাস, তাঁর ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। তবে তাঁর 'ইন্দিরা' পড়ে মনে হয় যে, কিছু কিছু প্রভেদ ছিল। সে যাই হোক, তিনিও লিখেছেন ইংরাজী আমলের সাহিত্যিক ভাষা, অর্থাৎ ভাষা নিয়ে experiment করেছেন।

আমি ভাষার বিষয়, বিশেষত প্রাদেশিক ভাষার বিষয় এত বাহানা করলুম

এই জন্য যে, কোনও বিশেষ প্রাদেশিক ভাষাই সেই দেশের সাহিত্যিক ভাষার পদে উন্নীত হয়। একটি উদাহরণ দিই। যাকে আমরা Italian ভাষা বলি, আর যে ভাষায় Italian সাহিত্য রচিত হয়েছে, সে দেশে সেই সাহিত্যিক ভাষার নাম Lingua Florentina, অর্থাৎ Florence সহরের মৌখিক ভাষা—Veniceয়ের মৌখিক ভাষা নয়, Naplesয়ের কথা ভাষা নয়। আর সর্ব্ব-সাহিত্যিক-ব্যবহৃত এই ভাষার অপর নাম হচ্ছে Lingua Purgata অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা। যদিচ Florenceয়ের মৌখিক ভাষা সম্পূর্ণ শুদ্ধ নয়। আমি Florence সহরে নিজ কানে শুনে এসেছি যে, সে সহরের অধিবাসীরা 'ক' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করে,—পূর্ব্ববঙ্গে লোকে যেমন 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করে। এই 'হ' অক্ষর নিয়ে সব দেশই গোলে পড়ছে। ইংলণ্ডেও কে hair কে air বলে ও air কে hair বলে, তাতেই তার সামাজিক জাত ধরা পড়ে। এখন আমার বিশ্বাস যে, বাঙলার গদ্য-সাহিত্য নদে, শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষার উপরেই গড়ে' উঠেছে,—অবশ্য সহিত্যিকদের হাতে purgata হয়ে। এ শুদ্ধি কি উপায়ে ঘটে?—তার সন্ধান বলে দেবে লেখকের কান ও প্রাণ। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, সাহিত্য কাকে বলে, সে বিষয়ে কিছুই বলব না; কারণ সাহিত্য-সম্বন্ধে এমন কোনও বিধি নেই, যা মেনে চললেই আমাদের লেখা সাহিত্য হতে বাধ্য। এমন কি grammarকে উপেক্ষা করেও কেউ কেউ সাহিত্যিক হতে পারেন,—য়ুরোপীয় সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। তা ছাড়া কেউ কাউকে উপদেশ দিয়ে সাহিত্যিক বানাতে পারবেন না; কারণ আলঙ্কারিকরা কস্মিনকালে কাউকেও কবি বানাতে পারেন'নি। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকরা জানতেন যে, যদি কোনও ব্যক্তির প্রতিভা না থাকে প্রাক্তন-সংস্কার না থাকে, তাহলে অলঙ্কারশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়ে তাকে শুধু বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত করা যায়।

তা ছাড়া ধরুন আমরা যদিও সাহিত্যের একটা definition খাড়া করতে পারি, তাহলে সে definition—হয় অতি উদার নয় অতি সঙ্কীর্ণ হবে, অর্থাৎ কাগজের উপর কালির আঁচড় মাত্রকেই হয়ত সাহিত্য বলে ভুল করব; নয়ত যার ভেতর প্রেমের কথা আছে, সেই কবিতা ও সেই গল্পকেই সাহিত্য বলব—সে প্রেমের কথা যতই খেলো, যতই বস্তাপচা হোক্ না কেন। আমি অবশ্য সাহিত্য-শব্দের ব্যাপক অর্থেরই পক্ষপাতী। বাঙ্গালী জাতির মনে বুদ্ধিবৃত্তি

আছে কিন্তু বাঙলা সাহিত্যকে যে এ গুণে বঞ্চিত করতে হবে– এ বড়ই আশ্চর্য্য কথা।

গত বৎসর ঠিক এই সময়ে আমি চন্দননগরে সাহিত্যসম্মিলনে সাহিত্যিকদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বঙ্গসাহিত্য যে দর্শন ও বিজ্ঞানসাহিত্যে দরিদ্র, এই স্পষ্ট সত্যটির উল্লেখ করি; এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলি যে, ভবিষ্যৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কাউকে কাউকে সাহিত্যিক হতে হবে, অর্থাৎ তাঁদের প্রচারিত দর্শন ও বিজ্ঞানকেও লোকায়ত করতে হবে।

কোনও কোনও দার্শনিক গ্রন্থ যে উঁচুদরের সাহিত্য তার প্রমাণ Plato's Dialogues এবং Bergsonয়ের গ্রন্থাবলী। এমন কি বেদান্তের শঙ্করভাষ্য যে এ দেশের লোককে এত মুগ্ধ করেছে তার একটি কারণ হচ্ছে তার ভাষার প্রসাদগুণ। আর এ গুণটি যে কাব্যেরই প্রধানগুণ, তা বলা বাহুল্য।

বাঙলা ভাষায় যে বিজ্ঞানের কথাও অতি স্পষ্ট করে বলা যায়, তার প্রমাণ—রবীন্দ্রনাথের সদ্যঃপ্রকাশিত "বিশ্বপরিচয়"। কত সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় যে নব astronomy ও পরমাণুতত্ত্বের কথা বলা যায়, তার অপূর্ব্ব নিদর্শন এই পুস্তিকাখানি। আমরা ছেলেবেলায় একটা ইংরাজী কবিতার দু-ছত্র আওড়াতুম। সে পদ দুটি হচ্ছে--

"Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are!"

নক্ষত্রকে আমরা প্রশ্ন করতুম what are you?—সে প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। সে উত্তর শুনতে আমি বাঙালী মাত্রকেই অনুরোধ করি। নক্ষত্রের twinkle দেখে যাঁদের মন কৌতূহলে আকুল হয়, নক্ষত্র বস্তু কি তা জানলে তাঁদের মন বিস্ময়ে বিহ্বল হবে। সেকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত বিশ্বরূপ দেখে অর্জ্জুনের মন ভয়ে অভিভূত হয়েছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হলে সকলেরই মন যুগপৎ বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে চমৎকৃত হবে। আমাদের দেশের জনৈক প্রাচীন আলঙ্কারিক বলেছেন—

ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ॥

একথা যে সত্য, আমাদের দেশের মহাকবি তা আবার প্রমাণ করেছেন। আমরা, যারা সাহিত্যিক মাত্র মহাকবি নই, আমরা অনেক বিষয়ের আংশিক ভার গ্রহণ করতে পারি। এ যুগ হচ্ছে division of labourয়ের যুগ।

আমার এ বাক্যস্রোত অবশ্য আনন্দলহরী নয়; কারণ আজকের দিনে আমাদের মনে আনন্দের চেয়ে দুশ্চিন্তাই প্রবল। Economically আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত। যে অবস্থায় কোনও জাতির অর্থের চাইতে বাক্য বেশী, – সে অবস্থার নাম দুরবস্থা। তার উপর politically আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি। এক দিকে ধর্ম্ম, আর এক দিকে পলিটিক্স্, অর্থাৎ একালের সঙ্গে সেকালের জড়াপট্‌কি বেধেছে।

তারপর শিক্ষা, অর্থাৎ যে শিক্ষা নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি, সে শিক্ষাও আমাদের হাত-ফস্কে-যাবার ভয় আছে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, যে বস্তু অন্ধকারে পথ দেখায়, অর্থাৎ সাহিত্য, তার আলোক সযত্নে রক্ষা করা; কারণ সাহিত্যের ধর্ম্মই হচ্ছে আলোক বিতরণ করা। ভাষা-রক্ষার সহজ উপায় তার চর্চ্চা করা; আর সাহিত্য-রক্ষার প্রধান উপায় মনোরাজ্যের নিত্যনব দেশ অধিকার করা। ভাষা আমাদের উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি নয়, অতএব সাহিত্যও তা হতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যকে যুগে যুগে নব কলেবর ধারণ করাতে হবে।

২৯এ মাঘ, ১৩৪৪ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্য

(১)

গণনানবিশেরা যদি হিসাব করেন প্রতি বছর এখন পৃথিবীতে কত বই ছাপা হয় তবে সংখ্যাটা সম্ভব এ কটা ছোটখাটো জ্যোতিষিক পরিমাণের কাছাকাছি যাবে। এই বিশাল গ্রন্থস্তূপের মধ্যে কোনগুলি সাহিত্য আর কোনগুলি সাহিত্য নয়? ইংরেজ লেখক চার্লস্ ল্যাম্ব লিখেছিলেন যে বই মাত্রই তিনি পড়তে পারেন, এ সম্বন্ধে তাঁর রুচি অতি উদার। তবে কতকগুলি জিনিষ আছে যাদের চেহারা বইএর মত, কিন্তু যাদের তিনি বই বলে স্বীকার করেন না। যথা—বার্ষিক রাজপরিবারের বিবরণী, ডাইরেক্টারি, পকেট বই, বইএর মত বাঁধান ও পিঠে নাম লেখা দাবার ছক, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ. পঞ্জিকা, আইনের পুঁথি, হিউম-গিবন-রবার্টসন-বেটি-সোমজেনিন্সের গ্রন্থাবলী, সাধারণত সেই সব গুরুভার পুঁথি যা ভদ্রলোকের লাইব্রেরীতে না থাকিলেই নয়, ইহুদী পণ্ডিত ফ্লেভিয়াস জ্যোসিফাসের লেখা ইতিহাস, পেলির চরিত্র-বিজ্ঞান। "With these exceptions, I can read almost anything. I bless my stars for a taste so catholic, so unexcluding."

বই ও অ-বই এর এই প্রভেদ হচ্ছে ল্যাম্বের অভিপ্রেত সাহিত্য ও অ-সাহিত্যের প্রভেদ। এর রসিকতাটা অবশ্য যা নিঃসন্দেহ সাহিত্য, যেমন গিবনের ইতিহাস তাকে যার সঙ্গে সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক নেই—ডাইরেক্টরী কি পঞ্জিকা তার সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত ক'রে এবং এই ইঙ্গিত দিয়ে যে সৌভাগ্য লব্ধ ঐ সার্ব্বভৌম রুচিটি প্রকৃত পক্ষে অতি সঙ্কীর্ণ ও ঘরোয়া।

গিবনের ইতিহাসকে যে বল্লুম নিঃসন্দেহ সাহিত্য সে হচ্ছে ইংরেজী literature শব্দের আমরা যে বাংলা অনুবাদ করেছি 'সাহিত্য' সেই অর্থে। প্রাচীনেরা 'সাহিত্য' বলতে বুঝতেন কাব্য, যেমন বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণ'। এর নামের অর্থ ও আলোচনা বিষয়বস্তু দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শের' সঙ্গে সমান। তবে সকলেই জানেন আলংকারিকেরা কাব্য অর্থে পদ্য বুঝতেন না। রসসৃষ্টি যার লক্ষ্য সেই রচনাই কাব্য—তা পদ্যই হোক আর গদ্যই হোক। 'কাদম্বরী' গদ্য আখ্যায়িকা, 'হর্ষচরিত' গদ্য জীবনী। কিন্তু আলংকারিকেরা এ দুই

বই থেকে কাব্যের নানা গুণের বহু নমুনা তুলেছেন। তাঁদের মতে বাণভট্ট ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। এমন কথাও কেউ বলেছেন 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্ব্বম্,'—কাব্যের জগৎ বাণভট্ট নিঃশেষ করেছেন, যা বাকী আছে সে তাঁর ভুক্তাবশেষ। অর্থাৎ আমাদের একালের উপন্যাস, ছোটগল্প, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লব', লিটন ষ্ট্রেচির 'কুইন ভিক্টোরিয়া' আলংকারিকদের পরিভাষায় কাব্য। গিবনের 'রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসের ইতিহাসকে' তাঁরা কাব্য বলতেন কিনা সন্দেহ। কারণ রসের সৃষ্টি ও গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। ওর লক্ষ্য প্রাচীন ঘটনাবলীর নির্ভুল যথাযথ বর্ণনা, যদিচ এমন বর্ণনা যে অতীতের নরনারী মনের চোখে মূর্ত্তিমান হয়, এমন ঘটনা যা মানুষের মন ও কল্পনাকে প্রবল নাড়া দেয়। হিউমের 'Human understanding' প্রবন্ধকে নিঃসন্দেহ তাঁরা কাব্য বলতেন না। কিন্তু ও গ্রন্থ যে সাহিত্য তা হিউমের প্রবন্ধ যিনি পড়েছেন তিনিই স্বীকার করবেন।

সুতরাং সাহিত্যকে দু ভাগে ভাগ করা চলে, কাব্য ও কাব্যেতর। কোন সমধর্ম্মিতায় এ দুই পদার্থ এক সাহিত্য গোত্রীয় তা আবিষ্কার করতে পারলে সাহিত্য ও অসাহিত্যের ভেদ বোঝা সহজ হবে; জানা যাবে হিউমের 'Human understanding' কেন সাহিত্য, আর পেলির 'Moral Philosophy' কেন সাহিত্য নয়, শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' কেন সাহিত্য ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মূল ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদ কেন সাহিত্য নয়।

কাব্যের লক্ষ্য রসের সৃষ্টি এবং তার উপায় ভাষার প্রয়োগ। কিন্তু উপায় ও লক্ষ্যের এই ভেদ বস্তুগত ভেদ নয়, আলোচনার সুবিধার জন্য বুদ্ধির বিশ্লেষণগত ভেদ। কারণ অখণ্ড সত্য এই যে কাব্যের লক্ষ্য ভাষা দিয়ে রসের সৃষ্টি। ভাষা নিরপেক্ষ, যদি রস থাকে সে রস কাব্যের রস নয়। চিত্র রসিক ছবিতে যে আনন্দ পায় সে আনন্দ ছবির বিষয়বস্তুর আনন্দ নয়, রেখা ও রং-এ বিষয়বস্তুকে রূপায়িত দেখার আনন্দ। তেমনি কাব্য রসিকের কাব্য পাঠের আনন্দ কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের আনন্দ নয়, কবির ভাষার বিষয়ের বর্ণনার আনন্দ। দুষ্মন্ত ও কণ্বদুহিতার প্রণয় কাহিনী, সেক্‌সপীয়ারের বহু নাটকের মূল উপাখ্যান পূর্ব্ব থেকে প্রচলিত ছিল কিন্তু সে কাহিনী ও উপাখ্যান 'শকুন্তলা' কি 'ম্যাক্‌বেথ' নয়। চৈতন্যের চরিত-কথা তাঁর ভক্তদের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী যখন তাতে কাব্যের রসায়ন দিলেন তখন তা হলো অমৃত।

কবি স্রষ্টা। 'অপার কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ'। তবে এ

প্রজাপতি সৃষ্টি করেন পঞ্চভূত দিয়ে নয় ভাষা দিয়ে। কিন্তু ভাষার জন্ম হয় নি কবি-প্রজাপতির কাব্য সৃষ্টির কাজে, ভাষার জন্ম হয়েছে লৌকিক সংসারে ব্রহ্ম-প্রজাপতির সৃষ্টি মানুষের জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। সমাজ না বাঁধলে মানুষ পৃথিবীতে টিকতো না। এবং মানুষের সমাজ-বন্ধনের মুখ্য বন্ধনী ভাষা। সুতরাং সে ভাষা কাজের ভাষা। সে ভাষার মারফত মানুষ খবর আদান প্রদান করে, অনুরোধ জানায়, বিধি নিষেধ দেয়। ঘরকন্নার এই ভাষা চিহ্নধর্ম্মী; নানা ইঙ্গিতের মধ্যে বহু কার্য্যোপযোগী সব চেয়ে ব্যাপক ইঙ্গিত। এবং নিজের দিকে দৃষ্টী আকর্ষণে মনকে বিক্ষিপ্ত না করে যত সংক্ষেপে ও সোজাসুজি বক্তব্যকে জানাতে পারে ততই এর সফলতা।

কিন্তু এ ভাষা দিয়ে কাব্য-সৃষ্টির কাজ চলে না। কারণ কাব্য যে কথা বলতে চায় সে কথা কাজের কথা নয়। আমি অন্যত্র বলেছি, "যে কথা শব্দবহা নাড়ী বেয়ে উঠে কর্ম্মের নাড়ী দিয়ে নেমে মাংসপেশীর পরিমিত বা ব্যাপক আকুঞ্চন-সম্প্রসারণে নিঃশেষ হয় কাব্য সে কথা বলে না। রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের যে জগৎ আমাদের ঘিরে আছে, যে সামাজিক জগৎ মিলন ও সংঘর্ষের অসংখ্য সুতোর জালে মানুষকে বেঁধে রেখেচে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও তার ইতিহাস—এরা মানুষের মনে যে বিচিত্র অনুভূতির জন্ম দেয় কাব্য ভাষার রূপ দিয়ে তার প্রকাশের চেষ্টা। এই প্রকাশের প্রেরণা মানুষের জৈব ব্যাপারের অতিরিক্ত ধর্ম্ম। মানুষ যেখানে জীবমাত্র সেখানে অনুভূতি তাকে কর্ম্মের প্রেরণা দেয়। অনুভূতিকে গড়ন দিয়ে প্রকাশের প্রেরণা বিশেষ করে মনুষ্য-ধর্ম্ম। যে ভাষা অনুভূতিকে এই প্রকাশের গড়ন দিতে চায়, অর্থাৎ কাব্যের ভাষা, সে ভাষা শুধু চিহ্ন হলে চলে না, কারণ এ ভাষার লক্ষ্য নয় আকার-ইঙ্গিতে বিষয়বস্তুর সেইটুকুমাত্র পরিচয় দেওয়া অভীষ্ট কাজের জন্য যেটুকু প্রয়োজন। কাব্য বস্তুর বিবরণ নয়, বস্তুর অনুভূতির প্রকাশ। এই অমূর্ত্ত অনুভূতির কাব্য-মূর্ত্তির দেহ হচ্ছে ভাষা; এবং মূর্ত্তি থেকে তার দেহকে তফাৎ করা যায় না। সুতরাং কাজের কথার ভাষায় লক্ষ্য থেকে চিহ্নের যে স্বাতন্ত্র্য, কাব্যের ভাষায় বাচ্য ও বচনের সে দ্বৈত নেই। বচনের রঙে বাচ্যকে রাঙানো যায় বলেই কাব্যের সৃষ্টী সম্ভব হয়েছে।"

সুতরাং কবিকে তাঁর কবি-কর্ম্মের জন্য কাজের ভাষাকে দিতে হয় নূতন রূপ। কবি-প্রতিভার কৌশল শব্দের চয়নে, রচনায় ও গ্রন্থনে ভাষায় যে সুর ও ব্যঞ্জনা আনে পুরাতন উপাদানে তাকে নূতন সৃষ্টী বললে ভুল হয় না। যা

ছিল ভাষা কবি তাকে করেন বাণী। কবি-কর্ম্মের দ্বিতীয় কৌশল কাব্যের কথা-বস্তুকে সেই নিপুণ গড়ন দেওয়া যে শিল্প-রূপ হচ্ছে কাব্য-সৃষ্টির মূল কথা। কবির কাব্য-রচনার যে প্রেরণা সে হচ্ছে কাব্যের বিষয়কে এই আকার ও রূপ দেবার প্রেরণা। কাব্য বড় ছোট হয় তার বিষয়-বস্তুর প্রসার ও গভীরতায়, কিন্তু তার কাব্যত্ব নির্ভর করে এই গড়নের সুষ্ঠুতায়—কবির রূপ-দক্ষতায়। কাব্যের রস তার এই রূপের ফল। কবিকে তার জন্য পৃথক যত্ন করতে হয় না। কবি জ্বালেন দীপশিখা, আলোর ভাবনা তার নেই।

যে রচনা কাব্য নয় অথচ সাহিত্য সেই কাব্যেতর সাহিত্যে সাহিত্যত্ব আসে কাব্যের ভাষা, গড়ন ও রসের ছায়া লেগে। কাব্য না হলেও সেই রচনাকে আমরা বলি সাহিত্য যার ভাষায় কাব্যের ভাষার প্রতিধ্বনি কিছু শোনা যায়, যার গড়নে কাব্যের গড়নের ভঙ্গী কিছু দেখা যায়, এবং যার আস্বাদে কাব্যের রসের আস্বাদ কিছু না কিছু পাওয়া যায়। যে রচনায় এর সম্পূর্ণ অভাব তাকে আমরা সাহিত্য বলি নে।

(২)

ইংরেজী literature শব্দ আজ ব্যবহারে বড় উদার। কোনও কিছুকেই সে আত্মদান থেকে বঞ্চিত করতে চায় না। বীমা কোম্পানীর দালালেরা জীবন বীমা ও মোটর বীমার literature লোকের বাড়ী বয়ে দিয়ে যায়, ছাপান একখানা পোষ্টকার্ড ডাকে ফেললে বোর্ণভিটার literature নিখরচায় ঘরে আসে। বাঙ্গালী 'সাহিত্য' শব্দটা এখনও তত উদার হয় নি। দোকানের সাইন-বোর্ডে 'পাদুকা-শিল্প' ও 'খাদ্য-প্রতিষ্ঠান' দেখা দিয়েছে, কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যাল তার 'অণু-মকরধ্বজের' বিবরণকে বিজ্ঞাপনের একতালা থেকে সাহিত্যের উপরতালায় প্রমোশন দেয় নি। Literatureএর উদারতা সম্ভব তার জন্মগত। অক্ষরে লিখে যা প্রকাশ করতে হয় তার পরিমাণটা একটু বড় হলেই তাকে বলা চলছে literature। দেশের কাব্যগ্রন্থগুলি তার poetical literature, অঙ্কশাস্ত্রের পুঁথি mathematical literature, অর্থাৎ মানুষের মনের যে কোনও সৃষ্টি, যাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হয় তাকেই বলা হয় literature। বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত আমাদের এই সাহিত্য-সম্মেলনের কাণ্ডের উপর যে 'সাহিত্য' শব্দ লেখা আছে সে অনেকটা literatureএর এই ব্যাপক অর্থে। এর নানা শাখার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, চারুকলা, সঙ্গীত।

চারুকলা ও সঙ্গীতের এ সম্মেলনে ভাষায় আলোচনা হবে বলেই সম্ভব এরা সাহিত্যের শাখা, কংগ্রেস উপলক্ষে খাদি-প্রদর্শনীর মত নয়। কিন্তু সম্মেলনের মূল সাহিত্য বৃক্ষের 'সাহিত্য' আবার একটা শাখা, যার উপর নিজে নিজে ওঠার অক্ষমতা সত্ত্বেও আপনারা মই দিয়ে আমাকে তুলে বসিয়েছেন। এই 'সাহিত্য শাখার' 'সাহিত্য' কথাটার নিশ্চয়ই সেই সঙ্কীর্ণ অর্থ যে অর্থে কোনও লেখাকে বলা হয় literary বা literary flavourযুক্ত। আমি বলেছি কাব্যেতর সাহিত্যে এই 'সাহিত্যত্ব' বা, ইংরেজী ভাষার উপর একটু জুলুম করে, literariness আসে কাব্যের ছায়ার স্পর্শ লেগে। মতটা পরীক্ষা করা যাক।

আইনষ্টিন যে প্রবন্ধে ১৯০৫ সালে রিলেটিভিটির special তত্ত্ব বা ১৯১৫ সালে রিলেটিভিটির general theory প্রকাশ করেন তা সাহিত্য নয়, খাঁটি নির্জ্জলা বিজ্ঞান। আইনষ্টিনের আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা এডিংটন্ যে 'Time, Space and Gravitation' নামের পুঁথিতে দিয়েছেন তাকে 'সাহিত্য' বলতে অনেকেই আপত্তি করবেন না। কেন? তার কারণ ও গ্রন্থে ভাষাকে শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের খবর ও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপযোগী মাত্র করে ব্যবহার করা হয় নি, তার অতিরিক্ত নানা ব্যঞ্জনায় ও গ্রন্থের ভাষা কাব্যধর্ম্মী। পাঠকের দুরূহ বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বোঝাতে ও গ্রন্থে বক্তব্যের যে গড়ন তার একমাত্র নিয়ামক লজিক নয়; এ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভিনবত্ব ও তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পিতমূর্ত্তি বা মূর্ত্তিহীনতায় পাঠকের মনে বিস্ময়ের চমক লাগান ও গড়নের একটা লক্ষ্য। এবং ও গ্রন্থের ভিতর দিয়ে শান্ত হাস্যরসের যে ফল্গুধারা বয়ে গেছে তাতে নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধির তত্ত্বে মানুষের মনের ছোঁয়াচ লেগেছে। ঠিক এই কারণেই যে সব গ্রন্থে ডারুইন তাঁর ইভলিউশন তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন তাকে যদিচ সাহিত্য বলা চলে না, শিষ্য টমাস হাক্সলি গুরুর আবিষ্কৃত তত্ত্বের প্রচারে যে সব পুঁথি ও নিবন্ধ লিখেছিলেন তার সাহিত্যত্বে কোনও সংশয় নেই। অধ্যাপক ইয়ুং মনস্তত্ত্বের একজন বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু তাঁর লেখা অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'সাহিত্য'। তাঁর একটা প্রবন্ধ থেকে একটি ছোট প্যারাগ্রাফ তুলছি, কোথায় তার সাহিত্যত্ব বুঝতে দেরী হবে না।

"The nearer we approach to the middle of life, and the better we have succeeded in entrenching ourselves in our personal standpoints and social positions, the more it appears

as if we had discovered the right course and the right ideals. For this reason we suppose them to be eternally valid, and make a virtue of unchangeably clinging to them We wholly overlook the essential fact that the achievements which society rewards are won at the cost of a diminution of personality. Many—far too many—aspects of life which should also have been experienced lie in the lumber room amongst dusty memories. Sometimes, even, they are glowing coals under grey ashes."

এটি অনুবাদ। কিন্তু এর প্রকাশভঙ্গী শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বার্ত্তাবহ মাত্র নয়। "Glowing coals under grey ashes" ত একেবারে কাব্যের ভাষা।

(৩)

কাব্যেতর সাহিত্যের মুখ্য আবেদন বুদ্ধির কাছে। বুদ্ধির কাছে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করাই ওর প্রধান কাজ। এবং এ সাহিত্য বলার ভঙ্গীর চেয়ে বলার বিষয় দামে অনেক বড়। সুতরাং এর ভাষা ও ভঙ্গী যদি বক্তব্যের প্রকাশ ও প্রমাণে কোনও বাধা জন্মায় তবে সেটা দোষ,—কাব্যের মেঘের রঙীন বাধা হলেও দোষ। সেই জন্য এ লেখা সাহিত্য হয় লেখকের সূক্ষ্ম মাত্রাবোধে। কাব্য-ধর্ম্মের স্বল্পমপি যে লেখাকে অ-সাহিত্যত্ব থেকে ত্রাণ করে কেবল তাই নয়, তার ন্যায্য পরিমাণের সামান্য বাহুল্যও নপুংসকের বিকৃতি এনে এর সাহিত্য-ধর্ম্ম নষ্ট করে। আলংকারিকেরা পদ্যগন্ধী গদ্যের নিন্দা করেছেন; ঠিক সেই নিন্দার ভাজন উগ্র কাব্যগন্ধী কাব্যেতর সাহিত্য। কাব্যের মাল-মসলার অল্প মিশ্রণে লেখাকে সাহিত্য করে, মাত্রা একটু বেশী হলেই লেখা হয় জাতিচ্যুত। এই ন্যায্য পরিমাণের মাপকাঠি কি?

কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গীর সার্থকতা রসের সৃষ্টীতে। সে ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে যদি কিছু থাকে যা রসসৃষ্টির প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেটা কাব্যের বোঝা, যেমন অলংকারের আতিশয্য। সাহিত্য-কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গীর যে অনুকরণ করে তা রসসৃষ্টির প্রয়োজনে নয়, বুদ্ধির চোখে বক্তব্যকে এমন উজ্জ্বলতা দিতে ঘরকন্নার ভাষা ও ভঙ্গীর ক্ষমতার যা সম্পূর্ণ বাইরে। এই প্রয়োজনেই

সাহিত্যকে শব্দের ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিতে হয়, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা বাদ দেওয়া চলে না, বক্তব্যকে দিতে হয় আর্টিষ্টিক গড়ন। সুতরাং এ সবারই মাপকাঠি এই ঔজ্জ্বল্যের উপযোগিতা। তার অতিরিক্ত কাব্যের উপাদানের আমদানী এ সাহিত্যকে বিকৃত করে। যুদ্ধের সৈনিককে বরের সজ্জা পরানোর মত' যেমন কাজের বিঘ্ন তেমনি অশোভন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি লেখকের ক্ষমতায় এ সকলই সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে! কিন্তু সে লেখা তখনই হয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যখন তার সাহিত্যিক রূপ ও ভঙ্গী বক্তব্যকে প্রকাশের প্রয়োজনে ভিতর থেকে গড়ে ওঠে, অলঙ্কার সজ্জার মত বহিরঙ্গ নয়—যাকে বাদ দিলেও বক্তব্যের বুদ্ধিগম্যতার কোনও ক্ষতি হতো না। এ যুগের দুজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের লেখা এর উৎকৃষ্ট নমুনা—বার্গসেঁা ও উইলিয়াম জেমস। তাঁদের লেখার সাহিত্যিক ভাষা ও রূপ তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বকেই সব সময় বিশদ ও পরিস্ফুট করে, অবান্তর কোনও রসের কখনও জোগান দেয় না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথাকে সাহিত্যিক পথে চালাতে সাবধানতার কত প্রয়োজন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়'। নিছক বৈজ্ঞানিক লেখকেরাও সাধারণের কাছে এ সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিচয় দিতে লেখায় যেটুকু কবিত্ব এনেছেন 'বিশ্ব-পরিচয়' সেটুকুও সযত্নে বর্জ্জন করেছে। মহাকবি রাশ টেনে রেখেছেন খুব জোরে। সকলেই জানেন যে জীন্স বা এডিংটনের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানী লেখকদেরও জনপ্রিয় গ্রন্থগুলির বিরুদ্ধে এ অভিযোগের অভাব নেই যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কাব্যের বিস্ময় আনতে গিয়ে তার যথার্থরূপ মাঝে মাঝে রঙীন বাষ্পে ভিন্নরূপ ধরেছে।

(৪)

যে কাব্যেতর সাহিত্যের বিষয়বস্তু মানুষের কথা, যেমন ইতিহাস কি জীবনী, সেখানে এ সাবধানতার প্রয়োজন আরও বেশী। ইতিহাস কি জীবন-চরিত ঘটনার ফর্দ্দ হলে সাহিত্য হয় না সে কথা ঠিক। কিন্তু এ সাহিত্যের বিষয়বস্তু কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক বলে অনিপুণ লেখকের হাতে এ সাহিত্য উগ্র কাব্যগন্ধী হয়ে ওঠার ভয় অত্যন্ত বেশী। খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে জর্ম্মান লেখক এমিল লাডুইকের লেখা জীবনচরিত গুলি এর উদাহরণ। লাডুইকের এ সব পুঁথি অনাবশ্যক ও অবান্তর কবিত্বের চাপে রুদ্ধশ্বাস, মনে হয় ঘটনার শুকনো বাতাসে এলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়:

লিটন ষ্ট্রেচি জীবন-চরিত লেখার যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেছেন ইউরোপের আধুনিক চরিতকারদের উপর তার অত্যন্ত প্রভাব। ষ্ট্রেচি তার জীবনী-গুলিকে যে আর্টিষ্টিক গড়ন দিয়েছেন তার লক্ষ্য চরিত-কথার মানুষটিকে জীবন্ত করে তোলা, তার চরিত্রের মর্ম্ম কথাটি উদ্‌ঘাটন করে। ইতিহাস কি জীবনচরিত লিখতে হলেই ঘটনাকে কাট ছাঁট করে একটা কাঠামে সাজাতে হয়। কিন্তু ষ্ট্রেচির রীতির ভয় চরিত-কথার নায়কের জীবনীকে সেই সংহতি দেবার লোভ যা বাস্তব জীবনে থাকে না, পাওয়া যায় শুধু কাব্যের নায়কের জীবনে। ফলে ঘটনার মাপে কাঠাম তৈরী না হয়ে, কাঠামের মাপে ঘটনার ছাঁটাই বাছাই হয়। এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় স্বয়ং ষ্ট্রেচির লেখায় তার প্রমাণ আছে, এবং তাঁর অনেক শিষ্যের হাতে এ দোষ উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইতিহাস বিজ্ঞান না সাহিত্য এ তর্কের মূলে বিজ্ঞান নামের আধুনিক 'প্রেষ্টিজ' আকর্ষণের ইচ্ছা ছাড়াও এই আশঙ্কা রয়েছে। প্রত্নতত্ত্বের টুকরো পিন্ দিয়ে গাঁথলে ইতিহাস হয় না, কিন্তু সাহিত্যিক গড়ন দেবার আত্যন্তিক লোভে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি ও উপেক্ষার ভয় অতি-ভয় নয়। আধু-নিক সময়ে অনেক সাহিত্যিক ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন। তাদের অনেকের লেখা ইতিহাস যে বস্তুভারহীন তার প্রধান কারণ খুব সহজে ইতিহাসকে সাহিত্য করে তোলার চেষ্টা। যাঁরা মহাঐতিহাসিক, যেমন গিবন কি মম্‌সেন, কেবল তাঁদের রচনাই একসঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্য। কারণ তাঁদের ইতিহাসের সাহিত্যিক গড়ন বাইরে থেকে ধার করা নয়। সভ্যতার সৃষ্টি ও ধ্বংসের বৃহৎকথাকে বিবৃতির প্রয়োজনে তাঁদের প্রতিভা ও গড়ন আবিষ্কার করেছে। এবং রসের সৃষ্টির কোনও চেষ্টা না করেও তাঁদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মহাকালের পদধ্বনি বেজে উঠেছে যা শোনা যায় মহাভারতে' কি গ্রীক ট্র্যাজিডিতে।

(৫)

সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরা আমার বাংলা সাহিত্যের আলোচনার দায়িত্ব অত্যন্ত হালকা করে দিয়েছেন। এ সম্মেলনে সাহিত্য শাখার দুইটি প্রশাখা রয়েছে, কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলা কাব্য সাহিত্য আমাদের পরম সম্পদ ও পরম গৌরব। আধুনিক কথা সাহিত্য পৃথিবীতে বেশী দিনের জিনিষ

নয়. বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাব অতি অল্প দিনের কথা। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে সময় গুণলে এখনও আশী বছর পূর্ণ হয় নি। এ সময়ের মধ্যে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে ও সৃষ্টি চলেছে তাতে বাঙ্গালীর লজ্জিত হবার কিছু নেই। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলার উপন্যাস সাহিত্য আজ শোকগ্রস্ত। তাঁর লেখক-জীবনের আরম্ভে যে বিতর্ক ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর জীবনকালেই তার অবসান তিনি এক রকম দেখে গিয়েছেন। যখন তাঁর লেখার অভিনবত্বের চমক কেটে যাবে, এবং অতি পরিচয়ের অনবধানতাও দূর হবে তখন তাঁর সৃষ্টি বহু নর-নারী কিশোর-কিশোরী বাঙ্গালী পাঠককে পুত্রপরম্পরা অমিশ্র সাহিত্যের আনন্দ দিতে থাকবে।

বাংলার এই কাব্য ও কথা-সাহিত্যের আলোচনা আপনারা যোগ্যতর লোকের মুখে শুনবেন। সে সম্বন্ধে কিছু বলে একটা সীমা-বিবাদের প্রতিবাদী হবার সাহস আমার নেই।

কবিতা ও কথা-সাহিত্য বাদ দিলে, যে কাব্যেতর সাহিত্য বাকী থাকে, অন্যত্র আমি যার নাম দিয়েছি 'মনন সাহিত্য,' বাংলা সাহিত্যে তার প্রধান আলোচনার কথা সাহিত্যের এ বিভাগে আমাদের পরম দৈন্য। আমাদের কাব্য-সাহিত্যের তুলনায় আমাদের এ সাহিত্য নগণ্য। এবং তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশের প্রকৃত জায়গা হয়ত সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্যশাখা নয়। কেননা এ দৈন্যের হেতু বাঙ্গালীর সাহিত্য-শক্তির অভাব নয়, বাঙ্গালীর মনন-বৃত্তির আলস্য। এ সাহিত্য-সম্মেলনে মনন-সাহিত্যের চারটি বিভাগকে স্থান দেওয়া হয়েছে,—বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাস। মানুষের মনের এ সব সৃষ্টি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণার ফল নয়, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ও ঔৎসুক্যে এদের জন্ম। অনুসন্ধিৎসা যখন বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাস গড়ে তোলে তখন তারই উপাদানে এ বিভাগের সাহিত্য সৃষ্টি হয়। জাতির মনের একটা বড় অংশ, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাসের তথ্য আবিষ্কারে ও তত্ত্বচিন্তায় রত নয়, অথচ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সাহিত্য সে জাতির ভাষায় গড়ে উঠবে এ হচ্ছে বিনা গাছে ফুলের প্রত্যাশা, অর্থাৎ আকাশ-কুসুম।

বিজ্ঞানের সর্ব্ব-জাতির আসরে বাঙ্গালী অতি স্বল্প সংখ্যায় সেদিন মাত্র প্রবেশ আরম্ভ করেছে। সে জ্ঞানের ভাণ্ডারে এখনও তার দান অতি সামান্য। এ দানের পরিমাণ বৃহৎ না হলে মানুষের বুদ্ধির এই পরম আশ্চর্য্য

বিজয়-যাত্রায় বাঙ্গালী দর্শক মাত্র হয়ে থাকবে, সহ-যাত্রীর উৎসাহ ও মমত্ব-বোধ জাতির মধ্যে আসবে না, এবং যথার্থ বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বাংলার ভাষায় কখনও লেখা হবে না। আমাদের দৈন্যের মর্ম্ম কথা এ নয় যে আমাদের মাতৃ ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য লেখা হচ্ছে না, আমাদের দৈন্যের মূল কথা যে আমাদের মাতৃ-ভূমিতে যথেষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞানীর এখনও আবির্ভাব হয় নি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শন ও ইউরোপের প্রাচীন ও নবীন দর্শন এর সংঘাত আধুনিক বাঙ্গালীর চিত্তে কোনও নূতন দার্শনিক চিন্তার জন্ম দেয় নি। এ যুগে কোনও দার্শনিক বাঙ্গালাদেশে জন্মে নি। ধার করা চিন্তার প্রকাশের প্রয়োজনে কোনও ভাষায় দর্শন-সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

আমাদের অর্থনীতি শাস্ত্র এখনও বিদেশী আচার্য্যদের কথার প্রতিধ্বনি ও লেখার মক্স। আমাদের ইতিহাসে এখনও তথ্য আবিষ্কারের যুগ চলেছে। সে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ হয় নি যার সঙ্গে তত্ত্বের মিশ্রণে ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এখন ইতিহাসের দাবী করলে যা পাওয়া যাবে সে হবে ইতিহাসের মনগড়া কাল্পনিক মূর্ত্তি।

আমাদের জাতীয় মনের এই আলস্যে বাঙ্গালা দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞমণ্ডলী গড়ে ওঠে নি, এবং নানা বিষয়ে ঔৎসুক্যবান বিদগ্ধ পাঠকসমাজের অভাব। তার ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস—এ সব বিভাগে কাজের মত কাজ ও চিন্তার মত চিন্তা যে দু একজন করে তাদের তা প্রকাশ করতে হয় বিদেশী ভাষায়, বিদেশী পণ্ডিত সমাজে যাতে তার প্রচার ও যাচাই হয়। এ অবস্থা চলতেই থাকবে যতদিন বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞমণ্ডলী ও বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজ গড়ে না উঠবে এবং পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে বাঙ্গালীর দানের পরিমাণ ততটা না হবে যাতে বাঙ্গালা ভাষার মারফৎও বিদেশী পণ্ডিত-সমাজ তার পরিচয় নেবে।

বাঙ্গালীর এই মানসিক আলস্যের মূল কারণ আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি। এই শিক্ষা আমাদের মনকে সচল ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করছে না, তৈরী বিদ্যার চাপে তাকে পিষে মারছে। এ শিক্ষাপদ্ধতিকে দূর করে বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে মুক্তি ও ঔৎসুক্যকে স্ফূর্ত্তির উপযোগী শিক্ষা আনতে পারলে তবেই বাঙ্গালী জ্ঞানের জগতে আসন পাবে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাসের অভাবের জন্য সাহিত্য-শাখার সভাপতিকে শোক

করতে হবে না। তার এক কারণ এগুলি তখন সাহিত্যের শাখা থাকবে না, প্রতিটি পরিণত হবে এক একটি মহাক্রমে। কে জানে অদূর ভবিষ্যৎ না সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

কথাসাহিত্য-শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ।

বন্দনা

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে মানুষ প্রথমে যে মাটিটুকু স্পর্শ করে, জন্মের আনন্দটি তার নিবিড় হয়ে জড়িয়ে যায় সেই মাটির সঙ্গে, আনন্দের অবতার মানুষের কাছে তাই জন্মভূমি চির আনন্দ-নিকেতন।

প্রথম দৃষ্টি পাওয়ার সঙ্গে নূতন আলোকের আবেষ্টনে মানুষ যে পৃথিবী প্রথম দর্শন করে সে তার জন্মভূমি। পৃথিবীর পরিচয় তাই প্রথম আরম্ভ হয় মানুষের কাছে জন্মভূমি থেকে। প্রথম পাওয়া, প্রথম ছোঁয়া রূপ-রসটি যে বোধটুকু জাগায়, সে রসটুকু যোগায় মানুষের মনে, চিরদিন তার ফল ফলতে থাকে তার চলায়, বলায়, চিন্তায় আলাপ-অলোচনায়, রচনার মধ্য দিয়ে রস পরিবেশনে। মানুষকে পৃথিবীর কাজের প্রেরণাও গোড়ায় যোগায় জন্মভূমি, দিতে শেখায় নিজের ছোট বড় সব কিছু পৃথিবীকে, নিজের প্রাণরসে পৃথিবীর প্রাণ সঞ্জীবিত রাখতে শেখায় আত্মদানে। দেওয়া-পাওয়ার প্রথম আনন্দ মানুষের জন্ম-ভূমির যোগে, তাই প্রাণের অধিক যত্ন জাগে জন্মভূমির প্রতি ; জীবন-জোড়া বাণীটি তার কণ্ঠে বাজে—জয় জন্ম ভূমির জয়।

সূচনা

বাংলার সাহিত্য সম্মিলনে কথা সাহিত্যের রূপটি দেখাবার জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করে এনেছেন আপনাদের এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করে তোলার জন্য। আপনাদের পরিতৃপ্ত করতে পারি, এমন সম্বল আমার নাই। তবে বাংলার অন্নজলে আমার শরীর, তার সংস্কৃতি ও সাধনায় আমার মন-বুদ্ধির পরিপুষ্টি, সাধ্বী জননীদের আদর্শ আমার চিত্ত সংযমের সহায়, মহাপুরুষদের পদধূলিতে আমার প্রাণ-চৈতন্যের অভিষেক সুতরাং বাংলার কোনো ডাককে প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার নাই।

যোগ্যতার বিচার মন থেকে মুছে ফেলে আজ আপনাদের মাঝে এসে বসেছি। শত অভাবত্রুটি সত্ত্বেও যদি সামান্য কিছু দিতে পারি, আপনারা প্রসন্নচিত্তে সেটুকু গ্রহণ করলে সব সার্থক হবে।

অফুরন্ত রূপরসে ভরা বৃহৎ বিশ্ব মানুষের শরীর মন বুদ্ধি ও চৈতন্যকে ঘিরে আছে চিরদিন। মানুষ ডুবে আছে রূপরসের সমুদ্রে সারাক্ষণ। জড় জগতের চাপা চৈতন্যে একটুখানি ঘা পড়লে সে যখন সাড়া দিয়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ

তখন মূর্ত্তচৈতন্য মানবচিত্তে একটু ছোঁয়া একটু পাওয়ার ঘা লাগলে সে যে বিচিত্র রূপরস সৃষ্টি করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! পৃথিবীতে খেচর, ভূচর, জলচর, উভচর প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাণীর সমাবেশ। মানুষ জাতিকে "রসচর" আখ্যা-দিলে বোধহয় ভুল হয় না। রসানুসন্ধান ও রসে পরিতৃপ্তি তার স্বধর্ম্ম।

মানবচৈতন্যের সূক্ষ্মতম স্তরে বিশ্বের আনন্দ-চৈতন্য মুহূর্ত্তের জন্য মৃদুতম ঘা দিলেও সে সাড়া দিয়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ--অমৃত পরিবেশন করে ক্ষণেক্ষণে। রসবৈচিত্র্যের মূর্ত্ত প্রতীক মানুষ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রসের সন্ধান দেয় নিজের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রসকে প্রকাশ করে; প্রকাশ-ধর্ম্ম তাই মানুষ-জগতের অমূল্য সম্পদ। শিল্পে, চিত্রে, সঙ্গীতে, কাব্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ভগবৎপ্রেমে মানুষের অপূর্ব্ব দানের কাছে মস্তক অবনত করে আজ আমি কথা সাহিত্যের কথার অবতারণা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

মানুষের অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি প্রথম যে দিন কথা হয়ে মুখে ফুটে উঠেছিল, পৃথিবীর মানুষরাজ্যে নাজানি সেদিন কি আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কথা কয়ে, বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত মানুষ বাতাসে বাহু মেলে ছুটেছিল পৃথিবীর পথে। মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর প্রথম কোলাকুলির সেই রূপটি নিজের চোখে দেখেছিল যারা, কাহিনীতে কাহিনীতে রেখে গেছে তারা তার পরিচয় কানে কানে। সেই সব কাহিনীতেই কথা-সাহিত্যের গোড়াপত্তন; ভাষাটি তার সাহিত্যের উপযোগী না হলেও,—এই মৌখিক রচনাগুলিকে 'সাহিত্য' আখ্যা দিতে না পারলেও—মানস-চেতনায় রূপসৃষ্টির এগুলি যে আদিম নমুনা, একথা বলতেই হবে। আদি জননী প্রাকৃতভাষা ও আদি জনক পুণ্যময় দেব-ভাষা সংস্কৃতের প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদন করে কথা সুরু করি।

অতি পুরাকাল থেকে পৃথিবীর সকলদেশের মানুষ-সমাজে কাহিনীর প্রচলন দেখা যায়। এদেশের বৈদিক যুগেও তার নিদর্শন আছে। ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর গল্প এবং বহু বৈদিক গ্রন্থে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে।

রামায়ণের যুগে বাল্মীকি লিখছেন—দুঃস্বপ্ন দেখে ভরত মাতুলালয়ে বিষন্ন, রাজসভার কথা-ব্যবসায়ীরা তাঁকে কথা শুনিয়ে প্রসন্ন করছে।

বৌদ্ধযুগে মালিনী ও নাপিত রমণীরা অন্দরমহলে পুরনারীদের গল্প শোনাত। পরবর্ত্তী যুগে তাদের 'আলাপিনী' নাম দেওয়া হয়েছিল। ময়মন-

সিংএর মহিলাকবি চন্দ্রাবতী (১৫৭৫)—তাঁর রচিত রামায়ণে লিখেছেনঃ—

"উপকথা সীতারে শোনায় আলাপিনী"। আলাপিনীরা বড় ঘরের মেয়েদের গল্প শুনিয়ে শ্রান্তি ও অবসাদ দূর করতো। সপ্তদশ শতাব্দির বৈষ্ণব কবি যত্নুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃতে এই আলাপিনীর উল্লেখ আছে। তারা কেবল গল্পবলতো না, রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাদের বেশ বিন্যাসেও সাহায্য করতো।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মুতাক্ষরিণ"এ লেখা আছে, আলিবর্দ্ধি খাঁ গল্পকারদের সঙ্গে দিনের কতকটা সময় কাটাতেন এবং মীরণ মরবার রাত্রিতেও এক আলাপিনীর মুখে গল্প শুনছিলেন। দীনেশ সেন মহাশয় বলেছেন—ঢাকা জেলার সাভার গ্রামবাসী কথা ব্যবসায়ী ভারতচন্দ্র রায় ত্রিপুরার রাজসভায় অতি দক্ষতার সঙ্গে গল্প শোনাতেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কাহিনী রচনার এরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত বাংলা-দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে দেখা যায়। ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠাকুরমার থলে, ইত্যাদি বইগুলি এইরূপ ছড়ানো কাহিনীরই সঞ্চয়ন।

সাহিত্য সৃষ্টি

বর্ত্তমানে আমরা কথা সাহিত্যের যে রূপ দেখছি তার সূত্রপাত হয়েছে কিন্তু বাংলার গদ্য সাহিত্য যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের সময় হ'তে। তখন থেকে বাংলা ভাষায় কিছু কিছু গল্প রচনার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো কথা-সাহিত্যের নমুনা নয়, মানুষের মনের গল্প রচনার চিরন্তন প্রবৃত্তির নিদর্শন মাত্র। সে আজ প্রায় ১৪০ বছর হ'তে চলল। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রসার আরম্ভ হয়। উইলিয়াম কেরী প্রমুখ বিদেশীদের উৎসাহে এবং পণ্ডিতদের সহায়তায় বাংলায় সকল রকম বিষয়ের আলোচনার সম্ভাবনা দেখা দেয়; অবশ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাইরেও তখন ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস চলেছিল। বাংলা গদ্যের একটা ব্যবহারিক রূপ আবিষ্কারের সে এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস। কিন্তু ভাষা তখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়নি। সাহিত্যের ভাষা তখনও ফোটেনি। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষীদের রচিত গ্রন্থাদি তখন বাঙালী পাঠকদের মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার আভাস নিয়ে এল।

বাংলা গদ্যকে সরল ক'রে সাধারণগ্রাহ্য করবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের মত প্রতিভার প্রয়োজন হ'ল। তাঁর বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৭

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্য সাহিত্য যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হ'তে পারে, এই গ্রন্থে তিনি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন। শুধু তাই নয়, গদ্যে তাঁর দেওয়া রূপটিই বাংলাভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করে। বর্ত্তমান কথা সাহিত্যের ভাষা বিদ্যাসাগরের এই ভাষারই অভিব্যক্তি।

ইতিপূর্ব্বে বাক্য রচনায় বাক্যের দৈর্ঘ্যের কোনো পরিমাপ ছিল না। অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণে যে একটি 'রিদ্‌ম্‌' যতি, বা তাল থাকা উচিত সে সম্বন্ধে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় ধ্বনির এই তাল বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। সেই জন্যেই তাঁর রচনা হ'ল শ্রুতিমধুর এবং তা পাঠকের মনোহরণ করতে সমর্থ হ'ল। কিন্তু এ সময়েও বাংলা ভাষায় আধুনিক কথা সাহিত্য রচিত হয় নি। এই সময়ে যে সব গল্প রচিত হয়েছিল তা বর্ণনাপ্রধান। গল্পের পর গল্প, গল্পের মধ্যে গল্প রচিত হচ্ছে, কিন্তু কোনো একটি মাত্র গল্প সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারছে না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রণীত আলালের ঘরের দুলাল যে তখন বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করেছিল তার কারণ এটি কথা সাহিত্য বলে নয়, তার কারণ এর ভাষা ছিল সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। আলালের ঘরের দুলাল কতকগুলি চিত্রের সমষ্টি মাত্র। প্রমথনাথ শর্ম্মার নব বাবু বিলাস, টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল এ সবই ঐ এক জাতীয় বর্ণনাপ্রধান চিত্রসমষ্টিমাত্র। এই ধরণের রচনা—অর্থাৎ একটা ছবির পর আর একটা ছবি আসছে, একটা গল্পের পর আর একটা গল্প আসছে,—এর কোথায়ও শেষ নেই,—যেখানে ইচ্ছা থামা যায়, যতদূর ইচ্ছা টানা যায়। এর বর্ণিত চরিত্রগুলো ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে কোনো একটা অনিবার্য্য পরিণতিতে গিয়ে পৌছায় না। সবাই মিলে এমন একটা বিশেষ জগৎ সৃষ্টি করে না যার মধ্যে সেই সব চরিত্রের একটা সৌন্দর্য্য এবং একটা ক্রমবর্দ্ধমান জীবন্তরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র

কথা সাহিত্য রচনা করতে হ'লে গদ্যের যে সারল্য প্রয়োজন ইংরেজি ভাষার মত বাংলা ভাষায় তা ছিল না, সুতরাং বাংলা ভাষায় প্রধানত প্রবন্ধ রচনাই তখন চলছিল, যদিও প্রবন্ধ রচনার পক্ষেও সে ভাষা ছিল অনুপযুক্ত। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষার রূপ ইংরেজি

ভাষার রূপের প্রায় সমকক্ষ ক'রে তুললেন। বিদ্যাসাগরের ভাষা হ'ল সকল বাঙালীর ভাষা। এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত হ'লেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করলেন অক্ষয় কুমার দত্ত, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। নানা প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে অনুবাদের ভিতর দিয়ে এই সময়ে বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গেল। এমন সময় এঁদের মধ্যে আবির্ভূত হ'লেন এক বিরাট প্রতিভা, বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি কথা সাহিত্যে এবং প্রবন্ধ রচনায় তাঁর সমসাময়িক কালকে ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

ইংরেজি ভাষায় কথা সাহিত্য বহু পূর্ব্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষায় কথা সাহিত্যের যে রূপটী অভিব্যক্ত হয়েছিল বাংলা ভাষায় সকল বাঙালী পাঠককে চমৎকৃত, বিস্মিত এবং পুলকিত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথা সাহিত্যে সেই রূপটি ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর হাতে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, রজনী, রাধারাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি নামে পরিচিত এক একটা বিস্ময়কর জগৎ রচিত হ'তে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যেন বাংলা দেশের সমতল ভূমির উপর হিমালয়ের চূড়ার মত আকাশচুম্বী হ'য়ে দেখা দিল। বাঙালী পাঠক মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর রচিত এক একটি জগতে প্রবেশ ক'রে তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে পুলকিত হ'য়ে উঠল। মানুষের পক্ষে সমগ্র মানুষের পরিচয় যে কি লোভনীয়, মানুষের বাসনা কামনা সুখদুঃখের বাস্তব ছবি যে কত বিস্ময়ের তা বাঙালী পাঠক এই প্রথম উপলব্ধি করতে সমর্থ হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট জগতে আমরা আমাদেরই পরিচিত লোকের পরিচিত সমাজ সংসারের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখের প্রতিফলিত রূপ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট রোমান্সে আমাদের মন খুশী হ'ল এবং তাঁর সামাজিক গল্পে আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। মানুষকে আমরা চিনি মাত্র, তার সমগ্রতার পরিচয় আমরা পাই না। সেই পরিচয়ে তার যা রূপ ফুটে ওঠে সেই রূপ দেখবার চোখ আমাদের ছিল না, সেই রূপের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য্য নিহিত থাকতে পারে তা দেখিয়ে দেবার মত প্রতিভাও কেউ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম

এই ভার গ্রহণ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলাভাষায় প্রথম কথা সাহিত্য রচিত হ'ল।

কথা-সাহিত্যে যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তারা সবাই জীবন্ত। অন্য কেউ তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বর্ণনা করে না; তাদের কাহিনী পড়তে আরম্ভ ক'রে দেখতে পাই, আমাদের অজ্ঞাতসারে তারা কখন নিজেরাই চলতে ফিরতে আরম্ভ করেছে, তারা নিজেরাই আমাদের কাছে তাদের পরিচয় দিচ্ছে। সিনেমা-ছবি যেমন যন্ত্র চললেই জীবন্ত হয়ে ওঠে, এরাও তেমনি পাঠকচিত্তে প্রবেশ করবামাত্র জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। তারা নিজেরাই আমাদের কানে কানে তাদের গোপনতম কথাটি পর্য্যন্ত বলে যায়। তারা কেউ তাদের দুঃখে আমাদের কাঁদায়, কেউ তাদের আনন্দে আমাদের আনন্দ দেয়। কথা-সাহিত্যে আমরা যে শুধু মানুষেরই পরিচয় পাই তা নয়। তাদের পারিপার্শ্বিক যাকিছু, ঘরবাড়ি, পথঘাট, আকাশ-বাতাস, আলো-ছায়া, গাছ-পালা পশু-পাখী—সকলের পরিচয় বহন করে আনে। আমরা যেন তাদের স্পর্শ করতে পারি, তাদের শব্দ শুনি, তাদের গন্ধ পাই, তাদের সান্নিধ্য অনুভব করি। এদের পরিচয় পাবার সময় এদের স্রষ্টার কথা আমরা ভুলে যাই। স্রষ্টা থাকেন অন্তরালে, এদের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য তাঁর কোনো প্রয়োজনই অনুভব করি না। হিতোপদেশ বা বেতালের গল্পে বা ঈসপের গল্প প্রকৃত কথা সাহিত্যের ধর্ম্ম নেই। সেখানে যে-সব চরিত্র আমরা দেখতে পাই তারা রচয়িতার উদ্দেশ্য মাত্র সিদ্ধ করেছে। রচয়িতা তাদের যে ভাবে চালিয়েছেন, তারা সেই ভাবে চলেছে। তারা এখানে তাদেরই সম্পূর্ণতার জন্যে নেই, তারা এখানে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু কথা সাহিত্যের চরিত্র—কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করে না, তারা শুধু নিজেদের পরিচয় দেয় মাত্র। তা ছাড়া কথা সাহিত্যের এক একটী গল্প যেখানে শেষ হয় সেইটেই তার একমাত্র পরিণতি। তাকে বাড়ানও যায় না, কমানও যায় না।

মানুষের চিত্তরঞ্জনের জন্য কথা সাহিত্যের এই যে ধর্ম্ম এটা পৃথিবীর সকল কথা সাহিত্যের ধর্ম্ম। বঙ্কিমচন্দ্রও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছেন বলেই তিনি যথার্থ কথা সাহিত্যিক হ'তে পেরেছেন। কিন্তু মানুষ বা মানুষের জীবনের পরিচয় অসংখ্য। তার বৈচিত্র্য কখনও শেষ হয় না, তাই নব নব প্রতিভা হতে এই কথা সাহিত্য নব নব রূপে প্রকাশিত হয়েছে—এবং চিরদিনই হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে কথা সাহিত্যে আরও কয়েকজন প্রতিভাবান

লেখকের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে প্রধান রমেশচন্দ্র দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা, সংসার ও সমাজ এবং ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের লঘু রস পূর্ণ ফোগলা দিগম্বর, বাঙ্গাল নিধিরাম ও অদ্ভুত রসপূর্ণ কঙ্কাবতী প্রভৃতি গল্প বাংলা ভাষায় বিশেষ আদরের ছিল। ভাষার দিক দিয়ে এগুলো উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সব গল্প রচনা করেছেন তার স্থান এবং কাল প্রশস্ত। কিন্তু এই স্থান এবং কাল আপেক্ষিক। তাঁর প্রয়োজনের পক্ষে যতটুকু স্থান এবং যতটুকু কাল প্রয়োজন হয়েছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের পরিপূর্ণতার পক্ষে ঠিক ততটুকুই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সৃষ্টির পক্ষে স্থান এবং কালের কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নেই। আমরা একটি মুহূর্ত্তের ঘটনাকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখতে পারি। একটি দিনের ঘটনায় একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত হ'তে পারে। গল্পের যে একটি মূল ধর্ম্ম আছে সেইটুকু বজায় রাখতে পারলে অতি অল্প পরিসরেও পরিপূর্ণ গল্প রচিত হ'তে পারে। সমগ্রের যেমন একটা সৌন্দর্য্য আছে, সমগ্রের অংশেরও তেমনি একটা সৌন্দর্য্য আছে। শিল্পীর হাতে সেই অংশই পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেতে পারে। সেটা অনভ্যস্ত চোখে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু শিল্পী যদি সমগ্র থেকে পৃথক ক'রে সেই অংশটির সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণভাবে আমাদের দেখাতে পারেন তা হ'লে তখন আর আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ

কথা সাহিত্যে ছোট গল্পের সৃষ্টি হয়েছে এই ভাবেই। সহানুভূতি, অনুকম্পা এবং শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখলে সাধারণ চোখে যা তুচ্ছ এবং মূল্যহীন মনে হয় তারই ভিতর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ মেলে। এই দৃষ্টি নিয়ে দেখা দিলেন আর এক বিরাট প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ। তিনি মানবজীবনের এক একটি মুহূর্ত্তকে, এক একটি অংশকে বেছে নিয়ে তা দিয়ে এমন এক একটি পরিপূর্ণ ছবি আঁকতে লাগলেন যার সম্ভাবনাও বাংলাদেশে কল্পনাতীত ছিল। এ যেন অন্ধকার জীবনপ্রবাহের মাঝে মাঝে সন্ধানী আলো নিক্ষেপ ক'রে এক একটি অংশ পরিদৃশ্যমান ক'রে তোলা। গল্প যে এত অল্প পরিসরে এমন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখালেন। পাঠক-মনকে আনন্দে অভিভূত ক'রে তুলতে ছোট গল্পের যে এত ক্ষমতা বাংলাদেশে সাধারণ পাঠকের

তা জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট অনুভূত হ'ল। তা ছাড়া ভাষার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন—অস্পষ্টতার অন্ধকার থেকে তিনি কথা সাহিত্যের ভাষাকে যে মুক্তি দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে তার মুক্তি হ'ল অবাধ; তিনি ভাষাকে এমন একটা অপরিমেয় শব্দ-প্রাচুর্য্যে ও অনুপম লাবণ্যশ্রীতে ভ'রে তুললেন, যাতে করে ইংরেজি ভাষার প্রায় সকল প্রকার প্রকাশ-মাধুর্য্য এবং অলঙ্কার অতি সহজে বাংলাভাষার সঙ্গে আত্মীয়ের মত মিশে গেল। তাতে ভাষার আভিজাত্যের কঠোরতা গেল ঘুচে কিন্তু আভিজাত্যের গৌরব গেল বেড়ে। কাজেই এ ভাষায় সাধারণ জীবন-যাত্রার কথা নিয়ে গল্প রচনার আর লেশমাত্র বাধা রইল না। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত ছোট গল্পের রীতিতে রবীন্দ্রনাথের পরে সার্থক গল্প লিখেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর ভাষার সরলতা এবং স্বচ্ছতার একটা বিশেষ রূপ আছে। প্রভাতকুমারের প্রতিভা বহুমুখী নয়, কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ গল্পকার। বাংলা ভাষায় যে কত সহজে কত অনাড়ম্বরে গল্প রচনা করা যায় তার দৃষ্টান্ত দেখালেন ইনি।

শরৎচন্দ্র

তারপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বাংলা কথা সাহিত্যে আর এক প্রতিভার আবির্ভাব ঘটল, এঁর নাম শরচ্চন্দ্র। ইনিও বিশুদ্ধ গল্পকার। বহু-মুখী প্রতিভা এঁর নেই কিন্তু ইনি গল্প বলতে আরম্ভ করলে তার শেষ না শুনে উপায় নাই। কথাসাহিত্যে মোহ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা এঁর অদ্বিতীয়। শুধু ভাষাই নয়, এঁর গল্পের বিষয়বস্তু এবং সৃষ্ট চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থাৎ তারা সবাই সাধারণ লোক। আমরা যাদের চিনি না, যাহাদের মধ্যে আমরা কোনো সৌন্দর্য্যই দেখতে পাই না, তাঁর অনুকম্পার আওতায় তারা অপরূপ রূপ নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের এবং শরচ্চন্দ্রের প্রবর্ত্তিত এই যে কথা সাহিত্যের ধারা, এই ধারা অনুসরণ করে বর্ত্তমানের অনেক নবীন শিল্পী সাধারণ লোকের জীবন-কাহিনী নিয়ে উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করছেন। নিষ্ঠাবান নবীন লেখকদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ক্রমশই প্রশস্ততর হচ্ছে। এ যুগে জীবন-দর্শনের ধারা গেছে বদলে। কাজেই তারা নব নব দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করছে। শরচ্চন্দ্রের পরে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক বাংলায় দেখা দিয়েছেন। প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের রচনার মধ্যে।

রস-রচনা

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা এখনো পরিপুষ্ট হয় নাই। বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ রচনার নায়ক, যদিও তৎপূর্ব্বে ঈশ্বর গুপ্ত ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসরচনায় পটুত্বের পরিচয় পাই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রস-রচনার জন্য জগত্তারিণী পদক পেয়েছেন। প্রসিদ্ধ রস-সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর দানও রস-সাহিত্যে বড় কম নয়। আধুনিক নবীন রসসাহিত্যিকদের মধ্যে কয়েকজন শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁদের গৌরবময় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

মহিলা শিল্পী

কথা সাহিত্যে মহিলাদের মধ্যে যিনি প্রথম একটা বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি দ্বারা পাঠকের চিত্ত হরণ করেন তাঁর নাম স্বর্ণকুমারী দেবী। এঁর লেখার মধ্যে এমন একটা স্ত্রীজনোচিত মাধুর্য্য ছিল যাতে সহজেই এঁকে পুরুষ লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র ক'রে চেনা যেত।

মহিলারই রচিত "ফুলমণি ও করুণা" উপন্যাসখানি বাংলায় প্রথমমুদ্রিত উপন্যাস; ১৮৫২ সালে মুদ্রিত হয়। ইংরাজ-পরিনীতা বঙ্গরমণী মিসেস্ মুলেন্স উহার রচয়িত্রী। আধুনিক মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন কথা সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন। অনুরূপা দেবী চিহ্নিত হয়েছেন জগত্তারিণী পদক পেয়ে। এঁদের লেখনীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি অন্তরের সঙ্গে।

কথা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

কথা সাহিত্যে বাস্তবতা এবং 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' প্রভৃতি নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। শিল্পী আপন সৃষ্টির আনন্দে শিল্প রচনা করে; তার সাধনা, তার ধ্যান হ'তে যা সৃষ্ট হয় তা যখনই সৃষ্টি হিসাবে সার্থক হয়ে ওঠে, তখনই তার সৌন্দর্য্য পাঠক মনকে নন্দিত করে। অক্ষম শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত অপরাধকে সমর্থন করবার জন্যই অনেক সময় আর্টের খাতিরে আর্টের মহিমা ঘোষণা হ'য়ে থাকে। যাদের সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, তারাই শিল্পের ব্যভিচারকে শিল্পের নামে সমর্থন করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজনে এমন জিনিষ বেছে নেন যা তাঁর প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। এই নির্ব্বাচনই শিল্পী-মনের আভিজাত্য প্রমাণ করে।

এই আভিজাত্য যে হারিয়েছে, সে শিল্পীই নয়। সুতরাং দুর্নীতি বাস্তব ব'লেই দুর্নীতির কলুষ আবহাওয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করার কোনো মূল্য নেই। সৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর সজ্ঞানতা থাকে বটে কিন্তু আসলে শিল্পী অনুপ্রাণিত হন তাঁর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আবেগ দ্বারা।

শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্র জীবন্ত, তারা নিজেরাই নিজের পথ কেটে চলে। তাদের বৃদ্ধি বা পরিণতি স্রষ্টার ইঙ্গিতে নয়, তাদের নিজস্ব প্রাণধর্ম্মে। স্রষ্টা তাদের কোনো বাধা দিতে পারে না, তাদের অগ্রগতিতে সাহায্য করে মাত্র।

ভবিষ্যৎ কথাসাহিত্যকারকে অনুরোধ করি, তাঁরা যেন তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী-দের মত সার্থক সৃষ্টিতেই মনোনিবেশ করেন, তাঁরা যেন সার্থক সৃষ্টি এবং অক্ষম সৃষ্টির ভিতরকার এই পার্থক্যটি সর্ব্বদা মনে রাখেন। যে সৃষ্টি অক্ষম, তাইতেই কুৎসিত এবং বিভৎস শুদ্ধমাত্র দাম্ভিকতার দ্বারা নিজের আসন দখল ক'রে রাখতে চায় এবং এরই জন্য এমন হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করতে হয় যে, কুৎসিত এবং বীভৎস বাস্তব, অতএব তাকে দেখে ভয় পেলে চলবে না। সার্থক সৃষ্টিতে এই প্রশ্নটাই ওঠে না।

সৃষ্টি সার্থক হোক, তা হ'লেই তা সুন্দর হবে; কারণ যা সুন্দর তাই লোককে আনন্দ দেয়, তাই থেকে লোকে শিক্ষালাভ করে, তাই থেকেই তাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়।

চিরারাধ্য মাতৃভূমিকে আশ্রয় করে মাতৃভাষা যুগে যুগে নব কলেবরে নূতন সৃষ্টিতে বিশ্ব সাহিত্যে জয়যুক্ত হোক, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী

পদাবলী-সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ

উপক্রমণিকা

একাধারে সামগান-মুখরিত প্রাচীন ভারতের গুরুকুল ও ঋষিকুল এবং বৌদ্ধ-আচার্য্যগণের বিজ্ঞান ও প্রতিভামণ্ডিত নালন্দা ও বিক্রমশীলার গৌরব-স্পর্দ্ধী নবদ্বীপের প্রভামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণনগরে, বাঙ্গলা সাহিত্যের পীঠস্থান মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং মহাকবি ভারতচন্দ্রের যশোগৌরবে-সমুজ্জ্বল কৃষ্ণনগরে, বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশন আহ্বানপূর্ব্বক আপনারা যেমন সমগ্র বাঙ্গালীকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সম্মেলনে পদাবলী ও কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য-প্রতিষ্ঠায় তেমনি জাতিকে, তাহার সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার পক্ষে গৌরবের কথা এই, যে পদাবলী ও কীর্ত্তনের সেবিকারূপে সর্ব্বপ্রথম আমাকেই আপনারা স্মরণ করিয়াছেন। আমি এই সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহার প্রথম কারণ—বাঙ্গালার ব্রজভূমি নবদ্বীপমণ্ডলের ধূলিকণাস্পর্শের লোভ, তাহার পুণ্য রজ-রাজিতে আপনাকে লুটাইয়া দিবার লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারি নাই। দ্বিতীয় কারণ – সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বের যে কল্পকথা আশৈশব আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, গৌর-ভগবানের নাম-গুণের মাধুর্য্যচমৎকৃতি, এবং করুণার অহৈতুকী-রীতি আমাকে লোকসমক্ষে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, অন্তরের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি শুধু দেখিতে আসিয়াছি, আজিকার এই সম্মেলনে জাতি সেই মানবতার মূর্ত্ত-বিগ্রহকে, আপন গৌরবান্বিত অতীতের পুণ্য-স্মৃতিকে কোনরূপে গ্রহণ করিতে চায়। সাহিত্যের সেবিকারূপে শুশ্রূষুর আকুলতা লইয়া আমি শুধু জানিতে আসিয়াছি, বাঙ্গালীর মিলিত-মনীষা জাতীয় মুক্তির পথে সাহিত্যের কোন সাধন নির্দ্দেশ করে।

পদাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পদাবলীর কথা বলিতে হইলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বলিতে হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিতে গেলেই পদাবলীর কথা আসিয়া পড়ে। অবশ্য একথা সকলেই জানেন যে শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই পদাবলীর সৃষ্টি হইয়াছিল। পদাবলী শব্দ আজিকার নহে। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবির্ভাব। কবি জয়দেব তাঁহার সংস্কৃতগীতিময় কাব্যকে

পদাবলী বলিয়াই অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। "মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্"। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিকীর্ত্তিও পদাবলী নামেই সুপরিচিত। কিন্তু বাঙ্গালী জানে শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের রচিতই হউক, অথবা শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী মহাজন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণই রচনা করিয়া থাকুন, পদাবলীর বিগ্রহরূপেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। পদাবলীর প্রতিপাদ্য বস্তুই শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সুতরাং আমরা এই পদাবলীর গহনে তাঁহাকে আলোকস্তম্ভ-রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এবং তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করিয়া, তাঁহারি করুণাকিরণে পদাবলী ও কীর্ত্তনের দিগ্‌দর্শন করিতেছি। স্বর্গগত আচার্য্য সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও পদাবলী-সাহিত্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদাবলী দ্বিতীয়—পর-চৈতন্যযুগের পদাবলী।

(ক) পদাবলীর প্রাক্‌চৈতন্য যুগ

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদাবলী আলোচনার পথে সর্ব্বপ্রথম কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীজয়দেবের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীপদ্ম-পুরাণ, ও শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যরূপে তিনি যে অতুলনীয় গীতিকবিতাময় কাব্য রচনা করেন, সেই শ্রীগীতগোবিন্দ শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্বের সাহিত্যোদ্যানেও প্রোজ্জ্বল সুরভি পুষ্পরূপে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুরাণে শুনিয়াছি মহাবিষ্ণুর চক্র ও গদা কখনো কখনো পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমাদের সন্দেহ হয়, ব্রজকিশোরের করধৃত মুরলীই কি শ্রীজয়দেব রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অথবা বংশীধারীর মনোহারিণী সঙ্গিনীরূপে কবি তাঁহার প্রিয় বান্ধবের মোহন বাঁশরী কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কবি জয়দেব তাঁহার স্বদেশবাসীকে সেই বাঁশরীর নিঃস্বন শুনাইয়াছিলেন, সৃষ্টি যেমন স্রষ্টার প্রেমে বিভোর, স্রষ্টাও তেমনি সৃষ্টির অনুরাগে অস্থির। ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য ব্যাকুল, ভগবান্‌ও তেমনি ভক্তের প্রীতিতে আকুল। এই অমৃতময়ী আশার বাণী কবি জয়দেবের কণ্ঠেই সর্ব্বপ্রথম সুগীত হইয়াছিল। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য সে বিশ্ববিমোহন বংশীরব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। জরাভারাক্রান্ত স্থবির, বধির জাতি সে বাণী শুনিতে পাইল না। বিলাসব্যসনের আশীবিষদংশনে

আলস্যের মোহে সুসুপ্তির সুখানুভূতিভ্রমে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। দুঃখরজনীর অন্ধকারে বাঙলার গগন মেদিনী একাকার হইয়া গেল।

কিন্তু বাঙ্গালী মরিলনা; বুঝিবা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল। স্মৃতির অমৃতপানে যে অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, বিস্মৃতি তাহাকে অধিক দিন আচ্ছন্ন রাখিতে পারিলনা। বাঙ্গালীর ভাবসাবিত্রী অপরাজেয় নিষ্ঠায় দুশ্চর তপস্যায় তাহার সত্যবান্‌কে—আপন রসানুভূতিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গলার মহাশ্মশানে ধীরে ধীরে কল্পতরুর নবাঙ্কুর উদ্গত হইল।

দীর্ঘ তিনশত বৎসরের ব্যবধান! কত নিদাঘের ঝটিকাবর্ত্ত, কত বরষার ধারা-বর্ষণ, কত শিশিরের হিমানীপ্রবাহ বাঙ্গলার উপর দিয়া বহিয়া গেল। তথাপি বাঙ্গালী মরিলনা। জড়তার বল্মীকস্তূপের অন্তরাল হইতে বাঙ্গলার অতীত স্মৃতির তপস্যানিরত কঙ্কাল, যেন কোন্ যাদুদণ্ড স্পর্শে এক দিব্য-দেহে প্রাণ প্রাপ্ত হইল। কবি চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইলেন। বীরভূমের অজয়তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জে যে মধুগীতি ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহারি অদূরবর্ত্তী নান্নুরের নিরঞ্জন পাতের কুটীরে সে গীতি প্রতিধ্বনি তুলিল। কবি জয়দেবের অন্তরদেবতা যে বাঁশী বাজাইছিলেন—

সঞ্চরদধরসুধা মধুর ধ্বনি
মুখরিত মোহন-বংশম্।
বলিতদৃগঞ্চল চঞ্চলমৌলি—
কপোল বিলোলাবতংসম্॥

সেই বংশীধ্বনি কবি চণ্ডীদাসকে আকুল করিল। তিনি যাঁহাকে পান তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন "এ কাহার বাঁশী, কোথায় বাজিতেছে, কে বাজাইতেছে?"

"কে না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কুলে
কে না বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়াই সে না কোনজনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়াই চিত্তের হরিষে।

তার পাএ বড়াই মো কৈলোঁ কোন দোষে ॥
আঝর ঝরয়ে মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়াই হারাইলোঁ পরাণী ॥
আকুল করিতে কিবা আম্মার মন।
বাজাএ সুস্বর বাঁশী নান্দের নন্দন।
পাখী নহোঁ তার ঠাঁয় উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেও পশিআঁ লুকাওঁ ॥
বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণি।
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন আভিলাষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে নব অরুণোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যে তুইজন কবির কণ্ঠে উষার আগমনী গীতি ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার একজন বর্ষার প্রেম-করুণকণ্ঠ পাপিয়া চণ্ডীদাস, অন্যজন বসন্তের মদকল কোকিল বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহারা কতদিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। তুই চারিটি উপমার সাদৃশ্য, ভাষার প্রাচীনত্ব. বিষয়বস্তুর ঐক্য, এবং ভাবের আংশিক সমতা দেখিয়া উভয়কেই প্রায় সমকালবর্ত্তী মনে হয়। মিথিলার সঙ্গে বাঙ্গলা সেকালে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল। মিথিলায় গিয়া শিক্ষালাভ না করিলে, বাঙ্গালী ন্যায়শিক্ষার্থী ছাত্রের পাঠ সম্পূর্ণ হইত না। বাঙ্গালায় মিথিলায় যাতায়াত চলিত। তথাপি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যদিইবা সমকালের হইয়া থাকেন, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে পরিচিত ছিলেন কিনা জানিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিদ্যাপতিকে লইয়া তত নহে, কিন্তু চণ্ডীদাসকে লইয়া সমস্যার বুঝিবা অন্ত মিলিবে না। চণ্ডীদাসের পিতৃপরিচয় একেবারেই অজ্ঞাত। চণ্ডী-দাসের সময় লইয়া সমস্যা, জন্মস্থান লইয়া সমস্যা, রামীকে লইয়া সমস্যা রচিত পদ লইয়াও সমস্যা। আর এই সমস্যার গ্রন্থি ক্রমেই যেন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

কিছুদিন ধরিয়া বাঁকুড়া জেলার ছাতনা হইতে তাহার প্রতিবাদ উঠিতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ পুঁথিও আবিষ্কৃত হইতেছে।

চণ্ডীদাস যে তিনজন ছিলেন সে বিষয়ে বোধ হয় সংশয়ের অবকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচয়িতা অনন্ত বড়ু ই আদি চণ্ডীদাস, এবং তিনি নান্নুরে বাস করিতেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। আমি চণ্ডীদাসকে বর্ষার কবি বলিয়াছি। কৃষ্ণকীর্ত্তন পাঠ করিলেই আমার উক্তি প্রমাণিত হইবে। "ফুটিল কদম ফুল ভরে নোয়াইল ডাল", "আষাঢ় মাসেতে নব মেঘ গরজয়ে," প্রভৃতি কবিতা বর্ষার মতই ভাবে নিবিড় এবং কবিত্বে উজ্জ্বল। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বসন্তের বিশেষ কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। আশ্চর্য্যের বিষয় রায়শেখর, কবিরঞ্জন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি-গণও এই ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। অপর একটি বিষয়ে এই ঐক্য আরো আশ্চর্য্যজনক। আমি আক্ষেপানুরাগের পদের কথা বলিতেছি। বিপ্রলম্ভ বিরহেরই নামান্তর মাত্র। পূর্ব্বরাগে বিরহ, প্রেমবৈচিত্ত্যে বিরহ, মানে বিরহ প্রবাসে বিরহ। কোনটি ক্ষণিক, কোনটি দীর্ঘ অথবা দীর্ঘতম। প্রেম-বৈচিত্ত্যের বিরহই সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়। পরস্পরে মিলিত থাকিয়াও বিরহের যে অনুভূতি তাহারি নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। "দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। আক্ষেপানুরাগ এই প্রেমবৈচিত্ত্যেরই অবস্থাভেদ মাত্র। চণ্ডী-দাসের কালে আক্ষেপানুরাগ নামের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি 'উজ্জ্বল নীলমণি'র সূত্রানুসরণে 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' খণ্ডের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আমরা স্বচ্ছন্দে এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী বহু কবি বিরহ অপেক্ষা আক্ষেপানুরাগের পদেই সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

অপর পরিচয়ের অভাবে অন্য দুইজন চণ্ডীদাসকে আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস নামে অভিহিত করিব। প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে অনন্ত বড় চণ্ডীদাসের রচিত পদের সংখ্যা বোধ হয় দশ, পনরটীর বেশী হইবে না। চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বাকী কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে করি। উদাহরণ স্বরূপ—

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম", ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইস যাও', 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' প্রভৃত পদ উল্লেখ যোগ্য। দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচনা আদি চণ্ডীদাসের রচনার প্রায় পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে, হয়ত মিশিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দীন চণ্ডীদাস বৈষ্ণবোচিত

বিনয়বশতঃ 'দীন' ভনিতা ব্যবহার করিতেন। ইঁহার রচনায় সেরূপ কবিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। ইনি কৃষ্ণলীলাত্মক পদ্যময় এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরিষদ্-প্রকাশিত চণ্ডীদাসপদাবলীর প্রাচীন ও নবীন সংস্করণে উদ্ধৃত—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, মাথুর ও জন্মলীলা প্রভৃতি ইঁহারি রচিত।

বিদ্যাপতির পরিচয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা নাই। কিন্তু তাঁহার পদ লইয়াও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্যা দুই এক জন মাত্র এদেশবাসী ও ভিন্ন-প্রদেশবাসী পণ্ডিতের ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গলায় রঞ্জন নামে এক-জন কবি ছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী, জাতিতে বৈদ্য। কবিত্বখ্যাতির জন্য লোকে ইঁহাকে ছোট বিদ্যাপতি নামে অভিহিত করিত। ইনি নিজে "কবিরঞ্জন" ভণিতায় পদ রচনা করিতেন। ইঁহার প্রায় সমস্ত পদই বিদ্যা-পতির নামে চলিতেছে। অপর একজন বাঙ্গালী কবি "রায়শেখর" শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। "গগনে অবঘন মেহ দারুণ, সঘনে দামিনী ঝলকই" এবং "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পদগুলি ইঁহারি রচিত।

আমরা প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, শ্রীমহাপ্রভুর শ্যালক, মাধবাচার্য্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে 'কবিবল্লভ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'সই কি পুছসি অনুভব মোয়' এই প্রসিদ্ধ পদটী ইনিই রচনা করেন। এইরূপ আরও অনেক বাঙ্গালী কবির পদ বিদ্যাপতির নামে গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাপতি রচিত পদের সংখ্যা চারিশতের অধিক হইবে কিনা সন্দেহ। আনন্দের কথা বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও চণ্ডীদাস-পদাবলীর এক একখানি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজিও বিদ্যাপতির একটি নির্ভরযোগ্য পদসংগ্রহ প্রকাশিত হইল না।

আমি বলিয়াছি চণ্ডীদাস বর্ষার কবি, বর্ষার সুর বিরহের সুর। বিদ্যা-পতি বসন্তের কবি—বসন্তের সুর মিলনের সুর। কিন্তু চণ্ডীদাসের সুরের মধ্যে বিরহের দুঃসহ তপস্যার তন্ময়তার যে একটী পরিপূর্ণতা, গরলের সঙ্গে অমৃতের যে একটি অপূর্ব্ব অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়, বিদ্যাপতির পদে তাহার সন্ধান পাই না। চণ্ডীদাসের মিলনেও যেন তৃপ্তি নাই, আবার বিরহেও কোন ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব কিম্বা মৎসরতা নাই। চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িয়া মনে হয়, ভালবাসার দুঃখের সাগরে সে যে কূল পায় নাই,

ইহার সমস্ত অপরাধই যেন তাহার নিজের, দোষ তাঁহার অদৃষ্টের। সুতরাং বর্ষার কবি বলিয়াও চণ্ডীদাসের ঠিক পরিচয় দেওয়া গেলনা। বর্ষার নিকষ কালো নবীন মেঘ যেদিন দিগন্তরালের সীমারেখা নিশ্চিহ্ন করিয়া মর্ত্তের বুকে নামিয়া আসে, অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে আমারি ক্ষুদ্র কুটীরে আমাকে একাকী আবদ্ধ রাখিয়া বিশ্বের সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি করে. আপনাতে আপনি ফিরিয়া-আসা অন্তরের সেদিনের ছন্দের সঙ্গে যেন চণ্ডীদাসের কবিতার মিল খুঁজিয়া পাই। চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িতে বসিয়া কেবলি যেন মনে হয়—

রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি”

চণ্ডীদাসের কবিতা বাঙ্গলায় এক বিপুল পরিবর্ত্তনের সূচনা করিল। দিকে দিকে রাধাকৃষ্ণ লীলা কথার আলোচনা আরম্ভ হইল। গুণরাজ খাঁন, যশোরাজ খাঁন, চতুর্ভুজ, প্রভৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক কবিতা এবং কাব্যরচনা করিলেন। নানাবিধ পুরাণ ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদির অনুলিপি পল্লীতে পল্লীতে হরিকথা চর্চ্চার সহায় হইল। সমগ্র বঙ্গদেশ এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়া যেন যুগমানবের প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চণ্ডীদাসের যে প্রেম ভগবান্‌কে দানী সাজাইয়া পথের মাঝে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, যাচিয়া সাধিয়া হাত পাতিয়া দানগ্রহণে বাধ্য করিয়াছে. যে প্রেমে ভগবান্ মানবের মানস-যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া পার-যাত্রীকে অ-দান খেয়ায় আহ্বান করিয়াছেন, যে প্রেমে ভগবান্ ব্রজগোপীগণের দধিদুগ্ধের ভার বহিতে, ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিতে ভারবাহক সাজিয়াছেন, মানবপ্রতিনিধি আচার্য্য অদ্বৈতের সাধনায় সেই প্রেম একদিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। গোলোকের সম্পদ্ ভূলোকে আনিয়া অবতীর্ণ হইল। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ বীরভূমের একচক্রায় একাংশে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দরূপে, এবং শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত-তনু-শ্রীগৌরস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালাকে ধন্য করিলেন। বাঙ্গালার নরনারী সম্মিলিত কণ্ঠে যুক্তকরে উচ্চারণ করিল—

“বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ”

(খ) পর-চৈতন্যযুগ

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। বাঙ্গালী দেখিল-"নয়নে দরবিগলিত ধারা, অমৃতকণ্ঠে উচ্চ হরিকীর্ত্তন, হেমগৌর-তনু ধূলি-ধূসরিত, বিশ্বের নর-নারীর জন্য আলিঙ্গনোদ্যত প্রসারিত বাহু। সে এক অপূর্ব্ব রূপ"! সেই রূপ দেখিয়া বাঙ্গালী ভুলিল। সেই ভুবনমোহন রূপ হৃদয়পটে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া লইল। একজন আর একজনকে ডাকিয়া দেখাইল—

"নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥
পেখঁলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ কমল তলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

সেই রূপমাধুর্য্যের ভাবকান্তি এত প্রখর এবং এত ব্যাপক, যে তাহার ছটায় সমস্ত বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, এমন কি সুদূর মণিপুর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। সেকালে না ছিল দৈনিক সংবাদপত্র, না ছিল মাসিক পত্রিকা, না ছিল মুদ্রন যন্ত্র, বাষ্পীয় শকট, বেতার যন্ত্র! তথাপি তাঁহার করুণার কথা তড়িদ্‌বার্ত্তার মত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দিক্ হইতে দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। বলরাম দাস বলিতেছেন—

"প্রেম বন্যা নিতাই হইতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়ায় কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে এবং অন্যান্য মহাজনগণ রচিত গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গের এই অলৌকিক লীলা এবং রূপের আভাস পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী সেই রূপ দেখিল। যে রাধাপ্রেমের অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদনের জন্য মহাপ্রভুর অবতারগ্রহণ, সেই প্রেমের মহিমা বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ করিল। ব্রজপ্রেমের যে অলৌকিক লীলা আত্মারামগণকেও মুগ্ধকরে, সেই অপ্রাকৃত প্রেমের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বাঙ্গালী-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অপ্রাপ্তির আকুলতায় অধীর বিরহে জর্জ্জর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই দিব্যোন্মাদ আসমুদ্র হিমাচল প্রমত্ত করিয়া তুলিল। কাননে বসন্তসমাগমে যেমন তরুলতা মঞ্জরিত হয়, অগণিত বিহগকলকণ্ঠে তাহার বন্দনাগীতি উদ্গীত হয়, শ্রীচৈতন্যের পদস্পর্শে বাঙ্গালীর জীবনেও তেমনই বসন্ত দেখা দিল। অগণিত পুণ্যস্মৃতি ভগবদ্-প্রেমিক বৈতালিক সেইরূপসাগরের জলতরঙ্গের তালে তালে গাহিয়া উঠিল।

শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণের রচনার মধ্যে এমন দুই একটি পদ পাওয়া যায়, পদের মধ্যে এমন দুই একটি পংক্তি পাওয়া যায়, যাহা জগতের যে কোন কবির উৎকৃষ্ট রচনার সহিত তুলিত হইতে পারে। বাঙ্গালাসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি আমরা এ পর্য্যন্ত প্রায় তিনশতাধিক বৈষ্ণব-কবির নাম জানিতে পারিয়াছি। ইঁহাদের পদের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্রের কম হইবে না। কয়েকজন উৎসাহী সাহিত্যসেবীর চেষ্টায় ইদানীং আমরা আরো কতকগুলি নূতন কবির নাম এবং পদের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাঁদের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধানে ত্রিপুরা হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত নানা স্থানে পর্য্যটন-পূর্ব্বক যিনি বহু ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে আমি সেই পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের নাম করিতেছি। স্বর্গগত আচার্য্য সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পর পদাবলী-সাহিত্যের

কথায় ইহাঁরই নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহম্মদ সহিদ্‌উল্লাহ এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের অধ্যবসায় এবং উদ্যমে, ইহাঁদের আবিষ্কৃত পুঁথি এবং রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে যেমন বাঙ্গালা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, তেমনই বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-সাধনার অতীত ইতিহাসের এক অপঠিত অধ্যায় জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। এজন্য ইহাঁরা সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র। বাঙ্গালী ইহাঁদের নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী হইয়া রহিল। দুঃখের বিষয় উপযুক্ত উৎসাহ ও সাহায্যের অভাবে ইহাঁদের কার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। আমি এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পদাবলী-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার সময় এবং সাধ্যেও তাহা কুলাইবে না। আমি সংক্ষেপে দুই একজন পদকর্ত্তার কথা উল্লেখ করিতেছি। পদাবলীর আলোচনা করিতে গিয়া আমার মনে হইয়াছে, প্রাচীন-সাহিত্যের পক্ষ হইতেও যেমন, পদাবলী-সাহিত্যের দিক্ দিয়াও তেমনই, রায়শেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং বলরামদাসের নাম সাহিত্যসেবীমাত্রেরই স্মরণীয়। ইহাঁদের কবিত্ব বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, শিক্ষিতসমাজ, অথবা সাধারণ পাঠক কিম্বা সুদূর পল্লীর নিরক্ষর শ্রোতৃবৃন্দ—নর-নারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রায়শেখরের কয়েকটী উৎকৃষ্ট পদ বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে। কেবলমাত্র ভণিতার পরিবর্ত্তনেই সে পদ বিদ্যাপতির নামে পরিচিত হয় নাই, বরং পরিবর্ত্তিত ভণিতাই আমাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছে এ পদ মিথিলার নবকবিশেখরের রচিত নহে, ইহা বাঙ্গালার রায়শেখর বা কবিশেখরেরই রচনা। পদের গঠনপারিপাট্য, রসমাধুর্য্য, ভাবগাম্ভীর্য্য এবং ছন্দঝঙ্কার অনবদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্যাপতির নামে গৃহীত বর্ষাভিসারে পদটিই আবৃত্তি করিতেছি।

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।

কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥
সজনি, আজি দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসারি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈসনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জীবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥

ইঁহার "দণ্ডাত্মিকা-পদাবলী" বৈষ্ণবসমাজে সাধনের অবলম্বনরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। অষ্টকালীয়-নিত্যলীলা স্মরণে বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত পদই গান করিয়া থাকেন। ইঁহার বাৎসল্য-রসের পদগুলিও অতি সুন্দর। রায়শেখর শ্রীখণ্ডের শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য এবং শাখাভুক্ত ছিলেন। গোপালবিজয় নামক কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যখানি ইঁহারই রচিত বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞানদাস প্রাচীন বীরভূমির অন্তর্গত কাঁন্দরার অধিবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীজাহ্নবাদেবীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। খেতরীর বৈষ্ণব-সম্মেলনে কবির উপস্থিতি তাঁহার কালনির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের পটভূমিতে ইঁহার প্রাণরসে অঙ্কিত শ্রীরাধার চিত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইনি চণ্ডীদাসের অনুগামী; ব্রজবুলী অপেক্ষা বাঙ্গালা রচনাতেই ইঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ইঁহার রচনা

পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, প্রশ্নদূতিকা প্রভৃতি নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত। পদের ভাষা দেখিয়া কিছু কম প্রায় চারিশত বৎসরের এই কবিকে আধুনিক কবি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। একটী উদাহরণ দিতেছি ঃ—

আলা মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে॥
রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে অন্তর কাঁদে কিবা করে প্রাণ
চন্দনের চান্দ মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা।
কটী পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল খাটে কলঙ্কর কোঁড়া।
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী হইয়া দু'কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ়া করি থাক বুক॥

গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডের চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর সুপণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ। ইঁহারা কিছুদিন কুমারনগরে বাস করিয়া পরে বুধরি গ্রামে গিয়া বাস করেন। দুই ভ্রাতাই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী পদাবলী প্রণেতৃগণের মধ্যমণি, একাধারে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিত্বপ্রতিভার উত্তরাধিকারী গোবিন্দকবিরাজের নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। যশোরাজ খান, রায় রামানন্দ প্রভৃতি যে ব্রজবুলিতে পদরচনার সূত্রপাত করেন, রায়শেখর এবং জ্ঞানদাসের হস্তে যাহার বিকাশ, সেই ব্রজবুলি গোবিন্দদাসের রচনায় একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ভাষার ছটায়, অলঙ্কারের ঘটায়, রসের ব্যঞ্জনায়, ভাবের দ্যোতনায় এবং ছন্দের ভঙ্গিমায় আমরা ইহাঁকে মহাকবির কৃতিত্বগৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে করি। ইহাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং রসজ্ঞ সাধক

আকুমার সন্ন্যাসী শ্রীপাদ শ্রীজীব শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসিয়াও গোবিন্দ কবিরাজের কবিতাপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। পূর্ব্বরাগে, অভিসারে, মিলনে, আক্ষেপানুরাগে, রসোদগারে, স্বয়ংদৌত্যে, মাথুর বিরহে, কোন্‌টী রাখিয়া কোন পর্য্যায়ের কথা বলিব? তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটী কবিতাই অতি সুন্দর। একটী মাত্র পদ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়া বলিতেছেন :—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

বলরামদাসও বুধরির অধিবাসী। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, ইঁহার কবিপতি উপাধি ছিল। পদকল্পতরুপ্রণেতা বৈষ্ণবদাস, গোবিন্দ দাসের পৌত্র ঘনশ্যামের সঙ্গে ইঁহারই বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন -

কবি নৃপ বংশজ ভুবন বিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।

ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন। ব্রজবুলি এবং বাঙ্গলায় ইহার উভয়বিধ রচনাই কবিত্বসম্পদে সমুজ্জ্বল। ইঁহার আক্ষেপানুরাগের পদ চণ্ডীদাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা ইঁহার একটী গোষ্ঠের পদ উদ্ধৃত করিলাম।

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দেগো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে॥
পীতধড়া পরাও মাগো গলায় দাও মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পিয়ল বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি পুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে॥
বলরামদাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি॥

প্রসঙ্গতঃ এইখানে একটি কথা নিবেদন করিয়া রাখিতে চাই। সংক্ষিপ্ত ভাবেই হউক আর সম্পূর্ণ রূপেই হউক, পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রণীত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', "শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি" এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রণীত 'শ্রীগোপালচম্পূ' ও সন্দর্ভগ্রন্থাদির নাম উল্লেখ করিতে হয়। পদাবলীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে এই সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য আমরা অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলার পদকর্ত্তৃগণ এবং রসকল্পবল্লীপ্রণেতা রামগোপাল দাস, রসমঞ্জরীপ্রণেতা তৎপুত্র পীতাম্বর দাস প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ প্রায় প্রত্যেকেই উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঋষিগণ যেমন মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন, বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিগণও তেমনই পদাবলীর দ্রষ্টা ছিলেন। পদাবলী তাঁহাদের হৃদয়েরই বহিঃপ্রকাশ বলিয়া তাহা আমাদের হৃদয়কে আজিও সহজেই অধিকার করিয়া লয়। তাঁহারা যে রূপের সাধক ছিলেন, পদাবলী সেই রূপেরই ভাষাময় প্রকাশ, সেই

শাশ্বত রূপের সনাতন ভাষা। এইজন্যই এই যুগকে আমরা রূপ-সাধনার যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই যুগের ধর্ম্ম রূপধর্ম্ম। এই যুগের—ধর্ম্ম-গ্রন্থ—বৈষ্ণবপদাবলী, এই যুগের সঙ্গীত, এই যুগের সাধনমন্ত্র কীর্ত্তন। ইহার বিনিয়োগ আচণ্ডালে প্রেমদানে, মানবতার উৎকর্ষসাধনে; এ যুগের দেবতা, এই মন্ত্রের মূর্ত্ত বিগ্রহ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং।

(৩)

রূপধর্ম্ম

রসস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রধান প্রকাশ রূপে। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রূপের তুলনা নাই। তিনি অনন্ত রূপের আকর, তাইতো তাঁহার বিশ্ব জুড়িয়া রূপের মেলা, আর রঙের খেলার অন্ত খুঁজিয়া পাইনা। যে দিকে চাই রূপে রঙে মাখামাখি দেখিয়া মনে হয়, বিশ্ব যেন তাঁহারি রূপের কণামাত্র লইয়া নিজেকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, এবং এই রূপের মধ্য দিয়াই বিশ্ব-বাসীকে বিশ্বেশ্বরের রূপের সন্ধান দিয়েছে। তাইতো কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

> বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
> শ্রেণীঃ শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
> স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
> শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

সখি বিশ্বকে ভাবানুরূপ অনুরঞ্জনে আনন্দদান করিতে করিতে নীলোৎপলদল শ্যামল কোমল অঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছরূপে আলিঙ্গিত হইয়া আনন্দোৎসব বর্দ্ধন করিতে করিতে মুগ্ধ হরি এই বসন্তে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রসের ন্যায় বিলাস করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ যেমন রসময়, তেমনই রূপময়! তিনি যেমন মধুর তেমনই সুন্দর। কিন্তু সৃষ্টি তাঁহার সৌন্দর্য্যেই প্রথম আকৃষ্ট হয়। তাইতো সৃষ্টির প্রধান উপাস্য—রূপ। তিনি যেমন অনন্ত রূপের আকর তেমনই আবার অনন্ত গুণেরও রত্নখনি। তাঁহার রূপ গুণের তুলনা নাই, তাঁহার রূপে ত্রিলোক আলোকিত, গুণে চরাচর বশীভূত। তাঁহার রূপে যেমন মাধুর্য্যের প্রকাশ, গুণে তেমনই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। বৈষ্ণব ভক্ত এই মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট হন।

বৈষ্ণব মহাজনেরা মনে করেন যে মানুষ কেবল মানুষের ভাব দিয়াই শ্রীভগবানের রূপ উপলব্ধি করিতে পারে। শ্রীভগবানের রূপ বলিতে তাঁহারা বুঝেন তাঁহার দেহ সুন্দর, গঠন সুন্দর, তাঁহার ভঙ্গী সুন্দর, গতি সুন্দর, তাঁহার মন সুন্দর, তাঁহার কার্য্য সুন্দর, এক কথায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সাধক কবি বিল্বমঙ্গল বলিতেছেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥"

আমরা এই সৌন্দর্য্যেরি উপাসনা করি। শ্রীভগবান্ সৃজন পালন এবং বিনাশকর্ত্তা। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, এবং পাপের দণ্ডবিধাতা; তিনি বিরাট। কিন্তু এই কথাইতো শেষ কথা নহে। তিনি যে চিরসুন্দর, চির-মধুর, চিরকরুণাময়, চিরনবীন! তিনি যে "নব রে নব, নিতুই নব"। তাইতো আমরা মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার প্রেমে চিরবিক্রীত গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর রূপই ভালবাসি। ঐ যে ব্রজরাখালের বন্ধু, জননী যশোদার স্নেহের দুলাল, ঐ যে ব্রজহরিণী-নয়নাগণের প্রিয় দয়িত, ঐ যে বামে বৃষভানুরাজনন্দিনী সহ চিরকোমল চিরনবীনরূপ, ঐ রূপেই আমাদের নয়ন ভরিয়া উঠে। হৃদয় আপনহারা হয়। আমরা এই রূপেরই আরাধনা করি। তাহাতেই আকৃষ্ট হই, এবং ডুবিয়া যাই। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলি;—

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন॥
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।"

বৈষ্ণব মহাজনগণ এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপকেই সুরে, ছন্দে, ভাষায়, ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার উত্তরাধিকারিত্ব আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। পদ-সাহিত্যের পটভূমিতে বৈষ্ণব কবির অমৃতময়ী তুলিকা এই রূপকে চিরকালের জন্য চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

পদাবলীর দ্বাদশ তত্ত্ব।

বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে মহাজনগণ এবং প্রাচীন আচার্য্যগণের অনুসরণে আমরা পদাবলীর মধ্যে যে দ্বাদশ তত্ত্বের সন্ধান পাইতেছি, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম—

প্রথম তত্ত্ব, যুগলরূপ :—

যুগল রূপই শ্রীভগবানের স্বরূপ। রসস্বরূপ শ্রীনন্দনন্দন এবং মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী তত্ত্বতঃ এক এবং অভিন্ন। যথা;— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥"

এই যুগলরূপই মানবের চরম এবং পরম উপাস্য।

দ্বিতীয় তত্ত্ব, প্রকাশ এবং বিলাস :—

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা যেমন অভিন্ন, তিনি এবং তাঁহার সৃষ্টি তেমনি অভিন্ন। সৃষ্টির চরম এবং পরম উৎকর্ষই শ্রীরাধারূপে স্বপ্রকাশ। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই এই সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার রসময়ত্ব এবং করুণাময়ত্বই এই ইচ্ছার হেতু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

এই ইচ্ছা মূলতঃ রসাস্বাদনের ইচ্ছা। বহু না হইলে একাকী সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে। তাই একদিকে যেমন শ্রীরাধাকে পৃথক্ করিয়া, গোপীযূথকে পৃথক করিয়া তিনি বহু হইয়াছেন; শ্রীরাসমণ্ডলে তেমনই আপনাকেও বহুরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। অন্যদিকে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বসৃষ্টিও তাঁহার বহুত্বের দ্যোতনা মাত্র। তিনি যেমন সৃষ্টিরূপে বহু হইয়াছেন, তেমনি বিশ্বের ভোক্তারূপে সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণুতে বিলসিত হইতেছেন।

তৃতীয় তত্ত্ব, রসাস্বাদন :—

রসাস্বাদনের জন্যই, শ্রীভগবানের লীলাবৈচিত্র্যের জন্যই এই পার্থক্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন ;—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ; –

"রেমে রমেশ ব্রজসুন্দরীভিঃ
যথার্ভক স্বপ্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ" ॥

চতুর্থ তত্ত্ব, পরস্পর ভজনা—

শ্রীভগবানের শ্রীরাধার জন্য, আপন সৃষ্টির জন্য যে আকর্ষণ, শ্রীরাধার শ্রীভগবানের জন্য সৃষ্টির স্রষ্টার জন্য তেমনি আকর্ষণ। শ্রীরাধার প্রতি যে আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

"সজনি তোহে হাম কি কহব আর
মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন
ঐছন অবহু হামার" ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সেই আকর্ষণ দেখিয়াই সখী বলিয়াছিলেন—

'ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর" ॥

পরস্পরের এই অনুরাগ দেখিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

পঞ্চমতত্ত্ব, শ্রীভগবান্ এবং মানুষ—

মানুষ শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি—মানুষ শ্রীভগবানেরি পরা প্রকৃতি। মানুষ শ্রীভগবানের অংশ। যথা ;—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে –

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে"॥

মানবের প্রতি কৃপাপ্রকাশের জন্যই করুণাময় গোবিন্দের নরলীলা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহারি স্বরূপ"।

ষষ্ঠতত্ত্ব, মানবের সাধ্যবস্তু

শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন প্রেম। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। এই প্রেমেই মানুষ বিশ্বসৃষ্টির রহস্য বুঝিতে পারে। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আকর্ষণের, এবং সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার আকর্ষণের মর্ম্ম উপলব্ধি করে।

সপ্তমতত্ত্ব, মানবের সাধন

মানবের সাধন গোপীভাব। গোপীভাব ভিন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপালাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। বিশ্বরহস্য বুঝিবার অপর কোন উপায় নাই। আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্যই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভালবাসার নামই গোপী ভাব। যথা;—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥

রাগানুগা মার্গে ভজনাই গোপীভাবের সাধনা। যথা;—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"॥

অন্যত্র;—

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন
সখিভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ"॥

অষ্টমতত্ত্ব, পূর্ব্বরাগ

প্রেমোদয়েরই অপর নাম পূর্ব্বরাগ। পূর্ব্বরাগের কালাকাল নাই, স্থানাস্থান নাই। পূর্ব্বরাগ বিচারের কোন অপেক্ষা রাখে না, পরিণাম চিন্তা করে না। এই পূর্ব্বরাগ মানবকে দুঃসাধ্য সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রীভগবানের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, মানবকে সর্ব্বস্বত্যাগে বাধ্য করে। পূর্ব্বরাগে মানুষ ঘরের বাহির হইয়া, সীমা হইতে অসীমের পথে আসিয়া দাঁড়ায়।

নবমতত্ত্ব, অভিসার

পূর্ব্বরাগের আবেগে দুর্লভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ দুর্গমের পথে অভিসার করে। পথে কত বাধা, কত বিঘ্ন, পথিকের কিন্তু বিশ্রামের অবসর নাই। যতক্ষণ না অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তাহাকে পথ চলিতে হইবে। কত তপস্যায়, কোন্ সাধনায়, এই অভিসারে সিদ্ধিলাভ ঘটে কবি গোবিন্দ দাস তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন —

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরী বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
হরি অভিসারক লাগি॥
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কন পণ ফণী মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
আন শুনই কহ আন
গুরুজন বচন বধির সম মানই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

দশমতত্ত্ব, বাসকসজ্জা

মানবের একমাত্র গন্তব্য স্থান শ্রীবৃন্দাবন। অভিসারের পারসমাপ্তি

শ্রীবৃন্দাবনে। গোপীভাবের সাধনায় হৃদয় বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হয়। মানুষ তখন আপন ভাবানুরূপ কুঞ্জ সাজাইয়া প্রিয় সমাগমের প্রতীক্ষা করে। অতঃপর এক শুভক্ষণে মানবের মানসনেত্রের সম্মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণ আসিয়া আবির্ভূত হন।

একাদশ তত্ত্ব, মিলন

এই বাস্তব জগতেই মানুষের সঙ্গে শ্রীভগবানের মিলন ঘটে। সাধক তাহার হৃদয়-বৃন্দাবনে, প্রাণের কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন;—রসহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবন্তি।"

দ্বাদশ তত্ত্ব, শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য শ্রীগৌরাঙ্গচরণে শরণ লইতে হইবে। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তির ফলে স্বতঃ-সিদ্ধরূপেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটিবে। বাঙ্গালী একদিন এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। আসুন সেই সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া যুক্তকরে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করি —

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্"

পদাবলীর রস-বিভাগ

বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ রসকে পঞ্চ মুখ্য ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। পদাবলীর মধ্যে শান্ত এবং দাস্য রসের পদের সংখ্যা নিতান্তই কম। সখ্য এবং বাৎসল্য রসের পদের সংখ্যা ও অধিক নাই। মধুর বা উজ্জ্বল রসের পদের সংখ্যাই প্রচুর। শ্রীভগবানের প্রেম-বিষয়ক বলিয়াই অপ্রাকৃত আদিরসকেই তাঁহারা মধুর বা উজ্জ্বলরস নামে অভিহিত করিয়াছেন। মধুর রস দুই ভাগে বিভক্ত। একটীর নাম বিপ্রলম্ভ, অপরটীর নাম সম্ভোগ। চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের নাম পূর্ব্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, মান এবং প্রবাস। পূর্ব্বরাগ দুইরূপ; যথা দর্শন ও শ্রবণ। দর্শন তিন প্রকার—চিত্রপট, স্বপ্ন ও সাক্ষাদ্দর্শন। শ্রবণ পাঁচ প্রকার—ভাটমুখে, দূতীমুখে, সখীমুখে ও গুণীজনের গানে শ্রবণ এবং বংশীধ্বনি শ্রবণ। প্রেমবৈচিত্ত্যেরই অপর নাম আক্ষেপানুরাগ। ইহা আট প্রকার—

যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, নিজ প্রতি, সখী প্রতি, দূতী প্রতি, মুরলী প্রতি, বিধি প্রতি, কন্দর্প প্রতি, ও গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ। মান দুইরূপ—সহেতু ও নির্হেতু। প্রিয় দয়িতের অন্যানুরাগশ্রবণ বা দর্শনে মানই সহেতু। যেমন সখীমুখে ও শুকমুখে শ্রবণ, বিপক্ষাগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন-দর্শন, এবং অন্যা নায়িকার সঙ্গে একত্র দর্শন। নির্হেতু মান তিন প্রকার—স্বপ্নে পূর্ব্বোক্তরূপ দর্শন বা শ্রবণ, প্রিয় দয়িতের বক্ষকৌস্তুভে, অঙ্গলাবণ্যে, করপদনখরে কিম্বা প্রিয়সঙ্গে মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্বদর্শনে অন্যানায়িকাভ্রম; এবং গোত্রস্খলন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধাকে আহ্বান করিতে গিয়া বিপক্ষানায়িকার নাম কথন, কিম্বা কথাপ্রসঙ্গে অথবা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণমুখ হইতে ঐরূপ নামের উচ্চারণ। বংশীতে শ্রীরাধার নাম লইতে গিয়া ঐরূপ অন্যার নাম লওয়াও গোত্রস্খলনের অন্তর্ভুক্ত। প্রবাস দুইরূপ—নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস। কালীয়দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ, কার্য্যানুরোধ ও রাসে অন্তর্দ্ধান, নিকট প্রবাস নামে অভিহিত। নিকট প্রবাস পূর্ব্বে অনিশ্চিত থাকে, হঠাৎ সংঘটিত হয়। একমাত্র গোচারণই নিত্য নিকট প্রবাস, যাহা পূর্ব্ব হইতে নিশ্চিত রহিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহারও নিশ্চয়তা থাকে, যে প্রতি সন্ধ্যায় প্রিয় রাখালগণ সঙ্গে ধেনুগণ লইয়া গোক্ষুররেণু-ধূসরতনু বনমালী ব্রজে প্রত্যাগমন করিবেন। দূরপ্রবাসে এইরূপ কোন স্থিরতা নাই, এবং যাত্রার পূর্ব্বে সকলকে জানাইয়া আয়োজনের ঘটা পড়িয়া যায়, যেমন অক্রূরাগমন। এই জন্য এই ভাবি বিরহ, অর্থাৎ দূরপ্রবাসযাত্রার সম্ভাবনাও দূরপ্রবাসের মতই দুঃখদায়ক হয়। তাই দূরপ্রবাস তিন প্রকার—ভাবিবিরহ, মথুরাগমন ও দ্বারকাগমন। দূর প্রবাসের বিরহের তিনটী অবস্থা দেখিতে পাই। ভাবিবিরহ, ভবন্ অর্থাৎ বর্ত্তমান বিরহ এবং ভূত বিরহ, অর্থাৎ প্রিয়দয়িতের প্রবাসে স্থিতিকালের বিরহ।

বিপ্রলম্ভের যেমন এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ভেদ রহিয়াছে সম্ভোগেরও চারি প্রধান রূপ, এবং প্রতি রূপের অষ্টপ্রকার বিভাগ ধরিয়া ঐরূপই বত্রিশটী অবস্থান্তর আছে। লীলাকীর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত বিপ্রলম্ভের সব কয়টী রসেরই গান রহিয়াছে। কিন্তু যাহাকে চৌষট্টিরসের লীলাকীর্ত্তন বলে তাহার রসবিভাগ অন্যরূপ। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর মধ্যে এই বিভাগের বর্ণনা আছে। তিনি নায়িকার অবস্থাভেদ লইয়া আটটী মূলরসের কল্পনা করিয়াছেন। যথা অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কল-

হান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা। ইহার প্রত্যেকটীর আটআটটী ভাগে চৌষট্টি রসের কীর্ত্তন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে চৌষট্টিরসের নাম উল্লেখে বিরত রহিলাম। রাসাদি নিত্যলীলা নামে পরিচিত। গোষ্ঠাদি অষ্টকালীয় লীলার অন্তর্ভুক্ত। ঝুলন, হোরি, ফুলদোলাদি নৈমিত্তিক লীলা নামে অভিহিত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে পূর্ব্বরাগাদি এই চৌষট্টি রসের লীলাকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত নহে।

কীর্ত্তন

নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং

কীর্ত্তন বলিতে লীলাকীর্ত্তন এবং নামকীর্ত্তন বুঝায়। লীলাকীর্ত্তনে গড়েরহাটী প্রভৃতি চারি ঘরের গানের প্রকার ভেদ, প্রতি ঘরে আবার কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট, কীর্ত্তনাঙ্গে এই উপাঙ্গভেদ আছে। এই সমস্ত বিষয় আমি বিগত প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের পাটনা-অধিবেশনে যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুনরুক্তিভয়ে এখানে সে সমস্ত কথার আলোচনায় বিরত রহিলাম। আমি আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের মুখে নানাদেশের আচার ব্যবহার এবং নানা ধর্ম্মের প্রচার পদ্ধতির কথা শুনিয়াছি তাঁহার সঙ্গে এবং পরে আমার স্বামীর সঙ্গে আমি নানাদেশ বিদেশে ঘুরিয়াছি, যথাসাধ্য অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লইয়া দেশকে এবং দেশবাসীকে দেখিয়াছি। কিন্তু কীর্ত্তনের মত অধ্যাত্মসাধনার এবং জাতি গঠনের উপায়স্বরূপ এমন সুন্দর এবং মনোহারী প্রচারপদ্ধতি আমি দেখি নাই বা শুনি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কীর্ত্তনের মত মানব-সম্মেলনের এমন নির্দ্দোষ, এমন উদার, এমন পবিত্র ভূমি, এমন ফলপ্রদ নির্ভুল পদ্ধতি আর কোন জাতি কল্পনা করিতে পারিয়াছে কিনা জানি না।

নামকীর্ত্তনে কাঞ্চনকৌলীন্য নাই, জাতিভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্খের বিচার নাই; বালক, প্রৌঢ় যুবক, বৃদ্ধ সকলেই সমান অধিকারে আসিয়া তাহাতে

যোগ দিতে পারে। বহু পল্লীবৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, সেকালে বৈশাখ মাসের প্রতি সন্ধ্যায়, অথবা সংকল্পিত অহোরাত্র, চব্বিশপ্রহর, বা নব-রাত্রের প্রতি দিনান্তে বা ধুলোটের দিনে 'নগর কীর্ত্তন' গ্রাম বা নগর প্রদক্ষিণ করিত। তখন শুদ্ধান্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূও গবাক্ষপথে, অলিন্দ হইতে, অথবা বহির্দ্বারে আসিয়া সেই কীর্ত্তনমণ্ডলীর উদ্দেশে প্রণতি জানাইত। লীলা-কীর্ত্তনেও নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া শ্রোতৃরূপে যোগ দিতে পারে। আজিকার দিনে নামকীর্ত্তনের বহুল প্রচলনের প্রয়োজন আমরা অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। এবং লীলাকীর্ত্তনের প্রাচীন ধারার সংরক্ষণ ও প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি। দেশের প্রত্যেক সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান এবং দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। দীর্ঘসূত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর আজ কয়েক বৎসর ধরিয়াই বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার গণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক ভগ্নাংশ উচ্চশ্রেণীর নামমাত্র পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। 'উজ্জ্বল নীলমণি' অথবা 'ষট্ সন্দর্ভ' তাঁহা-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, বৈষ্ণব চরিতগ্রন্থ, দর্শন, অলঙ্কার এবং পদাবলী মিলিতরূপে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে গৃহীত হয় না।

এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা ভিন্ন নামকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে না। এই আত্মাবমাননা, এই চিত্তদৈন্য কোন জাতির পক্ষেই মঙ্গলকর হয় নাই। বাঙ্গালীর সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

উপসংহার

আমাদের মত এমন ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতি বোধ হয় আর নাই। আর কোন জাতির এমন দণ্ডে দণ্ডে আত্মবিস্মৃতি ঘটে বলিয়াও শুনি নাই। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া যিনি বাঙ্গলার এক মহাজাতি গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের অকাল অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত

পরেই সেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দও অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আচার্য্য অদ্বৈতেরও তিরোধান ঘটিল। অতঃপর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দের অসমাপ্ত কার্য্য-সংসাধনে ব্রতী হইলেন। কিন্তু পরাধীনতার মধ্যে সে কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হইল না। এমন কি, তাঁহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত নায়কের অভাবে বাঙ্গলায় জাতিগঠনকার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। কোন্ পাপে আমরা সেই পতিতপাবনের করুণা হইতে বঞ্চিত হইলাম—কোন্ অভিমানে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন—কেহ সেকথা ভাবিবারও চেষ্টা করিল না। অবশেষে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে পলাশীর প্রাঙ্গণে আমাদের শোচনীয় নৈতিক পরাজয় ঘটিল। তাহাতেই জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। অশনে, বসনে, আচারে, ব্যবহারে, শিক্ষায়, দীক্ষায় অতি হীন পরানুচিকীর্ষার মোহ আমাদিগকে চিরতরে পাইয়া বসিল। এই কবন্ধ এখনো বাঙ্গলার স্কন্ধদেশ পরিত্যাগ করে নাই। তাই আমরা আজিও পশ্চিমের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছি। কিসের আশায়, কোন্ ভরসায়, কাহার মুখ চাহিয়া আমরা এই আত্মহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, কেন আমরা বারবার কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচের মায়ায় মজিতেছি, কে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কে এই দুর্দ্দিনে আমাদের আত্মসম্বিত ফিরাইয়া আনিবে? আজিকার এই অন্ধকারে একান্ত একাকিনী—অসহায়ার মত বসিয়া বসিয়া আমার আর এক রাত্রির কথা মনে পড়িতেছে।

দীর্ঘ সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের সে রাত্রি, সেদিন কি রজনী অন্ধকারময়ী ছিল না? দিগ্‌ভ্রান্তিকারী নিরন্ধ্র আঁধারে নদীয়ার পথ আচ্ছন্ন হয় নাই? তটপ্লাবী বন্যার বিপুল উচ্ছ্বাসে সুরধুনী কি এপার হইতে ওপারের ব্যবধান অপার করিয়া তুলিতে পারেন নাই? মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় বিষ্ণুপ্রিয়া তন্দ্রাভরে ঢুলিয়া পড়িয়াছেন মুহূর্ত্ত মাত্র! সারানিশি জাগিয়া জাগিয়া এই দণ্ডার্দ্ধমাত্র তাঁহার তন্দ্রা আসিয়াছে, কে জানে যে এমন কালদণ্ড তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। নিমাই পণ্ডিত সেই সুযোগ আর ত্যাগ করিলেন না। তিনি চিরতরে ঘরের বাহির হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাহুপাশালিঙ্গিত চরণপদ্ম স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। শূন্যবক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া জাগিয়া উঠিলেন। প্রকোষ্ঠান্তরে স্থবিরা জননী, আশঙ্কাকম্পিতচিত্তে দুরু দুরু অন্তরে প্রহর গণিতে ছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়া কহিলেন 'মাগো, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, প্রভু আমাদিগকে ত্যাগ

করিয়াছেন।' সে রোদনধ্বনি নদীয়াবাসীর প্রতি গৃহকক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল। উদ্বেগাকুল নরনারী মিশ্রভবনে আসিয়া সমবেত হইলেন। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, জগদানন্দ - তনয়ের নিত্যসঙ্গিগণকে দেখিয়া জননীর শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল মায়ের সে বুকভাঙ্গা আকুলতা কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিল।

"হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও
বাহু পসারিয়া গোরা চান্দেরে ফিরাও॥"

দিন, পক্ষ, মাস, বৎসর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই আর্ত্তস্বর আজিও বাঙ্গালীকে আহ্বান করিতেছে—ফিরাইয়া আন, বাঙ্গালী! ফিরাইয়া আন, তোমার সেই ভাববিগ্রহকে। আর একবার বাঙ্গলায় ফিরাইয়া আনিয়া আপনার প্রাণের বেদীতে সেই বিগ্রহকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। তোমার সাহিত্য-সাধনা, রসের উপাসনা সার্থক হউক। ঐ শোন! বাঙ্গলার গগনে, পবনে, আজিও মায়ের কণ্ঠ কাঁদিয়া ফিরিতেছে—

"হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও
বাহু পসারিয়া গোরা চান্দেরে ফিরাও"॥

শ্রীঅপর্ণা দেবী।

কাব্য-শাখা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যাহা কিছু গৌরবের তাহার সূত্রপাত মাইকেল-বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া—সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথে। মাঝখানে ভাববিভোর বিহারীলাল। রবীন্দ্রনাথের পরেই অতি-আধুনিক যুগের আরম্ভ। কবি, কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে গণেশ-বন্দনার মত মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কবি ও কাব্যবিষয়ক অনুভূতির উল্লেখ দোষাবহ হইবে না।

মাইকেল বলিতেছেন -

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন.
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন —

"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? অনেকে উত্তর দিবেন, নীতিশিক্ষা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে, 'হিতোপদেশ' 'রঘুবংশ' হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতির বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব ?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন--চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা ; কিন্তু নীতি নির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা

শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

বিহারীলাল কাব্যসৃষ্টির মুহূর্ত্তে কবির 'দশা' বর্ণন করিয়াছেন—

"বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা —
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে !
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপুর করে প্রাণ—
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে !"

রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে কবির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—

"শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,'
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।
অতি দুর্গম সৃষ্টি-শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে,
স্বর-তরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,—
সেথা হ'তে টানি' ল'ব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।

*　　*　　*

ধরণীর তলে, গগনের গায়,

সাগরের জলে অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।

সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি' দিব দূর
তা'র পরে ছুটি নব।"

আজ হইতে ঠিক একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের এই মাঘ মাসে সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর তরুণদের হাতে বাঁশিখানি তুলিয়া দিয়া বিদায় লইতে চাহিয়াছিলেন। নিজের মস্তিষ্কে নিত্যনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা তখনও টলমল করিতেছিল বলিয়া তাঁহার মনে ভবিষ্যৎ তরুণদের সম্বন্ধে অনেক আশা ছিল—তাঁহার আশীর্ব্বাদও সেদিন হইয়াছিল স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

"আজ আমি বাংলাদেশের দুই বিভিন্ন কালের উদয়াস্ত-সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কবির বাণী স্মরণ করিতেছি।

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্।
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ॥

এখন আমাদের কালের শীতরশ্মি চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে, তোমাদের কালের তেজোদ্ভাসিত সূর্য্যোদয় আসন্ন—তোমরা তাহারই অরুণ-সারথি। আমরা ছিলাম দেশের সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে; অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত ক্ষীণ জ্যোতিতে আমরা দীর্ঘরাত্রি অপরিস্ফুট ছায়ালোকের মায়াবিস্তার করিতেছিলাম। আমাদের সেই কর্ম্মহীন কালে কত অলীক বিভ্রম এবং অকারণ আতঙ্ক দিগন্তব্যাপী অস্পষ্টতার মধ্যে প্রেমের মত সঞ্চরণ করিতেছিল। আজ তোমরা পূর্ব্বগগনে নিজের আলোকে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছ। এখনো জলস্থল-আকাশ নিস্তব্ধ হইয়া নবজীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে; অনতিকাল পরেই গৃহে গৃহে পথে পথে কর্ম্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই কর্ম্মদিনের প্রখর দীপ্তি দেশের সমস্ত রহস্য ভেদ করিবে—ছোট বড় সমস্তই তোমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন তোমাদের কবিবিহঙ্গগণ আকাশে যে গান গাহিবে তাহাতে

অবসাদের আবেশ ও সুপ্তির জড়িমা থাকিবে না—তাহা প্রত্যক্ষ আলোকের আনন্দে, তাহা করতললব্ধ সত্যের উৎসাহে সহস্র জীবন হইতে সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। এই জ্যোতির্ম্ময় আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহৎ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার *বিদায়ের নেপথ্যপথে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। তোমাদের উদয়পথ মেঘনির্ম্মুক্ত হউক এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।"*

রবীন্দ্রনাথের *সেদিনের সবিনয় আশীর্ব্বাদ যে কতখানি সত্য হইয়াছে,* আজিকার দিনে তাহা ইঙ্গিতে বলিতে গেলেও উপহাসের মত শুনাইবে। হয়তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আশীর্ব্বাদ-ছলে এ যুগের অক্ষমতা ও নিষ্ফলতা লইয়া প্রকাণ্ড একটা ব্যঙ্গ করিয়া থাকিবেন, কিম্বা হয়তো তিনি সেই উদয়াস্ত-সন্ধিস্থলে মানসচক্ষে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া অস্তভাগকে দিয়া উদয়ভাগকে আশীর্ব্বাদ করাইয়াছিলেন। সেদিন যাহাই ঘটিয়া থাকুক, এ যুগের কবিবিহঙ্গগণ আকাশে যে গান গাহিতেছেন, তাহাতে আমাদের অবসাদের আবেশ ও সুপ্তির জড়িমা কাটিতেছে কি না তাহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা বাংলা-কাব্যসাহিত্যের শশীতারকাহীন অমাযামিনীর কথাও একবার স্মরণ করিব।

প্রদোষকাল বলিতে পারিতাম, রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অমা-যামিনী বলিলাম। বঙ্গীয় এবং প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য ও কাব্যশাখার সভাপতির অভিভাষণে বৎসরে তিনবার করিয়া আমরা এই গৌরবময় অতীতযুগের নাম, কোটেশন ও নোট অব অ্যাডমিরেশন কণ্টকিত ধারাবাহিক ইতিহাস শুনিতে পাই। তাহারই পুনরাবৃত্তির দ্বারা আমি সাহিত্য-প্রীতির নামে আপনাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিব না। মূল কথাটি বলিবার চেষ্টা করিব।

লিরিক বা গীতিকাব্যই বাংলার ধাতুগত। কাব্যের অপর দুই বিভাগ, এপিক ও ড্রামায়, বাঙ্গালী আজ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বাংলা-সাহিত্যের নিতান্ত নীহারিকা-যুগেও আমরা বাঙালীর এই গীতিপ্রবণতা লক্ষ্য করি এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলার আদিমতম কবি চণ্ডীদাস গীতিকাব্যে আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। বাংলা কাব্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার প্রায় সকলগুলিই গীতিপ্রাণ কিন্তু প্রথম যুগের গীতিপ্রাণ কবিতায় কল্পনা ও বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রসার বড় অল্প

ছিল, সেগুলির আবেগ বা ইন্‌স্‌পিরেশনে ভেজাল না থাকিলেও তাৎকালীন কাব্যাদর্শের গতানুগতিকতায় আকাশচুম্বী অথবা দুরবগাহ কল্পনার স্পর্শে একটা বিশেষ কিছু হইয়া উঠিতে পারে নাই; অতি সরল গীতোচ্ছ্বাস, অনেকটা স্বচ্ছন্দ বনজাত পুষ্পের মত একপ্রকার গ্রাম্য সাহিত্যের প্রাচুর্য্য বিধান করিয়াছিল। তাহার পর চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তিন শত বৎসরের ব্যাকুল প্রতীক্ষার শেষে তাঁহার আবির্ভাবে বাঙালী রসিক সম্প্রদায়ের নব-জাগ্রত মনে ভাব ও রসের এক অপরূপ বন্যা উথলিয়া উঠিয়াছিল, যাহার পরিণতি দেখিতে পাই—জীবনী-কাব্যে ও পদাবলীতে। রবীন্দ্রনাথের মতে—'বৈষ্ণব কাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সঙ্কীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্ব্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝরণা বাহির হইল।' তাহার পর বাঙালীর কবিপ্রতিভা অনেকটা লোকগীতির অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য-গুলিতে এই ব্যালাড্‌ধর্ম্মী লোকগীতির সূত্রপাত, কবিকঙ্কণে তাহার বিকাশ এবং ভারতচন্দ্রে চরম আর্টিস্‌টিক পরিণতি। কয়েকটি মঙ্গলকাব্যে বিশেষ করিয়া মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রে বস্তুতান্ত্রিক রস এবং চরিত্রসৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও প্রধানত সেগুলি গাথাকাব্য-হিসাবেই উপভোগ্য হইয়াছিল—বাংলা-কাব্যের অন্য কোনও লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই।

মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ—উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষার্দ্ধের ইতিহাসকে বাংলা-কাব্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। বৌদ্ধচর্য্যাপদ হইতে মাইকেলের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্ত ও দাশরথী রায় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ নয় শতাব্দীর ইতিহাসকে আমরা মুখ্যত সঙ্গীত ও পদ্যের যুগ নামে অভিহিত করিতে পারি। ইয়োরোপীয় সমালোচকদের মতে কাব্য বলিতে যাহা বুঝায়, বাংলা-দেশে তাহার আবির্ভাব হইয়াছে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পর—ইয়োরোপীয় আদর্শে। তাহার পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য ছিল; চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলীতে যাহার আরম্ভ, রামপ্রসাদ-নিধুগুপ্তের মধ্য দিয়া কবিওয়ালাদিগের অনুপ্রাস ও অশ্লীলতার মধ্যে তাহার সমাপ্তি। আর ছিল নানা দেবতা ও দেবতাশ্রেণীর মানুষের কীর্ত্তিমুখর পালা-গান; মনসা, সত্যনারায়ণ, শিব, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্ম্ম, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারক মঙ্গলকাব্যগুলি; অনুবাদ-শাখায়—ভাগবত, রামায়ণ মহাভারত, পদ্মাবতী; চৈতন্যের জীবনীশাখায় কয়েকটী উৎকৃষ্ট পদ্যগ্রন্থ। পদাবলীর মধ্যে

কাব্য ছিল এবং কাব্যের অতিরিক্ত আর একটা কিছু ছিল, যাহা নিতান্ত গূঢ় অন্তর্লোকের সামগ্রী; বৃহৎ পদ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সুর ছিল, ছন্দ ছিল এবং পারিপার্শ্বিক বস্তু ও ঘটনার, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অতিশয়োক্তি-দোষদুষ্ট বর্ণনা ছিল। মোট কথা, সে যুগে সঙ্গীত ছিল যেমন সাধকের একান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ, পদ্যও ছিল তেমনই সম্পূর্ণ বহির্মুখী—একটা কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড ও একটা ফিজিক্যাল মিকশ্চার—দুই পরস্পরবিরোধী বস্তু বাংলা-সাহিত্যদরবারে হাত ধরাধরি করিয়া দীর্ঘকাল চলাফেরা করিয়াছে। ইয়োরোপ হইতে নূতন সাহিত্যবুদ্ধির আমদানির সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই দুই বস্তু এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে। আধুনিক বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের সূত্রপাত সেখান হইতেই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই পুনরভ্যুদয়ের যুগেও বাঙালীর অতিশয় গীতিপ্রবণ প্রাণ কাব্যের অপর বিভাগে গৌরবময় প্রবেশাধিকার পায় নাই—এই যুগে শত শত কাহিনীকাব্য ও মহাকাব্য রচনার নিষ্ফল প্রয়াসই তাহার সাক্ষ্য হইয়া আছে। মাইকেলের মতন যুগান্তকারী প্রতিভাও যে মহাকাব্য রচনা করিলেন—ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনার লিরিক সুর তাহাকে সহজেই অতিক্রম করিল।

বাংলা-গীতিকাব্যে আসল আধুনিকতার সূত্রপাত বিহারীলালে—রবীন্দ্রনাথে তাহার চরম বিকাশ ও পরিণতি। ভারতচন্দ্র ও মাইকেলের মত অনন্যসাধারণ প্রতিভার হাতে পড়িয়া বাংলা-ভাষা ও ছন্দে যে অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আসিয়াছিল, বিহারীলাল হইতেই, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক কল্পনার বলে তাহা নূতন ভাব-জগতের সৃষ্টি করিল। বাঙালীর সুপ্ত গীতিপ্রতিভা এযুগে যেন পুনর্জাগ্রত হইয়া পঞ্চমুখে উৎসারিত হইয়াছে এবং বাংলা-ভাষার অশেষ সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছে; প্রাণের মুক্ত ধারায় ভাষা—সুর ও রূপ পাইয়াছে। হয়তো এই ধারারই ক্রমোন্নতি কল্পনা করিয়া সেদিন রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক কবিবিহঙ্গদের আহ্বান করিয়াছিলেন—আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাহিত্যিক নবজন্ম, প্রতিভার এই সতেজস্ফূর্ত্তি—যে দেশ কাল ও সমাজ, যে শিক্ষা জীবন-যাত্রা ও কাল্চারের ফলে সম্ভব হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তাহা এক নূতনতর বিপ্লবের মুখে ক্রমশ বাধা পাইয়া শেষে নষ্ট হইয়া গেল। সমাজের তলদেশে এমন একটি বিরাট গহ্বর হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া ক্রমশ বিস্তার লাভ করিল—যে সমাজ অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলার যাবতীয় কাল্চার গড়িয়া তুলিয়াছিল—বহু সম্ভাবনাযুক্ত সাহিত্য ও ভাষা যে জলমাটিতে পুষ্ট হইয়াছিল—

সেই সমাজ ও সেই জলমাটির স্বাস্থ্য নানা কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাহার ফলে বিগত শতাব্দীপাদের মধ্যেই তিল তিল করিয়া গড়িয়া তোলা বাংলার রসজীবন বা কাল্‌চারাল লাইফ দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার বুনিয়াদ নষ্ট হইয়াছে। অজয় হইতে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত বাংলার মর্ম্মস্থান যেমন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তেমনিই সেই চিত্তপ্রকৃত লোপ পাইতেছে। তাহার স্থানে চারিদিক হইতে ঘোলাজল প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষীণ স্রোতোধারাকে প্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর বাংলা-কবিতার, তথা সাহিত্যের, সে বহুকালপ্রবাহিত ও কবিরসিকসেবিত রসধারা সে গতিপ্রবাহ নাই; জাতির বহুদিবসের বহুসাধনালব্ধ সে সংস্কৃতি আজ নষ্টপ্রায়। তাহার স্থানে অতিশয় অশুচি ও আবিল—অক্ষম ও বেরসিক একটা শূদ্রমনোবৃত্তি প্রবল হইয়াছে, বঙ্গসরস্বতীর সর্ব্ব আভরণ হরণ করিয়া তাঁহাকে বিকলাঙ্গ ও বিবস্ত্র করিয়া একটা উদ্দাম অনাচার জয়ী হইতে চাহিতেছে। ভাবকল্পনা বা কবিত্ব নির্ব্বাসিত হইয়াছে—ভাষা ও ছন্দ দুইয়েরই আর প্রয়োজন নাই। বাংলা-কবিতার একরূপ মৃত্যু হইয়াছে—অতিশয় বর্ত্তমান কালে একটিও কবির আবির্ভাব হয় নাই; রবীন্দ্র-যুগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-কাব্যের যুগাবসান হইয়াছে। ইহার জন্য সমাজকে দায়ী করা যায় না; বাঙালীর প্রাণে কবিতার অবকাশ এ যুগে আর নাই। সে জন্য দুঃখ করিয়াও লাভ নাই।

হয়তো অত্যন্ত আবেগের বশে অতিশয় শতমুখীসঞ্চারী অভিমত প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। পাছে আমাকে কেহ ভুল বুঝেন, এই জন্য আমি সেই ১৩১৩ সালের নবযুগের উদ্বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথের, ১৩৩৪ সালের বিশ্বাস, নজির-স্বরূপ দাখিল করিয়া কতকটা আত্মদোষ ক্ষালন করিতে পারি।

"আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই সব তরুণ-লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এই রকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়াসাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় আমরা কিছু মানিনে,—এটা তরুণের ধর্ম্ম।...কিন্তু যেখানে না মানাই হচ্চে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহঙ্কার তরুণের পক্ষেই সব-চেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানিনে যদি বলতে পারি তাহোলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ

উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য-বিষয় করতে যদি না বাধে, তাহোলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিত মতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।"

বহু শতাব্দী একটানা চলিয়া যদি আমাদের বনেদিবাড়ির পিতামহ-ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে দুঃখ করিব বই কি! দিন ও রাত্রির সকল প্রহরে অবিরাম টিক্ টিক্ এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় টং টং করিয়া যে বিশ্বাসী যন্ত্রটি সমস্ত সংসারের ঘুম ও জাগরণের সকল অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতেছিল, তাহার হঠাৎ বিমুখতায় জড়তা এবং চাঞ্চল্য যে বেহিসাবিভাবে পরিবারস্থ সকলকে আক্রমণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে উপমার যুক্তি সব চাইতে হেয় জানি, তবু, আধুনিক কাব্য-সাহিত্যসংসারের অরাজকতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে ইহা অপেক্ষা সহজ যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। সংসারে সময়নির্দ্দেশক যন্ত্রের অভাবটাকেই প্রগতিমার্গের উন্নততর অবস্থা বলিয়া জাহির করিলে যেমন নূতনত্ব করা হয়, সত্য বলা হয় না—আধুনিক কাব্য-সংসারের অরাজকতা-বিলাসী কবি ও সমালোচক সম্প্রদায় তেমনই মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের দাবিতে ভাষা ও ছন্দরূপ ঘড়ির অভাবটাকেই নানা ভাবে জয়যুক্ত করিতে চাহিতেছেন; ফলে কবিতা ও কাব্যের চিরন্তন পরিধি ও বিস্তারকে অতিক্রম করিয়া কবিতার এমন একটা ভ্রান্ত সর্ব্বগ্রাসী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইতে চলিয়াছে, যে মতবাদ সত্যসত্যই প্রতিষ্ঠিত হইলে কবিতা বলিতে আমরা এতকাল যাহা বুঝিয়াছি, তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না।

ইহা কেবল বাংলা-দেশের কথা নয়, আমি ইয়োরোপ ও আমেরিকার অতি-আধুনিক কবিতার অবস্থা স্মরণ করিয়া এই কথা বলিতেছি। যে মাদার-টিংচার ডাইলিউশনে ডাইলিউশনে বাংলা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দুইশত শক্তির ভয়াবহ কার্য্যকারিতা লাভ করিয়াছে—সেই মূলের সহিত পরিচয় থাকিলে ফুলকে বোঝা সহজ হইবে।

সেখানে একদল সমালোচক বলিতেছেন, কবিতার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য শোক করিবার কারণ নাই। কবিতার যুগ সমাপ্ত হইয়াছে, এটা বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগ—অর্থাৎ নিছক গদ্যের যুগ।

"Poetry matters little to the modern world. That is,

very little of contemporary intelligence concerns itself with poetry." *

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়ের ফলে যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তি ও সঙ্ঘের সংঘর্ষ, ক্যাপিটালের অত্যাচার, লেবারের উল্লম্ফন, অভাব-দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিজ্‌ম-কম্যুনিজ্‌ম-বলশেভিজ্‌ম—অটোমোবিল-এরোপ্লেন ও সংবাদ-পত্র—সব কিছু মিলিয়া মানুষকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে যেখানে ইমোশনের অবকাশ থাকিলেও ট্র্যাঙ্কুইলিটির স্থান নাই, সুতরাং কবিতারও স্থান হইতে পারে না।

প্রোলিটারিয়েট প্রাধান্যের যুগে উক্ত সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল নায়কেরা বুর্জ্জোয়া-পরিপুষ্ট কবিসম্প্রদায়কে যে আল্টিমেটাম দিতেছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য।—

"To-day the dialectic of the poet's position is this: subjectively he is (often) revolutionary both because he reflects the pessimism and hesitation of the bourgeoisie, and as a producer of commodities: objectively he is reactionary because of his dependence on the bourgeoisie and his isolation from the revolutionary movement of the proletariat. Hence a choice is possible for the individual poet though not for poets as a whole. The intellectual who, to-day, realizes that 'freedom is the consciousness of necessity' is able because of this dialectical position to identify himself with the proletariat. Whether he chooses to do so or not it seems clear that the only alternative before him is sterility and ultimate extinction." †

আরও অসংখ্য মতবাদ আধুনিক শত শত কাব্যসমালোচকের মুখে গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া শোনা যাইতেছে। এই স্বল্পপরিসর সময়ে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় আধুনিক কবিতার রীতি-প্রকৃতি ও রূপ লইয়া এত অধিকসংখ্যক পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে যে তাহার তালিকা দিতে গেলে ধৈর্য্য থাকিবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিরা স্বয়ং সমালোচক সাজিয়া বসিতেছেন এবং ভিক্টোরিয়ান ও জর্জ্জিয়ান কবিতাকে চাপা দিয়া 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'র প্রচার ও প্রসারকল্পে পরস্পরের সভূমিকা কবিতা-সংগ্রহ ছাপিয়া

* F. R. Leavis in 'New Bearings in English Poetry'

† A. L. Morton in "The Criterion', October, 1932.

থিওরির ভেল্কি ও আধুনিকতার হুমকি দিয়া নিছক গায়ের জোরে আসর জাঁকাইতে চাহিতেছেন। প্লেটো. আরিস্টটল, মিল্টন, জন্সন, মিল, মেকলে, শিলার, কার্লাইল, জেফ্রি, ডিকুইন্সি, বায়রন, শেলী, কোল্রিজ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, হান্ট, হ্যাজ্লিট, আর্নল্ড, পো, এমার্সন. রাস্কিন. ডান্টন, পেটার, সেন্টস্বেরি, ব্রিজেস, হুইট্ম্যান, হইতে ক্রোচে মারী. ব্র্যাড্লি, অ্যাবারক্রম্বি, এলিস, হাডসন হাউসম্যান, উইলিয়ম্স পর্য্যন্ত কাব্য ও কবিতাকে যে দৃষ্টি দিয়া দেখা হইয়াছে, বর্ত্তমানে সে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ অথবা অংশত ভ্রান্ত বলিয়া উপহসিত ও আলোচিত হইতেছে। হপকিন্স, এলিয়ট স্যাণ্ডবার্গ, পাউণ্ড, স্পেণ্ডার, রবার্টস, কুয়েনেল. ম্যাক্ডিয়ারমিড, অডেন প্রভৃতির কবিতাকে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দিবার জন্য বিশেষ সমালোচনা-পদ্ধতিরও সৃষ্টি হইতেছে। ফলে, ইংরেজী কবিতার ভাষা বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই এমন হইয়া আসিয়াছে যে তাহাকে সন্ধ্যাভাষা বলিলেও চলে; সেক্স-পীয়র, মিল্টন, কীট্সের কাব্যসাধনায় সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যে নূতন করিয়া বৌদ্ধগান ও দোহার যুগের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এই উন্মাদ অনাচারের বিরুদ্ধে যে সকল সক্ষম ও সুচিন্তিত প্রতিবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে, আমি তন্মধ্যে তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তিনজন চিন্তাশীল মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বাংলাদেশের আধুনিকতা বিচারে ফিরিয়া আসিব।

১। "Contemporary poetry in the whole of the Western world is insisting, loudly and emphatically through the mouths of its propagandists, on an absolute liberty to speak of what it likes how it likes. Nothing could be better; all that we can now ask is that the poets should put the theory into practice, and that they should make use of the liberty which they claim by enlarging the bounds of poetry.

The propagandists would have us believe that the subject-matter of contemporary poetry is new and startling, that modern poets are doing something which has not been done before....... Much too much stress has been laid on the newness of the new poetry; its newness is simply a return from the jewelled exquisiteness of the eighteen-nineties to the facts and feelings of ordinary life. There is nothing

intrinsically novel or surprising in the introduction into poetry of machinery and industrialism, of labour unrest and modern psychology : these things belong to us, they affect us daily as enjoing and suffering and beings ; they are a part of our lives, just as the kings, the warriors, the horses and chariots, the picturesque mythology were part of Homer's life. The subject-matter of the new poetry remains the same as that of the old. The old boundaries have not been extended." —Aldous Huxley.

২। "No one could be seriously interested in the great bulk of the verse that is culled and offered to us as the fine flower of modern poetry. For the most part it is not so much bad as dead—it was never alive. The words that lie there arranged on the page have no roots : the writer himself can never have been more than superficially interested in them." —F. R Leavis

৩। "এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খটখটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার ঠোঁটে রং লাগানো হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসঙ্কোচে। বলতে চায় মোহ জিনিষটাকে আর কোন দরকার নেই। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানারূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ি নক্ষত্র বিচার করে দেখেছে, বলছে মূলে মোহ নেই, আছে কার্ব্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিওলজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এই গুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গীতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি এ কথা কবুল করতেই হবে।......আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।" —রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু বিপুল কবিতা-সম্পদে সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে ব্যসন এবং যে বিলাস শোভা পায়, ব্যাঙের আধুলি-সম্পদে সম্পন্ন বাংলা-দেশে তাহার

কেতাবী অনুকরণ যে কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে, অতি আধুনিক বাংলা-কবিতার সহিত পরিচয় থাকিলে, আপনারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে বাংলা-কাব্যসাহিত্যে, প্রাচীন ও আধুনিকের, মাটি ও বৃক্ষের যোগসূত্র ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। সাহিত্য লুতাতন্তু জাতীয় উদ্ভিজ্জ নহে—ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে অবস্থিত হইয়া আর যাহাই বাঁচুক, সাহিত্য বাঁচে না। মাটির অন্ধকারে বহুধাবিস্তৃত মূলের সাহায্যে সাহিত্যের জীবনীরস সংগৃহীত হয়—তবেই শাখাপ্রশাখা-সম্বলিত সাহিত্যপাদপে ফুল ও ফলের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ এমন দুঃসময়ে আমাকে কাব্য-শাখায় চাপাইয়া দিয়াছেন যখন মূল বৃক্ষ হইতে এই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ শাখাটি বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলপাতিত হইতে আর বিলম্ব নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাবর কাটিয়া যাঁহারা ইহার উপর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ঢুলিতে ঢুলিতে হাই তুলিয়া তুড়ি দিতেছেন, তাঁহারা যদি এখনও আস্ত থাকিয়া থাকেন, পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের স্বপ্ন ও চমক ভাঙ্গিল বলিয়া। কাব্য-শাখায় না বসাইয়া পদ্য শাখায় যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বসিতে দিতেন, তাহা হইলে এই তিমিরময়ী রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভাণ্ডারে সত্যকার যাহা কিছু সঞ্চয় আছে, তাহারই অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া অপরিচিতের সহিত তাহার পরিচয় সাধন করাইয়া একটা সৎকার্য্যে লাগিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল; নব সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় সেই অনির্ব্বাণ মণিদীপগুলিকে ভাল করিয়া জ্বালাইয়া রাখাও অসম্ভব হইত না।

কিন্তু কাব্য করিতে আসিয়া গদ্য-কাব্যের বিভীষিকাকে এড়াইয়া চলা সহজ নয়; কাব্য-সংসারের অতি-আধুনিকতা-মহামারীর মূল বীজ যেখান হইতে সংক্রামিত হইয়াছে ও আজিও হইতেছে, প্রতিষেধের জন্য খোন্তা কোদাল লইয়া সেখান পর্য্যন্ত ধাওয়া না করিয়া উপায় নাই। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কথা এই যে, রোজার সরিষার মধ্যেই মারাত্মক ভূত প্রবেশ করিয়া, শুধু প্রবেশ করিয়া নয়, একেবারে মৌরসীপাট্টা লইয়া বসিয়া আছে। ঘড়িটা যতদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল—অর্থাৎ যতদিন ছন্দ ও মাত্রার বন্ধন ছিল, ততদিন অনাচার এতটা প্রবলতা লাভ করে নাই। অন্য সকল বন্ধনের বালাই ত্যাগ করিয়াও ছন্দ ও মাত্রার ভার বহন করিতে করিতে অতি-বড় অনাচারীকেও হাঁপাইয়া উঠিয়া রাস্তা ছাড়িতে হইয়াছে। এখন সে ডিসিপ্লিন ভাঙিয়াছে।

উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে নিছক গল্প বলার ও যুক্তি প্রয়োগের বাধা আছে বলিয়া যাহা সম্ভব হয় নাই, ছন্দের বাঁধ ভাঙিয়া কাব্যের ক্ষেত্রে সেই সকল অনাচার অনায়াসে হুড়হুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে। অন্য নিম্নভূমি না পাওয়া পর্য্যন্ত বন্যার জল নামিবে না, সুতরাং কাব্যক্ষেত্রের কচি শস্যগুলির পচন আমাদিগকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে।

কুক্ষণে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সর্ব্বনাশা কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। একজন সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে ঝাড়-লণ্ঠন ভাঙিয়া ভাঙিয়া মিঠা ঠুন্‌ঠুন আওয়াজের পুনরাবৃত্তি শ্রবণগোচর করা নিন্দার নহে, কিন্তু দরিদ্র আল্‌নাস্কারের কাচ-ভাঙা-স্বপ্ন দেখা সহিবে কেন? পায়ের বাসন যে তাহারই নিজের কপাল!

১৩২৯ সালে অর্থাৎ ইহার ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা' প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাতে বিভিন্ন রচনা কবিতার আকারে সাজানো হয় নাই—গ্রন্থারম্ভে ভূমিকার নামে কোনও সাফাই গাহিবার চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। সাহিত্যে অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তির অভাব কখনই হয় না—বিশেষ করিয়া বাংলা-দেশে ইঁহাদের সংখ্যা স্বভাবতই একটু অধিক। 'লিপিকা'রও অনুকরণ হইয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত গদ্যের আকারে মুদ্রিত হইয়া সেগুলি আসর জমাইতে পারে নাই, স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। ঠিক দশ বৎসর পরে 'পুনশ্চে' রবীন্দ্রনাথ মুদ্রণের ও ভূমিকা-যোজনের যে আধুনিকত্ব দেখাইলেন, তাহাতেই নূতনত্বকামী কবিকুলের সহজদাহ্য মস্তিষ্ক-উলুবনে আগুন ধরিয়া গেল এবং বাংলা-কাব্যলোকের ছায়ান্ধকার কুঞ্জবন এমনই রোশ্‌নায়িত হইয়া উঠিল যে নিতান্ত অবসর-বিনোদেচ্ছু পথিক-সম্প্রদায়েরও বিভ্রান্ত হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

রবীন্দ্রনাথ যে নামই ইহার দিন, আসলে এ বস্তুগুলি কি? আমাদের সেই সনাতন বাংলা গদ্য—যে গদ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামরাম বসু প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সীরা হাত পাকাইয়াছিলেন, যে গদ্যে রামমোহন লিখিয়াছিলেন তাঁহার বেদান্তগ্রন্থ, অক্ষয় দত্ত—বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস, বঙ্কিম—কপালকুণ্ডলা এবং শরৎ চট্টোপাধ্যায়—বিরাজবৌ। সেই গদ্য যাহাতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া থাকেন 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। কেরীর মাতিউ লিখিত সুসমা-

চারে অথবা সরকারের ষ্ট্যাম্প-আইনের ভাষায় আমরা কাব্যরস প্রত্যাশা করি না বলিয়াই তাহা নিছক গদ্য—বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা অথবা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে মাঝে মাঝে সেই রস স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে বলিয়া তাহা গদ্যকাব্য। সাবধানী পাঠকের চোখে এগুলিতে একটা অন্তর্লীন ছন্দ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে এবং ইহাই গদ্যচ্ছন্দ। রচনাভেদে এই ছন্দ বিভিন্ন; 'পুনশ্চে' তাহারই একটি ভঙ্গির প্রকাশ। সুতরাং এই জাতীয় রচনাকে ঘটা করিয়া একটা স্বতন্ত্র নাম দিয়া কবিতার মত করিয়া পংক্তি সাজাইবার মধ্যে অন্য যে উদ্দেশ্যই থাকুক, যুক্তি নাই। এগুলিকে আমি কবিতা বলিতে প্রস্তুত নই, কারণ কবিতার সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট—কি এদেশে, কি বিদেশে; সে সংজ্ঞা ভাঙিয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা আর যাহাই হউক, কবিতা নয়। ছন্দই কবিতার প্রাণ। "So long as the words remain in an uncadenced prose form, they do not give us any lasting feeling of reality. The moment they are taken and put into rythm they vibrate into a radiance." ছন্দের ক্ষমতা অপরিসীম। কয়েকটি সামান্য অর্থবিশিষ্ট সীমাবদ্ধ শব্দে ছন্দের যাদুস্পর্শে কল্পনাতীত একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা বাজিয়া উঠে; সসীমের সমষ্টিতে অসীম অনায়াসে ধরা দেয়। "কবিতায় ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্বিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে।"

ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে।
মাগো কি হ'ল তোমার অবাক্ নয়নে
চাহিস কিসের তরে!

পাশাপাশি সাজানো কয়েকটি অতি সাধারণ শব্দের সাহায্যে কন্যা মাতার নিকট যে সংবাদ ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে, নিছক শব্দগত অর্থে তাহা অত্যন্ত মোটা কথা—ইডিয়টিকও বলা চলিতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে

ছন্দের পাখায় শব্দগুলি ভর দিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই নেহাৎ মণিহার-ছেঁড়ার সংবাদ ছাড়া আর একটা অব্যক্ত বেদনার আভাসও মায়ের মর্ম্মস্থলে পৌঁছিল। ছন্দের তথা শব্দবিন্যাসের এই অলক্ষ্য শক্তিই অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার পক্ষে কবিদের একমাত্র অবলম্বন।

যদি কেহ যুক্তি দেন অধুনাকীর্ত্তিত গদ্যকবিতায় এই ছন্দ আছে, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়কে বচনে বাঁধিবার কৌশলও তাহার অনায়ত্ত নয়, তাহা হইলে বলিব, এ আর নতুন কি! গদ্যের এই ছন্দগত নিজস্ব প্রকাশ-ক্ষমতার সম্বন্ধে এখন হইতে আশি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব রবীন্দ্রনাথেরও ইহা অজ্ঞাত ছিল না।

"যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধ রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ডসকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষলতা সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে, নীরবে লতাগুল্ম মধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। পশুপক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎমাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন শব্দ, কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাত শব্দ কোথাও তলস্থ শুষ্ক পত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ, ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুর রব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু বহিতেছিল না; মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ, একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র, তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্র ভাগারূঢ় পত্রাবলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামালতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র, তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সংভুক্ত-পূর্ব্ব সুখের অস্পষ্টস্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

"কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনা পারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্দ্ধে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐক্যতানে মৃত্যুর গান গাহিল;—সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিনভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যসুন্দর শান্ত শীতল

অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল।" —রবীন্দ্রনাথ

"এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'ল?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠচে রজনীগন্ধা, বাসর-ঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধুর মত; কোন্‌খানে ফুট্‌ল ভোর বেলাকার কনকচাঁপা?

জাগ্‌ল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যার জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা। এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল। সেখানে জান্‌লা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেচে হাওয়া।" —রবীন্দ্রনাথ

গদ্যেও বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাযথ শব্দ প্রয়োগের গুণে যে কাব্যের আমেজ লাগে, এই দৃষ্টান্তগুলিই তাহার প্রমাণ। এই জন্য গদ্যকে পদ্যাকারে গ্রথিত হইবার হীনতা স্বীকার করিতে হইবে কেন? যেখানে আবেগ বা ইন্‌স্‌পিরেশনের সত্যকার অভাব সেখানে এই পংক্তি-বিভাগের সহায়তাই কি কাব্যের ক্ষেত্রে গদ্যকে মুক্তি দিতে পারে? পারে না যে তাহার প্রমাণ দিতেছি।—

"ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ।
শুক্‌নো ধূলো, একটি ঘাস উঠতে পায় না।
একধারে আছে কাঞ্চন গাছ,
আপন রঙের মিল পায় না সে কোথাও।
দেখে মনে পড়ে আমাদের কালো রিট্রিভার কুকুরটা,
সে বাঁধা থাকে কোঠাবাড়ির বারান্দায়।"

—রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ

"একদা এক ঘেস্থুড়ে কাটছিল ঘাস।
এমন সময় তার আঙুল কামড়াল এক সাপে।
আঙুলটা সে কেটে ফেল্‌লে তৎক্ষণাৎ,
হল বটে যথেষ্ট রক্তপাত,
তবু হল তার প্রাণরক্ষা।"

—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, পর্ণকা

অথবা —

"সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।
কোকিলের গান
বিবর্ণ এঞ্জিনের মত খ'সে খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বকযন্ত্র,
পাশ ফিরে শোও"

— জীবনানন্দ দাশগুপ্ত, কবিতা

দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার বক্তব্যকে আমি সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অস্বাভাবিক counterfeit বা জালিয়াতি অথবা চতুর ভান হইতে আধুনিক কবিরা মুক্তি লাভ না করিলে আধুনিক কাব্যের মুক্তি নাই। কাব্য যেখানে criticism of life না হইয়া দৈনিক প্রসাধনের একটা ভঙ্গিমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অত্যন্ত সচেতন অবস্থায় এলোমেলো ভাষা, রীতি ও শব্দ প্রয়োগ করিয়া অব্যক্তকে ব্যঞ্জনা দিবার প্রাণান্তকর প্রয়াস যেখানে ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট, directness of inspiration-এর যেখানে একান্ত অভাব সেখানে কেবল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পুস্তকগত একটা নকল ইনটেলেকচুয়াল ভঙ্গিকে কাব্যিক প্রেরণার সম্মান দিলে কাব্যের অকালমৃত্যুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কি কারণে জানি না, সাহিত্য নেতাদের মধ্যে অনেকেই অবাধে এই প্রশ্রয় দিতেছেন। মহা-জলপ্লাবনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আর্কে আশ্রয় লাভ করিয়া নোয়া কি ক্রূর আনন্দে প্লাবনবিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন ?

আমি নিজে অনাধুনিক নই। বিংশ শতাব্দীতেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং বিংশ শতাব্দীর তরুণ মন লইয়া এ কথা বিশেষভাবেই বুঝিতেছি যে, বাংলা-দেশে যে কাব্যধারা বিহারীলালে সুরু হইয়া রবীন্দ্রনাথে আসিয়া শেষ হইয়াছে. আধুনিক যুগের মনের কথা প্রকাশ করিবার পক্ষে তাহার ভাব ভাষা ও ছন্দ যথেষ্ট নয়। এই যুগ এখনও যুগের কবির প্রতীক্ষা করিতেছে। এ যুগের জীবনযাত্রার শতধাবিভক্ত পথে পদে পদে যে আঘাত ও বেদনা আমা-

দিগকে প্রতিনিয়ত সহিতে হইতেছে তাহার অভিজ্ঞতা যেদিন উপযুক্ত প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইবে, যাহা একান্ত ইমোশন অথবা একান্ত যুক্তিই হইবে না, সেদিনই বাংলা-কাব্যসাহিত্যে নব-অরুণোদয় হইবে। আমাদের যুগের যে সকল তরুণ ফাঁকির পথে না গিয়া সাধনার ক্রূরদুর্গম পথে বিচরণ করিতে করিতে রক্তাক্তচরণে একটা নূতন কিছু সম্ভাবনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা এই ব্যাকুলতার কথা বুঝিবেন। নকলকে, ফাঁকিকে, লোকে স্বভাবতই অনুকরণ করিতে চায়। কঠিন এবং দুর্গমকে এড়াইতে গিয়া বাংলা-দেশের তরুণসম্প্রদায় কাব্যের নামে এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর উপাসনা করিতেছেন এবং একটা ভ্রান্ত cult খাড়া করিয়া সেই তাণ্ডবে সকলকেই ঝাঁপ দিতে ডাকিতেছেন, তাহাতেই আশঙ্কান্বিত হইয়া আমি আজিকার এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিলাম। তাঁহারা যেন মনে রাখেন এই অভিশপ্ত যুগের অক্ষম কবিসম্প্রদায়ের আমিও একজন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সংবাদ-সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় প্রধান সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বৈঠকে সংবাদ-সাহিত্য বিভাগের উদ্বোধন ও আমন্ত্রণ এই প্রথম। বলাবাহুল্য, এই সাদর আমন্ত্রণে আমি ও আমার সাংবাদিক সহকর্ম্মিগণ আনন্দিত ও গর্ব্বিত। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের শৈশবকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণই দৈনিক ও সাময়িক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিতেছেন। ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত বাঙ্গলা সংবাদপত্রের চিরদিনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতীতে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, সাহিত্যিকরূপেই সম্মেলনে যোগ দিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে সংবাদপত্রগুলি উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহিত এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই আপনারা সম্ভবতঃ সংবাদ-সাহিত্যরূপ স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রথম সভাপতিরূপে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কেননা, আপনারা আমার নিকট যাহা শুনিতে চাহেন সে সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট নহে। আশঙ্কা হয়, আমি যাহা বলিব, তাহা সংবাদপত্র সম্পর্কে কতকগুলি মামুলী কথা মাত্র। সঙ্কোচ ও আশঙ্কা সত্ত্বেও এই সুযোগ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, যাহারা চিরদিন নিজেদের নেপথ্যে রাখিয়া অপরকে ঘোষণা করে; ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রাষ্ট্রবীর হইতে অতি সাধারণ লোকও যাহাদের সাহায্যে সমাজে খ্যাতি ও মর্য্যাদালাভ করে; যাহারা প্রবলের পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যায় অবিচার কুব্যবস্থা দূর করিবার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধিকে সদাজাগ্রত রাখিবার প্রয়াস পায়; অথচ নিজেদের অপমান পীড়ন হইতে রক্ষা করিতে অক্ষম ও উদাসীন;—সেই সাংবাদিক মণ্ডলীর অবরুদ্ধ হৃদয়ের দু'চারিটা কথা যদি আজ প্রকাশ করিতে পারি, এবং যদি তাহা আপনাদের সহানুভূতি ও স্নেহ লাভ করে, তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব।

মানবসভ্যতার প্রথম উন্মেষ কাল হইতেই মানুষের কৌতূহলী মন পরস্পরের ও রাজরাজড়া বড়লোকদের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছে। এই স্বাভাবিক ইচ্ছা হইতেই পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদির আবির্ভাব। ভাট, চারণ ও কবিগণ তাঁহাদের আলঙ্কারিক ও অতিরঞ্জিত ভাষায় ও ছন্দে দীর্ঘকাল মানুষের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। মধ্যযুগে বিশেষ ঘটা, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যাভিষেক

প্রভৃতির সংবাদ হাতে লিখিয়া কিছু কিছু বিতরিত হইত। তারপর আসিয়াছে সংবাদপত্র।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে সংবাদপত্র এক অপরিহার্য্য বস্তু। জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ এই বিপুলা পৃথিবীর মানব সমাজকে নিকটতর করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের মানবের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কত বিচিত্র ধারা, অথচ সংবাদপত্রের স্থান সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ স্থানে যত-টুকু সংবাদ দেওয়া সম্ভবপর, বাছিয়া বাছিয়া তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে। আবার এমন সংবাদপত্রও আছে যাহা কেবল একই বিষয়ের সংবাদ দেন ও আলোচনা করেন। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য সাধারণ সংবাদপত্রের সম্মুখে প্রধান ও চিরন্তন প্রশ্ন, লোকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানিতে চাহে কোন কোন বিষয়গুলি। বহুকালের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে সংবাদ জানিতে লোকের আগ্রহের মাত্রা খুব বেশী। সাংবাদিকগণ, সেই সকল সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার চেষ্টাই করিয়া থাকেন। সংবাদ সংগ্রহ করার পর প্রশ্ন উঠে, কি ভাষায় কি ভাবে সেই সংবাদ লিখিত হইবে। এই কথাটাই বোধ হয় এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংবাদ-সাহিত্য বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমি জানি না। সম্ভবতঃ যে লিপিকৌশলদ্বারা সংবাদ-রচনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহাই সংবাদ-সাহিত্য। সংবাদ প্রচারের উপযোগী ভাষা ও বর্ণনা-রীতিকেও সংবাদ-সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

সংবাদপত্রের আদিযুগে বিলাত ও আমাদের দেশে যে সংবাদলিপির প্রচলন ছিল,—তাহা ছিল চিঠির ভাষা। মুদ্রিত সংবাদপত্রের আমলে প্রচলিত মার্জ্জিত সাহিত্যের ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, উচ্চাঙ্গের আলঙ্কারিক ভাষায় সংবাদ লিখিলে অল্প লেখাপড়া জানা পাঠকবর্গের বুঝিবার অসুবিধা হয়, তখন সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় সংবাদ লেখা আরম্ভ হয়। কালবশে নিত্যনূতন বিষয় নূতনভাবে সন্নিবেশ করার ফলে সংবাদপত্রের ভাষারও বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংবাদপত্রের সাজসজ্জা এবং শিরোনামার জন্য অনেক বড় বড় শব্দকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রয়োজন মত সংবাদপত্রে নিত্য-নূতন শব্দ গড়িয়া উঠিতেছে ;—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের ভাষা সম্বন্ধে বাঁধাধরা নির্দ্দিষ্ট কিছু স্থির হয় নাই। বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিম,

রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ, বিপিনচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির নিজস্ব রচনাভঙ্গীর মৌলিকতা সত্বেও লিখিত বাঙ্গলা গদ্য যে কারণে কোন অতি-নির্দ্দিষ্টতার মধ্যে আবদ্ধ হয় নাই,—সেই কারণেই সংবাদপত্রের লেখকগণও সর্ব্বক্ষেত্রে একই রচনাভঙ্গী অনুসরণ করিতে পারেন না। বিলাতেও টাইমস্, ডেলী হেরাল্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান প্রভৃতি কাগজগুলির 'সাহিত্য'—পৃথক পৃথক ধরণের। আমাদের দেশেও ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ও অমৃতবাজারের ইংরাজীর পার্থক্য আছে।

তবে সংবাদ-সাহিত্যের একটা মূলকথা আছে। যত কম কথায় বর্ণিত বিষয় প্রকাশ করা যায়, ততই ভাল। অত্যুক্তি ও অধিক অলঙ্কার বর্জ্জন করাই উচিত, এ সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট বিলাতী সাংবাদিক বলেন,—সংবাদপত্রের সাহিত্য হইবে নারীর আচ্ছাদনের মত। "It should be like a lady's garment, long enough to cover the subject, but at the same time short enough to be interesting." এ ক্ষেত্রে অবশ্য আধুনিক ইংরাজ তরুণীদের পরিচ্ছদই উপমাচ্ছলে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমাদের দেশের আপাদমস্তক অবগুণ্ঠনবতীরা অথবা মার্কিনী হলিউডের কৌপীনবতী ভাগ্যবতীরা এই উপমার আওতায় আসেন না।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রে যাঁহারা সংবাদ লিখিবার কাজ করেন তাঁহাদের দ্বারা যে অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লইয়া কাব্য ও সাহিত্য জগতের মহারথী ও রথীবৃন্দ বহু বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। সঙ্গত ও অসঙ্গত এই সকল সমালোচনা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সম্পাদকদিগকে নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতে হয়। তাঁহারা ভুলিয়া যান, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের চৌদ্দ আনা সংবাদ প্রত্যহ ইংরাজী হইতে তর্জ্জমা করিতে হয় এবং তাহাও ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবার উপায় নাই, রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত করিয়া যাইতে হয়। ইংরাজী আমাদের রাষ্ট্রভাষা। সমস্ত রাজকার্য্য ইংরাজীতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ ইংরাজীতে হয়। খেলাধূলা ইংরাজী ধরণের। বক্তা, নেতা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বিজ্ঞাপনদাতা সকলে ইংরাজীতে চিন্তা করেন, ইংরাজীতে বলেন, ইংরাজীতে লিখেন। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের কর্ম্মীদিগকে তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিতে হয়। এক এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যাহা বহুকাল ধরিয়া, প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করিয়া অতি সতর্কতার সহিত নিবিষ্টচিত্তে রচনা করেন, সাংবাদিকেরা তাহা দ্রুত অনুবাদ করিয়া পাঠকদের সম্মুখে ধরেন। বহু ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের নির্দ্দিষ্ট প্রতিশব্দের অভাব তাহাদিগকেই পূরণ

করিয়া লইতে হয়। কোন বিশেষ ঘটনা বা ঐতিহাসিক কারণ হইতে উদ্ভূত শব্দ এবং বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির অনুবাদ কেবল দুঃসাধ্য নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসাধ্য। এই অসাধ্যসাধনের দাবী প্রতিদিন সাংবাদিককে পূরণ করিতে হয়,—পাঠকদের মধ্যে অনেক বিলাতী-বিদ্যাবিশারদ বিশেষজ্ঞ এই অনুবাদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন না। অনেকসময় অনুবাদ যথাযথ হইলেও বাঙ্গলা ভাষা সম্পর্কে তাঁহাদের 'প্রশংসনীয় অজ্ঞতা'র দরুণ, নিজেদের বুঝিতে না পারার অক্ষমতার অপরাধ সংবাদপত্রের অনুবাদকের উপর নিক্ষেপ করিয়া কটূক্তি করেন। এই কটুবাক্য শ্রবণ ও সহ্য করিয়া প্রত্যেক দিনের কাজ আরম্ভ করার মত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা একমাত্র সাংবাদিকেরই আছে,—কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের নাই।

অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সহিত প্রত্যহ কত নূতন শব্দ সৃষ্টি হইতেছে। নিত্য নূতন ভাবধারা বিদেশ হইতে আসিতেছে তাহার সহিত আসিতেছে নূতন নূতন বিদেশী শব্দ। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সময় যতগুলি নূতন শব্দ এদেশে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সব শব্দ যাহারা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছে অথবা বাঙ্গলায় বোধগম্য করিয়া গঠন করিয়াছে, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিপারিশ্রমিকপুষ্ট এবং সুদীর্ঘ ছুটির আরামে তুষ্ট অধ্যাপকও নহে, বিশ্বসাহিত্যিক বা বিশ্বকবিও নহে। সংস্কৃত ভাষার সন্তান বাঙ্গলা ভাষা প্রধানতঃ কাব্য সাহিত্য ও দর্শনের ভাষা। ভাবাবেগ বা দিব্যানুভূতি প্রকাশে ভাষার ও শব্দের প্রাচুর্য্য আছে। বিজ্ঞান ও রাজনীতিক্ষেত্রে এখনও ভাষা তেমন স্বচ্ছন্দ ও বেগবান নহে। তাহার জন্য আমাদের কান ও মন তৈয়ারী হয় নাই বলিয়াই কাব্য ও উপন্যাসের বাঙ্গলা শুনিতে ও পড়িতে অভ্যস্থ মন ও কান অনুরূপ লালিত্য না পাইয়া বিরক্ত হয়; অনভ্যস্ত শব্দ শ্রুতিকটু মনে হয়। তাঁহারা নালিশ করিয়া বলেন, বাঙ্গলাভাষা আড়ষ্ট। ভাষার দোষ নহে, দোষ আমাদের শিক্ষার। বাঙ্গলার সংবাদপত্র একদিকে যেমন নূতন নূতন শব্দ আনিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতেছে, অন্যদিকে মাতৃভাষায় রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিবারও দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আজ বাঙ্গলা সংবাদপত্র যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের আভিজাত্য ও গৌরব খর্ব্ব করিয়াছে, ইহা তাহার বহুবর্ষের সাধনার ফল; এবং এ গৌরব তাহার একান্ত নিজস্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ অথবা সাহিত্যরথিদের নিকট সে কোন সাহায্যই পায় নাই। বাহির

হইতে সহানুভূতিহীন মন লইয়া সমালোচনা করা সহজ; সহৃদয়তার সহিত পথ প্রস্তুত করা কঠিন। অবশ্য ইংরাজী খেলার বাঙ্গলা বিবরণ, মার্কিন চিত্রজগতের হলিউডের ভাষা, বিলাতী ঔষধ, মোটরকার, যন্ত্রপাতির বিজ্ঞাপনের ভাষার হুবহু বাঙ্গলা তর্জ্জমা করা অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া একটা জারজ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এমন ঘটনাও বাঙ্গলা সংবাদপত্রের আপিসে ঘটে যে, যথাযথ অনুবাদও গ্রাহ্য হয় না। একবার একটি সওদাগরী কারবার হইতে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহাতে ইংরাজীতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল, 100 percent pure. বিজ্ঞাপনদাতার নির্দ্দেশ ছিল যেরূপ অক্ষরে ও আকারে এই কথা কয়টি আছে, বাঙ্গলাতেও সেইরূপ রাখিতে হইবে। অনুবাদক মহাফাঁপরে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া তিনি লিখিয়া দিলেন, ১৬ আনা খাঁটি। অক্ষর গাঁথিয়া প্রুফ্ পাঠান হইল, অনুমোদনের জন্য। বড় সাহেবের বাঙ্গলা বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। তিনি দেখিলেন ১০০ লিখিতে তিনটী সংখ্যা, অথচ প্রুফে আছে দুইটী। এই মস্ত ভুল ধরিয়া তিনি বড়বাবুকে ডাকিলেন। সাহেবকে তুষ্ট করিবার জন্য বড়বাবু বলিলেন, ভুলই হইয়াছে। এত বড় একটা ভুল আবিষ্কারের আনন্দে গদ গদ হইয়া সাহেব আনন্দবাজারে ফোন করিলেন। অনুবাদক উত্তর দিলেন, ভুল হয় নাই অনুবাদ ঠিকই হইয়াছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ঠিকই যদি হইবে তাহা হইলে ১০০ লিখিতে তিনটি সংখ্যা না দিয়া দুইটা দেওয়া হইল কেন? অনুবাদক বলিলেন, ফোনে এ বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। সাহেব বলিলেন, বিজ্ঞাপনটি বিশেষ জরুরী, পরদিনই বাহির হওয়া চাই, সুতরাং তিনি নিজেই আসিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বড়বাবুসহ সাহেব আসিয়া উপস্থিত। অনুবাদক বুঝাইয়া বলিলেন, বাঙ্গলায় এক টাকাকে পূর্ণ ধরিয়া আনা হিসাবে অংশ করা হয়; একশতকে পূর্ণ ধরার প্রথা নাই। সুতরাং নির্দ্দেশমত অক্ষর যথাসম্ভব ঠিক রাখিয়া এইরূপ করা হইয়াছে, ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবে ভাল এবং বিজ্ঞাপনের ফল হইবে। সাহেব কথাটা বুঝিলেন এবং বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন একথা তিনি বুঝাইয়া বলেন নাই কেন? বড়বাবু অম্লানবদনে বলিলেন, তিনি ভাল বাঙ্গলা জানেন না। বাঙ্গালী বাঙ্গলা জানেন না একথা শুনিয়া সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। আমরা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, সাহেব আমাদের

দেশে মাতৃভাষায় অজ্ঞতা শিক্ষার বা কোনও কাজের ব্যাঘাত ঘটায় না। দোষ সওদাগরী আপিসের বড়বাবুর একার নহে; প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ইংরাজীতে সংবাদ বা বিবৃতি লিখিয়া আনিয়া অনুবাদ করিয়া লইবার অনুরোধ করেন এবং ত্রুটী স্বীকার করিয়া গর্ব্বিত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, বাঙ্গলায় তিনি লিখিতে পারেন না। এই শ্রেণীর লোকের এক অন্ধ কুসংস্কার আছে যে, তাহারা মনে করে, তাহারা ইংরাজী বেশ ভাল জানে।

সংবাদপত্রের কর্ম্মীদের কেবল যে অনুবাদ করিতে হয় তাহা নহে, সংবাদ, অভিযোগ, বর্ণনা, বক্তৃতা কাটিয়া ছাটিয়া মাজিয়া ঘসিয়া সংবাদ পত্রের উপযোগী করিতে হয়। ভাষার উপর ভাল দখল না থাকিলে এ কাজ সহজে করা যায় না। অতিশয়োক্তি ও বাহুল্য বিস্তার করিয়া বলা আমাদের জাতীয় অভ্যাস। এই জন্য মফঃস্বল হইতে প্রেরিত অনেক সংবাদ প্রকাশ্যযোগ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু আমার নিজের জীবনেই দেখিতেছি, অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মফঃস্বল হইতে বহু উৎকৃষ্ট রচনা এখন পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের অনেক নিয়মিত পাঠক, ইদানীং এমনভাবে সংবাদ প্রেরণ করেন যাহা বেশী পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হয় না। কৃষক বা ইংরাজী না জানা অনেক পাঠক ও সংবাদ-দাতা উত্তম বাঙ্গলা লিখিতে পারেন। সংবাদ পত্রের বহুল প্রচলনের ফলে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষরের দেশেও বাঙ্গলার কথ্য ভাষাও মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়াছে এবং হইতেছে।

জাতীয় জীবনের উপর সংবাদপত্র যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা কেবল দ্রুত দেশ বিদেশের সংবাদ সরবরাহ করিয়া নহে—তাহার নিজস্ব মতবাদ দ্বারা জনমনকে জয় করিবার সদা সচেতন চেষ্টা দ্বারা। বাঙ্গলা দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার ফলে, ছত্রভঙ্গ দুর্ব্বল সমাজব্যবস্থায় অধিকাংশ নরনারী পীড়িত অপমানিত; এই কারণে যে সকল সংবাদপত্র জাতীয় স্বাধীনতার ভাবধারা প্রচার করিয়াছে, সামাজিক সমুন্নতির প্রেরণা দিয়াছে, তাহারাই জনপ্রিয় হইয়াছে। অন্যায় অবিচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, বিশেষ আদর্শবাদের দিকে জনমনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সম্পাদক ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখকগণ যাহা লেখেন, তাহা সাময়িক ক্ষণভঙ্গুর হইলেও সাহিত্যের দরবারে তাহার স্থান আছে। সম্পাদকগণের রচনাভঙ্গী, শব্দবিন্যাস-নীতি অনেক শক্তিমান স্থায়ী সাহিত্যরচয়িতা অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া থাকেন। জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার কৌশল, পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী

করিয়া বর্ণনা করিবার কৌশল, সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার কৌশল অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভা না হইলেও অনুপম ও তীক্ষ্ণ বোধশক্তির পরিচায়ক। যাহার ভাষায় ঝঙ্কার নাই, উদ্দীপনা নাই, প্রাণশক্তির গতিবেগের প্রাচুর্য্য নাই সে কখনও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া জনচিত্ত অধিকার করিতে পারে না। সাধারণ প্রবন্ধরচয়িতার সহিত সংবাদ পত্রের প্রবন্ধ লেখকের সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। খুব বড় পণ্ডিত না হইলেও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা যায়। কিন্তু হৃদয়াবেগ, তীব্র অনুভূতি এবং জাতির সহিত জাতির আশা আকাঙ্খার সহিত প্রাণগত যোগ না থাকিলে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা যায় না। সম্পাদককে নিত্য নূতন শিক্ষা লাভ করিতে হয়, পুরাতন ভুলিতে হয়। অতীতের প্রতি সে মমত্বহীন, বর্ত্তমান তাহার নিকট বাস্তবসত্য, ভবিষ্যৎ তাহার কল্পনায় রূপায়িত। সম্পাদকের চিন্তা ও সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ও আদর্শ নিষ্ঠাই সম্পাদকের প্রতিদিনের রচনায় প্রাণ সঞ্চার করে। সম্পাদককে খুটিনাটি অনেক কিছুই দেখিতে হয়; বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় যে সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রভাতে নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয়, তাহার কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে লিখিবার অবসর অল্পই মেলে। অনেক আকস্মিক গুরুতর ঘটনায় তৎক্ষণাৎ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে হয়। অসুবিধা, অনবসর, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও দৈনন্দিন কর্ম্মক্লান্তির মধ্যেও সংবাদপত্রের এক অপূর্ব্ব মাদকতা ও উত্তেজনা আছে; তাহাই সাংবাদিকদের চিত্তকে সরস ও মনকে সজীব করিয়া রাখে। প্রতিদিনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভাব অভিযোগ বেদনা ও পীড়া লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয় এবং জাতির বৃহত্তর আশা আকাঙ্খা লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয় আমাদের দেশে তাহা কেবল সংবাদসাহিত্য নহে, তাহা একাধারে রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র। বাঙ্গলাভাষায় উচ্চাঙ্গের মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গ্রন্থ একরূপ নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গলা সংবাদপত্র এই গুরুতর অভাব পূরণ করিয়াছে। চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের রাজনীতি আলোচনার একমাত্র ক্ষেত্র সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র। বাঙ্গলার কবি ও সাহিত্যিকগণও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহায়তাতেই প্রচার ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এককথায় বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই দরিদ্র দেশে সুলভ সংবাদপত্রই বহুজনলভ্য। সংবাদ পত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তখন তাঁহারাই সুলভে সাহিত্য প্রচার করিয়াছেন। ‘বঙ্গ-

বাসীর' পুরাণসমূহ প্রকাশ, 'হিতবাদীর' মহাভারত, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রভৃতি উপহার, সর্ব্বশেষে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' বিপুল প্রচেষ্টা ও বঙ্কিম, গিরিশ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি ছোট বড় বহু সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলীর 'সুলভ' সংস্করণ প্রকাশ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে এই চেষ্টা না হইলে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সৃষ্টি লোকসমাজে এ ভাবে ছড়াইয়া পড়িত না। আমাদের দেশে মূল্য দিয়া বই কিনিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি একেই কম, তাহার উপর দামী বই হইলে তো কথাই নাই। কোন সাহিত্যিকের নামের গুণে যতটা না হউক, সুলভের লোভেই পাঠক প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হউক আর যৌথ কারবারই হউক, সংবাদপত্রের আসল প্রভু জননায়ক, জনতা মহারাজ, গভর্ণমেণ্ট ও বিজ্ঞাপনদাতা। ইহাদের পরস্পরের বিপরীত স্বার্থ ও অভিপ্রায়ের ঘাতসংঘাত সংবাদপত্রের উপর সর্ব্বদাই প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইহাকে কখনও স্বীকার, অঙ্গীকার, উপেক্ষা, ক্ষমা করিয়াই দৈনন্দিন কাজ করিতে হয়। পূর্ব্বে সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম প্রকাশ করার রীতি ছিল না; সংবাদপত্র দমন আইন কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া সম্পাদকের নাম পকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্পাদকের ব্যক্তিগত খেয়াল খুসীতে সংবাদ পত্র পরিচালিত হয় না; অথচ প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা ও অপবাদের ভাগ সম্পাদকদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। সম্পাদক অতি-মানব নহেন দোষ ত্রুটি অপূর্ণতা যেমন সাধারণ মানুষে আছে, তেমনি সম্পাদকেরও আছে। কিন্তু তাহা স্মরণে রাখিয়া কেহ তাহাকে রেহাই দেন না। সম্পাদককে সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবে, সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে; সামান্য অসাবধান হইলেই আইন তাহাকে দংশন করিবে। ধনী ও বড় লোকেরা তাঁহাদের ঢাক পিটাইতে অস্বীকার করিলে ক্রুদ্ধ হন, নেতারা তাঁহাদের বিবৃতি বড় বড় হরপের শিরোনামা দিয়া প্রকাশ না করিলে বিষণ্ণ হন, মন্ত্রীদের দোষ ত্রুটী উদ্ঘাটন করিলে তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়া বড় ডাণ্ডা বাহির করেন, পুলিশ ও সিভিলিয়ানতন্ত্র তাঁহাদের নিরুদ্বিগ্ন ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপর প্রাত্যহিক কটাক্ষ ও সমালোচনা দেখিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করেন।

এই সকল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সাংবাদিক আমরা জনসেবার গৌরবে সমস্ত ঈর্ষা অসূয়া ক্ষোভ ক্রোধের আঘাত ভুলিয়া যাই। দরিদ্র দুর্ব্বল বঞ্চিত ও ব্যথিত অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে আমাদের জন্য যে স্নেহ ও সমবেদনা সঞ্চিত

হইয়া আছে, আমাদের সম্বল ও সান্ত্বনা তাহাই। তাহাদের ভাষায় আমরা তাহাদের কথাই বলি। শ্রমিক, কৃষক, বৃত্তিজীবী, বেকার, ছাত্র, যুবক, রাজরোষে লাঞ্ছিত নির্য্যাতনে ম্রিয়মান নরনারীর পক্ষ সমর্থন করিতে হয় বলিয়া আমাদের ভাষা রূঢ় কর্কশ অমাজ্জিত; ইহাকে যদি আপনারা সাহিত্য বলেন, আমরা ধন্য হইব, যদি না বলেন, তথাপি ক্ষুব্ধ হইব না। আমরা স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিবার গৌরবের দাবী করি না। লোকলোচনের অন্তরালে বসিয়া আমরা বিনিদ্র রজনীতে 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়', নানা পুষ্প চয়ন করিয়া বরমাল্য গাঁথি। প্রভাতে আমাদের উপাস্য গণশক্তির কণ্ঠে সে মালা তুলাইয়া দিই, সন্ধ্যায় তাহা ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়ে; আবার উদয়াস্ত চেষ্টায় পরদিন নূতন মালা গাঁথি। কোন দিন দেবতার ভাল লাগে, কোন দিন লাগে না। হে সাহিত্যিক, কবি সুধীবৃন্দ, আপনারা কত মহার্ঘ্য উপচার মণিমাণিক্য খচিত আভরণের অর্ঘ্য নিত্য নিবেদন করিতেছেন, যাহা অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া আপনাদের গৌরব ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; তাহার সহিত তুলনায় সুলভ স্বল্পস্থায়ী ও ক্ষীণপ্রভ হইলেও আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের আকুতি আগ্রহ চেষ্টা যত্ন কম নহে। অতএব আমরাও আপনাদেরই সতীর্থ, সহকর্ম্মী এবং সমান উত্তরাধিকার সূত্রে বঙ্গ সাহিত্যের উত্তর সাধক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজ

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের একবিংশতি অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতিত্বে আহূত হওয়ায় একদিকে যেরূপ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, অন্যদিকে সেরূপ নিজের অক্ষমতা পীড়াদায়ক মনে হইতেছে। নবদ্বীপের অব্যবহিত সান্নিধ্যে দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা অনেক অধিকতর বীরহৃদয়কেও কম্পিত করিবে। বাংলা সংস্কৃতসাহিত্যে যদি কিছু দানের দাবী করিতে পারে, তাহা দর্শনসাহিত্যে। সংস্কৃতসাহিত্যের প্রকার ও পরিমাণ বড় কম নহে। কিন্তু এই সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে স্মৃতির ও বেদান্তের পুস্তক কয়েকখানি বাদ দিলে এক ন্যায়দর্শন ব্যতীত বাংলার আর বেশী কিছু চিরস্থায়ী দান নাই। অবশ্য অনেক সংস্কৃত সাহিত্যই বাংলাদেশে আসিয়া স্থানীয় প্রতিভায় রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রণয়নের খ্যাতি দাবী করিবার অধিকার বাংলাদেশের নাই। বাংলার নিপুণ কবি সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদির উপর আপনার প্রতিভার ছায়াপাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিবার অধিকার এক ন্যায়শাস্ত্রের উপরেই আছে। সাম্প্রাদায়িকগ্রন্থ গোবিন্দভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ ইত্যাদি বাদ দিলে অন্য দর্শনশাস্ত্রে বাংলার বিশেষ শ্রদ্ধা কোনও কালে স্থায়ীভাবে ছিল বলিয়া মনে হয় না। হয় তো অন্যান্য দর্শনের কিছু কিছু আলোচনা হইত। কিন্তু নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানে ন্যায়শাস্ত্রের এক প্রকার একাধিপত্য ছিল বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক চিরকালই সূক্ষ্ম বিচার ও স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাংলার নিবন্ধকার সমাজশাসনে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং আজিও দায়ভাগ বাংলাকে উত্তরাধিকারবিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যপ্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিকের সংমিশ্রণে যে নব্য ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাংলার মনীষিগণ যে অসামান্য ভাষানৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা অতি বিরল। তর্ককে প্রণালীবদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত ভাষার সৃষ্টি এবং যথাযথ শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ না থাকিলে কোন বিষয় লইয়া তর্ক চলে না। কাজেই বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক এক অসামান্য পরিভাষার উদ্ভব করিতে বাধ্য হইয়াছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার যদি মস্তিষ্কের অপব্যবহার হয় তাহা হইলে জগতের অনেক

দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ এই দোষে দুষ্ট। যদি স্বার্থচিন্তা ও বাণিজ্যকৌশল বিদ্যা ও বুদ্ধির মানদণ্ড হয় তাহা হইলে নবদ্বীপের নৈয়ায়িকেরা যে মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি প্রকর্ষলাভ বিদ্যার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে নিঃস্বার্থ বিদ্যাচর্চ্চা ও গভীর অনুসন্ধিৎসা চিরকালই আদরণীয় বলিয়া গণ্য হইবে। এই বিদ্যা অর্থকরী না হইতে পারে, কিন্তু মানুষের মন কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তাহার পরিচয় পাইতে গেলে বাংলার ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তিযুগের টীকাটিপ্পনী না পড়িলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ইহার প্রভাব যে কেবল দর্শন-শাস্ত্রেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। পরবর্ত্তিযুগের আলঙ্কারিকগণ ও শাস্ত্রপ্রণেতারাও ইহার পরিভাষা গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ শাস্ত্রের শব্দপ্রয়োগকে সুনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রভাব বাংলার পরবর্ত্তী সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং বাংলার সুসংযত চিন্তার ধারা এই শাস্ত্রের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। মানুষের শারীরিক শক্তি যেরূপ প্রধানতঃ কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্যই আবশ্যক; কিন্তু লোকে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের জন্যও ব্যায়ামে সেই শক্তি ব্যবহার করে, সেইরূপ চিন্তা মুখ্যতঃ নিজের ও পরের কাজে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হইলেও নিঃস্বার্থভাবে তাহার উপচয় অস্বাভাবিক নহে। বাংলার চিন্তা কল্পিত প্রতি-পক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল তর্ক ও শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করি-য়াছে, তাহা একটী উপভোগ্য বিষয়। নিজের মতবাদের বিপক্ষে যে সকল তর্ক উঠিতে পারে আমরা সাধারণতঃ তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভারতীয়দর্শনের প্রথা এই যে নিজের বিপক্ষে যাহা কিছু বলা সম্ভব তাহা লেখক নিজেই বিশদভাবে বিবৃত করেন। অনেকসময়ে পাঠক কল্পিত বিপরীতপক্ষের তর্কবিন্যাসে মোহিত হইয়া যান, কারণ তাহা সময়ে সময়ে এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ পাঠকের মনেই আসে না যে এরূপ বিপরীত তর্ক সম্ভব। এই বিচার যে কত সূক্ষ্ম হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, একই তর্ককে একজন টীকাকার প্রতিপক্ষসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন, অপর একজন তাহাকে দর্শনকারের নিজের সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লন। নিজের তর্কের বিরুদ্ধে যে দোষ আসিতে পারে, তাহাকে লুকাইবার প্রয়াস কোথাও নাই। স্বাধীনচিন্তাকে প্রসার দিবার জন্য উভয়পক্ষের অনুকূল তর্ক অবতারিত করা হয়।

যদি বাংলার ও ভারতের দর্শনের চিন্তাবিষয়ক স্বাধীনতা এতই উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহা হইলে আজ সেই দর্শন মুমূর্ষু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ভারতের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে হয়। ইউরোপীয় দর্শন এবং ভারতীয় দর্শনের তুলনা করিতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য হয়. তাহাদের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য। আমাদের দেশে মৌলিক শাস্ত্রের অনুপাতে টীকাটিপ্পনীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। যদি কোন দার্শনিকের নূতন কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে, তাহা হইলেও তিনি কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। এইরূপে বেদান্তসূত্রকে আশ্রয় করিয়া শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি টীকাকারেরা স্ব স্ব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অনেকস্থলেই এই মতবাদের মূলে রহিয়াছে তাঁহাদের ধর্ম্ম বা সমাজগত সংস্কার—সেই সংস্কারকে দার্শনিক ভিত্তি দিবার জন্যই যেন কোন মৌলিকগ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিজের মতকে কোন মৌলিকগ্রন্থে নিবিষ্ট করিলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় চিন্তার এরূপ অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে কোন ভাবুকই পূর্ব্বাচার্য্যগণের উল্লেখ না করিয়া নিজের মত অবতারণ করেন না। এমন কি শঙ্কর ও রামানুজের মত অসামান্য দার্শনিকেরাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহাদের শাস্ত্রবিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমোদিত।

এই পদ্ধতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আনা চলে। সম্প্রদায়গত চিন্তায় বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব কমিয়া যায় এবং তর্কের বৈচিত্র্য অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না। যে চিন্তা কেহ কোনও কালে করে নাই তাহার প্রচার করিতে গেলে স্বতঃই সন্দেহ ও ভীতির উদ্রেক হয়। কিন্তু যদি জানা থাকে যে এ চিন্তা একেবারে নবীন নহে, তাহা হইলে সুধীসমাজে তাহার গ্রহণের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। এইজন্য অতি মৌলিক দার্শনিকেরাও দেখাইতে চাহেন যে তাঁহারা অপ্রচলিত চিন্তা চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন না। অবশ্য যে চিন্তার মধ্যে বিন্দুমাত্র নূতনত্ব নাই, তাহার প্রচারের সার্থকতা কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাচীন চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত, তাহার গ্রহণও সন্দেহজনক। সুতরাং নবীনকে প্রবীণের আকার গ্রহণ করিতে হয়, পাছে তাহা গ্রহণীয় না হয়। ভারতের প্রত্যেক দর্শনের টীকাকারেরা এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। এইরূপে টীকার উপর টীকা লেখা

হয় এবং যাঁহার কিছু নূতন বক্তব্য থাকে, তিনি তাহা টীকাচ্ছলে প্রকাশ করেন। ইহার ফলে একই শাস্ত্রের বহু ব্যাখ্যা আলোচনা করিতে করিতে অল্প কয়েক স্থানে নূতন মতের সন্ধান মিলে। যদি প্রত্যেক লেখক তাঁহার বিশিষ্ট মতবাদ ব্যাখ্যামুখে প্রচার না করিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্রের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইত। কিন্তু তাহা না করায় একই শাস্ত্রের বহু টীকা একই ভাবকে বিশদ করিতে প্রয়াস করে। কোন কোন টীকাকার তাঁহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় প্রথম কয়েকটী সূত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়া লন। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত বেদান্তদর্শনের চতুঃসূত্রীপ্রকরণ। কিন্তু এ প্রথা সর্ব্বত্র অবলম্বিত হয় নাই এবং তাহার ফলে সমস্ত টীকা আলোচনা করিবার শ্রমের পরিবর্ত্তে অতি অল্প নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

যদি এই অভ্যাসের বা পদ্ধতির কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আপ্তপ্রামাণ্যই ইহার মূল। ভারতের প্রথম দার্শনিকেরা যখন সূত্রাকারে মৌলিকগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন তখনও তাঁহাদের চেষ্টা প্রমাণ করিতে যে তাঁহারা শ্রুতিপ্রামাণ্য অবহেলা করিতেছেন না। বেদান্ত সাংখ্য যোগ ইত্যাদি দর্শন উপনিষদ্‌কে প্রামাণ্য করিয়া তাঁহাদের মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং স্বীয় শাস্ত্রের স্বপক্ষে যে সকল উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করা চলে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসাকার বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইয়া সন্দিগ্ধ স্থলে কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে তাহারই সমাধান করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। বৈদিক বিশ্বাস বা ব্যবস্থার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি না অথবা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব দোষশূন্য কি না ইহা পূর্ব্ব বা উত্তর মীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। শ্রুতিকে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া লইয়া, তাহার সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে নিবদ্ধ করাই যেন দর্শনকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রথম হইতেই স্বাধীন চিন্তাকে এইরূপ সংযত করায় পরবর্ত্তিযুগে নূতন মতবাদের অবতারণা প্রথাবিরুদ্ধরূপে পরিগণিত হয়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে এবিষয়ে ভারতীয় দর্শন একক নহে। যেখানে যেখানে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া দর্শন দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেইখানেই নিরঙ্কুশ চিন্তা স্থান পায় নাই। বাইবেল বা কোরাণকে কেন্দ্র করিয়া পাশ্চাত্য জগতে যে সকল চিন্তা গড়িয়া উঠে, তাহাদের অবস্থাও এইরূপ। প্রত্যাদেশ যদি অভ্রান্ত হয় তাহা হইলে দার্শনিক মতবাদ তাহার বিচার ও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের প্রেরিত সত্যের সহিত

অজ্ঞ মানব তাহার দর্শন লইয়া কিরূপে বিরোধ করিতে পারে! যেখানে দর্শন বিশিষ্ট ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছে কেবলমাত্র সেখানেই স্বাধীন চিন্তা অবাধগতিতে চলিতে পারিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ গ্রীকদর্শন ও বর্ত্তমান-যুগের পাশ্চাত্য মতবাদ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর বিরোধী কিনা, ইহা সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ বিভিন্ন-দেশে বিভিন্নপ্রকারে হইয়া গিয়াছে। এই বিবাদের মূলে আছে মানুষের জ্ঞানের শক্তির সীমানা সম্বন্ধে প্রশ্ন। যদি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত জ্ঞেয় বস্তু আর কিছু না থাকে এবং সেই যুক্তি যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে ধর্ম্মের ও দর্শনের বিবাদ অনিবার্য্য এবং আম্নায় (বেদ) বা অন্য আপ্তবাক্য সন্দেহজনক হইয়া উঠে। প্রত্যেক ধর্ম্মেই দুইটি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। প্রথমটি এই যে ধর্ম্মের বস্তু অলৌকিক অর্থাৎ ধর্ম্ম এমন কতকগুলি বস্তুর আলোচনা করে যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। আদিমযুগে মানুষ বিশ্বাস করিতে পারিত যে ভগবান্ সশরীরে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু সভ্যসমাজে এ বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মত আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না যে কেহ কোনও কালে ভগবানের ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। এইরূপ স্বর্গ বলিয়া একটি সুরম্য স্থান—যেখানে কল্পবৃক্ষ হইতে ইচ্ছামত খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান হয়, অপ্সরার নৃত্যগীতে চক্ষুকর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, যেখানে জরামৃত্যুর অধিকার নাই এবং নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎসান্নিধ্য আত্মাকে আনন্দরসে ডুবাইয়া রাখে—এইরূপ লোভনীয় আবাস কোথাও আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূতিগন্ধ-ময় ভয়াবহ, অন্ধকারাচ্ছন্ন পাপীজীবের পীড়াদায়ক নরকভূমি সম্বন্ধেও লোক সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশ ও কাল এই মর জগতের বাহিরেও বিস্তৃত আছে কিনা, এ প্রশ্নের সমাধান না হইলে স্বর্গনরক সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা সমর্থন বা নিরাকরণ করা সম্ভব নহে। উপনিষদ্‌কার বহুপূর্ব্বেই স্বর্গনরক হইতে আত্মার মুক্তিকে বিভিন্ন করিয়াছেন, এবং যদিও সাময়িক পুরস্কার বা তিরস্কার রূপে স্বর্গনরকের কল্পনা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, তথাপি ইহাও জানাইতে ক্রুটী করেন নাই যে আত্মার চরম অবস্থা কোন প্রাকৃতিক স্থান নহে। মুক্তি ও স্বর্গ এক বস্তু নহে বলিয়া দেবতারাও চিরস্থায়ী নহেন এবং পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যে স্বর্গে

যাওয়া যায় তাহাও নশ্বর। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম যে ছবি গড়িয়া তোলে, দর্শন সকল সময়ে তাহার সমর্থন করে না।

দর্শনের সহিত ধর্ম্মের দ্বিতীয় অনৈক্য জ্ঞানের পরিসর লইয়া। সকল ধর্ম্মেই শ্রদ্ধাকে অধ্যাত্মজীবনের অঙ্গহিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে যেখানে জ্ঞানের গতি ক্ষুণ্ণ হয় সেখানে শ্রদ্ধার দ্বার অবারিত। যাহা প্রত্যক্ষ বস্তু তাহার প্রমাণ শ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিক, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে প্রথমেই মানিয়া লইতে হয় যে সাধারণলোকের জ্ঞান সীমাবিশিষ্ট বটে কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁহারা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং যাঁহাদের দৃষ্টি অপ্রত্যক্ষ বস্তুরও সন্ধান পায়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে সাধারণলোকদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তারতম্য আছে। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধির যাহা অগম্য তাহা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িবে, ইহাতে সন্দেহ করার কি আছে? ধর্ম্মের দাবী এই যে, লোকোত্তর বিষয় কোন কোন মনীষীর জ্ঞানের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া থাকে এবং যাঁহাদের সে জ্ঞান নাই তাঁহারা এই সকল বিষয় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলে তাহা অযৌক্তিক হয় না। পক্ষান্তরে দর্শনকার তর্ক করেন যে সমজাতীয়জ্ঞান সম্বন্ধে তারতম্য স্বীকার করিলেও বিষমজাতীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের অনৈক্য স্বীকার করা হয় না। একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিক জানিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা একজনের অজ্ঞেয় তাহা অন্যজনের জ্ঞেয় হইতে পারে না। ধর্ম্ম ও দর্শনের এই বিবাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে যদি আমরা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে অতীন্দ্রিয় বস্তুর উপলব্ধি একেবারে অসম্ভব নহে। জন্মগত সংস্কার বা স্বকীয় প্রচেষ্টার দ্বারা যদি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধান পায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ও দর্শনের বিবাদ বন্ধ হইবে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত অনুমান ব্যতীত জ্ঞানের অন্য দ্বার নাই তাহা হইলে বেদান্তদর্শনের অপরোক্ষানুভূতি বা বৈষ্ণবদর্শনের ভক্তি প্রভৃতি তর্কাতীত জ্ঞানের কোন স্থান থাকেনা। ভারতীয় দর্শন সাধারণতঃ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি হিন্দু সকল ধর্ম্মই অসামান্যপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে সকল মহাপুরুষ স্বীয় প্রতিভার দ্বারা জগতের নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ জনসাধারণের শ্রদ্ধার বস্তু এবং

সর্ব্বথা গ্রহণীয়। যে, যে বিষয়ে পারদর্শী, জনসাধারণ সেই বিষয়ে তাঁহার মতের অনুবর্ত্তন করে; সুতরাং মহর্ষিদিগের প্রদর্শিত পথও অনুবর্ত্তন করা সকলের কর্ত্তব্য। এই যুক্তির বিরুদ্ধে দার্শনিকের উত্তর এই যে সত্যের স্বরূপ যদি এক হয় তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আসে কোথায় হইতে? অথচ দেখা যায় যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, এবং তদ্বিষয়ক বস্তু তর্কাতীত বলিয়া কেহই অন্যের মত গ্রহণ করিতে চাহেন না। তবে কি আমরা মানিয়া লইব যে প্রকৃতি হিসাবে মানুষের বুদ্ধিও বিভিন্ন হয়, এবং যে বিশ্বাস একের কাছে সহজ তাহা অন্যের কাছে দুরধিগম্য? ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিবৈষম্য স্বীকার হইলেও, ইহা স্বীকার করা হয় নাই যে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা বা তর্ক একেবারে নিষিদ্ধ। ভারতীয় দর্শনে সাধারণ বিশ্বাস এই যে জ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত ধর্ম্মেরও স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় এবং এইজন্য অধিকারিভেদে অধ্যাত্মবিদ্যা পৃথক হইয়া থাকে। যেমন শ্রদ্ধা না থাকিলে জ্ঞান আহরণ করিতে বিলম্ব হয়, সেইরূপ আহৃত জ্ঞান শ্রদ্ধার প্রকারকে ভিন্ন করিয়া তোলে। ব্যক্তিগত বা সমাজগত জীবনে জ্ঞান প্রসার লাভ করিলে বহু পুরাতন সংস্কার ও শ্রদ্ধা লোপ পায়।

আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সংযোগসূত্র যাহাতে ছিন্ন না হয়, এইজন্য ভারতীয় দর্শন তর্কশাস্ত্রকে বিশেষ সুনজরে দেখেন নাই। মনুসংহিতায় বেদ-নিন্দক তার্কিককে সাধুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে আস্তিক্যবাদের বিরোধী বলা হয়, কারণ তাহারা বেদ ও বেদপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে। যে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতীত্যসমুৎপাদকে অবলম্বন করিয়া জাগতিক ঘটনা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন, তাহা ভারতীয় দর্শনের এক স্মরণীয় দিন। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে এবং মানবের বুদ্ধি কার্য্যকারণসম্বন্ধ বুঝিলেই তৃপ্ত হয়, এই বাণী যেদিন প্রচারিত হইল সেইদিন দুর্জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় কারণবস্তুর অনুসন্ধান অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। অপ্রাকৃত বা অলৌকিক জগতে কিরূপে ঘটনা ঘটে তাহা অপেক্ষা এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকৃতি ও সমাজ কিরূপে গড়িয়া উঠে তাহার সন্ধান দর্শনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। বুদ্ধ অলৌকিকবিষয়ের তর্ক উঠিলে যে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন, তাহার কারণ এই যে তিনি অতীন্দ্রিয় বস্তুর আলোচনা নিরর্থক মনে করিতেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে চিরপ্রচলিত অনেক ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা শিথিল হইয়া গেল এবং পারলৌকিক বস্তু অপেক্ষা

ইহলৌকিক বিষয়ে সমাজ অবহিত হইয়া উঠিল। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ও সামাজিক পরিস্থিতির নৈতিকমূলের সন্ধান বৌদ্ধদর্শন যে নিপুণ ভাবে করিয়াছেন, তাহা আজও বিস্ময় উৎপাদন করে। ধর্ম্মকে স্বর্গ হইতে ভূতলে নামাইবার কৃতিত্ব বৌদ্ধধর্ম্ম ন্যায্যতঃ দাবী করিতে পারেন। পরবর্ত্তিযুগের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম অনেক অলৌকিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে সত্য। কিন্তু তাঁহারা দর্শনকে ধর্ম্মের উপরে স্থান দিয়া যে নির্ভীকতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা অন্যদেশের প্রাচীনযুগে অতি বিরল। অতীন্দ্রিয় প্রত্যাদেশ স্বীকার না করিলেও নৈতিকজীবন যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে প্রথম দেখাইয়াছেন। নীতি ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বহুশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু নীতিবাদকে ধর্ম্ম করিয়া তোলার যশঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেরই প্রাপ্য।

হিন্দুদর্শনেও যে কার্য্যকারণবাদের উপর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হয় নাই তাহা নহে। বৌদ্ধদর্শন যখন প্রতীত্যসমুৎপাদের ভিত্তির উপর দর্শনকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন হিন্দু দর্শনেও তখন কর্ম্মবাদের উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যদি ভগবানের ইচ্ছা তাহার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ভগবানের উপর পক্ষপাতিত্বদোষ আসিয়া পড়ে। আমরা যদি নিজ নিজ কর্ম্মফলে এই পার্থক্য অনুভব করি, তাহা হইলেই ভগবানের দায়িত্ব চলিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে প্রাথমিক অনৈক্যের কোন সমাধান হয় না বলিয়া হিন্দুদর্শনকে মানিয়া লইতে হইয়াছে কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি। ভগবান্ যে কোনও কালে কতকগুলি বিভিন্নপ্রকৃতির জীব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, প্রত্যেক জীবাত্মা অজ, নিত্য ও শাশ্বত। যুগযুগান্তে জীব স্বকীয় কর্ম্মফলে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিতেছে এবং পাপপুণ্যের অনুপাতে ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি লাভ করিতেছে। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত প্রাণিজগৎ কর্ম্মের ফলে উন্নত ও অবনত হইতেছে। এই অনন্ত গমনাগমনের পথে প্রলয় সাময়িক বিশ্রাম দিতেছে সত্য, কিন্তু নূতন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আবার পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত জীবনগতি আরম্ভ হইতেছে। যতদিন না আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ততদিন এ গতির আর বিরাম নাই! যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করেন তিনি আর ফিরিয়া আসেন না। বৌদ্ধদর্শনে যেরূপ উদ্বুদ্ধ আত্মা সম্বন্ধে বলা হয় যে তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হিন্দুদর্শনে আত্মজ্ঞ জীবকে বলা হয় যে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনে এবিষয়ে দুইটি পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম এই কর্ম্মপ্রবাহে ভগবানের কোন স্থান রাখেন নাই এবং কর্ম্মভোগ করিতে গেলে যে আত্মা অভিন্ন থাকা আবশ্যক ইহাও বিশ্বাস করে নাই। হিন্দুদর্শন বৌদ্ধমতের বিপক্ষে এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, যে আত্মা কর্ম্ম করে সেই আত্মাই যদি ফলভোগী না হয় তাহা হইলে একের পাপে অন্যের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে, এবং কোনও সুকৃত অর্জ্জন না করিয়া এক জীব অন্য জীবের প্রাক্তনপুণ্যের ফলভাগী হয়। ইহাতে কৃতপ্রণাশ অর্থাৎ কাজ করিয়া তাহার ফলভোগ না করা এবং অকৃতাভ্যুপগম অর্থাৎ না কাজ করিয়া তাহার ফলভোগ করা এই উভয় দোষই ঘটে। যে আত্মা কর্ম্ম করে সেই আত্মাই ফলভোগ করে, ইহা মানিয়া লইলে আর এই দুইটী দোষ ঘটে না। কিন্তু তাহা মানিতে গেলে আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতে হয়। হিন্দুমতের বিপক্ষে যুক্তি করা যায় যে যদি মানুষ কর্ম্মজনিত ফলভোগ করে তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হয়। যদি জীব স্বকীয় প্রাক্তনকর্ম্মের ফল ইহ জন্মে ভোগ করে, এবং ইহজন্মসঞ্চিত কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সময়ে সময়ে সংসারক্লান্ত জীবকে বিশ্রাম দিবার জন্য প্রলয় সৃষ্টি করা ও কর্ম্মোপযোগী দেহে জীবকে অনুপ্রবিষ্ট করা যদি ভগবানের একমাত্র ক্রিয়া হয়, জীব কেন এরূপ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাঁহাকে ভক্তি করিবে? আমরা যখন বিপদে পড়িয়া ভগবানের শরণাগত হই, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। কিন্তু যদি বিপদ্ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা ভগবানেরও নাই। অর্থাৎ যদি কর্ম্মবাদ সত্য হয় ভগবান্ আমাদিগকে সাহায্য করিতে অসমর্থ। আর যদি ভগবান্ ভক্তকে সত্য সত্যই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে কর্ম্মফলের যে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে তাহা মানিতেই হয়। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়, সেখানে জীবের কর্ম্ম ভগবানের কর্ত্তৃত্বের অন্তরায় হইয়া উঠে না এবং তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহের ক্ষমতা কোনরূপে সীমাবদ্ধ করা হয় না। কাজেই সে ধর্ম্মে প্রার্থনা, প্রপত্তি, শরণাগতি ইত্যাদির সার্থকতা আছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করে অথচ সেই সঙ্গে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে চায়, সে ধর্ম্মকে যুক্তি খুঁজিতে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়।

আরও একটী দৃষ্টান্ত দেই। যদি জীব নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ

করে, তাহার আত্মার উন্নতির জন্য অন্যের কি কিছু করা সম্ভব? ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কর্ম্মবাদ অভ্রান্ত হইলে অন্যের দ্বারা আত্মার সদ্‌গতি কোনরূপেই সম্ভব নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে যুক্তির বিরুদ্ধ হইলেও জনসাধারণের বিশ্বাস যে অন্যের আত্মার কল্যাণকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম্ম করা যায় তজ্জনিত সুকৃত মৃতাত্মার উপকারে আসে। শ্রাদ্ধশান্তি, স্নানদান ইত্যাদি কত কর্ম্মই না আমরা পূর্ব্বপুরুষের আত্মার কল্যাণকামনায় করিয়া থাকি? এই সকল ক্রিয়ার মূলে কি এই বিশ্বাস নিহিত নাই যে সৎকর্ম্ম যাহার দ্বারাই কৃত হউক না কেন, যে আত্মার উদ্দেশ্যে তাহারা সাধিত হয়, সেই আত্মাই তাহার ফলভোগ করে? যখন কোন পার্ব্বণে গঙ্গাস্নান করিয়া আমরা ত্রিকোটীকুলোদ্ধার করি, তখন আমরা কি বিশ্বাস করিনা যে স্নানজনিত পুণ্য অন্য আত্মারও উপকারে আসিবে? কিন্তু যদি বাস্তবিকই এইরূপ স্নানে পূর্ব্বপুরুষেরা মুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজের জীবনকে সুসংযত ও সুচালিত করার প্রয়োজন কি? নিয়মিত তর্পণ, শ্রাদ্ধ, স্নান, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এইরূপ অধস্তনপুরুষ রাখিয়া গেলেই তো চলে? আমরা যে কেবল কর্ম্মবাদকে উপেক্ষা করিয়া পরের আত্মার উদ্ধারের চেষ্টা করি তাহা নহে, কিন্তু সেই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি করিয়া নিজের বিশ্বাসেরও ক্ষীণতার পরিচয় দেই। যদি কোন বিশিষ্টযোগে গঙ্গাস্নান করিলে ত্রিকোটীকুলোদ্ধার হয়, লোকে তবে কেন আবার সেই যোগ আসিলে পুনরায় স্নান করিতে ধাবিত হয়? যে কুল একবার উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, তাহাতো আর দ্বিতীয়বার স্নানের অপেক্ষা করে না? বস্তুতঃ ব্যাপার দাঁড়াইতেছে যে ইহাদের কোনটীকে আমরা বিশ্বাস করিব তাহা আমরা নিজেরাই জানিনা। হয় কর্ম্মবাদের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক, না হয় এই সকল ক্রিয়াকলাপের সার্থকতা সম্বন্ধে নূতন আলোচনা হওয়া উচিত।

কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আজ দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুসমাজে যে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলেও আছে এই কর্ম্মবাদ। বেদে চারিবর্ণের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে উপজীব্য করিয়া যে সামাজিকদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই ফল আমরা আজ ভোগ করিতেছি। যোগসূত্রকার যখন বলিলেন যে মানুষের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাক্তনকর্ম্মের ফলমাত্র, এবং যখন ব্যাখ্যাকারেরা বলিলেন যে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতের ফলে জীব কুক্কুর বা চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন

তাহারা অত ভাবিয়া দেখেন নাই যে ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজ ইহার ফলে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যাইবে। তাঁহারা অবশ্য ইহা বলেন নাই যে উচ্চকুলে জন্ম কোন জীববিশেষের একমাত্র অধিকার কিংবা উচ্চকুলের সহিত আত্মার সদ্‌গতির কোনও নিয়তসম্বন্ধ আছে। সংসারচক্রের আবর্ত্তনে এবং কর্ম্মের ফলে জন্মান্তরে উচ্চ নীচ হয়, এবং নীচ উচ্চ হয়। স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সকলেই আত্মার সদ্‌গতি করিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃত যখন এজন্মে নীচ-বর্ণের ছাপ লাগাইয়া দেয় এবং নানা সদ্‌গুণভূষিত হইয়াও সেই নিকৃষ্টবর্ণ জীব দুষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ঘৃণ্য হয়, তখনই সমাজে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষ চারিত্র্যতারতম্যকে উপেক্ষা করিয়া কল্পিত পূর্ব্বজন্মের সুকৃতদুষ্কৃতকে সামাজিক মর্য্যাদার ভিত্তি করিলে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব নহে। যেখানে দর্শন সমাজকে স্পর্শ করে না, সেখানে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু যে মতবাদের তরঙ্গ সমাজের অঙ্গে আঘাত করে সেই মতবাদ সুদৃঢ়যুক্তির উপর দাঁড় করাইতে না পারিলে উহা অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মের ভিতর অনেক অলৌকিক বস্তুর অঙ্গীকার করিয়া লওয়া হয়। চাক্ষুষপ্রমাণদ্বারা এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব স্থাপিত হয় না। ইহারা মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত, এবং ধরিয়া লওয়া হয় যে যাঁহারা এই মতবাদ প্রচার করেন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও আমাদিগের অপেক্ষা প্রভূতপরিমাণে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহাদেরই মতের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বর্ণভেদ সমর্থন করি, এবং সামাজিক আচারব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করি। যদি কোনদিন প্রশ্ন উঠে, তাঁহাদের দৃষ্টি অভ্রান্ত কি না, সেইদিনই সমাজের গঠন নড়িয়া উঠিবে। আর যদি আমরা মনে করি যে বর্ণবিভাগ এবং কর্ম্মবাদের উপর তাহার ভিত্তি একটি দার্শনিক মতবাদ মাত্র, তাহা হইলে সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ যুক্তিবাণ দ্বারা জর্জ্জরিত হইবে। সামাজিকজীবন যখন প্রাথমিক হইয়া উঠিবে, তখন দর্শন তাহার অনুগামী হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন দর্শনের দোহাই দিয়া সমাজের স্তর নির্দ্দিষ্ট হইবে না এবং সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে যে দর্শনের প্রয়োজন হইবে, তাহারই অবতারণা অনিবার্য্য হইবে। যে সকল বিশিষ্ট গুণ না থাকিলে বর্ণ ও বংশ একার্থক হইয়া উঠে, সেই সকল গুণ অবর্ত্তমানে কোনও ব্যক্তি বর্ণের দাবী করিতে পারিবেন কি না, তখন সেই প্রশ্নই বিবেচ্য হইবে। তুলনামূলকযুক্তির চক্ষে বর্ণবৈষম্য যে একটী ভৌগোলিক অর্থাৎ বিশিষ্টদেশনিবদ্ধ বিশ্বাসমাত্র ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। সুতরাং

যাঁহারা বর্ণবিভাগ মানিয়া চলেন, তাহাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে এই বিশ্বাসের মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে জগতের সকল দর্শনের সাড়া আজ আমাদের দ্বারে ধ্বনিত হইতেছে। আজ যদি আমরা পরম্পরের দোহাই দিয়া বিশ্বের আহ্বান ও ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করি এবং কূপমণ্ডূকের ন্যায় আমাদের ক্ষুদ্রচিন্তা-রাজ্যের মধ্যে নিবদ্ধ থাকি তাহা হইলে যে স্বাধীন চিন্তার জন্য ভারত এককালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, সে চিন্তা ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে কি করিয়া আবার উদ্দীপিত হইবে? ভারতের সাধনা ও সভ্যতার ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া আমরা জীবহৃদয়ের আকুল প্রশ্নগুলির যথাযথ সমাধান করিতে যদি তৎপর না হই, তাহা হইলে নিশ্চেষ্টতা ও গতানুগতিকতার জালে আমরা ক্রমশঃ অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িব। আজ আমাদের প্রয়োজন ভারতের চিরন্তন ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়া এবং পারিপার্শ্বিকঘটনার সহিত সংযোগ রাখিয়া ভারতীয় দর্শনকে দেশ ও কালের উপযোগী করিয়া তোলা। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই এক দর্শনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে নাই। ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া কোন মতকে গ্রহণ না করায় ভারতে ভাবুকেরা স্ব স্ব মতপ্রচারে কুণ্ঠা, কার্পণ্য বা কাপুরুষতা কখনও দেখান নাই। বিভিন্নমতের সমাদর ও সমালোচনা ভারতের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ভারত যেমন অবাধে আগন্তুক জাতিগুলিকে আপনার বিশাল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে, সেইরূপ আভ্যন্তরীণ স্বতন্ত্রমতবাদগুলিকেও মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

কিন্তু সমাজের শান্তির জন্য পরের মতবাদের আলোচনা হইতে নিরস্ত থাকা সমীচীন হইলেও ব্যক্তিগতজীবনে অমীমাংসিত মতবাহুল্য পোষণ করা মানসিকস্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। মানুষ পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্নমতে বাস করিতে পারে না। যে আত্মায় মতের আভ্যন্তরিক কলহ চলে, সেখানে চিন্তা ও নীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়। যেমন সুবিন্যস্ত চিন্তা না থাকিলে তর্ক করা চলে না, যেমন বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে মনের ঐক্য ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ যুগপৎ বিভিন্ন মতবাদ অনুবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলে সমাজে ও স্বীয় জীবনে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। আমাদের সকলের পক্ষে সেই দিন আসিয়াছে যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম কোন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহারা সহজে বিচলিত হয় না, তাহার সন্ধান করা। জন-সমাজে এই দার্শনিক তত্ত্ব যদি বহুল প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে বুদ্ধকে

অনুকরণ করিয়া আমাদের আবার প্রাদেশিকভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে দর্শন অলস মুহূর্ত্তের কল্পনার খেলা নহে — ইহা দৈনন্দিনজীবনের উৎস ও উপাদান।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

অর্থনীতি-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

মাননীয়া মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ, উনবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, যখন অর্থনীতি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস-শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন আপনারা আমাকে এই সম্মেলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। এবার আপনারা আমাকে অর্থনীতি শাখার সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি নানা কারণবশতঃ বঙ্গ ভাষার উপযুক্ত সেবা করিতে পারি নাই। আমার ত্রুটী ও অক্ষমতা সত্ত্বেও আপনারা যে আমাকে একাধিকবার আদর ও সম্মান প্রদান করিয়াছেন সে জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমি আজ সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা না করিয়া শুধু বঙ্গদেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যাটক, বার্ণিয়ার, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করিবার পর বঙ্গদেশের উর্ব্বরতা, ধন সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রাকৃতিক সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে মিশরই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই কথাই চিরকাল প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও অনেক আধুনিক লেখকেরও ইহাই ধারণা। কিন্তু সম্প্রতি আমি বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে এই গৌরব এই দেশেরই প্রাপ্য। বঙ্গদেশে এত প্রচুর পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয় যে দেশের অভাব পূরণ করিয়াও বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করিবারমত বহুপরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়।...বঙ্গদেশের চিনি কেবল গোলকুণ্ডা ও কর্ণাট রাজ্যেই ব্যবহৃত হয় না, সুদূর আরব ও মেসো-পটোমিয়া এবং এমন কি পারস্যদেশেও রপ্তানি হয়। ঐ দেশের মিষ্টান্নও সুপ্রসিদ্ধ। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ও সুস্বাদু বিস্কুট তৈয়ারীর জন্য সেখানে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। জিনিষ এত সুলভ যে অতি সামান্য ব্যয়ে লোকেরা প্রত্যহ তিন চারি প্রকার ব্যঞ্জনসহ অন্ন, ঘৃত প্রভৃতি আহার করিতে পারে। এক টাকা মাত্র খরচ করিলে ২০।২৫টী কুক্কুট পাওয়া যায়। নানা প্রকার মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার দ্রব্যাদির বঙ্গদেশে প্রাচুর্য্য রহিয়াছে।"

বার্ণিয়ার আরও বলেন: "মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে বৈদেশিক সওদাগরদের আকৃষ্ট করিবার দিক্ দিয়া বঙ্গদেশের ন্যায় কোনও দেশ আমি পরিদর্শন করি নাই। চিনির কথা ছাড়িয়া দিলেও বঙ্গদেশে এত প্রচুর পরিমাণে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হয় যে এদেশকে ঐ দুই প্রকার দ্রব্যের জন্য কেবলমাত্র হিন্দুস্থান বা মোগল সাম্রাজ্যের সরবরাহকারী না বলিয়া নিকটস্থ রাজ্যসমূহের ও ইউরোপের সরবরাহকারী বলিলেই ঠিক কথা বলা হইবে। আমি সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ও রংয়ের কার্পাস বস্ত্র দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছি। আগে জানিতাম যে কেবল মাত্র ওলন্দাজবাসীরাই এই সকল দ্রব্য জাপান ও ইউরোপের বিভিন্নস্থানে রপ্তানী করিয়া থাকে; কিন্তু এখানে দেখিলাম যে ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ ও স্থানীয় বণিকেরা কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায়ে লিপ্ত। এই দেশে ভ্রমণ না করিলে বঙ্গদেশ কিরূপে যে বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের সুদূর লাহোরে ও কাবুলে এবং বিদেশে কার্পাস বস্ত্র সরবরাহ করিয়া থাকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।" বার্ণিয়ার বঙ্গদেশে উৎপন্ন নানাপ্রকার ফল, এবং গালা, অহিফেন, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বলিয়াছেন যে "বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য্য ইংরাজ, দিনেমার, ও পর্ত্তুগীজদের মধ্যে এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছে যে ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য শতদ্বার উন্মুক্ত আছে কিন্তু বাহির হইবার জন্য একটী দ্বারও নাই।"

আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালাদেশের অবস্থা এইরূপ ছিল আজ তাহার কি অবস্থা? আজ বঙ্গদেশে উৎপন্ন শস্য দেশের নরনারীর দৈনন্দিন আহার্য্যের জন্যও অপ্রচুর। দেশে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা অতি সামান্য। সম্প্রতি সংরক্ষণ শুল্ক বসাইবার ফলে, গত ছয় বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশ তাহাতে স্বল্পই লাভ করিয়াছে। যদিও বঙ্গদেশে পাঁচটী চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে তথাপি তাহাতে বাঙ্গালীর কোন অংশ নাই। এদেশে এখন আর তুলা উৎপন্ন হয় না। দেশের যে কয়েকটী কাপড়ের কল আছে তাহাতে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহা সামান্য এবং সেই কারণে বাঙ্গালাদেশে প্রতিবৎসর অন্য প্রদেশ, জাপান ও ইংলণ্ড হইতে বহু টাকার বস্ত্র আমদানী করিতে হয়। দেশের রেশম শিল্পের অবস্থা অতি শোচনীয় এবং কৃত্রিম রেশমের আমদানী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ফলমূল, তরী-তরকারী, মৎস্যের আর সে

প্রাচুর্য্য নাই। ঘৃত ও দুগ্ধ অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়, ও লবণ এখন একেবারেই প্রস্তুত হয় না।

রপ্তানীর জন্য বঙ্গদেশে এখন একমাত্র পাটই উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু উহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়া প্রায়শঃই দেশের লোককে আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গলার পাটকলগুলি বৈদেশিক ও ভিন্ন প্রদেশস্থ বণিকদের আয়ত্তাধীন থাকায় দেশের লোকের খুব অল্প সুবিধাই হইয়াছে। আভ্যন্তরিক ব্যবহার ও রপ্তানী জন্য যদিও প্রচুর পরিমাণে চা দেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাতে দেশের লোকের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না—কেন না এই ব্যবসার অধিকাংশ বিদেশীয়দের করায়ত্ত। যদিও দেশে প্রয়োজনের অধিক কিছু পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয়, উহা এখনও দেশের শীল্প-সমৃদ্ধির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

দেশের কৃষি ও শিল্পের সঙ্কুচিত অবস্থার ফলে আজ দেশের লোক এত অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র। দেশের কৃষি শিল্পের অবস্থা বর্ত্তমানে এত শোচনীয় যে কায়িক পরিশ্রমে সক্ষম সকল লোককে সর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছলতার সময়েও পরিপূর্ণ-রূপে কর্ম্মে নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় এই দেশের বেকার সমস্যাকে চিরস্থায়ী বলা যায়। এতদ্ব্যতীত, বঙ্গদেশে যাহারা কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত তাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই অলস-ভাবে কাটাইতে বাধ্য হয়। বাস্তবিক অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে নিষ্কর্ম্মা লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর বিবরণ অনুসারে পরিলক্ষিত হয় যে সমগ্র ভারতবর্ষে শতকরা ৩৫·৭৩ ভাগ উপার্জ্জনশীল কিন্তু বঙ্গদেশের সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৭·৩। শিল্পে নিযুক্ত লোক সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যায় যে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পশ্চাতে।

বর্ত্তমান কালোপযোগী জীবন যাত্রা যেরূপ ক্রমশঃই ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে, সেই অনুপাতে বঙ্গদেশের অধিবাসীরা নিজেদের আর্থিক উন্নতি করিতে পারিতেছে না। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর বিবরণ অনুসারে বাংলার জেল সমূহে কয়েদীদের যেরূপ আহার্য্য দেওয়া হয় দেশে কৃষক সম্প্রদায় তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে দেশের কৃষককুল অন্যদিকে কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে কিন্তু উহা তাহাদের সাচ্ছন্দ্যের নিদর্শন নহে। এখানে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে যেমন

ভারতবর্ষের জনপ্রতি আয় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা অনেক কম, তেমনই বাঙ্গলা দেশের জনপ্রতি আয় অন্য কোন কোন প্রদেশের আয় অপেক্ষা অনেক কম। তাই, বাঙ্গলা দেশের আর্থিক অবস্থার কথা আলোচনা করিতে হইলে উহার দারিদ্র্য ও দুর্গতির কথাই বলিতে হয়, ধনসম্পদের কথা বলা যায় না।

আজ দেশের এই দারিদ্র্য, বেকার অবস্থা, এবং অপ্রচুর আহার্য্যের ফলে স্বাস্থ্যহীনতা, স্বল্পায়ুতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, এবং দেশের লোকের শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে শোচনীয় হইতেছে।

দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ সমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দেশের প্রধান শিল্প কৃষি কার্য্যের প্রকৃতির উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল হওয়াটা কোন ক্রমেই যুক্তি-যুক্ত নহে। এই কারণেই যাহাতে কৃষিকে বৃষ্টির উপর একান্ত নির্ভর করিতে না হয় তজ্জন্য অতীতকালের শাসকগণ খাল খননের ব্যবস্থা করিতেন। পর্য্যটক বার্ণিয়ার বলেন যে তাঁহার ভ্রমণকালে রাজমহল হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে তিনি বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত বহু খাল দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে। ইহার পরিণাম যে কি হইয়াছে তাহার নিদর্শন আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় আর্থিক দুর্গতি। অন্য দিকে দেশের কৃষকগণ আর্থিক দুর্গতি বশতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি কর্ম্ম পরিচালন করিতে অক্ষম, পুনঃপুনঃ কর্ষিত জমির উর্ব্বরা শক্তি উপযুক্ত সার অভাবে বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অর্থাভাবে ভূমি-কর্ষণের জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। কৃষকদিগের নিরক্ষরতা নূতন প্রণালীতে শস্য বপনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিক্ষিপ্ত ও স্বল্প জমির জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমি কর্ষণ করা কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ ক্রমবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যাকে জীবন ধারণের জন্য একমাত্র কৃষি শিল্পের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, কারণ দেশের শিল্পসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত কিম্বা বিদেশী ও অন্য প্রদেশবাসীর করতলগত। এই সকল কারণে জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। কিন্তু কৃষককুল নিরুপায়। অন্যান্য কৃষি-সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাহায্যে তাহারা যে নিজেদের উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিবে—দেশের শিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়—তাহারও আর উপায় নাই।

কৃষির বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় দেশের শিল্পের অবস্থা আরও শোচনীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের শিল্প সমূহের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। কি কি কারণে যে উহা আজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কাহারও নিকট অবিদিত নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি-শূন্য স্বার্থান্ধ নীতির ফলেই বাঙ্গলা দেশের শিল্প-সমূহ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অনেকে "শিল্প বিপ্লব" (industrial revolution) ও রুচির পরিবর্ত্তন দেশের শিল্প ধ্বংসের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকিত তাহা হইলে সময়োপযোগী উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার শিল্প-নীতি দেশের স্বার্থরক্ষা কল্পে পরিচালিত করিতে পারিত। গত মহাসমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে তাঁহাদের শিল্প-নীতি এইরূপ ভাবে পরিচালিত করিয়াছেন যে তাহাতে দেশে শিল্পের প্রসার না হইয়া ক্রমশঃ সঙ্কোচ হইয়াছে। মহাসমরের সময় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নীতির ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং উপলব্ধি করেন যে সাম্রাজ্যরক্ষার্থ ভারতেও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই পরিবর্ত্তিত নীতির ফলে যদিও ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্প-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তথাপি পরিতাপের বিষয় এই যে, বাঙ্গলাদেশ তথা বাঙ্গালী নানাকারণে এই নীতির সম্যক্ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে না।

বাঙ্গলার এই দুর্গতির জন্য কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া লাভ নাই---আমাদের দেশের লোকও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কূটনীতির ফলে আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। যে বাঙ্গলাদেশ ভারতে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আন্দোলনের স্রষ্টা, আজ তাহার এই দুর্দ্দশা কেন ? এই বাঙ্গলা দেশই প্রথমে স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ ও প্রচার করে। এই আন্দোলনের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প-সম্পদ প্রসারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়---যাহার ফলে ঐ সকল প্রদেশ অর্থনীতি হিসাবে বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা অনেক স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশ বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না, আমাদের সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা আজও যদি শ্রমবিমুখতা ত্যাগ করি এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে পারি—তাহা হইলে ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে আজও বাঙ্গালী তাহার প্রতিভা ও ক্ষমতা বলে যোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে।

আমি যাহা বলিলাম তাহা হইতে আপনাদের প্রতীয়মান হইবে যে বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গভর্ণমেণ্টের একটি সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই পরিকল্পনাতে একদিকে যেরূপ কৃষির উন্নতির দিকে জোর দিতে হইবে সেইরূপ কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংস্থাপনের ও বৃহদায়তন শিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কৃষির উন্নতির জন্য ইহার বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকসমূহ অপসারিত করিতে হইবে। বাঙ্গলা নদীমাতৃক দেশ। উহার নদ নদীর গতিবিধি যদি সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহা হইলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে এবং বাঙ্গলার কৃষককুলকেও বর্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হয় না। কিন্তু নদ-নদীর গতি যদি সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা দেশের প্রচুর অনিষ্ট সাধন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে হার্ডিং পুলের কথা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ পুল রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট এক কোটী টাকার অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। ঐ টাকা যদি ঐরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা সহকারে ব্যয় না করিয়া গভর্ণমেণ্ট পদ্মার যে সকল শাখানদী মজিয়া গিয়াছে তাহার উদ্ধার সাধন এবং নূতন খালসমূহ খনন করিতেন তাহা হইলে উহা দ্বারা কৃষির উন্নতি এবং পদ্মার গতি নিয়ন্ত্রিত হইত। আজ যদি আমরা পদ্মা, ভাগীরথী ও দামোদরের জল কৃষির উন্নতির জন্য যথোপযুক্তরূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারি তাহা হইলে কৃষকদের বহু দুঃখের লাঘব হইবে, জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, অনেক অকর্ষিত জমি কর্ষণযোগ্য করা যাইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের পরিকল্পনা যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে উহা যে কোনরূপে হিতসাধন না করিয়া কৃষকদের করভারই বৃদ্ধি করিবে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্ত্তমান দামোদর খাল। মহীশূরের মহারাজ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছেন আমি এই সম্পর্কে তাহার প্রতি বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলেন—"এক সময় ছিল যখন আমরা দেশের উন্নতির জন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ব্যয়িত টাকা হইতে বৎসরে কত টাকা লাভ হইতে পারে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিতাম এবং যদি দেখিতাম যে বৎসরে অন্ততঃ শতকরা ৬ টাকা লাভ হইবে না তাহা হইলে আর অগ্রসর হইতাম না। কিন্তু এক্ষণে আমরা আমাদের মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এখন যদি আমরা বুঝিতে পারি যে এই কাজে অর্থব্যয় করিলে কৃষককুলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে আমরা আর টাকার সুদের কথা ভাবি না।"

কৃষির অন্যান্য সমস্যাগুলি তিনরূপে সমাধান করা যায়। প্রথমতঃ, বহু

বিভক্ত জমি সমূহ একত্রিত করিয়া ধনিকায়ও উৎপাদন প্রথা (capitalistic production) অবলম্বন করিলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কর্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে এই কারণে এই পন্থা ত্যাগ করাই ভাল। দ্বিতীয় পন্থা সাম্যনীতির (socialism) সাহায্য গ্রহণ। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়া উহার পক্ষে কতদূর অনুকূল তাহা জানা দরকার। বাঙ্গালী কৃষক যে তাহার চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া এক নূতন মত বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় যে সমবায় নীতির সাহায্যে কৃষির উন্নতি সাধনই আমাদের দেশের পক্ষে সময়োপযোগী, কেন না এই নীতি সাম্য ও স্বাতন্ত্র্যবাদের সমন্বয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলায় যে ভাবে সমবায়ের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে উহার ফল খুব আশাপ্রদ নহে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলা দেশের সমবায়ের কার্য্যের ফল খুবই নৈরাশ্যজনক। কিন্তু আমি একথাও বলি যে যদি বর্ত্তমান সমবায় পদ্ধতির ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধন করা যায় এবং ইহার মূল নীতি জনগণের মধ্যে প্রচার করা যায় তাহা হইলে কৃষির অনেক উপকার সাধন করা যাইতে পারে। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী কৃষি বিভাগেরও অনেক সংশোধন আবশ্যক। এই বিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী কাজ করিবেন তাঁহাদের বাঙ্গলা দেশ সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যে উৎসাহ থাকা আবশ্যক। কোথায় কৃষকেরা ভ্রম করিয়া থাকে কি ভাবে সার ব্যবহার করিলে জমির উৎকর্ষ সাধন করা যায় এ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রতিনিয়ত কৃষকদের উপদেশ দিবেন। মিঃ ব্রেণ বলেন যে গ্রামের আবর্জ্জনা সমূহ ভাল ফসল উৎপাদনের সাহায্যকারী। বাঙ্গলা দেশের কৃষক দরিদ্র বলিয়া তাহাদের পক্ষে কৃত্রিম সার ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য, এই কারণে যাহাতে আবর্জ্জনা সমূহ সার রূপে ব্যবহৃত হয় তৎসম্বন্ধে কৃষি বিভাগের চেষ্টা করা দরকার। ইহা ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য উৎকৃষ্টবীজ সরবরাহ করা, গোজাতির উন্নতির ব্যবস্থা করা, ভূমিকর্ষণের উপযোগী সুলভ যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা কৃষি বিভাগের কর্ত্তব্য। যাহাতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি স্বল্পায়াসে এবং উচিত মূল্যে বিক্রীত হয় তৎসম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ দেওয়া দরকার।

বহু-বিভক্ত জমির জন্য ভারতে লাভজনক ভাবে কৃষিকার্য্য করা সম্ভবপর নহে। এইজন্য জমি সমূহ একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষি সম্বন্ধে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়া দরকার এবং এই সকল গবেষণার ফল যাহাতে কৃষকেরা

জানিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষি-কার্য্য লাভজনক করিবার জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থযোগানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এই কাজ স্থানীয় মহাজনেরাই করিয়া থাকে এবং সেই কারণে ইহাদের নিকট কৃষকেরা এক হিসাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই সকল মহাজনেরা কৃষির উন্নতি অপেক্ষা নিজেদের লাভ সম্বন্ধেই সবিশেষ সচেষ্ট। লোন অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যদিও কৃষকদের প্রয়োজনের সময় টাকা ধার দিয়া থাকে, তথাপি এই ব্যবস্থা সকল দিক দিয়া দেখিলে খুব সুবিধাজনক নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৭ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ টাকা দাদন দেওয়ার কার্য্য করিবে তাহাদের দেখা দরকার এই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার হয় কিনা এবং কৃষকেরা উহা অন্য কাজে ব্যয় না করে। এই জন্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে সমবায় সমিতির সাহায্যে কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করা সর্ব্বদিক দিয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য দেশেও কৃষিঋণ সম্পর্কে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

কৃষি ঋণ সম্পর্কে সম্প্রতি বাঙ্গলাদেশে যে সকল আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমি এখানে বিশেষ ভাবে ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় কুসীদজীবী আইন ও ১৯৩৬ সালের বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইনের কথা বলিতেছি। এই যে দুইটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহার উভয়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষকদের সাহায্য করা। এই আইন প্রয়োগের ফল যে কিরূপ হইবে তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তবে বর্ত্তমানে অনেকেই ভাবিতেছেন যে উহার ফলে মহাজনেরা আর পূর্ব্বেকার মত সদাসর্ব্বদা কৃষকদিগকে ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে না। যদি এই আইনের ফল এইরূপ হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে তাহা নহে কৃষকেরাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এইজন্য আমার মনে হয় যে এই সকল আইনের ফলে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে তৎসম্বন্ধে এখন হইতেই গভর্ণমেণ্টের খোঁজ খবর লওয়া দরকার। ঋণ হ্রাসের জন্য যে আইন প্রয়োগ করা হইতেছে সে সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণ-বিভাগ সম্পর্কিত রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আমি উল্লেখ করিতেছি। "সুদের হার ও ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন হইয়াছে তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে কৃষকদের ঋণ পাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা হইতে পারে। অবশ্য যদি কোন বিশেষ অবস্থার দরুণ এই আইন প্রয়োগ করিতে হয় —তাহা স্বতন্ত্র কথা। যেখানে কৃষকগণ সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত এবং ঋণ পরিশোধে অসমর্থ সেখানে কেবলমাত্র আইনের

বলে ঋণের পরিমাণ বা সুদের হার কমাইয়া দিলেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহার ফল স্থায়ী হয়।"

কিন্তু কৃষির উন্নতির সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃসহায় নিরক্ষর, বুভুক্ষিত কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি না হয়। বাঙ্গলার গ্রামগুলি নানাপ্রকার ব্যাধির আক্রমণে শশ্মানে পরিণত হইতে চলিতেছে। কাজেই, কৃষির উন্নতির সহিত যাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং গ্রামবাসীরা শিক্ষার আলোক পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের পরিশ্রমের যথাযথ পুরস্কার পায় সে প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগক্লিষ্ট দরিদ্র কৃষক যখন তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে, শিক্ষার আলোক যখন তাহাকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়া তুলিবে তখনই কৃষির যথার্থ উন্নতি সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। শিক্ষার বর্ত্তিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামে লইয়া যাওয়া তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য।

আমি যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কৃষকের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু স্বচ্ছন্দ-ভাবে জীবন যাত্রার পক্ষে তাহা যথেস্ট হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। এই হেতু অবসর সময়ে যাহাতে অন্যভাবে তাহাদের আরও কিছু রোজগার হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। চরকায় সূতা প্রস্তুত, বয়ন কার্য্য, বেতের গৃহসামগ্রী প্রস্তুত করা, রজ্জু প্রস্তুত করা প্রভৃতি শিল্পদ্বারা এ বিষয়ে কৃষকদের অনেক সাহায্য হইতে পারে।

ফলের বাগান, তরী-তরকারী উৎপাদন, দধি ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা, গো-পালন প্রভৃতি কৃষি সংক্রান্ত লাভজনক ব্যবসায় এবং এই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন।

কিন্তু একমাত্র কৃষির সাহায্যে বাঙ্গলা দেশের আর্থিক অবস্থার যথাযথ উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর হইবে না। জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস-মূলক (diminishing return) হওয়ায় কোন জাতিই দেশের উন্নতির জন্য কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন না। যত ভাবেই কৃষির উন্নতি করা যাউক না কেন বাঙ্গলা দেশের ক্রমবর্দ্ধমান লোক সংখ্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা একমাত্র উহাদ্বারা হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে কতক লোককে কৃষি কার্য্য হইতে সরাইয়া লইতে হইবে।

কিন্তু তখনই সমস্যা হইবে এই সকল উদ্বৃত্ত লোকগুলিকে লইয়া কিরূপে কাজে লাগান যায়। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় দেশে শিল্প-বিস্তার। বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক উন্নত জাতিকেই শিল্পের সাহায্যে উন্নতি লাভ করিতে হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশকে তাহাদের সমকক্ষ হইতে হইলে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

শিল্প ব্যাপারে বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশের যে শোচনীয় অবস্থা তাহাতে কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের উন্নতি সাধন করিলেই হইবে না। যাহাতে বড় বড় শিল্প-সমূহ এদেশে গড়িয়া উঠে সে দিকে আমাদের সচেস্ট হইতে হইবে। বাঙ্গলাদেশ শিল্প সম্বন্ধে লুপ্ত-চেতন হইয়া আছে। এই চেতনা-শক্তিকে সঞ্জীবিত করা গভর্ণমেণ্টের চেস্টা ভিন্ন সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশ শিল্প সম্বন্ধে নিরুৎসাহ, যাহা কিছু গচ্ছিত অর্থ আছে তাহা শিল্পোন্নতিকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য ধণিকদের সাহস নাই। যাঁহাদের মস্তিষ্ক ও মানসিক শক্তি আছে তাঁহারা অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষপাতী এরূপ অবস্থায় বাহির হইতে কোনরূপ উদ্দীপনা না আসিলে বাঙ্গালীর ব্যবসা বুদ্ধি জাগ্রত হইবেনা। ভারতীয় শিল্প কমিশন (Indian Industrial Commisson) বলিয়াছিলেন, "এই উদ্দীপনা দিতে হইলে তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের আর্থিক ও অন্যান্য প্রকারের সাহায্য প্রদান নিতান্ত আবশ্যক"। শিল্পোন্নতি বিষয়ে প্রেরণা দেওয়া সর্ব্বপ্রথমে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাঁহারা যদি শিল্প বিস্তারের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য দানে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তাহা হইলে জনসাধারণের নৈরাশ্য কটিয়া গিয়া তাহাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হইবে। এই পুনর্গঠন কার্য্য সফল করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বণিকগণকে ও শ্রমজীবীদিগকে সমবেত-ভাবে চেস্টা করিতে হইবে।

সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যাহাতে দেশে শিল্পবিস্তার হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং এসম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও আর্থিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করার জন্য একটি অর্থনীতিক উন্নয়ন সমিতি (Economic Development Board) গঠন করা দরকার। যাঁহাদের উপর দেশবাসীর বিশ্বাস আছে কেবল তাঁহারাই এই বোর্ডের সদস্য মনোনীত হইবার যোগ্য ব্যক্তি। এই বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে দেশের আর্থিক উন্নতি হইতে পারে সেই সকল বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে এবং জনসাধারণকে উপদেশ প্রদান করা। এই বোর্ডের হস্তে নিম্নলিখিত কার্য্যভার সমূহ ন্যস্ত থাকিবে। অর্থনীতিক বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার

সংবাদ সরবরাহ, নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাহায্য করা ও উপদেশ প্রদান অন্যান্য প্রদেশের ও বিদেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ রাখা, শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান এবং যোগ্য শিল্পসমূহকে অর্থ সাহায্য বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ও ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করা। যাহাতে বোর্ড সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকারে এই বোর্ডের সহায়তা করিতে হইবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বোর্ডের কার্য্যে অকারণে হস্তক্ষেপ করা উচিত হইবে না।

যাহাতে বোর্ড সত্যই দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হইতে পারে তজ্জন্য অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বহু সমস্যা সম্পর্কে ইহাকে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন শিল্প ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য ইহাকে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গলাদেশের কোনস্থানে কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কি পরিমাণে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, কোন কোন শিল্পের পক্ষে এই প্রদেশ উপযোগী, কি কারণে বর্ত্তমান শিল্প সমূহ উন্নতি লাভ করিতেছে না, শিল্পোন্নতির পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে তাহা দূর করিবার উপায় ইত্যাদি বিষয় এই অনুসন্ধানের ফলে সম্যকরূপে অবগত হওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের অধীনে বর্ত্তমানে একটি শিল্প বিভাগ আছে। সামাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে এই বিভাগটি কিছু কাজ করিতেছে বটে কিন্তু ইহাকে যথার্থরূপে কার্য্যকুশল করিবার জন্য এই বিভাগকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করা আবশ্যক। এই বিভাগটিকে প্রস্তাবিত বোর্ডের উপদেশ অনুসারে চালিত হইতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে উন্নয়ন কার্য্যের জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মকলাপ হইতে যে আমরা কিছু লাভবান হইয়াছি তাহা আমার মনে হয় না। বিনা কারণে এই ধরণের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া অর্থব্যয় করা কোনমতে সমর্থন যোগ্য নহে।

এই উন্নয়ন সমিতি কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহদাকার শিল্প স্থাপনের এবং তাহাদের উন্নতি সাধনের দিকে দৃষ্টি দিবেন। কুটির শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিল্প যদিও ইহা এখন পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহে তথাপি বহু নরনারী এই শিল্প হইতে তাহাদের অন্নসংস্থান করে। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সূতা কাটা, মোজা ও গেঞ্জী বোনা, রেশম শিল্প কাঁসা ও পিত্তলের বাসন তৈয়ারী লোহার ইস্পাতের জিনিষ পত্র তৈয়ারী, ছুরী, কাঁচি নির্ম্মাণ, তামাক

প্রস্তুত করা, জুতা সেলাই, খেলনা প্রস্তুত করা স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে এই সকল শিল্প সমূহ যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা যদি অপসারণ করা যায় তাহা হইলে উহারা আবার উন্নতি লাভ করিতে পারে। মধ্যমাকার শিল্পের মধ্যে যেগুলিকে সাহায্য করা দরকার তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—চর্ম্ম-শিল্প, সাবান ও মোমবাতির কারখানা, টালী ও ইট তৈয়ারী, চাউলের কল, আচার ও মোরব্বা, পাটের আসন তৈয়ারী ইত্যাদি, গুড় তৈয়ারী পেন্সিল কলম নির্ম্মাণ, কাঠের আসবাব পত্র নির্ম্মাণ, বোতাম চিরুণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ, ছাপাখানার কাজ ও নৌকা তৈয়ারী। এই সকল শিল্প কুটীর শিল্প অপেক্ষা কিছু পরিমাণে বড় বটে, কিন্তু ইহাদের জন্য সুবৃহৎ শিল্পের ন্যায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় না এবং এই কারণে ইহাদের প্রসারের যথেষ্ট সুবিধা আছে।

কিন্তু কেবলমাত্র কুটীর শিল্প বা মধ্যমাকার শিল্পের দ্বারা বাঙ্গলা দেশের অর্থনীতিক উন্নতি সংসাধিত হইবে না। বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের প্রদেশে এখন কয়েকটী কলকারখানা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীদের খুব বেশী স্বার্থ নাই। বাঙ্গালীর মূলধনে গঠিত বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত কাপড়ের কল, পাটের কল, চিনির কল থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এদেশে কাগজের কল ও কাঁচের কারখানা স্থাপন করিবার এখনও যথেষ্ট সুযোগ আছে। নানাপ্রকার কল কব্জা ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। খনিজ শিল্পের উন্নতিরও যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। যদিও আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ কয়েকটী জেলা বাঙ্গলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সকল জেলা ফিরিয়া পাইবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। মোটর গাড়ী প্রস্তুত করার কারখানা প্রতিষ্ঠার এবং রাসায়নিক কারখানা কার্য্য বিস্তারের সুযোগ এ প্রদেশে যথেষ্ট আছে।

জাহাজী কারবার, আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় ও উপকূল বাণিজ্যের দিকেও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রত্যেক ব্যবসা চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক আছে। এই সকল ব্যাঙ্কগুলি যদি এক যোগে কাজ করে তাহা হইলে ব্যবসা বিস্তারের অনেক সুবিধা হয়। শিল্প সমূহকে সাহায্য করিবার জন্য শিল্প-ব্যাঙ্ক (Industrial banks) গঠনে প্রয়োজন। যাহাতে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধনের অভাব না হয়, সেজন্য

যদি গভর্ণমেণ্ট টাকার সুদের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে মূলধনের অভাব হইবে না মনে করি। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলা দেশের গভর্ণমেণ্ট যদি শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার কল্পে মূলধন যোগাইবার জন্য একটি প্রাদেশিক শিল্প সংগঠন ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাও করিতে পারেন। ব্যাকিং তদন্ত কমিটি এইরূপ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এই উন্নয়ন সমিতির অন্যতম কার্য্য হইবে। বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেশে আছে তথাপি তাহারা যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্য করে, সে বিষয় দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রয়োজন হইলে একটি বড় শিল্প শিক্ষাগার স্থাপন করিতে হইবে। শিল্পের প্রসার বিজ্ঞানের সহিত জড়িত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহার বিস্তারের প্রয়োজন। ব্যবসায় শিক্ষা সম্বন্ধে যদিও কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র কিছু ব্যবস্থা আছে, তবু ঐ সকল ব্যবস্থা আরও ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। বাল্যকাল হইতেই বালকবালিকাদিগকে শ্রমশিল্প শিক্ষা দিলে ভাল হয়।

যদি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত অর্থব্যয় করিতে রাজী না হন তাহা হইলে আমি যে গঠন কার্য্যের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছি তাহা কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হইবে না। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ঋণ গ্রহণ এবং তাহার পরিশোধের জন্য বাৎসরিক বাজেটে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কারণে আমি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এ স্থানে কিছু আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি। মণ্টেগু চেমেসফোর্ড শাসন সংস্কারে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের আর্থিক স্বচ্ছলতার কোন প্রকার সুব্যবস্থা না হওয়ায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে সাহায্যকল্পে পাটের রপ্তানী শুল্কের বাবদ আদায়ী টাকার অর্দ্ধেক দিতে স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বহু নূতন নূতন করের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও নিজেদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এই অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহার ফলে ভারত সরকারকে দেয় ঋণ হইতে বাঙ্গলা সরকার মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং পাট শুল্কের ৬২$\frac{1}{2}$ ভাগ প্রাদেশিক সরকারকে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রেল সমূহের আর্থিক স্বচ্ছলতা

হইতে মনে হয় যে আয়করের কিছু অংশও বাঙ্গলা দেশকে দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। যদিও পাট শুল্কের আদায়ী টাকার সমস্তটা এবং আয়করের বেশীর ভাগ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোন ক্রমেই সন্তুষ্ট হইব না, তথাপি ইহাও আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা যেরূপ নৈরাশ্যজনক ছিল তদপেক্ষা বর্ত্তমান অবস্থা অনেক আশাপ্রদ। আমার স্থির বিশ্বাস যে, যদি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের আর্থিক অবস্থা অধিক স্বচ্ছল করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন এবং সুবিবেচনার সহিত অর্থব্যয় করেন তাহা হইলে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাদের অর্থের অভাব হইবে না। পুলিশের বাবদ ব্যয় হ্রাস, ক্রমিক হারে বেতন হ্রাস এবং পূর্ত্ত ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ করিলে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। অন্যান্য বিভাগে হ্রাস করিয়া এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে চেষ্টা না করিয়াই নূতন করভার স্থাপন করা আমি কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পারি না।

আমরা, "সুজলা", সুফলা "শস্যশ্যামলা" বলিয়া আমাদের দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়া থাকি। আমাদের বঙ্গজননী বাস্তবিকই একদিন এইরূপ ছিলেন। এখনও তিনি সুজলা আছেন, কিন্তু তাঁহার জলের আমরা সদ্ব্যবহার করি নাই। আমাদের অক্ষমতা ও অকর্ম্মণ্যতা দ্বারা আমরা তাঁহার ফলদায়িণী শক্তির হ্রাস করিয়াছি। জননী তাঁহার পাঁচকোটী সন্তানের ভরণপোষণ করিয়া নিজে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার অন্নদানের সামর্থ্য ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। যে উপায়ে আমাদের দেশ-মাতৃকার শক্তি বাড়ে, সে বিষয়ে আমরা কখনও চেষ্টা করি নাই। তাঁহার রত্নরাজির লুণ্ঠনে আমরা বাধা দিই নাই, তাঁহার প্রদত্ত ধনসম্ভারের আমরা অপব্যবহার করিয়াছি। সেবার অভাবে আজ বঙ্গজননী দীনা, ক্ষীণা, রোগক্লিষ্টা হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এখনও আমাদের চৈতন্যের উদয় হয় নাই। আমরা গতানুগতিক পন্থায় দিনের পর দিন ধ্বংসের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। এখনও যদি আমরা বাঁচিতে চাই, তবে আমাদিগকে মাতৃসেবাব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যপালনে কোন ক্রটী না হয়, সেজন্য দৃঢ় পণ

করিতে হইবে। আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বলিতে হইবে :—

"আমরা ঘুচাব, মা, তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ।
দেবি আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার আমার দেশ॥"

বন্দে মাতরম্।

ডাঃ **শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,** এম এ,
ডি, এস-সি, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম, এল, এ।

বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান সাধনা।

সমবেত সুধীবৃন্দ!

আজ আপনারা আমাকে যে সম্মানিত আসন দান করিয়াছেন, সে আসন গ্রহণ করিবার আমার যোগ্যতা না থাকিলেও আমি এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি নাই। মনে হইয়াছে যে, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের কার্য্যে মাতৃভাষার সেবার সুযোগ তেমন পাই না আজ যদিবা এইরূপ একটী সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাকে উপেক্ষা করি কি বলিয়া। সাহিত্যিক বলিয়া আপনাদিগের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই, বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তেমন বিরাট কিছু করিবার সৌভাগ্য এখনও ঘটে নাই তবুও আপনারা যে স্নেহ দ্বারা আমাকে আকর্ষণ করিয়াছেন তাহার শক্তি অসীম। এই স্নেহের স্পর্শ আমি নিজে অন্তর মাঝে অনুভব করিয়াছি এবং এই অনুভূতির ফলেই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিবার পরম সৌভাগ্যে আমি ধন্য হইয়াছি। আশা করি আমার সীমাবদ্ধ শক্তি ও ততোধিক সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা যদি কোথাও ভ্রম প্রমাদের সৃষ্টি করি আপনারা স্বীয়গুণে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনাদিগের অনুগ্রহের জন্য আমি একান্ত কৃতজ্ঞ, আমার ভাষা শক্তিহীন বলিয়া সেই কৃতজ্ঞতা কথায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। মাত্র কৃতজ্ঞচিত্তের অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমার আজিকার বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিতেছি।

বিজ্ঞান বলিতে যে একটি দুরূহ বিষয়ের চিত্র মানসনেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা বিস্ময়জনক হইলেও মনোরম নহে। সাহিত্য সভার বিভিন্ন শাখায় আপনারা যে চিত্তোষক সুমধুর শব্দ ঝঙ্কারের পরিচয় পাইয়াছেন তাহার একাংশও বিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে দিতে পারা সম্ভবপর নহে, তবুও যখন বিজ্ঞান, সাহিত্য সম্মেলনের একটী বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়াছে; তখন আমার মনে হয় ইহার দ্বারাও ভাষার সমৃদ্ধি সম্ভবপর। সত্য বলিতে কি আমাদিগের যাবতীয় চিন্তার বাহন যখন এই ভাষাই তখন আমাদিগের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট জ্ঞান ও এই ভাষার সাহায্যেই ব্যক্ত হইবে এবং তাহার আলোচনাও

ইহার দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হইবে। নব নব বিষয়ের বিভিন্ন অর্থবাচক নূতন শব্দের প্রণয়ন দ্বারা বিজ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদ অল্প না হইলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যাবতীয় শিল্প সংক্রান্ত শব্দের অনুরূপ প্রতিশব্দ নির্ণয় করা দুরূহ কার্য্য। কতকগুলি শব্দ এরূপ রহিয়াছে যাহার অনুবাদ করিতে গেলেই নূতন প্রতি শব্দটী কেবল মাত্র যে অনাবশ্যক ভাবে কঠিন হইবে তাহাই নহে বরং অনেক স্থলে সঠিক প্রতিশব্দ নির্ণয় করাই অসম্ভব প্রায়। এরূপ স্থলে যদি আমরা আদিম পরদেশীয় শব্দই গ্রহণ করিয়া লই তাহাও অন্যায় হইবে না। আমার আরও মনে হয় যে অনেক স্থলে যদি বাংলা তেমন যথাযোগ্য শব্দ নাই পাওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো আরবী বা ফারসি ভাষার শব্দ পাওয়া গেলে, সেগুলি অনায়াসে গ্রহণ করা সম্ভব। এইরূপ শব্দ সংগ্রহের ফলে ভাষার সমৃদ্ধি যে বাড়িবে সে কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা আমার আজিকার বক্তব্য নহে।

আমি আজিকার আলোচ্য বিষয় স্বরূপ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের ধারা সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই। বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা, মানব-মনের কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে, তাহার দিকেও দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করিব। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে সমগ্র বিজ্ঞানের আলোচনা সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং কোন একজন লোকের পক্ষে বর্ত্তমানে ইহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপরও নহে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানের আলোচনা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, প্রধানতঃ আমি বিজ্ঞানের একটী বিশেষ শাখা রসায়ন বিজ্ঞানের মধ্যেই আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইব। রসায়নকেও এখন আর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে, ইহার আলোচনা করিতে গিয়া নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে কিন্তু আজিকার এই সাহিত্য সভায় ইহায় কোন বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে না, পরন্তু মোটামুটী ভাবে ইহার ক্রমোন্নতির কথাই উল্লেখ করিব। ইহার বিশিষ্ট আলোচনা কোন বৈজ্ঞানিক সভার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে—এখানে তাহা সম্ভবপর নহে, উচিৎ বলিয়াও মনে করি না।

রাসায়নিকের চিন্তাধারা যুগে যুগে যে পথে পরিচালিত হইয়াছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিবার প্রলোভন আমি এখানে সামলাইতে পারিতেছি না। কবি তাঁহার সোণার তরীতে খ্যাপা সন্ন্যাসীর যে সুন্দর বিবরণটী

দিয়াছেন—তাহাই রসায়নের গবেষকদিগের সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইতে পারে।

তিনি বলিয়াছেন,

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।
একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে,
সন্ন্যাসী ঠাকুর একী, কাঁকালে ওকী ও দেখি
সোণার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে।
সন্ন্যাসী চমকি উঠে, শিকল সোণার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোণা জানেনা কখন।
এক কী কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বার বার
আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর বসে পড়ে ভূমিপর
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা।
পাগলের মত চায় কোথা গেল হায় হায়
ধরা দিয়ে পলাইল সকল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাস মত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন করে ঠেকাইত শিকলের পর।
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ পাথর।

রাসায়নিকের প্রাথমিক চর্চ্চা এই পরশ পাথরের সন্ধানেই আরম্ভ হইয়াছিল, যুগে যুগে মানবের অনুসন্ধিৎসু চিত্ত এই খোঁজার ফলেই নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া বিশ্ব মানবের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। এই অনুসন্ধানে যে অভিনব জ্ঞান মানব লাভ করিয়াছে তাহারই বিবরণ আজ মোটামুটিভাবে আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই যে কোনও একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া যখন আমরা কোনও কার্য্যে অগ্রসর হই, তখন এই উদ্দেশ্যের সাফল্য ঘটিবার পূর্ব্বেই আরও কত নূতন সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যাই। রসায়নের বিরাট অনুসন্ধান সম্বন্ধেও এই কথাটী অত্যন্ত চমৎকার ভাবে খাটে। যে সকল মনীষি রসায়নের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য

সম্পূর্ণরূপে সফল দেখিতে না পাইলেও, নূতনতর বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াই, তাঁহাদিগের আশার অতীত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মানবের আদিমতম সভ্যতার নিদর্শন বর্তমান যুগের অধিবাসী যতদূর জানিতে পারিয়াছে তাহাতে মনে হয় মানবের কৃষ্টি, ক্রমপরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের ফলে আজ যে অবস্থায় নীত হইয়াছে তাহাই পূর্ণ পরিণতি নহে। অতীতের এমন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, এক কালে মানব-সভ্যতার চূড়ান্ত সম্পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছিল; কিন্তু যে রূপেই হউক মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে, যাহার ফলে অতীতের সহিত বর্তমানের ধারাবাহিক সংযোগ সংরক্ষিত হয় নাই। কাল সূত্রের এই বিচ্ছিন্ন অংশ সম্বন্ধে আমাদিগের কোন ধারণাই নাই, ইতিহাস এ সম্বন্ধে আমাদিগকে খুব বেশী সাহায্য করে না। অতএব অতীতের কাহিনী বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহাকে আংশিক ভাবেই আমি পূর্ণ করিতে পারিব। আমার এ অক্ষমতা ইচ্ছাকৃত নহে এই যা আমার সান্ত্বনা।

অতীতের সভ্যতার কাহিনী মনে জাগিতেই স্পষ্টভাবে জাগিয়া ওঠে চারিটী দেশের কথা; গ্রীস্, মিশর, চীন ও আমাদিগের বাসভূমি এই ভারতবর্ষই আদিম যুগের কৃষ্টির প্রচারক ও রক্ষক ছিল। ইহাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষ ও চীন পরস্পরের সহিত ভূভাগ দ্বারা সংযুক্ত রহিয়াছে, এবং গ্রীসের সহিতও অনুরূপ সংযোগ বর্তমান। তবে মিশর ও গ্রীস্ প্রধানতঃ জলভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন বলিয়া সেই সকল দেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন একমাত্র জলপথ দ্বারাই সম্পন্ন হইত বলিতে হইবে। মানব সভ্যতা আদিমযুগে যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় থাকিলেও, তখন যানবাহনের সাহায্যে, এই বিভিন্ন দেশের ব্যবধান সহজে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না, কাজে কাজে এই সকল দেশ, পরস্পরের সহিত জ্ঞানের আদান প্রদান তেমন দ্রুত সম্পন্ন করিতে পারিত না। এই জন্যই প্রত্যেক দেশের কৃষ্টির মধ্যে তদ্দেশীয় চিন্তাধারার বহুল সংযোগ বর্তমান ছিল পরস্পরের সহিত এই যুগের ন্যায় তাহারা কোন বিষয়ের যথেচ্ছ আদান প্রদান করিতে পারে নাই বলিয়া অতীতের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা প্রভূত পরিমাণে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব বিষয় বলিতে হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি মানবের চিন্তার ধারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে আহৃত হইলেও আমরা বিভিন্ন দেশের কাহিনী অধিক পরিমাণে জ্ঞাত হইতে পারি নাই। কারণ এখনকার ন্যায় অতীত কালের চিন্তাধারা বিধিবদ্ধও হইতে পারে নাই এবং

লিপিবদ্ধ হইবার সুযোগও তাহাদিগের ঘটে নাই। ফলে আমরা অতি আদিমযুগের সভ্যতার কাহিনী মোটামুটিভাবে জানিলেও ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিব না। সভ্যতার সাধারণ কথারই যখন এই অবস্থা, তখন তার এক অঙ্গ বিজ্ঞান—তথা রসায়নের কথার তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। তবু দেখা যায় যে চীনেব পোরসিলেনের পাত্র সুদূর অতীতে যে প্রস্তুত হইত, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের সহায়তায় আমরা কতক জানিতে পারিয়াছি। ভারত ভূমিতে বিভিন্ন ধাতু পদার্থ নির্ম্মিত যন্ত্রপাতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। গ্রীস্ ও বিশেষতঃ মিশরের পুরাতন নিদর্শন যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় সেই সকল দেশেও রাসায়নিক চর্চ্চার অভাব ছিল না, পরন্তু ব্যাপকভাবে এ বিষয়ের আলোচনা সেই সকল দেশমধ্যে সম্পাদিত হইত।

বিজ্ঞান সাধনার দুইটী দিক বর্ত্তমান, ইহার একাংশে আমরা পরীক্ষামূলক আলোচনা করিয়া থাকি এবং দ্বিতীয়াংশ ভাববাচক আলোচনায় পূর্ণ। পূর্ব্বে যে দু'একটী নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছি; গ্রীস্, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীনের ঐগুলি পরীক্ষামূলক রসায়ন চর্চ্চার নিদর্শন বিশেষ, চিন্তামূলক গবেষণার তেমন উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি তখনও হয় নাই। ভারতবর্ষে আদিমযুগের জ্ঞানিগণ জানিতেন যে মূল পদার্থ বলিতে পাঁচটী জিনিষের উল্লেখ করা যায়; ইহা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই অবগত আছেন যে ইহাদিগের কাহাকেও মূল পদার্থ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, পরন্তু ইহাদিগের মধ্যে যাহারা পদার্থবাচক শব্দ তাহাদিগের প্রত্যেকটীই একাধিক মূল পদার্থ সহযোগে প্রস্তুত। অন্যান্য দেশেও পদার্থের মৌলিকতা সম্বন্ধে ইহার অনুরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। মানবের চিন্তার ধারা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে অতীতের বিজ্ঞান আলোচনা বর্ত্তমানের তুলনায় সাতিশয় নগণ্য ছিল। তৎকালে মানবের আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান নিরতিশয় পুষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতত্ত্বের মধ্যেও এই আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম গ্রীক এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া যাবতীয় পদার্থকে একই মূল পদার্থ হইতে বিনির্ম্মিত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকও প্রায় সেই একই সুর তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে এ দু-এর মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি।

মধ্য যুগের ইউরোপ অজ্ঞানতার অন্ধকারায় আবদ্ধ ছিল। তথায় ধর্ম্মের বাণী যেমন এশিয়া হইতে নীত হয়, জ্ঞানের দীপ শলাকাও তেমনি এই প্রাচ্যের মনীষিরা তথায় জ্বালাইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ সমগ্র ইউরোপ স্পেনের মুস্‌লিম পাণ্ডিতদিগের নিকটই গ্রহণ করিয়াছিল। আজ প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের বশে দুর্ভাগ্য মুস্‌লিম সমাজ অজ্ঞানতার মধ্যেই অতি ক্লেশে জ্ঞানোজ্জ্বল নূতন রাজ্যের অভিমুখে অতিশয় ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইউরোপই আজ সে রাজ্যের প্রধান পথপ্রদর্শক। বিজ্ঞান ইউরোপকে কেবলমাত্র বৈষয়িক প্রাধান্য ও আর্থিক আধিক্যই প্রদান করে নাই, অধিকন্তু তাহার অন্তরকেও নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া নূতন জাতির সৃজন করিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস যত্নের সহিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তথায় পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে যখন খৃষ্টধর্ম্মের নূতন বাণী প্রচারিত হয় তাহার দ্বারা সারা দেশের মধ্যে নব প্রেরণা দেখা দিয়াছিল এবং ধর্ম্মভাবের তীব্র অনুভূতির ফলে তাহাদিগের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হওয়ায় সমস্ত দেশ নিদারুণ কুসংস্কারে অভিভূত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের নামে যে গোঁড়ামির সাক্ষাৎ তদানীন্তন ইউরোপের ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহার ফলে স্বাধীন চিন্তা তথা হইতে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তখন ধর্ম্ম প্রচারকের সহিত মতের অমিল হওয়ায় স্বাধীন চিন্তা নায়কদিগের অনেকেই অকাল মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হয়েন। গ্যালিলিও, কোপার নিকাস্‌ প্রমুখ বিজ্ঞান সাধকদিগের উপর কত নির্য্যাতন স্তূপীকৃত হইয়াছিল এখন কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? লাভোসিয়ে, তদানীন্তন যুগের ফরাসী বৈজ্ঞানিক, আজ বিশ্ব যাঁহার সাধনার ফলে নূতন জ্ঞানের অধিকারী, তিনিও অকালে ঘাতকের ক্ষুরধার খড়্গাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এমন যে ইউরোপ, বিজ্ঞানের সাধনা প্রকৃতপক্ষে তাহার দৃষ্টি-কোণ আজ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। ইউরোপ কেবলমাত্র অর্থই লাভ করে নাই, সে নূতন জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নূতন জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

অতএব বলিতে হয় বিজ্ঞান কেবলমাত্র বিত্ত সংগ্রহের সহায়ক নহে, ইহার সাহায্যে মানবের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, মানব তাহার চিত্তের উৎকর্ষতা লাভ করে। বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেকটি প্রশ্নের সমাধান উপলক্ষে, তাহার আলোচনা বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে সম্পন্ন করিয়া, অবশেষে সঠিক পথটাই অবলম্বন করেন। বিজ্ঞানের ইহাই যখন আদর্শ পন্থা তখন কেবলমাত্র লোক বিশেষের নহে, সারা জাতির মধ্যে নূতনত্ব আনয়ন করিতে, নব জাগরণের আনন্দ

দান করিতে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির জীবনে ইহা সত্য বলিয়াও প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা এই বলিয়া গর্ব্ব করি যে সুদূর অতীতে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের, যে মহা সত্যের সন্ধান, এই প্রাচ্য ভূমির অধিবাসিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; ইউরোপের আধুনিক উন্নতি তাহার কাছে অতি সামান্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। হয়তো একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম, কিন্তু যাহা চতুষ্পার্শ্বে প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাতে তো সেই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না। আজও তো আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কার মস্তক উত্তোলন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিজ্ঞান তার জ্ঞান প্রদীপের সাহায্যে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকার যদি দূর করিতে না পারিয়া থাকে তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক সাধনার কি নিদর্শন আমাদের মধ্যে দেখা গেল !

কিন্তু সে কথা এখন যাক। আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবের নৈতিক নীতির পরিবর্ত্তনের কথাই আজ একান্তভাবে আলোচনা করিতে চাই না। বিজ্ঞান আলোচনার ফলে অতীতে কোন কোন প্রাকৃতিক সত্যের সন্ধান মানুষ পাইয়াছিল তাহাই এবার বলিব। ভারতের অতীত ইতিহাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কানদা, চিকিৎসক-প্রধান চরক ও শুশ্রুত, রাসায়নিক নাগার্জ্জুন প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সুদূর অতীতে চরক ও শুশ্রুতের লিখিত গ্রন্থে বিভিন্ন গাছপালার যে বিশেষ গুণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার দ্বারা আজিও মানুষের কতই না উপকার সাধিত হইতেছে। নাগার্জ্জুনের প্রতিভা, মহাকাল তন্ত্র ও রস রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অধিকন্তু তাঁহার রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় তদানীন্তন যুগের ধাতু পরিষ্কার কৌশল হইতে বহুল পরিমাণে জানিতে পারা যায়। এই সকল রাসায়নিক সেই যুগে স্বুবর্ণ নির্ম্মাণের বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই পদার্থবিষয়ক চর্চ্চার আরম্ভ করেন। অন্য পদার্থের রূপের পরিবর্ত্তন দ্বারা তাঁহারা যে স্বর্ণ সদৃশ পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। রসরত্নসমুচ্চয়ে স্বুবর্ণকে পাঁচটী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ত্রিবিধ সুবর্ণ স্বর্গীয় নিদান ভুক্ত কিন্তু চতুর্থশ্রেণীর স্বুবর্ণ খনিজ বলিয়া কথিত, এবং পঞ্চম বিধ সুবর্ণই হীনতর ধাতুর পরিবর্ত্তন দ্বারা বিনির্ম্মিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ লৌহ হইতে সম্পাদিত হইত, কিন্তু এই পঞ্চবিধ সুবর্ণের কোন নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না, যদি তাহা পাওয়া সম্ভবপর হইত তাহা হইলে আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারিত। সে যাহাই হউক

এই পরিবর্ত্তনের একটী যোগ্য উপায় আবিষ্কার করিতে গিয়া নির্ম্মল লৌহ এবং অন্যান্য ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ধাতুবর্গের মধ্যে লৌহ যে বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হইয়া বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইত তাহার নিদর্শন যেমন পুরী, সোমনাথ ও কণারকের মন্দির গাত্রে বর্ত্তমান তেমনি দিল্লীর কুতুবমিনারের লৌহস্তম্ভ অতিশয় পরিষ্কার ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে তদানীন্তন ভারতবর্ষে কেবল যে নির্ম্মল লৌহ প্রস্তুত হইত তাহাই নহে পরন্তু সেই লৌহ দ্বারা সুদীর্ঘ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার শিল্প কুশলতা সেকালের লোকের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে এই লৌহ স্তম্ভ ওজনে প্রায় ২৭০ মণ এবং আধুনিক যুগেও এইরূপে বৃহৎ লৌহ স্তম্ভ খুব বেশী সংখ্যায় প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় না।

ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলেও মিশর, গ্রীস্, চীন, বেবিলন, রোম প্রভৃতি যাবতীয় দেশেই পুরাকালের শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে রাসায়নিক চর্চ্চার অল্পাধিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরব ও পারস্যের মুস্লিম বৈজ্ঞানিকগণ যেমন গণিত, পদার্থ বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়া নূতন তথ্য দ্বারা বিশ্বমানবকে উপকৃত করিয়াছেন; তেমনি তাঁহারা নব্য রসায়নের আদি পাঠ ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দকে শিক্ষা দিয়া বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নব যুগের সূচনা করিয়াছিলেন। এখানেও দেখিতে পাই রসায়নের প্রেরণা যোগাইয়াছিল সেই একই বিষয়। পরশ পাথরের সন্ধান কেবল যে ভারতবর্ষে চলিয়াছিল তাহাই নহে; মিশর, আরব, গ্রীস প্রভৃতি প্রত্যেক দেশেই পরশ পাথরই দার্শনিকের প্রস্তর' বা 'ফিলোসফরাস্ ষ্টোন' নামে পরিচিত হইয়া ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানের সামগ্রী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। মানবের কোন পরিশ্রমই যেমন ব্যর্থ হয় না তেমনি এই পরশ পাথরের অনুসন্ধানও একেবারে বিফল হয় নাই, হয়তো সুবর্ণ নির্ম্মাণের কোন বিশিষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হইবার এখনও সময় আসে নাই কিন্তু পরশ পাথরের স্পর্শ দ্বারা মানবের অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মন যে জ্ঞানের নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে মুস্লিম বৈজ্ঞানিকগণ আধুনিক অম্ল পদার্থ ও ক্ষার পদার্থগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী **Alkali** নাম, আরবি আল্‌কিলির অপভ্রংশ মাত্র। এইরূপ বহু সংখ্যক আরবি শব্দ ল্যাটিনের মধ্য দিয়া আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে কোন ইংরাজ রাসায়নিক লিখিয়াছেন। "আমরা দেখিতে পাই যে আমাদিগের গ্রন্থকারদিগের চিন্তা শক্তি, তেমন কার্য্যকারী নহে, যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে সামান্য কোনরূপ সাক্ষ্য

প্রাপ্ত হয়েন তাহাই সত্য বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পারদ সম্বন্ধীয় রচনাটী ইহার আরবী মূল নিদান সম্বন্ধে পরিষ্কার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং আবুসিনার মধ্যে দিয়া অবশেষে জাবিরের লেখা বলিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে কোন নূতন কথা, অথবা মৌলিকদান কিংবা নবীন কল্পনা (Theory) কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের নাই। তখনও এ নব বিজ্ঞান সবে গঠিত হইতেছিল এবং মুসলিম লেখকের বিবরণ হইতে যে কত বিষয় গ্রহণ করা হইরাছে তাহা, অসংখ্য অনুবাদ এবং আরবী শত শত রাসায়নিক শব্দের ল্যাটিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দ্বারায় নির্ণীত হইতে পারে" ইহার পরে উক্ত বৈজ্ঞানিক যে সুদীর্ঘ শব্দ তালিকা তাঁহার লেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে প্রাথমিক ইউরোপীয় রসায়ন, আরব রাসায়নিকদিগেরই নিজের জিনিষ ছিল। এখানে আমি এই সকল বিষয় উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের আর অধিক সময় নষ্ট করিব না।

অতীতের যে জ্ঞান ধারার আলোচনা করিলাম বর্ত্তমানে তাহাই বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এখন মনে হয়, যেন পূর্ব্বের সহিত এই বর্ত্তমান উন্নত যুগের বিজ্ঞানের কোনও যোগ সূত্রই নাই। বর্ত্তমানে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিয়াছি ও ইহার ফলে ভবিষ্যত আমাদিগের কি হইতে পারে তাহাই এখন সংক্ষেপে বলিতে চাই। বলিবার বিষয় বহু হইলেও আমাকে মাত্র কতকগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে, অন্যথায় কাহিনীও দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতিরও সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞানের সাধনা দ্বিবিধ উপায়ে অগ্রসর হয়। ইহাদিগের একটী চিন্তামূলক এবং অপরটী পরীক্ষামূলক। বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা মানবের চিন্তাধারায় কি অভিনব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে সেই কথাই প্রথমে আলোচনা করিব। পদার্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে গ্রীক দার্শনিকদিগের মনে হইয়াছিল যে, যাবতীয় পদার্থ একই মূল পদার্থ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। মানবের আদিম চিন্তায় সে চিরকালই একের পূজারী, বিভিন্ন ধর্ম্মমত এই একই ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া যুগে যুগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। একমেবাদ্বিতীয়মের বাণী যেমন বেদের ধর্ম্ম হইতে মানব গ্রহণ করিয়াছে, হজরত ঈসা, মুসা, অথবা হজরত মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মও সেই একই বিশ্বপতির উপাসনার প্রয়োজন বার বার আমাদিগের চঞ্চল চিত্তের সম্মুখে উত্থাপন করিয়াছে। অতএব ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনই কারণ নাই যে পদার্থের স্বরূপ বুঝিতে গিয়াও মানব এইরূপ একটী মূল পদার্থের

উল্লেখ করিবে। এই মূল পদার্থই অবস্থা বিশেষে তরল, কঠিন ও বায়বীয় রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এক হইতে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে। ইহাই পদার্থ সম্বন্ধে আদি মানবের পরিকল্পনা। যতদিন এই সকল আলোচনা সম্পূর্ণরূপে চিন্তামূলক ছিল ততদিন কেহ কোনও অসুবিধাই অনুভব করে নাই। কিন্তু মধ্য যুগে ইহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা আরম্ভ হইতে আর তখন ইহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। একই মূলপদার্থ হইতে যাবতীয় পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, উহার রূপান্তরের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে সত্য হইতে বাধা। কিন্তু তাহা যখন সম্ভবপর হইল না তখন স্থির করা গেল যে, কতকগুলি বিভিন্ন পদার্থ এইরূপ মূল শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে এবং উহাদিগের বিশিষ্ট সংযোগের ফলে নূতনতর অসংখ্য পদার্থ নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর। এই নির্ম্মাণ কার্য্য পরীক্ষাগারেও সম্পাদিত হয়; অথবা স্বাভাবিক উপায়েও ইহা অগ্রসর হইতে পারে। অতএব মূল পদার্থের একত্র সংযোগ বা সংশ্লেষণের ফলেই নূতন যে পদার্থ নির্ম্মিত হয় তাহাই যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থ নির্ম্মাণ ব্যাপারটা বিশদ আলোচনার ফলে পদার্থের সূক্ষ্মতম কণা অণু ও পরমাণুর পরিকল্পনা সম্ভবপর হইল। ইহাদিগের রূপের আলোচনায় স্থির হইয়াছে যে পদার্থ মধ্যে এই অণুগুলি স্থিরভাবে বিরাজ করে না, পরন্তু উহারা অবিরত চলিয়া ফিরিতেছে। এইরূপ পরিকল্পনাই Kinetic theory বা গতিতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত। অণু ও পরমাণু অবিরাম গতির ফলেই নানাবিধ ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংসাধিত হইতেছে। একখণ্ড সৈন্ধব লবণ কোন পাত্রে রাখিয়া জল দ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করতঃ রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, অল্প কাল মধ্যে সমস্ত জলই লবণ আস্বাদ-যুক্ত হইয়াছে, ইহা কি জলায় অণুর গতির কাহিনী বিবৃত করে না? জল উত্তপ্ত হইলে উহার অণুগুলি সাতিশয় বেগে পাত্র হইতে বহির্গত হইয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতিনিয়ত পদার্থের মধ্যে এই গতিশীলতার জন্য আরও বহুবিধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়। এই গতির মধ্যে কোনও বিশিষ্ট ছন্দ ধরা পড়ে নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জড়ের এই গতির কাহিনী এইরূপে প্রকাশিত হইতে পারে।

নাই সুর নাই ছন্দ অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্ত্তন
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ

জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু
নূতন জীবন স্নায়ু টানিছে হতাশে
দিগ্বিদিক নাহি জানি বাধা বিঘ্ন নাহি মানি
ছুটেরে প্রলয় পানে আপনারি ত্রাসে।

ক্রমে অণুর স্থূল পরিকল্পনা হইতে রাদার ফোর্ড, বহ্‌র প্ল্যানক হইতে আরম্ভ করিয়া সমারফিল্ড, লিউইস্, ল্যাংম্যু'র পর্য্যন্ত যাবতীয় মনীষিবর্গের চিন্তাধারা পরমাণুকে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে প্রচার করিলেন। এইরূপে বিশ্বমানবের চিন্তাধারা স্থূল হইতে ক্রমশঃ অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। পরমাণু আজ স্থির অবিভাজ্য পদার্থ কণা নহে, ইহাও যেন একটী সৌর-জগৎ বিশেষ। প্রতিটী পরমাণুর মধ্যে মূল পদার্থের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন কণা ভীমবেগে প্রোটনগুলির চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করিতেছে। এই প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের গুণ প্রতি পদার্থেই একরূপ। অর্থাৎ পদার্থের আধুনিক পরিকল্পনায় সূক্ষ্মতম তত্ত্বেও আমরা যেন সুদূর অতীতের গ্রীক দার্শনিকের মতের মধ্যেই আসিয়া পড়িতেছি। প্রত্যেকটী মূল পদার্থের মধ্যে একই গুণ বিশিষ্ট ইলেকট্রন ও প্রোটন যখন অবস্থান করিতেছে এবং উহাদিগের বাহ্যিক পার্থক্য ইলেক্‌ট্রন কণার সংখ্যার পার্থক্য অনুসারেই যখন ঘটিয়া থাকে তখন আর পদার্থের রূপান্তরের কাহিনী অলীক বলিয়া মনে করা যায় না। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে তাই পরমাণুর বিশ্লেষণ চেষ্টা বিশেষ ভাবেই চলিতেছে।

পরমাণুর বিশ্লেষণ কাহিনীর উল্লেখ করিতেই আমার কয়েকটী কথা মনে পড়িয়া গেল। ফরাসীর সুবিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরি বিশ্বের যে বিস্ময়কর পদার্থটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই রেডিয়াম নামে পরিচিত হইয়া পরমাণুর আন্তরিক রূপ সম্বন্ধে নূতন বাণী জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে মানব জানিতে পারিয়াছে যে প্রত্যেকটী পরমাণুর মধ্যে অজস্র শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে, এবং পরমাণুর বিশ্লেষণ দ্বারা এই নিদারুণ দৈত্য শক্তির উদ্ভব সম্ভবপর। হয়ত মানব একদিন এই শক্তি প্রকৃতপক্ষে কাজে লাগাইতে পারিবে কিন্তু এখনও পরমাণুর বিশ্লেষণ ফলে এই প্রচণ্ড শক্তিতে আহরণ করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রায় এক পোয়া পরিমাণ সীসার মধ্যে যে শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহাকে মুক্ত করিতে পারিলে কেবলমাত্র সেই শক্তির সাহায্যেই একখানি বিমানপোতকে সমস্ত পৃথিবী ঘুরাইয়া আনিতে

পারা যাইবে। এই সম্বন্ধে ডক্টর এস্টনও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে একগ্লাস পরিমাণ জলে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহার দ্বারা মরিটেনিয়া জাহাজকে অতি সহজে চালাইয়া লওয়া যাইবে। এই শক্তি অন্য কিছুই নহে, ইহারই সাহায্যে প্রত্যেকটী পরমাণু স্বীয় বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ইলেকট্রন-গুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে। পরমাণুর বিশ্লেষণ ফলে, এই ইলেকট্রন-গুলিই স্বীয় নির্দ্দিস্ট পথ হইতে ছিন্ন হইয়া আসিবে। এই প্রচণ্ড শক্তির কথা এদেশে আমরা দেখি নাই কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যখন ডক্টর ওয়ালে-র পরমাণু বিশ্লেষণের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল তখন ইংলণ্ডের সাধারণ লোকদিগের মধ্যে অনেকের মধ্যেই বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, এই ভাবিয়া যে হয়তো বা এই শক্তি প্রভাবে অকালেই এই রমণীয় পৃথিবীর ধ্বংস সাধিত হইবে।

পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মানষনেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, রাসায়নিকের সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তির কথা, যাহার দ্বারা মানবের নানা ব্যাধির প্রতিকার দ্বারা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে দীর্ঘতর করা সম্ভবপর হইয়াছে। রসায়নের সূচনা হয় রোগের প্রতিকারকল্পে ঔষধের পরীক্ষার মধ্যে, সেই রসায়নই কালে নানাভাবে নানাবিধ পদার্থ আবিষ্কার করিয়া মানবকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। রাসায়নিক পাস্তুর যেমন রোগের প্রতিষেধক টীকার আবিষ্কার করেন, তেমনি পরবর্ত্তী যুগে অন্যান্য রাসায়নিক সংজ্ঞাহারী ও পচন নিবারক বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার কার্য্য বহুল পরিমাণে সহজ ও নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছেন। সুবিখ্যাত চিকিৎসক সার প্যাট্রিক ম্যানসন ও সার রোণাল্ড রস যথাক্রমে এলেফেনটিয়াসিস ও ম্যালেরিয়ার বাহন, দ্বিবিধ মশার কীর্ত্তি, পরিষ্কার ভাবেই প্রকটিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে রোগের প্রতিকারকল্পে যে ঔষধের প্রয়োজন তাহা এই রাসায়নিকই প্রস্তুত করিয়াছেন। এখনও নানাবিধ পীড়ার প্রতিষেধকের পরীক্ষা অনবরত হইতেছে। সুস্থ দেহের জন্য একান্ত প্রয়োজন যে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ অথবা বিভিন্ন গণ্ডরস বা হরমোন, তাহাও এখন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লোকহিতকর এই বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে ভারত কি করিয়াছে ? অতীতের যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের একটী উল্লেখযোগ্য স্থান থাকিলেও বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান-সাধনায় তাহার তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও অবদান বিশ্বসমাজে পরিচিত নাই। কিন্তু তবু একথা ভুলিবার নহে যে আধুনিক

ভারতের বিজ্ঞান সাধকগণ এদেশের গভীর আলস্য-নিদ্রার মধ্যে সবে নব-জাগরণের সাড়া জাগাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ভারতের পুণ্যভূমি হইতেই বাংলার প্রিয় সন্তান স্বর্গীয় সার জগদীশচন্দ্র বসু সজি জগতে জীবনের চির চঞ্চল গতির পরিচয় কথা প্রচার করিয়া বিশ্বমানবকে মুগ্ধ করিয়াছেন। সার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান-সাধনার প্রতি এদেশবাসীর একাগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে নবীন রাসায়নিক সঙ্ঘের আবির্ভাবে সাহায্য করিয়াছেন আশা করা যায় তাহারা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাসায়নিকের মধ্যে নিজেদের জন্যও একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ণয় করিয়া লইবে। চিন্তামূলক বিজ্ঞানের মধ্যে এদেশের আর একটী বরণীয় সন্তান সার ভেঙ্কট রমণ যে নূতন বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার সহায়তায় বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সভায় ইহারই মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া তিনি ভারতবাসীর অবনত মস্তককে বিশ্বসভায় উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। এদেশের আয়তনের তুলনায় আমাদিগের এই সকল কর্ম্ম সংখ্যা সাতিশয় অল্প, তবুও নিরাশার কারণ নাই। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের উজ্জ্বলতর দিনের কথা এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে। এদেশের উদীয়মান যুবসম্প্রদায়কে তাই একান্ত আগ্রহে আহ্বান করি এই পুণ্য ব্রত গ্রহণ করিতে তাঁহারা অগ্রসর হউন।

এতক্ষণ বিজ্ঞানের গঠনমূলক দিকটীর আলোচনাই করিয়াছি, কিন্তু উহার আরও একটি দিক বর্ত্তমান, সেটী তাহার সংহারক মূর্ত্তি।

বৈজ্ঞানিক নিত্য যেমন নবীন সৃষ্টি দ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তেমনি তাঁহার আবিষ্কৃত কতকগুলি বিষয়ের সহায়তায় মানবের বিকৃত চিত্ত তাহার অসদ অভিপ্রায় চরিতার্থ মানসে নানাবিধ জীবন সংহারক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধোপকরণ হিসাবে সেগুলিকে ব্যবহার করিতেছে। ইহা সত্য যে বিজ্ঞানই এই বিভিন্ন সামগ্রী যোগাইয়া মানবের পার্থিব সম্পদ লিপ্সা চরিতার্থ করিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কি মানব চিত্তেরই একটী বিকট ভাব বশতঃ ঘটে নাই ? আমরা জানি অন্ধের পক্ষে যষ্ঠির প্রয়োজন কত অধিক, কিন্তু এই যষ্ঠিই অন্যত্র প্রহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই বলিতে হয় যে মানবের বিকৃত মনোভাবই বিজ্ঞানের এই অপব্যবহারের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানের সাহায্যে যেমন বিবিধ ধ্বংসকারী যন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে তেমনি বিজ্ঞানই পুনরায় এই সকল নিদারুণ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবাব উপকরণ যোগাইয়া চলিয়াছে। এই জন্যই বলা যায় যে ইহার এক হস্ত যেমন ধ্বংস মানসে উদ্যত কৃপাণ ধারণ

করিয়াছে, অন্য হস্তে তেমনি উহা বরাভয় লইয়া ভীত মানবকে সান্ত্বনা দান করিতেছে। অতএব বিজ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে এই ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী নহে। মানব মনের পরিপূর্ণ সংস্কার যতদিন না ঘটে, ততদিন এই প্রচণ্ড আসুরিক প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অসম্ভব।

এইতো বিজ্ঞানের বর্ত্তমান পরিস্থিতি। ইহার মধ্যে আমরা যে বিভিন্ন কথার আলোচনা করিয়াছি তাহাদিগের অধিকাংশ ইউরোপের কর্ম্মক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপ কেবলমাত্র যে বিজ্ঞান দ্বারা তাহার জড় প্রকৃতির উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহাই নহে, পরন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা তথায় মানবের অন্তরদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া, মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধ ইউরোপীয় সমাজের মনের মধ্যে বিরাট বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়া, আজ তথায় সাধারণ মানবকে পূর্ণতর অখণ্ডিত মানবতার মহান আদর্শে উন্নীত করিয়াছে। আমার কিন্তু একথা ভাবিয়া দুঃখ হয় যে বিজ্ঞান-আলোচনার সূচনা যদিচ প্রাচ্য দেশেই ঘটিয়াছিল তবুও বিজ্ঞানের যাহা প্রধান দান—মানবের শিক্ষাধারাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহাকে সংস্কার হইতে উদ্ধার করা—সেই বিজ্ঞান শিক্ষার অতি সাধারণ সুফল আমাদিগের মনের উপর ঘটিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের শিক্ষায় শ্রেণীবিভাগ নাই, বরং শ্রেণীবিভাগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া শিক্ষার মধ্য হইতে সাম্প্রদায়িকতাকে চিরতরে বিদূরিত করিবার মহান আদর্শই বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা আমরা পাইয়া থাকি। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় যে আজও আমরা শিক্ষার এই দিকটা সম্বন্ধে মোটেই সজাগ হইতে পারি নাই, যে সাম্প্রদায়িকতার হীন মনোভাব সমাজ নির্বিশেষে আমাদিগের দেহ ও মনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহার তুলনা এই আধুনিক সমাজে কোথাও দেখিতে পাই না। দুঃখ হয় এই ভাবিয়া যে, মুসলমানের মৌলবী ও পীর সাহেবান যেরূপ কথায় কথায় কাফেরের ফতওয়া দিয়া নিজকে মধ্যযুগের ইউরোপীয় পাদরীদিগের সহিত প্রায় একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া চলিয়াছেন, তেমনি বিরাট এই হিন্দুসমাজ ছুঁৎমার্গের কদাচার দ্বারা মহামানবতার অবমাননা করিয়া নিজ গৃহে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করার ফলে উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেশময় অশান্তির বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছেন। নব্য বাংলার জনপ্রিয় কবি নজরুল ইসলাম ইহা লক্ষ্য করিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে গাহিয়াছেন।

জাতের নামে বজ্জাতি তোর,
জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে,
জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া।
ভগবানের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই।

আমি সমাজ-সংস্কারকের পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য এখানে এবিষয়ের অবতারণা করি নাই। নদীয়ার পুণ্য ক্ষেত্র হইতে শ্রীচৈতন্যদেব যেমন একদিন এই সামাজিক দৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নূতন হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, হয়তো ভবিষ্যতে অন্য কেহ এই পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই একতার মহা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইবেন। আমি কেবলমাত্র, আমাদিগের বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তাধারার অভাবের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব। অতএব আমার দৃষ্টিকোণ একটু ভিন্ন; আমি বলিতে চাই যে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যে উপদেশ লাভ করি তাহা যেন ত্বকস্পর্শী না হইয়া আমাদিগের অন্তরকেও স্পর্শ করিতে পারে। তাহা হইলেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সার্থক হইবে, এবং তখন সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তের সম্প্রসারণ দ্বারা উচ্চতর মার্গে উন্নীত হইতে পারিব। আমার বিশ্বাস, যেমন বিভিন্ন কৃষ্টির সমন্বয় সামাজিক ক্ষেত্রে একত্র মেলামেশার ফলে সংঘটিত হইতে পারে তেমনি সেই একই কার্য্য বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চার দ্বারাও আমরা সম্পাদন করিতে পারি। অতএব বিজ্ঞান শিক্ষার যাহাতে বহুল প্রচলন ঘটে তাহার জন্য একান্ত চেষ্টা করা এদেশের প্রত্যেক নরনারীর বিশেষ কর্ত্তব্য। আমাদিগের জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে যে নূতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই দেশের জন্য নবীন ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষাস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা জাতির জ্ঞানভাণ্ডার যেরূপ সমৃদ্ধ হইবে সেই অনুপাতেই তাহার সংস্কারাচ্ছন্ন মন নূতন জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ফলে আমাদিগের এই শতধা বিভক্ত সমাজে সংঘবদ্ধ হইবার মনোভাবের নিশ্চয়ই সূত্রপাত ঘটিবে। শিশুর মন চিরকালই অনুসন্ধিৎসু; এটা কি, ওটা কি, এইরূপ প্রশ্নে তাহার অন্তরের জ্ঞানের পিপাসার নিদর্শন সে অতি শৈশবকাল হইতেই দেখাইয়া থাকে। বিজ্ঞান আলোচনার ফলে তাহাকে আর স্তোকবাক্যে তুষ্ট রাখা চলিবে না। সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা দ্বারা সে সম্পূর্ণরূপে

পরিতৃপ্ত হইতে চেষ্টা করিবে। তখনই অন্ধবিশ্বাস এবং গোঁড়ামীর মূলে কুঠারাঘাত হইবে, সে কথা আমি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি এবং এই জন্যই আশা রাখি যে ভবিষ্যতের ভারত, বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নিরত ভারত, জ্ঞানের নূতন গরিমায় গরিমান্বিত ভারত একটী সম্পূর্ণ জাতি হিসাবেই নিজেকে প্রকাশিত করিবে।

জগতের বিভিন্ন জাতি স্থির হইয়া বসিয়া নাই। প্রগতিশীল এই বিশ্বমাঝে স্থাণুর ন্যায় স্থির থাকা চলে না, কাজেই সকলেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এযুগই উন্নতির যুগ, বিজ্ঞানের সাধনাও তাই অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যতের জগতের কী যে রূপ, এই পরিবর্ত্তন ফলে দাঁড়াইবে, তাহা স্থির করা তেমন সহজ নহে। তবে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনামূলক পরীক্ষা দ্বারা আমরা ভবিষ্যতের চিত্রও অন্ততঃ আংশিকভাবে প্রস্তুত করিতে পারি। পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় এই ভবিষ্যতের কথা যেরূপভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা অতিশয় অদ্ভুত, আমি সে সকল তথ্যের কোনও আলোচনা করিব না, আমার মনে হয় অত্যদ্ভুত কোনও কিছু না ভাবিয়াও আমরা বলিতে পারি যে নূতনতর সত্যের সন্ধান পাইয়া মানব তাহার আরব্ধ কার্য্যের বহুল পরিমাণে পূর্ণতা আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু বিশ্বের কথা, অর্থাৎ সমগ্র মানবতার কথা আলোচনা না করিয়া আমি নিজেকে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিব, আজ আমি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আলোচনার কথাই বলিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষের বাহিরে সমগ্র জগৎ একাগ্রভাবে এই দেশের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে কি জন্য? আমাদের দেশে মাটীর নীচে কি সোনা জহরতের খনির খবর তাহারা পাইয়াছে, না এদেশের লোকের সিন্দুকের মধ্যে অজস্র সোনা দানা লুক্কায়িত রহিয়াছে, এই সংবাদ তাহাদিগের নিকট পৌঁছিয়াছে? এ দুটার কোনটার জন্যই আমরা সম্পদশালী বলিয়া পরিচিত নহি। এ দেশের লোকের গড় আয় মাত্র দৈনিক ছয় পয়সা, অথচ ইউরোপের লোক, দৈনিক গড়ে প্রায় তিন টাকা উপার্জ্জন করে অথচ এদেশেই আমরা সম্পদশালী বলিয়া পরিচয় দিই; ইহার একমাত্র কারণ এই যে এ দেশের মাটী যে শস্য দান করিতে সক্ষম, এ দেশের খনিজ সম্পদের দ্বারা যে বিত্ত আহৃত হইতে পারে, তাহার পরিমাণ বড় অল্প নহে। এই হিসাবেই ভারতবর্ষ ধনীদেশ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। দুঃখের বিষয় আমাদের এই ধন

সম্পদ আমরা ব্যবহারে আনিতে পারি না, ইহার যথোচিত পরিবর্ত্তন দ্বারা অধিকতর মূল্যে ইহাকে বিক্রয় করিতে পারি না, যে অল্প পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে আমরা দেশের উৎপন্ন পণ্য প্রদান করিয়া থাকি তাহাতে আমরা কখনই ধনশালী হইতে পারিব না, কিন্তু এই পদার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া ইহার নানাবিধ পরিবর্ত্তন দ্বারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এই সকল দ্রব্যই এ দেশে এবং অন্যান্য দেশে বিক্রয় করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াও হইতেছে না, আমরা যেন একান্ত ভাবেই নিষ্কর্ম্মার সর্দ্দার, কাজে কাজেই কোনওরূপ পরিশ্রমসাপেক্ষ কর্ম্মের প্রতি আমরা অগ্রসর হইতে নারাজ।

বিজ্ঞান জগৎ নানাবিধ শিল্পালয়ের কাযে যে সকল কাঁচা মাল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই হয় কৃষিজাত নয় খনিজ পদার্থ। অতএব আমরা চেষ্টা করিলে এই উভয়বিধ দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে কাযে নিযুক্ত করিয়া সুবৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিতে পারি। ধরুণ যেমন সাধারণ পাট জাতীয় দ্রব্য, তুলার সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত। তুলা হইতে, অথবা তুলা সদৃশ অন্য পদার্থ হইতেও অধুনা প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতেছে। চেষ্টা করিলে পাট জাতীয় তন্তুকেও উপযুক্ত পরিবর্ত্তন দ্বারা এইরূপ সূতা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এখানে পাথুরীয়া কয়লারও অভাব নাই। বিভিন্ন স্থানের খনি হইতে এই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই জার্ম্মাণীর আধুনিক আর্থিক অবস্থা এই পাথুরিয়া কয়লার সাহায্যেও প্রভূত পরিমাণে উন্নত হইতে পারিয়াছে। ইহার সাহায্যে যেমন রঞ্জন শিল্পের বিবিধ উপাদান প্রস্তুত হইতে পারে তেমনই, ইহার উপযুক্ত পরিবর্ত্তন সাহায্যে পেট্রলের ন্যায় দাহ্য পদার্থও প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর। আমরা পেট্রলের তেমন কোনও খনির সন্ধান ভারতভূমিতে পাই নাই, ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে আমরা এই দ্রব্যটার জন্য এখন সম্পূর্ণরূপেই বিদেশের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। কিন্তু ইহা কোন দেশের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় অবস্থা নহে, অতএব আমাদিগের উচিত এই পদার্থটীও যাহাতে আমরা নিজেরাই প্রস্তুত করিতে পারি তাহার চেষ্টা করা। আরও বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থ আমাদিগের দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু আমরা অন্য দেশের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি, যতদিন তথা হইতে এই সকল পদার্থ পাওয়া যাইবে ততদিন আমাদের প্রয়োজন কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু

যেদিন এই বিদেশের পণ্য এদেশে আর আসিবে না সেদিন আমরা নানাবিধ দুঃখের মধ্যেই নিজেদের নিমজ্জিত দেখিব।

ভারতের ভবিষ্যতের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য যে বিজ্ঞান শিল্প সাধনার এই দিকটীর কথা তাঁহারা সুচারুরূপে চিন্তা করেন এবং অবিলম্বে যতদূর সম্ভব একনিষ্ঠ চেষ্টা দ্বারা নানাবিধ শিল্পাগারের প্রতিষ্ঠা করুন। এই শিল্পাগারগুলিকে সচল রাখিবার জন্য কৃষির উন্নতিও একান্ত দরকার। কৃষি-উপযোগী বহু সম্পত্তি এদেশে বর্ত্তমান অথচ উপযুক্ত চেষ্টা অভাবে আমাদিগের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই যেন কমিয়া চলিয়াছে। মানবকে ভগবান যে শক্তি দিয়াছেন তাহার সাহায্যে অন্যান্য দেশের লোক এখন আর কোন কার্য্যের জন্য অনির্দ্দিষ্টের মধ্যে থাকিতে চাহে না; নিজের প্রয়োজন অনুসারে প্রায় প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তুলিতেছে। অথচ আমরা ভূমির ফসলের জন্যও একান্ত ভাবেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকি। হয় তো সুবৃষ্টির জন্য আকাশের প্রতি চাহিয়া দিন গণিতে থাকি, অথবা নদীর উদ্ধার, নহর কাটা ইত্যাদি কাজের জন্য গভর্ণমেণ্টের উপর ধন্না দিয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু যতদিন নিজেরাই কাজে অগ্রসর না হইব ততদিন আমাদিগের অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নহে। আমাদিগের যেমন কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টা করিতে হইবে তেমনি বিজ্ঞান শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারাও দেশের অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। আমাদিগের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি আমরা নিজেরাই না গড়িয়া তুলি তাহা হইলেও এই সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষের বাহিরের লোকই এদেশে আসিয়া এই কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিবে। ইহারই মধ্যে এই দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং নূতন রাসায়নিক শিল্পালয় বহির্দ্দেশীয় মূলধন সহযোগে স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আমি একান্তভাবে এদেশের হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। আমাদিগের বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা যেরূপ প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাও ততোধিক আবশ্যক।

আপনাদিগের অমূল্য সময় বহুল পরিমাণে আমি লইয়াছি; আর আপনাদিগকে কষ্ট দিব না। বিজ্ঞানের সেবার সুযোগে যে সকল কথা আমার মনে উঠিয়াছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাষ আপনাদিগকে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার শক্তি অতি নগণ্য; এই সামান্য শক্তি সম্পূর্ণরূপে

আমার মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিল না। যাহা বলিয়াছি তাহার মধ্যে কোনও নূতন কথা বলিয়াছি তাহা আমার মনে হয় না, তবু এই কথাই মনে হইয়াছে যে এই পুরাতন কথাও পুনরায় বলার প্রয়োজন ছিল। আমার অক্ষমতার ক্রটী আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। পরিশেষে আপনাদিগকে আমায় এই স্নেহ এবং দয়ার জন্য বার বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আজিকার বক্তব্য আমি শেষ করিতে চাই।

ডক্টর মুহম্মদ কুদরত্-এ-খুদা।

বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চ্চা

বাংলা দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্য ঐতিহাসিকগণ

ঐতিহাসিকগণ কালের পরিবর্ত্তনের সাক্ষী. কাল-প্রবাহের বেলাভূমিতে বসিয়া তাহারা কালতরঙ্গের গণনায় প্রবৃত্ত। জগতের কিছুই যে স্থায়ী নহে, এ-সত্য তাঁহাদের অপেক্ষা আর কে ভাল জানে? অক্ষয়কুমার, হরপ্রসাদ, রাখালদাস—কেহই চিরজীবি হইয়া জগতে আসেন নাই। কাল পূর্ণ হইলে সকলকেই পরপারে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু রাখালদাসের কি কাল পূর্ণ হইয়াছিল? এই অসাধারণ কর্ম্মী, এই বিরাট্ হৃদয় পুরুষ, এই বন্ধুবৎসল বাংলার সুসন্তান অকালে যে খেলা থামাইয়া চলিয়া গেলেন, আমাদের সেই দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? অকালমৃত্যু বাংলা দেশের পরম অভিসম্পাত - এই দস্যু কেশবকে হরণ করিয়াছে, এই দস্যু বিবেকানন্দকে ছিনাইয়া লইয়াছে। যাঁহার কণ্ঠধ্বনি, যাঁহার মুখাবয়ব চিন্তা করিলেই আজিও অসীম অশ্রুর উৎস লইয়া স্মরণপথে সমুদিত হয়, আমাদের অনেকেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই রাখালদাসও ইহারই করাল কবলগত হইয়াছেন। অক্ষয়কুমারও বাণীচরণে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যানুযায়ী অঞ্জলি দান আরম্ভ করিতে-না-করিতেই তিরোহিত হইলেন। আমরা হরপ্রসাদের সার্থক সাধনার সশ্রদ্ধ বন্দনাগীতি রচনা করি, অক্ষয়কুমারের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি, কিন্তু অশ্রুজল ভিন্ন রাখালদাসের স্মৃতি তর্পণের আর কোন উপাদান খুঁজিয়া পাই না।

দুর্ভাগ্যের অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও মনে জাগে যে বিধাতার করুণার কথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক-শেলা বক্ষে অহর্নিশি ধারণ করিয়া রোগজর্জর দেহে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ যেভাবে অনন্যমনা হইয়া বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে নিযুক্ত আছেন, তাহা পুরাণ-বর্ণিত দধীচিকেই মনে করাইয়া দেয়। এই প্রকার দুরবস্থার মধ্যেও যে তাঁহার এতখানি কর্ম্মক্ষমতা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই নিষ্ঠুর বিধাতার করুণা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অক্ষয়কুমারের সহকর্ম্মী রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর কর্ম্মবহুল জীবনের অপরাহ্ণে অদ্যাপি কর্ম্মবিমুখ নহেন। তাঁহার অক্লান্ত উদ্যমের ফলে মহাপুরুষ রামমোহন রায় সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত

হইয়েছে। তাঁহার আরব্ধ ময়ূরভঞ্জের ইতিহাস সমাপ্ত হইলে ইতিহাস-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। অক্ষয়কুমারের অপর সহকর্ম্মী ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক "উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস" নামক পুস্তক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বাংলা ভাষায়ও ইনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন তথ্য বঙ্গবাণীকে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। এই ত্রয়ীর মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ হিসাবে তাঁহার নিকট আমাদের অদ্যাপি অনেক পাওনা রহিয়াছে।

সমস্ত জীবন যিনি একলব্যের একনিষ্ঠার সহিত ইতিহাস চর্চ্চা করিয়াছেন সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি সর্ যদুনাথ সরকার যে পরিণত বয়সেও অক্লান্ত উদ্যমে অদ্যাপি ইতিহাসের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিয়াছেন, ইহাও বিধাতার বিশেষ করুণা বলিয়া মনে করি। তাঁহার "আওরংজীব," তাঁহার "শিবাজী," তাঁহার "মোগলসাম্রাজ্যের পতন" এবং মোগল রাজত্বকাল সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধাবলী চিরদিন তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব-ভারতের সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রত্যক্ষদর্শী মির্জ্জা নাথন প্রণীত বাহার-ই-স্তান-ই-ঘায়বী গ্রন্থের আবিষ্কার, ও তাহার সারমর্ম্ম প্রচার অধ্যাপক সরকারের এক অমর কীর্ত্তি। ঐ গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'প্রবাসী' পত্রিকায় পনর বৎসর পূর্ব্বে তিনি ছয়টি প্রবন্ধ লিখেন। ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠেই প্রথম আমরা প্রতাপাদিত্য, ওসমান, ঈষা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ, সাহাজাদপুর, খলসী ও চাঁদপ্রতাপের হিন্দু জমিদারগণ ইত্যাদি অসংখ্য বাঙালী বীরগণের বিস্মৃত কীর্ত্তিকাহিনী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারি। কি পরিমাণ বাধা প্রতিহত করিয়া জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁকে বাংলা দেশ মোগলশাসনে আনয়ন করিতে হইয়াছিল, মোগলপক্ষীয় প্রত্যক্ষদর্শী লিখিত তাহার বিবরণ পড়িয়া আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই! সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্য-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর বরা মূল পারসী হইতে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করিয়া আসাম গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহা প্রকাশিত করিয়া এই অমূল্য পুস্তক সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য করিয়াছেন।

সর্ যদুনাথ অক্লান্ত উদ্যমে আজীবন স্বয়ং ইতিহাসের চর্চ্চা ত করিয়াছেনই, সেই উদ্যম তাঁহার শিষ্যবৃন্দে সঞ্চারিত করিয়া তিনি যে একটি ঐতিহাসিকমণ্ডলী গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার সেই কীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়ী হইবে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রমুখ তাঁহার শিষ্যবৃন্দ তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া মোগল ও মোগল-পর যুগের ইতিহাসের অনেকগুলি অন্ধকার কোণ প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত আলোকিত করিয়া তুলিতেছেন।

সর্ যদুনাথের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" সঙ্কলিত করিয়া আধুনিক কালের ইতিহাসচর্চ্চার পথ সুগম করিয়াছেন।

ডক্টর ভাণ্ডারকরের সস্নেহ লালনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসচর্চ্চার এক প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়ায়। ডক্টর ভাণ্ডারকরের কৃতী ছাত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী স্বীয় কৃতিত্ববলে গুরুর আসন অধিকার করিয়াছেন। তাহার ইংরেজী ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বহুদিন পর্য্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দীরূপে বিরাজ করিবে। তাহার সহকর্ম্মী ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় মারাঠা শাসনযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অন্যতম সহকর্ম্মী ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় মহাশয়ের ইংরেজী ভাষায় সঙ্কলিত বৃহৎ দুই খণ্ড "উত্তর-ভারতের রাজবংশসমূহের ইতিহাস" (Dynastic History of Northern India) অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ ভবিষ্য অনুসন্ধিৎসুগণের নিত্যসহচর হইয়া থাকিবে। ইঁহাদের নিপুণ শিক্ষাপ্রভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্য হইতে অনেক ঐতিহাসিক উদ্ভূত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ইতিহাসের অধ্যাপক এবং বর্ত্তমান ভাইস-চান্সেলর ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রথম জীবনে ভারতের ও বাংলার ইতিহাসের একনিষ্ঠ সেবা করিয়া ইতিহাসক্ষেত্রে অনেক নূতন তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরে তিনি বৃহত্তর ভারতের ইতিহাসই নিজের গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র বলিয়া বাছিয়া লইয়া নিষ্ঠার সহিত তাহার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। পরলোকগত অক্ষয়কুমারের বড় সাধ ছিল, তিনি বাঙালীকে এই ইতিহাস শুনাইবেন। তাহার "সাগরিকা" এই উদ্যমেরই পূর্ব্বাভাসরূপে সমাজ-পতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ডক্টর মজুমদার অক্ষয়কুমারের সেই সাধ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এত কাল দেশীয় ভাষায় এই বিষয়ে ত পুস্তক ছিলই না, ইংরেজী ভাষায়ও এই বিষয়ের পুস্তকের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল। ডক্টর মজুমদারের পুস্তক সেই অভাব মোচন করিয়াছে। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় রচিত "চম্পা" ও "সুবর্ণদ্বীপ", চম্পা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ও মালয় উপদ্বীপে হিন্দু রাজাসমূহের সম্পূর্ণাঙ্গ বিবরণরূপে আদৃত হইয়াছে। ডক্টর মজুমদারের লালনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক দল নবীন ঐতিহাসিকের উদ্ভব হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ডক্টর শ্রীমান ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীমান হিমাংশুভূষণ সরকার, শ্রীমান

নীরদভূষণ রায়, শ্রীমান প্রমোদলাল পাল এবং শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্তা বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা খ্যাতিভাজন হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী করুণাকণা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ উভয়েই প্রশংসনীয় গবেষণা-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিদুষী তরুণীদ্বয়ের আগমন সানন্দে অভিনন্দনীয়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ম্মধারত্রয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রায় শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়গণের সাধনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-ভারতের প্রত্নবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ সেই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতেই। প্রশংসনীয় অধ্যবসায় এবং কৃতিত্ব সহকারে তিনি অক্ষয়কুমারের আরব্ধ কর্ম্ম গৌড়লেখমালার কার্য্য বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তিনি চন্দ্র, বর্ম্ম এবং সেনরাজগণের শাসনাবলী ও শিলালিপিসমূহ (Inscriptions of Bengal Vol-III). নাম দিয়া প্রকাশ করিয়া বাংলার প্রত্নপ্রেমিকগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলার প্রত্নক্ষেত্রে আদর্শ গ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। মাতৃভাষা অবলম্বনে প্রত্নচর্চ্চায় যে নীতি গৌড়রাজমালা ও গৌড়লেখমালা প্রকাশে অনুসৃত দেখিতে পাই, মজুমদারমহাশয়ের সম্পাদিত "ইন্সক্রিপশ্যনস্ অব বেঙ্গল" গ্রন্থে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুস্তকের মুখবন্ধ এবং ভূমিকা পড়িয়া জানিতে পারি যে বৃহত্তর পাঠকসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিবার উদ্দেশ্যই এই নীতি পরিবর্ত্তনের কারণ। বাংলায় যাঁহারা প্রত্নচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের শতকরা নিরানব্বই জনই ইংরেজীনবীশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই এই মাতৃভাষা পরিত্যাগে তাহাদের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এবং ইংরেজী ভাষার সহায়তায় বৃহত্তর পাঠকসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিবার সম্ভাবনাও মিথ্যা নহে। কিন্তু তথাপি কেন যেন মনটা প্রসন্ন হয় না। প্রত্নলিপিক্ষেত্রে ননীবাবুর পুস্তকের পরেই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্কলিত "কামরূপ শাসনাবলী" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই সুসম্পাদিত পুস্তকখানি গৌড়লেখমালার মতই বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় এই পুস্তক ইংরেজীতে সম্পাদন করিলে বৃহত্তর পাঠকসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। বাংলায় এমন মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশ কেহ কেহ পাগলামি নামেও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মনের উপর ত কাহারও জোর খাটে না।

বস্তুতঃ, বাংলা দেশের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধেই আমার এই সাধারণ নালিশ যে তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল হইতে মাতৃভাষা অন্যায় রকমে বঞ্চিত হইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিকত্রয়—ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর সেন ও ডক্টর রায় বাংলা ভাষায় কলম ধরেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ, তাঁহাদের চোখের উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা প্রবন্ধাভাবে শুকাইয়া মরে! তাঁহারা যদি দয়া করিয়া তাঁহাদের ইংরেজী প্রবন্ধাবলীর সারমর্ম্ম একটু সোজা করিয়া লিখিয়া মাসিক পত্রিকায় প্রেরণ করেন, তবে বাংলা দেশের মাসিক পত্রিকাগুলি রাবিশ ছাপিবার দায় হইতে অব্যাহিত পায় এবং বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চ্চা খরবেগে প্রবাহিত হয়। সর্ যদুনাথ সেই যে পনর বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার পরে বাংলা ভাষায় রচিত তাঁহার আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তবে তদ্রচিত শিবাজীর বাংলা সংস্করণ দেখিয়া এবং গত বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধীয় বঙ্গভাষায় প্রদত্ত অধরচন্দ্র বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়া আমাদের মনে আবার ভরসার সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধেও আমার সেই একই নালিশ। বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলায় যখন কিছু লিখিয়াছেন, তাহা কি প্রকার সমাদরের সহিত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছিল, আশা করি তাহা তাঁহার স্মরণে আছে। দেশবাসিগণ তাঁহাদের গবেষণার ফল জানিতে উন্মুখ হইয়া থাকে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা একটু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের গবেষণার ফল যদি বাংলা ভাষায় লিখিয়া দেশবাসিগণকে জানাইতে আরম্ভ করেন, তবে বঙ্গভাষায় ইতিহাস-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, দেশবাসি-গণও কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হয়। বঙ্গভাষা-জননীর কোলের সন্তানগণ সমর্থ হইবামাত্র যদি দুঃখিনী মাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা সমৃদ্ধা প্রতিবেশিনী ইঙ্গভাষার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্যই অহরহ লোলুপতা প্রকাশ করেন তবে আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? মৌলানা শিবলি ত তাঁহার প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ উর্দ্দু ছাড়িয়া ইংরেজীতে প্রকাশ করেন নাই। মারাঠা ঐতিহাসিকগণ ত মাতৃভাষাতেই ইতিহাস চর্চ্চা করিতেছেন! মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার "ভারতীয় প্রত্নলিপিতত্ত্ব" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ এবং প্রামাণ্য প্রকাণ্ডকায় রাজপুতনার ইতিহাস ইংরেজী ভাষায়

প্রকাশিত হইলে অধিকতর সুপ্রচারিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ত সেই অজুহাতে হিন্দীভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী ভাষা অবলম্বন করেন নাই!

আমি জানি, যে-সমস্ত মনীষীর নাম করিয়াছি, ইঁহাদের কাহারও অবসর প্রচুর নহে। জগতের গবেষণাক্ষেত্রের সহিত যোগ রাখিবার জন্যই ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের লিখিতেই হয়, এবং তাহার পরে আবার তাহা বাংলা ভাষায় লিখিতে যে পরিশ্রম ও সময় আবশ্যক, ইঁহাদের কেহই তাহা দিতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি তাহাই চিন্তনীয়। এই মনীষিগণের প্রত্যেকেরই অনুগত ছাত্রসঙ্ঘ আছে। যদি ছাত্রগণের সাহায্যে তাঁহারা নিজেদের গবেষণাগুলি বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশিত করেন, তবেই সমস্ত দিক্ রক্ষা হয় বলিয়া মনে হয়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রস্তরমূর্ত্তি-সংগ্রহ বাংলা দেশে অতুলনীয়। কুমার শরৎকুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অক্ষয়কুমার প্রমুখ কর্ম্মিগণের চেষ্টায় এই সংগ্রহের আরম্ভ। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় যখন এই সমিতির চিত্রশালার অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁহার চেষ্টায় এই সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীরদবন্ধু সান্যাল এই সমৃদ্ধ সংগ্রহকে সমৃদ্ধতর করিতে চেস্টা করিতেছেন, সন্দেহ নাই। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বার্ষিক বিবরণী পাঠে অবগত আছি যে এই বিচিত্র সংগ্রহের একটি বিস্তৃত বিবরণমূলক সচিত্র তালিকা শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় সঙ্কলন করিয়াছেন। বঙ্গের প্রত্নপ্রেমিক মাত্রেই এই তালিকা প্রকাশের পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। এই তালিকা যাহাতে উপযুক্ত চিত্রসমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়, আশা করি সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ সেই চেষ্টার কোন ক্রটি করিবেন না। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট সমিতির চিত্রশালাটির পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অবগত হইলাম। সংবাদ সত্য হইলে বঙ্গের এই অমূল্য প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়দ্বয়ের একনিষ্ঠ ইতিহাসসেবার কথা বাংলা দেশে সাহিত্যসেবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। নরেন্দ্রনাথ **Indian Historical Quarterly** প্রচারিত করিয়া বাংলা দেশের ক্রমবর্দ্ধমান ইতিহাস-চর্চ্চা-স্রোতের জন্য যে সুপ্রশস্ত পথ কাটিয়া দিয়াছেন, ঐতিহ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ সেই জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্তের সম্পাদিত বৌদ্ধ সাহিত্যের

মূল্যবান গ্রন্থাবলীর কোন কোন খানি এই পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিমলাচরণের Indian Culture পত্রিকা Indian Historical Quarterly-র পরে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সুমুদ্রিত এইত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি মুদ্রণসৌষ্ঠবে পূর্ব্ববর্ত্তীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, প্রবন্ধগৌরবে পূর্ব্ববর্ত্তীর সমান মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ডক্টর বিমলাচরণ ডক্টর বড়ুয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধকীর্ত্তি সম্বন্ধীয় সারগর্ভ পুস্তকাবলীর প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া, বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনে বঙ্গভাষায় অভিনব কোষগ্রন্থ "মহাকোষ" প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশের জন্য বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির হস্তে ন্যাস সমর্পণ করিয়া যে প্রত্নপ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, বাংলা দেশে তাহার তুলনা মিলা কঠিন। নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলাচরণের অধিকাংশ গবেষণাই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, তবে তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম্ম তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বাংলা মাসিকাদিতেও প্রকাশিত করিয়া থাকেন। পরিণতবয়স্ক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের এবং তরুণবয়স্ক শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী Indian Historical Quarterly এবং Indian Culture অবলম্বনেই প্রথম সুপরিচিত হইতে আরম্ভ করে।

বাংলা দেশে কয়েক জন ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত স্থানীয় ইতিহাস লিখিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "বিক্রমপুরের ইতিহাস" ১৯১০ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি গুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাস, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বীরভূম বিবরণ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহার পাবনা জেলার ইতিহাস এবং শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত বড় বড় দুই খণ্ডে সমাপ্ত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রশংসনীয় গ্রন্থ। এই শ্রেণীর স্থানীয় ইতিহাস রচনা স্থানীয় লেখকগণের প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চ্চার এই যে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বিবরণী হইতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন নিরাশ হইবার আমাদের কোন কারণ নাই। আর এক জন রাখালদাস বা আর এক জন হরপ্রসাদ আমরা শীঘ্র নাও পাইতে পারি, কিন্তু বহু জনের সমবেত চেষ্টার ফল দুই-চারি জন অতিমানবের অসাধারণ কীর্ত্তি হইতে গুরুত্বে কম হইবার কথা নহে। আমার অজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধির

সঙ্কীর্ণতা বশতঃ যে-সমস্ত যোগ্য কর্ম্মীর কর্ম্মের সহিত আমি আজিও পরিচিত হইয়া উঠিতে পারি নাই, এই প্রসঙ্গে অনুল্লেখের জন্য তাঁহাদের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ইতিহাস-ক্ষেত্রের কোন্ কোন্ অংশে কর্ম্মীর অভাব ঘটিতেছে

ভারতীয় ইতিহাসচর্চ্চার পরিধি বর্ত্তমানে এত বৃহৎ যে কোন এক জন লোকের পক্ষে তাহার সমস্ত বিভাগ আয়ত্ত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ইতিহাসে বিষয়-বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কর্ম্মিগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে অধীতব্য বিষয় বাছিয়া লইতেছেন। ইহার ফল হইতেছে এই যে, কতকগুলি বিভাগে উপযুক্তরূপ অথবা আদৌ কর্ম্মী জুটিতেছে না। বঙ্গীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব বা ভাস্কর্য্য অথবা স্থাপত্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে হইলে মাত্র কলিকাতা, রাজশাহী বা ঢাকা যাদুঘরের মূর্ত্তি-সংগ্রহ দেখিলে চলে না। উহার জন্য বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে হয়। কারণ যে বিশাল ভাস্কর্য্য-বন্যা এক দিন বাংলা দেশের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমরা এ যাবৎ যাদুঘরগুলিতে আনিয়া তুলিতে পারিয়াছি। বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ইতিহাস-লেখকের আগমন আমাদিগকে আর কত দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে?

আমি অনেক দিন পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম, ব্যক্তি-বিশেষের অপরাধে এবং নির্ব্বুদ্ধিতা হুজুক বশতঃ দেশের সামাজিক ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান কুলশাস্ত্রগুলিকে বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ বহু দিন ধরিয়া অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। এই পুরুষানুক্রমে সযত্নসঞ্চিত গ্রন্থগুলির সামাজিক প্রয়োজন তিরোহিত হওয়ায় অনাদরে এগুলি দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বঙ্গের প্রত্নপ্রেমিকগণের কর্ত্তব্য, এই গ্রন্থগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় ইহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুঁথি সংগ্রহে হাত দিয়া আমি এই বিষয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের অনেকগুলি কুলগ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় স্থান লাভ করিয়াছে। সযত্নে এগুলি অধ্যয়ন করিলে ইহাদের মধ্যে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব মূল্যবান তথ্য মিলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। ফলে, ইতিহাসের এই মহামূল্য উপাদানগুলি

অদ্যাবধি কোন কাজেই লাগে নাই। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, কুলশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যিনি সামাজিক ইতিহাস উদ্ধারের কার্য্যে হাত দিবেন, তাঁহাকে ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাসের ন্যায় সত্যসন্ধ হইতে হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের, সত্যে যাঁহাদের কঠোর দৃঢ়নিষ্ঠা নাই, তাঁহাদের এই পবিত্র ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষেধ।

ইতিহাসের আর একটি অবহেলিত বিভাগ বাংলা দেশের প্রাক্-মোগল যুগের মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নলেখতত্ত্ব। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে সুলতানী আমলের প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালেখসমূহের পাঠ বিচার করিয়াই টমাস ও ব্লখমেন সাহেব ঐ আমলের বাংলা দেশের প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ব্লখমেন সাহেব কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া মুদ্রা ও শিলালিপির সাহায্যে সুলতানী আমলের বাংলার ইতিহাসের কাঠামো নির্ম্মাণ করেন। সেই অসম্পূর্ণ কাঠামোর উপরেই আমাদের রাখালদাস অপূর্ণাঙ্গ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই ধারার গবেষণাপদ্ধতিই যেন আজকাল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী পণ্ডিত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব ব্যতীত ব্লখমেন-প্রবর্ত্তিত ধারা অনুসরণ করিতে আর কাহাকেও দেখি না। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শরফুদ্দিন সাহেবকে এই পথে চলিতে দেখিয়া প্রাণে বড়ই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কারণ কৃতবিদ্য মুসলমান পণ্ডিতগণ তাঁহাদের আরবী পারসী ভাষাজ্ঞান লইয়া তাঁহাদের নিজস্ব এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চক্ষুহীন এবং বিবেচনাহীন শিক্ষা-বিভাগের মর্জ্জিমত আজ ঢাকা, কাল রাজশাহী ও পরশ্ব চট্টগ্রাম বদলী হইয়া এই প্রতিভাশালী উদীয়মান মুসলমান পণ্ডিতটির লেখাপড়ার নেশা শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। ১৯১৮ সনের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাপ্ত সুলতানী আমলের কয়েকটি শিলালিপি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার লিখিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরে বিহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান সমিতির পত্রিকায় এবং **Epigraphia Indo-Muslemica** নামক ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত পত্রিকায় কয়েকখানি অপ্রকাশিত শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ আর এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।

এই বিষয়ে সর্ যদুনাথ সরকারের নিকট আমার নালিশ আছে। হাতের লেখা পারসী পুঁথি পড়িয়া তাঁহার যে-সকল ছাত্র গবেষণা করিয়া খ্যাতি লাভ

করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই চেষ্টা করিলে প্রাচীন মুদ্রা বা শিলালিপি পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু মুসলিম মুদ্রাতত্ত্ব বা প্রত্নলেখতত্ত্ব চর্চ্চার দিকে তাঁহার এক জন ছাত্রও মনোযোগ দেন নাই। পারসী ভাষায় অসামান্য পণ্ডিত হইয়াও তিনি নিজেও এই অবিমিশ্র প্রত্নতত্ত্বে অনেকটা উদাসীন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ আওরংজীবে আওরংজীবের বৈচিত্র্যময় মুদ্রাসমূহ সম্বন্ধে অথবা তাঁহার টাকশালগুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত, গবেষণার মোড় যেদিকে ফিরাইবেন, গবেষণাস্রোত সেই দিকেই ফিরিবে। আমরা সানুনয়ে এই বিষয়ে তাঁহার·দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উল্লেখযোগ্য আরব্ধ কার্য্যাবলী

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভাস্কর্য্য-সংগ্রহের সচিত্র বিস্তৃত বিবরণীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি ঢাকাতে নিতান্ত একান্তে বাস করি। কাজেই আমার পক্ষে বাংলা দেশের সমস্ত উল্লেখযোগ্য আরব্ধ কার্য্যের সন্ধান রাখা সম্ভবপর নহে। যে দুই-একটির কথা জানি তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলিত বাংলার ইতিহাস। বাংলা দেশের বিশেষজ্ঞগণের সমবায়ে লিখিত এই পুস্তকখানি যে বহুদিন পর্য্যন্ত আদর্শ পুস্তক হইয়া থাকিবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যত দূর জানি, ইহার কার্য্য আশানুরূপ দ্রুততার সহিত অগ্রসর হইতেছে না। এই রকম বৃহৎ ব্যাপারে বিলম্ব অনিবার্য্য, তাহার জন্য অধীর হইয়া লাভ নাই। এই কার্য্য কি প্রকার পরিশ্রমসাধ্য, ইহার সমাপ্তির পথে বাধাবিঘ্ন কত, তাহা আমার ভালই জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার এই মাত্র অনুরোধ যে বৃহত্তর ইংরেজী সংস্করণ অবলম্বনে ক্ষুদ্রতর বাংলা সংস্করণ একখানি যে তাঁহাদের প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আছে, মূল কার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই কার্য্যে যেন অযথা বিলম্ব না হয়।

প্রায় দশ বৎসর হইল, ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ত্রয়ের সম্পাদনে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে রামচরিতের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিবার উদ্যোগ হয়। সম্পাদকগণের মধ্যে মতভেদের দরুন উহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াও প্রকাশ স্থগিত ছিল। প্রায় বৎসরেক পূর্ব্বে ডক্টর বসাকের নিকট উহার মুদ্রিত কয়েক ফর্ম্মা দেখিয়াছি। উহার মুদ্রণকার্য্য শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে,

আশা করা যায়। সকলেই জানেন রামচরিত দ্ব্যর্থ কাব্য—অত্যন্ত দুরূহ। দ্বিতীয় সর্গের কতকাংশ পর্যন্ত উহার টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহারই সাহায্যে রামপাল-পক্ষের ঐতিহ্যমূলক বাক্যাবলীর অর্থ বুঝা যায়। অভিনব সংস্করণের পণ্ডিত সম্পাদকদ্বয় বহু পরিশ্রমে সটীক অংশের টীকা এবং ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। কাজেই বাংলা দেশের প্রত্নপ্রেমিক মাত্রেই এই পুস্তক প্রকাশের পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। ডক্টর বসাকের অধ্যবসায়বলে আশা করি শীঘ্রই এই পুস্তক লোকলোচন-গোচর হইবে।

ইতিহাস-চর্চ্চার আদর্শ

যাঁহাদের পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া আমরা ইতিহাসের ক খ শিখিয়াছি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে অদ্যাপি সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি ঐতিহাসিকগণের দুই-তিন জন বাঁচিয়া আছেন। ইতিহাস-চর্চ্চায় যে কঠিন আদর্শ তাঁহারা আজীবন অনুসরণ করিয়াছেন, সেই আদর্শই তাঁহারা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া যাইবেন, ইহাই আমরা তাঁহাদের নিকটে প্রত্যাশা করি। বিশেষ মত বা বিশেষ পক্ষ সমর্থন যে কৌশলী লোকগণের উদ্দেশ্য, বড় বড় ঐতিহাসিকগণকে স্বপক্ষ-ভুক্ত করিয়া যেন তেন প্রকারেণ মোকদ্দমায় জয়লাভ করাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে সেই কৌশলী স্বার্থপর লোকগণের মিষ্টবাক্যে বা খোসামোদে ভুলিয়া জজের আসন ছাড়িয়া ঐতিহাসিকগণ উকীলের গাউন পরিয়া বিশেষ বিশেষ পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হইয়া যদি আত্মহত্যা করেন, তবে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে? বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সম্প্রতি এইরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে। যে দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা আমরা ব্যক্তিবিশেষের সহিত আজীবন যুক্ত করিয়া আসিতেছি, সহসা দেখি কৌশলী স্বার্থপর পক্ষসমর্থকগণের মিষ্টবাক্যে তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে! এই কুহকগণের কুহকে ভুলিয়া তাঁহারা অসত্যের পক্ষ সমর্থনে লাগিয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের অধৃষ্য খ্যাতিদুর্গ বালকেরও বেধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ইমার্সন বলিয়াছেন, আমরা কাচের জগতে বাস করি, পাপ করিয়া লুকাইবার স্থান এখানে নাই। যে কারণে, যে দুর্ব্বলতায়ই হউক, অসত্যের পক্ষ সমর্থন করিবামাত্র লোকের নিকট তাহা ধরা পড়িয়া যায়, এই অমোঘ নিয়ম হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না! যাহারা মনে করেন, প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা অসত্যকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, তাঁহারা অবিশ্বাসী নাস্তিক,—জগৎনিয়ন্তা, জাতের, জাতির, কালপ্রবাহের নিয়ন্তা যে এক জন আছেন, এই অতি স্বচ্ছ সত্য তাঁহারা উপেক্ষা করেন। বাঙ্গালার বাউল গাহিয়াছে

দেখ আমার গুরু গোসাঞা সাঁই
সে যে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল
তাড়াহুড়া নাই।

সত্যের মুকুলই যে এই ভাবে যুগযুগান্তে ফোটে তাহা নহে, অসত্যের মুকুলও ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া যতুবংশধ্বংসী মুষলে পরিণত হয়। যে-দেশ বা যে-জাতি বা যে-ব্যক্তি মনে করে যে চালাকি করিয়া আজ ত মোকদ্দমা জিতিয়া লই, পরের ভাবনা পরে করিব, —সেই মুহূর্ত্তে সে আত্মবিধ্বংসী মুষলের বীজ বপন করে। চট্টগ্রামের কবি শশাঙ্ক সেন গাহিয়াছেন,—কীর্ত্তিমন্দিরের দ্বারে কুলাহস্তে ধূমাবতী পাহারা দিতেছেন, ফাঁকা শস্যের সেথায় প্রবেশের অধিকার নাই, বিরাট কুলার ভীষণ বাত্যায় ফাঁকা শস্য কালের নস্যে পরিণত হইতেছে। সত্যের মন্দির সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা অসত্য সেথায় প্রবেশ করিতে পারে না। বুঝিবার ভুলে যে অসত্যসমর্থন উদ্ভূত, তাহা ক্ষমার্হ। কিন্তু তুর্ব্বলতায় যাহার জন্ম, তাহা ক্ষমার একেবারেই অযোগ্য।

নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা লইয়া আলোচনা করিব।

প্রথম সমস্যা

নদীয়াতে কি কখনও সেনরাজগণের রাজধানী ছিল? ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ খল্‌জি কি এই নদীয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন? বাংলার ইতিহাসের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন, তবকত্‌-ই-নাসিরি গ্রন্থে মিনহাজুদ্দিন সিরাজ লিখিত ইখ্‌তিয়ারুদ্দিনের নদীয়া-বিজয়, এবং নদীয়া হইতে লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের বিবরণ, এই দেশে ইতিহাস আলোচনার আদিযুগে সকলেই বিশ্বাস করিতেন। সেই বিবরণ এতই সুপরিচিত যে এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ ১৯১৩ সনের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন যখন বাংলা রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন লক্ষ্মণ সেন জীবিতই ছিলেন না, তখন তাঁহার পুত্রগণের রাজত্ব চলিতেছিল। লক্ষ্মণাবতী টাকশালে ৬১৩ হিজরি—১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত (*Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, p. 146.*

No. 6) সুলতান মুঘিসুদ্দিন য়ুজবকের একটি মুদ্রাতে লিখিত আছে যে উহা নদীয়ার খাজানা বাবদ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে নববিজিত দেশেরই নাম এই ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে, কাজেই নদীয়া ঐ বৎসরই বিজিত হয়, ইহার পূর্ব্বে নহে। কাজেই তবকত্-ই-নাসিরির নদীয়া-বিজয়-বিবরণ মিথ্যা।

সপ্তদশ-অশ্বারোহী-সহচর ইখ্তিয়ারুদ্দিন নদীয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বাংলা-বিহারের অধিপতি বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেন সেই আক্রমণে নদীয়া ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে বাঙ্গালীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে,—স্বদেশীর যুগে এই আঘাত তীব্রতর হইয়া লাগিয়াছিল। তাই বাংলার ইতিহাসের এই দুই দিক্পাল, প্রায়-সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিন্হাজের উক্তি উড়াইয়া দিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিরাছিলেন। সেই ১৯১৩ হইতে আজ পাদ-শতাব্দ অতীত হইয়া গিয়াছে। নানাবিধ প্রমাণে এখন বঙ্গের সম্ভবতঃ সমস্ত ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে রাখালবাবুর প্রমাণাবলী একটাও ঘাতসহ নহে। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে ইখ্তিয়ারুদ্দিন যখন নদীয়া আক্রমণ করেন, তখন বল্লাল-পুত্র লক্ষণ সেনই বাংলার রাজা এবং তাঁহার রাজত্ব পূর্ব্ববঙ্গে সম্ভবতঃ ইহার পরেও কয়েক বৎসর চলিয়াছিল।

লক্ষণ সেনের আমলে নদীয়ার সেন-রাজধানীর সুস্পস্ট চিহ্ন বল্লাল-দীঘি এবং বল্লাল-ঢিবিতে রহিয়া গিয়াছে। বল্লাল-দীঘির নামেই উহার অবস্থান বল্লাল-দীঘি গ্রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বল্লাল-ঢিবি উহার সংলগ্ন উত্তরে বামনপুকুর গ্রামে অবস্থিত।* ১৮৫৪ সনে যখন এই স্থানের রেভেনিউ সার্ভে হয় এবং মানচিত্র প্রস্তুত হয়, তখন ভাগীরথীর মূল প্রবাহ বামুনপুকুরের অব্যবহিত উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত। (মানচিত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)। ভাগীরথীর প্রবাহ বর্ত্তমানে এই খাত হইতে সরিয়া গিয়াছে। (আধুনিক মানচিত্র দ্রষ্টব্য) সেন-

---

* ৪″=১ মাইল স্কেলে মূল রেভিনিউ সর্ভে ম্যাপ অঙ্কিত হইয়াছিল। উহা হইতে ১″=১ মাইল স্কেলে মেন সাকিট ম্যাপ প্রস্তুত হয়। আমার প্রদত্ত মানচিত্র এই মেন সাকিট ম্যাপের নকল। মূল রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে দেখি যে, বল্লাল ঢিবিটিকে Site of Ballal Sen's Old Rajbari বলিয়া লিখিত হইয়াছে। উহা হইতে আরও একটি বিচিত্র ব্যাপার দেখা গেল। বিক্রমপুর রামপালের বল্লাল-দীঘি প্রায় ৭৩৩ গজ লম্বা, নদীয়ার বল্লাল-দীঘি ৮২৫ গজ লম্বা। বিক্রমপুরের দীঘিটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, নদীয়ার দীঘিটি কিন্তু পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা! কোন কোন দীঘি কেন যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা করা হইত, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজিও পাই নাই।

বামুন
পুকুর
গঙ্গানগর
বল্লাল
দীঘি
ভাগীরথী
জলঙ্গী
উ
সহর নদীয়া
প্রাচীন ভাগীরথী
গদিগাছা
পারডাঙ্গা
মাজিদা
১৮৫৪ সনের রেভিনিউ সার্ভে
মানচিত্র অনুসারে
০ ১ ২ ৩
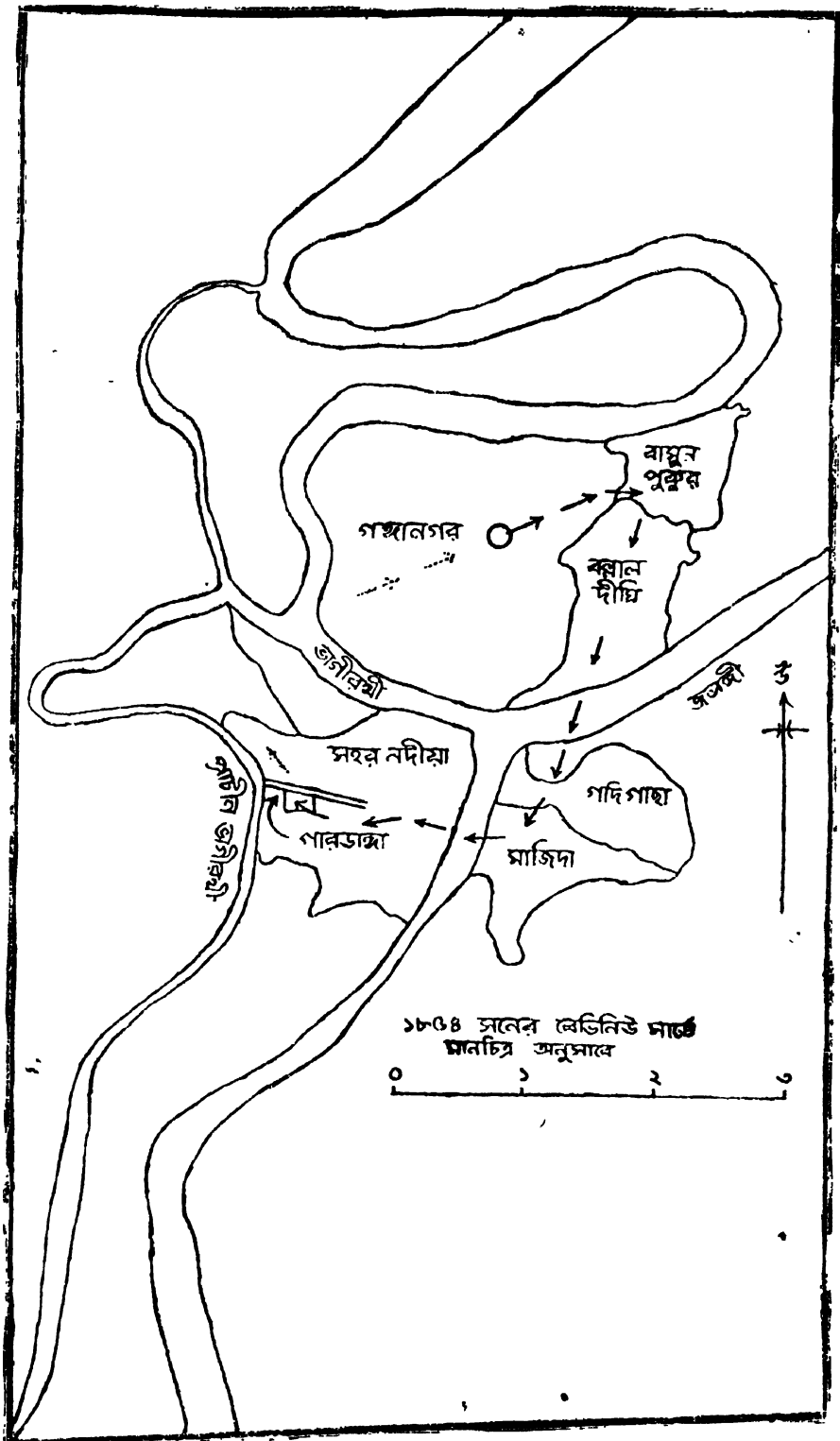
আমলে এই খাতেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গাপ্রবাহের যথা-সম্ভব নিকটবর্ত্তী থাকাই গঙ্গাতীরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। এই অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে সেন-রাজধানী নদীয়া নগরী গঙ্গার দক্ষিণ তীর জুড়িয়া সেই আমলে অবস্থিত ছিল। মিন্‌হাজের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি বিচার্য্য।

"The fame of the intrepidity gallantry and victories of Muhammad-i-Bakhtiyar had also reached Rai Lakhmaniya, whose seat of Government was the city of Nudiah." Raverty. P. 554

"Muhammad-i-Bakhtiyar suddenly appeared before the city of Nudiah" Ibid. P. 557.

"Most of the Brahmins and inhabitants of that place (i. e., Nudiah) left and retired into the province Sonkanat the cities and towns of Bang and towards Kamrud" Ibid. P. 557.

এই সমস্ত হইতেই নদীয়া যে বড় শহর ছিল এবং ইখ্‌তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণের সময় রাজা তথায় বাস করিতেছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে চারি-পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত এই শহর বিস্তৃত ছিল। মনে রাখিতে হইবে, এই সময় জলঙ্গী নদী এই স্থানে ছিল না ; কাজেই গঙ্গার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তীর জুড়িয়া বেশ জমাট শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিক্রমপুরে সেন-রাজগণের সরকারী রাজধানী ছিল, নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতীতে অপর দুই রাজধানী ছিল। সেন-রাজগণের সর্ব্বপ্রাচীন রাজধানী নদীয়াতেই ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

বাংলার ইতিহাস যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সেন-বংশের সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূতে দক্ষিণ দিক হইতে আগত পবনকে কবি ত্রিবেণীর পরেই, স্কন্ধাবার এবং রাজধানী বিজয়পুরে, যাইতে বলিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বোধ হয় যে ইহা নদীয়া নগরীস্থিত সেন-রাজধানী ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে পারে না। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের উত্তরে অবস্থিত, বল্লাল-দীঘি এবং বল্লাল-ঢিবি চিহ্নিত, প্রাচীন সেন-রাজধানী নদীয়া নগরীকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল,—এই কল্পনার সার্থকতা দেখি না। এই বিচারে নদীয়ারই প্রাচীন নাম বিজয়পুর ছিল—এই

সম্ভাবনাই স্পষ্টীকৃত হয়।* কাজেই সেন-বংশের প্রথম বিখ্যাত রাজা বিজয় সেনের নামানুসারে কৃতনামা রাজধানী বিজয়পুর সেন-বংশের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল। বিক্রমপুর পরে বিজিত হয় এবং যে কারণে জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন, সেই কারণেই বাংলার সরকারী রাজধানী সেন-যুগে নদীয়া-বিজয়পুর হইতে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। উত্তরবঙ্গ এবং বিহার হইতে পাল-বংশের রাজত্ব নিঃশেষে লুপ্ত হইলে পাল-রাজধানী রামাবতী ও মদনাবতী লক্ষ্মণাবতী নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে। সুলতানী আমলে লক্ষ্মণাবতীতেই সুলতানগণের রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণাবতীর "গৌড়" নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। হুমায়ুন এই নগরের নাম রাখেন জান্নতাবাদ। আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল্ লিখিয়াছেন—

"জান্নতাবাদ একটি প্রাচীন শহর। কিছুকাল ইহা বাংলার রাজধানী ছিল এবং লক্ষ্মণাবতী নামে বিখ্যাত ছিল। কিছুদিন ইহা গৌড় নামেও পরিচিত ছিল।" (Trans. Jarret. II. P. 122)

গোর (কবর) শব্দের সহিত গৌড়ের ধ্বনিসাদৃশ্য হুমায়ুনের ভাল লাগিল না, তিনি গৌড় নাম বদলাইয়া জান্নতাবাদ করিলেন।

মুঘিসুদ্দিন য়ুজবকের ৬৫৩ হিজরিতে লক্ষ্মণাবতী টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রায় নদীয়ার নাম দেখিয়া রাখালবাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ঐ বৎসরই নদীয়া বিজিত হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে,- -এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। প্রথম কথা এই যে, বাংলায় মুসলমানপ্রতিষ্ঠিত আদি রাজ্য প্রায় শতাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তরে মালদহ ও দিনাজপুর জেলা এবং গঙ্গার দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রবল উড়িষ্যা-রাজগণের প্রতিবন্ধকতায় দক্ষিণ দিকে উহা বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেনরাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলে, নদীয়া অঞ্চল করতলগত রাখার মত বল আদি মুসলমান সুলতানগণের ছিল কিনা সন্দেহ। কাজেই নদীয়া প্রথমে বিজিত হইয়া থাকিলেও রাজনৈতিক কারণে পরিত্যক্ত এবং ৬৫৩ = ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বিজিত হওয়া অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় কথা এই যে, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯২২ সনের পত্রিকায় ৪১০ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত স্টেপলটন সাহেব দেখাইয়াছেন যে, মুঘিসুদ্দিনের মুদ্রায় যেমন "মিন্ খরাজ নদীয়া" অর্থাৎ "নদীয়ার রাজস্ব হইতে" এই কথা কয়টি আছে, পরবর্ত্তী সুলতান

* পবনদূতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, মহাশয় পবনদূতের ভূমিকায়, পৃ, ২৫-২৬, অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

রুকনুদ্দিনের ৬৯০ হিজরির মুদ্রায় আছে—"মিন্ খরাজ বঙ্গ্" এবং সুলতান জলালুদ্দিনের ৭০৯ হিজরির মুদ্রায়ও আছে "মিন্ খরাজ বঙ্গ্"। রাখালবাবুর যুক্তি মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, এক সুলতান বঙ্গ্ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ জয় সমাপ্ত করিবার কয়েক বৎসর পরেই আবার অপর সুলতানকে বঙ্গ জয় করিতে হইয়াছিল। কাজেই এই যুক্তি ঘাতসহ নহে। নদীয়ায় যে অন্যতম সেন-রাজধানী ছিল এবং ইখ্তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ খল্‌জি এই রাজধানীই আক্রমন করিয়াছিলেন, প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লিখিত এই বিবরণে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বল্লাল-ঢিবি খুঁড়িলে সেন-রাজত্বের অনেক স্পষ্টতর চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভারতীয় প্রত্নবিভাগ বাংলা দেশকে অতিমাত্রায় অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। পাহাড়পুর-খননের ফলে দেখা গিয়াছে, বাংলা দেশের ঢিবিসমূহ উপেক্ষার বস্তু নহে। প্রত্নবিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ প্রত্নপ্রেমিক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের দৃষ্টি আমরা সানুনয়ে বল্লাল-ঢিবির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি।

দ্বিতীয় সমস্যা

দ্বিতীয় সমস্যা, নদীয়া শহরের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং চৈতন্যের জন্মকালীন নদীয়ার অবস্থিতি নির্ণয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মিনহাজ বলিয়াছেন যে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে নদীয়ার বহু অধিবাসী জগন্নাথ (উড়িষ্যা) বঙ্গ ও কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল। মিন্হাজ বলেন, "মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার নদীয়াকে জনশূন্য অবস্থায় ফেলিয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপিত করিলেন।" (Ravcytr, p, 558) এই বিধ্বস্ত নদীয়া নিশ্চয়ই বহুদিন পর্য্যন্ত জনহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মুসলমান আধিপত্য মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ হইলে ধীরে ধীরে লোকজন আবার নিজ নিজ বাড়ী-ঘরে ফিরিতে লাগিল। এই সম্পর্কে বাংলার বিনষ্ট নগরীগুলির বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা শিক্ষাপ্রদ হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের বিনষ্ট নগরীগুলির সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছি। ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমাস্থ গৌরবময়ী সেন-রাজধানী বিক্রমপুর নগরী অধুনা রামপাল নামে পরিচিত। প্রাচীন রাজধানী প্রায় ৫ × ৫ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ছিল।* এই প্রকাণ্ড নগরের শেষ চিহ্ন আজ নগরের কেন্দ্রে স্থিত পরিখাবেষ্টিত বল্লাল-বাড়ী এবং নগরের সীমার মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

* প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৭, সংখ্যায় মুদ্রিত মদীয় "প্রাচীন বঙ্গে দাক-ভাস্কর্য্য" প্রবন্ধে প্রকাশিত শ্রীবিক্রমপুর নগরীর মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

দীর্ঘিকা আর তাহাদের তীরে তীরে "দেউল" নামে পরিচিত বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন নগর এখন প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে বিভক্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশ অদ্যাপি নগর-কস্‌বা নামে পরিচিত। অনেকেই জানেন, কস্‌বা একটি পারসী শব্দ এবং উহা "নগর" শব্দের সমানার্থক। এই নগর-কস্‌বা অদ্যাপি ধনী বণিকগণের আবাসস্থল এবং সৌধ-প্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি আনয়ন করে। বিক্রমপুর নগরের অবশেষ যে বর্ত্তমান নগর-কস্‌বা, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা স্বীকার করিবেন। ঢাকা জেলায় প্রাচীনতর একটি নগর সাভারে অবস্থিত ছিল। তথায়ও ধনী বণিকগণের বাসভূমি, সৌধপ্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি আনয়নকারী অনুরূপ অবশেষ অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্যতম প্রাচীন নগর সুবর্ণগ্রাম সম্বন্ধেও অবিকল সেই কথাই প্রযোজ্য—তথায়ও অনুরূপ অবশেষ পানাম নামে পরিচিত এবং ধনী বণিকগণের আবাসস্থল। বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত শ্রীপুর নগরেরও কেদারপুর নামে পরিচিত অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত প্রাচীন নগরেরই এইরূপ অবশেষ শত শত বৎসর পরেও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়া মনে হয়, বিধ্বস্ত নবদ্বীপেরও অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যের নগর-ভ্রমণের এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনের বিবরণে বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপের পাড়াগুলির যে পরিচয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,* তাহাতে দেখা যায়, সমস্ত প্রাচীন নগরীর মত,—এমন কি ইংরেজ রাজধানী কলিকাতারও মত, নবদ্বীপ নগরে শাঁখাড়ীপাড়া, তাঁতীপাড়া, গোয়ালপাড়া, বানিয়াপাড়া, মালীপাড়া, তাম্বুলিপাড়া ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায় হইতে বুঝা যায়, শিমলিয়া গ্রামে কাজিপাড়ার দক্ষিণে, ঐ আমলের অবশেষ নবদ্বীপ নগরীর পূর্ব্বাংশে, শাঁখারীপাড়া, তাঁতিপাড়া ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। গঙ্গার তীরে তীরে ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল। ঢাকা জেলায় শ্রীবিক্রমপুর নগরীর আয়তন যেমন কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, নবদ্বীপের আয়তনও তেমনি অনেকগুলি পাড়ায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। নগরের অবশেষ গঙ্গাতীর-সংলগ্ন হইয়াছিল।

ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে বর্ত্তমান কালে গঙ্গা আধুনিক নবদ্বীপের পূর্ব্বভাগ দিয়া প্রবাহিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বে উহা নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। বঙ্গের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য মানচিত্র ভেন্‌ডেন্‌ব্রুকের মানচিত্র ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত

* চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়। মধ্যখণ্ড ২৩শ অধ্যায়। অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

হইয়াছিল। (Hunter's Statistical Account of the 24 arganas ard Sundarbans. Dr. Blochmann's Note in the Appendix. P. 361.) এই মানচিত্র হইতে আবশ্যক অংশের বর্দ্ধিতায়ন চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে, এই সময় নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ইহার কিঞ্চিদধিক শতাব্দ পরে অঙ্কিত (১৭৬৪ খ্রীঃ) রেণেল সাহেবের মানচিত্রের সহিত ব্লকের মানচিত্র মিলাইলেই দেখা যাইবে যে, নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ গঙ্গাপ্রবাহ তখন পর্য্যন্ত অঙ্কনযোগ্য ও সচল আছে বটে, কিন্তু গঙ্গার প্রধান স্রোত নবদ্বীপের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ ভাগীরথীর এই প্রাচীন খাত বর্ষায় আজিও সচল হয়। পূর্ণ বর্ষাকালে আমি ইহার উপরে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া ইহার খাতের পরিসর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সরকারী সার্ভে-বিভাগের আধুনিকতম মানচিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। দেখা যাইবে যে, অদ্যাপি এই খাত মানচিত্রে অঙ্কিত হয় এবং অদ্যাপি উহাই নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার সীমানা, নদীয়ার পূর্ব্বস্থ আধুনিক প্রবাহটি নহে।

এই প্রাচীন খাতের পূর্ব্বতীরেই চৈতন্যের আমলের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী অবস্থিত ছিল, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে ইহাই বুঝা যায়। মানচিত্রে চৈতন্যের নগরকীর্ত্তনের পথ অনুধাবন করিলে এই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

শতবার-উক্ত কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক, আমি অতি সংক্ষেপে বিষয়টির অবতারণা করিতেছি।

চৈতন্যভাগবতে আছে, চৈতন্য গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া আপনার বাড়ীর ঘাটে আগে বহু নৃত্য করিয়া মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। পরে বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়া ঘাট দিয়া গঙ্গানগর গ্রাম হইয়া শিমুলিয়া গেলেন। তথায় কাজির ঘরদুয়ার ভাঙিয়া কাজিকে দণ্ড করিলেন। শিমুলিয়া গ্রাম বর্ত্তমানে বামুনপুকুর নামে পরিচিত, তথায়ই অদ্যাপি এই চৈতন্য-দণ্ডিত এবং সেই কারণে বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধেয় কাজির কবর বিদ্যমান আছে। চৈতন্যের নিজের ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট কোথায় ছিল আমরা জানি না। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়, নবদ্বীপের বহুসংখ্যক ঘাটের মধ্যে বৃন্দাবন দাস মাত্র চারিটি বিখ্যাত ঘাটের নাম করিয়াছেন। যাহা হউক, এইঘাটগুলি কোথায় ছিল, আমরা জানি না। কিন্তু গঙ্গানগরের অবস্থান রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে দেওয়া আছে। ঐ ম্যাপের নকল এই স্থানে প্রদত্ত হইল। উহাতে গঙ্গানগরের সংস্থান দ্রষ্টব্য। এই স্থান হইতে বামনপুকুর-শিমুলিয়া প্রায় দেড় মাইল পূর্বোত্তর কোণে। ইহার আগে চৈতন্য

পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাতীর ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

শিমুলিয়া হইতে চৈতন্য শাঁখারীপাড়া ও তাঁতীপাড়া হইয়া দক্ষিণে গাদিগাছা গ্রামে পৌঁছিলেন। এখন এইরূপে যাইতে হইলে মধ্যে জলঙ্গী নদী পড়ে এবং উহা পার না-হইয়া গাদিগাছা যাইবার উপায় নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন জলঙ্গীর এই খাত ছিল না এবং শিমুলিয়া হইতে গাদিগাছা পর্য্যন্ত অখণ্ড স্থান ছিল। ইহার পরে চৈতন্যভাগবতে সামান্য একটু পাঠভেদ লক্ষিত হয়। শিমুলিয়া হইতে দক্ষিণে চলিয়া (গাদিগাছা যাইতে দক্ষিণেই চলিতে হয়) শাঁখারী-পাড়া ও তাঁতীপাড়া হইয়া এবং খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ীতে জলপান করিয়া—"নগরে আইল পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি"—অর্থাৎ তিনি **town proper**এ ফিরিয়া আসিলেন। কোন্ পথে ফিরিলেন সেইখানেই একটু পাঠভেদ আছে। গৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতে আছে ঃ—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতেও এই পাঠই আছে। কিন্তু ৪০৪ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত শিশিরবাবুর সম্পাদিত আদি সংস্করণে নাকি পাঠ ছিল—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

রায় শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ১৩৪১ সনের ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি চৈতন্যভাগবতের ১২৩৯ সনের একখানি যে হাতের লেখা পুঁথির পাঠ দেখিয়াছিলেন তাহাতেও—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।—

এই পাঠই আছে। (ঐ প্রবন্ধ, ৩৫২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় স্তম্ভ, পাদটীকা)। আমি ঢাকা-মিউজিয়মের পুঁথিশালায় তিনখানা পুঁথি দেখিয়াছি। ফল নিম্নে দেখান গেল।

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

D. M. MS. No 26, মধ্য, ১৮৮ পাতা। Undated.

D. U. MS. No 4197 from Mathrun, Dt. Burdwan.
P. 146/2, Undated.

D. U. MS. No. 205. Page 67/1, from Dt. Midnapur
Date 1207 B. S.

গাদিগাছা পারডাঙ্গা দিয়া প্রভু যায়।—

D. M. No. ২৫—খ, P.145/1. undated.

D. U. No. 2352 B. P. 139/1. Date 1165 B. S.

কাজেই মাজিদার নাম কোন পুঁথিতেই পাওয়া গেল না, শিশিরবাবুর সংস্করণেও ছিল না। যাহা হউক, গৌড়ীয় সংস্করণের সম্পাদক এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আপিসের সংশোধিত সংস্করণের সম্পাদক যদি এই লাইনটি—"গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়", এই আকারে কোন পুঁথিতে পাইয়া থাকেন, তাহা অবশ্যই—"গাদিগাছা মাজিদা পারডাঙ্গা দিয়া যায়"—এইরূপে সংশোধ্য। কারণ রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে এই তিন স্থানেরই অবস্থান স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে যে পারডাঙ্গার অবস্থান এমন স্পষ্টরূপে দেখান আছে, এই তথ্যটি উপেক্ষা করাতেই এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীয় রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপের প্রতিলিপিতে পারডাঙ্গার অবস্থান দ্রষ্টব্য। চৈতন্য শিমুলিয়া হইতে রওনা হইয়া গাদিগাছা, (মাজিদা) পারডাঙ্গা দিয়া আপনার নিবাস ঐ সময়ের নবদ্বীপ নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই গঙ্গানগর হইতে পারডাঙ্গা পর্য্যন্ত আমরা তাহার গমনপথ স্পষ্ট অনুসরণ করিতে পারি। এই সমস্ত স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে অঙ্কিত আছে। মানচিত্র দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকিবে না যে চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী প্রাচীন গঙ্গার খাতের পূর্ব্বে এবং গঙ্গানগর ও পারডাঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলঙ্গী নদী ঐ সময় উহার বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত ছিল না। ব্রুকের মানচিত্র দেখিলেই উহার সেই সময়কার খাতের অবস্থান বুঝা যাইবে। ব্রুকের মানচিত্রে এই স্থানে একটু নামের গোলমাল আছে। ব্রুক আম্বোয়া উত্তরে এবং আম্বোক অর্থাৎ অম্বিকা = কালনা দক্ষিণে দেখাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিপরীত হইবে। কাজেই ব্রুকের ম্যাপে যথায় আম্বোয়া চিহ্নিত আছে, উহা প্রকৃতপক্ষে অম্বিকা-কালনা। উহারই বিপরীত দিকে অর্থাৎ শান্তিপুরের অব্যবহিত উত্তরে জলঙ্গী আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। চৈতন্য যখন ফুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন এই নদীরই খেয়াঘাটে নবদ্বীপবাসীর ভিড় হইয়াছিল। এই নদীর খাত অদ্যাপি স্পষ্ট বিদ্যমান এবং আধুনিকতম মানচিত্রগুলিতেও উহা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। থানা কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। ব্রুক এই নদীর নাম লিখিয়াছেন জলগাছি (Galgatese) নদী। ইহা

জলঙ্গী ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার প্রথম পৃষ্ঠায় শান্তিপুর-নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক সাহেব-লিখিত একটি পাদটীকা আছে। উহাতে জলঙ্গীর এই প্রাচীন খাতটির সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে, যথা ঃ—

"বর্ত্তমান নবদ্বীপের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে, গঙ্গানদীর পূর্ব্বপারে এবং প্রাচীন নবদ্বীপের অর্থাৎ মেয়াপুর ও বামনপুকুরিয়া পল্লীদ্বয়ের দেড় মাইল দক্ষিণে খড়িয়া বা জলঙ্গী নদীর দক্ষিণ ধারে মহেশগঞ্জ গ্রাম আছে। মহেশগঞ্জের দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রাচীন জলপ্রবাহের খাত টেংরা, আমঘাটা, গঙ্গাবাস, উশিদপুর, ভালুকা, কুঁদপাড়া, শিঙ্গাডাঙ্গা, কুর্শি, টেরাবালি, গোয়ালপাড়া, কুলে, হিজুলী বাঁকীপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রায় পাঁচ ছয় মাইল চলিয়া আসিয়া বার্গাচড়া গ্রামে বাদ্দেবীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ খাতটির স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন অলকার বিল, গোপেয়ার বিল, এবং বাদ্দেবীর খাল, ইত্যাদি। বাদ্দেবীর খাল বার্গাচড়া গ্রামের উত্তর দিয়া গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষাকালে গঙ্গার জল এই খালে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রাচীনকালে ইহা যে একটি জলপ্রবাহে পরিণত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।"

ইহাই জলঙ্গীর প্রাচীন প্রবাহের খাত। ব্রুক ইহারই খাত তাঁহার মানচিত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রুকের মানচিত্র অঙ্কনের কালে জলঙ্গী যে এই খাতে প্রবাহিত ছিল, তাহার অপর একটি সমসাময়িক প্রমাণও আছে। হেজেস্-এর ডায়েরীর প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৬৮২ সনের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে ঢাকা যাইবার পথে হেজেস্ ফুলিয়ায় নৌকা রাখিয়া প্রকাণ্ড একটি গাছের ছায়ায় ভোজন সমাপ্ত করেন। ১৫ই এবং ১৬ই অক্টোবরের ডায়েরী এই অঞ্চলের ইতিহাসের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়, তাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

October 15—Being Sunday, we dined ashore at Pulia, under a great shady tree near Santipore, where all our Saltpetre boats are ordered to stop, till we can have assurance from Parmesuradass, that we shall receive and send it on our sloops, after entrys were made of it. At this place, Mr. Wood who has charge of ye Petre boats came to me. I gave him a letter to Mr. Beard to be sent by an express to Hugly and proceeded on our voyage.

October 16.—Early in the morning, we passsed by a village called SINADGHUR and by 5 o'clock this afernoon, we got as far as Rewee, a small village belonging to Wooderay, a Jemadar that

has all the country on that side of the water almost as far as ever against Hugly. It is reported by the country people that he pays more than twenty Lack of rupees per annum to the King, rent for what he possesses, and that about two years since, he presented above a lack of rupees to the Mogull and his favourites to divert his intention of hunting and hawking in this country, for fear of his tenants being ruined and plundered by the emperor's lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees most of them tamarins well-stored with peacocks and spotted deer, like our fallow-deer: we saw 2 of them near the riverside at our first landing."

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক মহারাজ ভবানন্দের প্রপৌত্র মহারাজ রুদ্রই যে এই বর্ণনায় Wooderay বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হেজেসের বর্ণনায় মহারাজ রুদ্র রায়ের যে প্রজাবৎসল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, কৃষ্ণনগর-রাজের প্রজাগণের তাহা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। হেজেস বলিয়াছেন, ফুলিয়ায় ডিনার সমাপ্ত করিয়া চিঠিপত্র লিখিয়া তিনি নৌকা ছাড়িয়াছিলেন। রাত্রে সম্ভবতঃ শান্তিপুরের নিকটে কোথাও নৌকা ছিল। তিনি খুব প্রাতে SINADGHUR নামক স্থান অতিক্রম করেন এবং অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রেউই অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে উপনীত হন। কৃষ্ণনগর শান্তিপুর ও নবদ্বীপ থানার আধুনিকতম মানচিত্র দেখুন। প্রাতে ৬টা হইতে বৈকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত ১১ ঘণ্টা হইতে মধ্যাহ্ন আহারাদির জন্য এক ঘণ্টা বাদ দিয়া দশ ঘণ্টা নৌকা চলিয়াছিল ধরিয়া হিসাব করিতেছি। নৌকা উজাইয়া চলিয়াছিল। এ অবস্থায় ঘণ্টায় দুই মাইলের বেশী যাওয়া নৌকার পক্ষে অসাধ্য ছিল। কাজেই জলপথে সিনাদঘার কৃষ্ণনগর হইতে কুড়ি মাইলের বেশী দূর হইতে পারে না। ফুলিয়া হইতে গঙ্গা ও জলঙ্গীর বর্ত্তমান খাতের পারে পারে সিনাদঘার এই ধ্বনিসাদৃশ্যের একটি গ্রামের নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।* আমার মনে হয়, জলঙ্গীর প্রাচীন খাতের উপর অবস্থিত শিঙ্গাডাঙ্গাই বিদেশীর কর্ণে "সিনাদঘার"-এ পরিণত হইয়াছিল। এই প্রাচীন খাতের পথে শিঙ্গাডাঙ্গা হইতে কৃষ্ণনগর সতের মাইল দূর।

* শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার নদীয়া কাহিনীতে SINADGHUR-কে Sreenagar-এ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিবার কালে এ রকম ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অসঙ্গত। মল্লিক-মহাশয় এই শ্রীনগর কোথায় তাহার নির্ণয়ে কোন যত্ন করেন নাই। কৃষ্ণনগর-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের নাম স্মরণে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই রাজধানী শ্রীনগর রাণাঘাটের বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাকদহ থানার এক প্রান্তে অবস্থিত।

তৃতীয় সমস্যা

আর একটি সমস্থার আলোচনা করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার মোগলপক্ষে যোগ দিয়া মান-সিংহকে সাহায্য করিয়া প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটাইয়া বড় হইয়াছিলেন। এই অভিযোগে ভবানন্দ বেচারীর প্রেতাত্মাকে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নাট্যকারও ভবানন্দের লাঞ্ছনার ক্রটী করেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় নদীয়া-কাহিনী লিখিতে বসিয়া ঐ প্রচলিত কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।

১৩৩৯ সনের ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় "প্রতাপাদিত্যের কথা" নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে ভবানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। আমাদের দেশের শিথিল ইতিহাস-অলোচনা-পদ্ধতির ফলেই ইতিহাসক্ষেত্রে এই ভিত্তিহীন অভিযোগের এত দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে মূল কথা কয়টার পুনরুক্তি এই স্থানে করিতেছি।

১। প্রতাপাদিত্য স্বদেশ উদ্ধারকামী বীর ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি মোগল-পক্ষের অনুগত লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত মোগলগণের অবিশ্রাম যুদ্ধের কাহিনী একেবারেই মিথ্যা।

২। তাঁহার পতন মানসিংহের হস্তে ঘটে নাই, বাহার-ই-স্তানের আবিষ্কারে এই সত্য স্পষ্ট হইয়াছে—রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রেও মানসিংহের সহিত তাঁহার সখ্যের কথাই আছে। কাজেই প্রতাপাদিত্যের পতনে মানসিংহকে সাহায্য করিয়া ভবানন্দের জমিদারী লাভের কথা মিথ্যা।

৩। ইসলাম খাঁর আমলে সুবাদার ইসলাম খাঁকে যথোচিত সাহায্য না করাতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। সেই অভিযান জলপথে ভবানন্দের জমিদারীর উপর দিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয়। তখন অনুগত জমিদার ভবানন্দ এই অভিযানকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন, যদিও বাহার-ই-স্তানের বিস্তৃত বিবরণেও ভবানন্দের নামোল্লেখ অথবা ভবানন্দের সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই।

৪। কৃষ্ণনগর-রাজগণের জমিদারীর মূল দলিল দুইখানি,—প্রথমখানি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরের = ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফর্ম্মাণ। দ্বিতীয়খানি ১০২২ হিজরী = ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ কেহই এই দলিল দুইখানি যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করেন নাই। এমন কি দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়

পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে প্রথম দলিলখানি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি উভয় দলিলেরই ফটো লইয়া উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুবাদ করাইয়াছি। উভয় দলিলই বেশ অক্ষত ও স্পষ্ট আছে। প্রথম দলিলে দেখা যায়, রাজা ভবানন্দ তাহার দুই ভাই রাজা বসন্ত ও দুর্গাদাসকে দিল্লী পাঠাইয়া এই ফর্ম্মাণ আনাইয়াছিলেন। ভবানন্দ পূর্ব্ব হইতেই বাগোয়ান মাটিয়ারী ও নদীয়া, এই তিন পরগণার অধিকারী ছিলেন। প্রথম ফর্ম্মাণখানির দ্বারা মানসিংহের অনুরোধে তাঁহাকে অধিকন্তু মহৎপুর পরগণা ১২০০০৲ টাকা বার্ষিক রাজস্বে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ফার্ম্মাণ দ্বারা পূর্ব্ব চারি পরগণার উপরও আরও সাত পরগণা দেওয়া হয়। দুই ফর্ম্মাণের এক ফর্ম্মাণেও প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই। এই ফর্ম্মাণ দুইখানি সানুবাদ এবং সটীক আমি অন্যত্র শীঘ্রই প্রকাশিত করিব। ভবানন্দের বিরুদ্ধে যে যুগ যুগ ধরিয়া মিথ্যা অভিযোগ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে তাহা দূর করিতে পারিয়া থাকিলে চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে ডক্টর ভাণ্ডারকরের ছাত্র বলা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে বলিয়া ডক্টর রায়চৌধুরী আমাকে জানাইয়াছেন।

ইতিহাসক্ষেত্রে কর্ম্মিগণের কর্ম্মের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক কর্ম্মীর নাম বাদ পড়িয়াছে, ইহার জন্যও আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডক্টর শ্রীযুক্ত অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, প্রত্নলিপিতত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবিমল সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডক্টর শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার ডক্টর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীমান্ অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বহু কর্ম্মীর কর্ম্মের কোন পরিচয় আমি দিতে পারি নাই। আজ ইহাদের নাম স্মরণ করিয়া এবং ইতিহাসক্ষেত্রে বাংলা দেশে কর্ম্মীর অভাব নাই, গর্ব্বের সহিত এই কথা উপলব্ধি করিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। স্থানীয় ইতিহাসক্ষেত্রে ৺সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোর-খুলনার ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনের বগুড়ার ইতিহাসের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের নদীয়া-কাহিনী, এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত হিজলির মসনদ্-ই-আলা এই ক্ষেত্রে দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

এম, এ, পি-এইচ-ডি।

পরিশিষ্ট (ঝ)

কবিতা এবং প্রবন্ধ

বন্ধু

(শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য)

কত যুগযুগান্তের পরিচয় তোমায় আমায়
হে অভিন্ন বন্ধু মোর ভুলো নাই মোর বক্ষ বরি'
আনন্দের স্পর্শ দিয়া জীবনের প্রভাত বেলায়
টেনে নিলে বক্ষে মোরে সুগোপনে আলিঙ্গন করি
কত জন্ম চলে গেছে নিয়তির কালচক্রে ঘুরি
কত দেশ দেশান্তরে পাতিয়াছি সাধের সংসার,
স্বজনের সমারোহে উড়ায়েছি স্বপনের ঘুড়ি
প্রাণের জাহ্নবী কূলে হৃদয়ের হোতো অভিসার।

অতি দূর দূরান্তরে যাহাদের এসেছি ফেলিয়া
তাহারা হয়'তো আজো গাহিতেছে মোর মধুগীতি
পড়িতেছে শেষ লিপি বার বার নয়ন মেলিয়া
এসেছি নূতন পথে, সেথা আছে পুরাতন স্মৃতি।
তাহারা হয়তো মোরে ভুলিয়াছে আনন্দ উচ্ছ্বাসে
বিরহের হাহাকার বহেনাক' তাহাদের গেহে,
যাহাদের সনে আমি প্রতিদিন প্রচুর উল্লাসে
যাপন করেছি কাল নানা কর্ম্মে পূর্ব্বতন দেহে।

কতবার তীর্থযাত্রা ক্ষণতরে হয়েছে ভুবনে
কেহ তো জানেনা বন্ধু তুমি জানো অন্তরে বিশেষ,
তব নাম জপে জপে রূপালোক পেয়েছি গোপনে
ধেয়ানে জমেছে রস, জড়ত্বের হয়েছে নিঃশেষ।
তীর্থ হ'তে তীর্থে আসি প্রতিমারে করিয়া বরণ,
সুখ দুঃখ অর্ঘ্য দিয়া আমি চলি মাতায়ে ভূলোক
অকস্মাৎ সমাধির স্তব্ধতায় হই যে মগন
তারে মৃত্যু সবে কহে—সমাধির এইতো পুলক।

ব্যথাতুরা স্নেহলতা, সকরুণ গৃহ বলীভুক্
প্রাঙ্গণের পুষ্পতরু বেদনায় আর্ত্তনাদ করে,
বিরহের ব্যাকুলতা উদ্বেলিয়া দেয় প্রাণে দুখ
মায়ার কুরঙ্গ কাঁদে, বিহঙ্গের অশ্রুকণা ঝরে।
সুষুপ্তির মহাসিন্ধু বয়ে যায় মরণের মাঝে,
আমার অস্তিত্ব কোথা জানিনাক সুনিদ্রিত মন,
ধরণীর চক্রবালে মৌন সন্ধ্যা অশ্রুময়ী রাজে
তমস্বিনী বনাঙ্গনা নদীপথে কাঁদে অনুক্ষণ।

সমাধি ভাঙ্গিয়া যায় জড়ত্বের জৈবজ্যোতি ভাসে
এইকি জনম বন্ধু ! মাতৃবক্ষে মায়ার পরশে
বালার্ক রঞ্জিতরাগে স্বপ্নভাঙা শতদল হাসে
এ মানস সরোবরে রাজহংস দেদীপ্য হরষে।
সকলি নূতন হেরি, জীবধাত্রী মোরে পাশে রহে
তার সাথে করি খেলা, হয় যত জ্ঞানের উন্মেষ,
কল্পনার কাব্যকুঞ্জে মৃদু মৃদু সমীরণ বহে,
জীবনের মধুচক্রে পাইয়াছি রসের উদ্দেশ।

দুঃখে সুখে সংসারের কর্ম্মশালা আশায় খচিত
নব নব ব্যাকুলতা পাইয়াছি তারি মাঝে আমি
ভালোমন্দ সাথে নিজ নানা কাজে হই পরিচিত
তবুও আমারে ভ্রম পদে পদে করে দূরগামী।
তোমারে চিনেছি বন্ধু নাম ধরে পারিনা ডাকিতে
অসীমে সসীমে ব্যাপ্ত জ্যোতির্ম্ময় নিদ্রাজাগরণে,
ভ্রমিতেছ লক্ষ কোটী ভুবনের আঁখিতে আঁখিতে,
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টির প্রাণরূপে নানা আচরণে।

আনন্দ-সঙ্গমে

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

বঙ্কিম, সর্পিল গতি অবিরল চলে স্রোতস্বতী
কলধ্বনি-নূপুর চরণে, আশ্লেষ-আকুল কোন্ অভিসারিণীর মত ?
নির্মল, নিতল নীরে দক্ষিণের অলক্ষ্য পরশ উলসিছে তরঙ্গলীলায়।
বনশ্রীর স্নিগ্ধ, শ্যাম শোভা, নীলিমার অনন্ত বিস্তার ধরি' ঐ
স্বচ্ছ, ক্ষুদ্র বুকে
চলিয়াছে অকূল-উদ্দেশে লক্ষ্য-হারা বাসনার মত।
দুই তীরে অবারিত শ্যামল প্রান্তরে লীলায়িত ধরণীর বসন অঞ্চল !
দূরে কোন্ বনবীথি হ'তে ভেসে আসে কোকিলের কলকণ্ঠে
মুক্তির কাকলী।

তারা-জাগা, পাখী-ডাকা, নদী-গান-গাওয়া সেই বিজন প্রান্তরে
জাগে শুধু অনন্তের অন্তরের ধ্বনি !
সাধ হয় জীবনের সর্ব দুঃখ-সুখ, সব দ্বন্দ্ব, সকল বিক্ষোভ
বেদনার রক্তশতদলে দিই অঞ্জলিয়া চরণে তাহার !
ঐ যে ফুটিছে তারা—নিশীথের ধ্যানের স্বপন,
ঐ যে হাসিছে পূর্ণ শশী বাঁধিয়া ধরার বক্ষ রজত কুহকে,
ঐ যে তটিনী মর্মের মর্মরধ্বনি গুঞ্জরিয়া তটেরে শুনায়,—
ঐ সুর, ঐ আলো, ঐ দোলা রক্তে মোর তুলিয়াছে ঢেউ,
জানায়েছে অন্তরে আমার নেপথ্যের অনুক্ত আহ্বান ;
দুঃখ-সুখ, অশ্রু-হাসি, জীবন-মরণ
এক হ'য়ে গেছে আজ অসহ্য পুলকে।

যে-জননী স্তন্য-সুধারসে পালিয়াছে জন্মক্ষণ হ'তে,
দিয়াছে ক্ষুধার অন্ন, মিটায়েছে প্রাণের পিপাসা
দিগন্ত ললাটে যার ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়াছে জ্যোতির্ময় আশা—শতশোভা
বরণের,
—কভু শুভ্র, অনভ্র, সুষীম ; কভু দীপ্ত রাগ-রক্ত-রেখা ;
কখন বা নিগূঢ় আঁধার ;

যার সাথে তনু মোর, প্রাণ মোর ছিল বাঁধা নাড়ীর বন্ধনে,
তাহারে ত্যজিতে আজি নাহি কোন ভয়, সরম-সংশয়,
ফেলে যেতে জীবন-সঞ্চয় নাহি ক্ষোভ কোন !
পথে যেতে ফিরে ফিরে চাওয়া,
করুণা-কণিকা-ভিক্ষু, ভীরু মিনতির মৌন, মূঢ় মায়া—
আজি তার শেষ।
আসে যদি সান্দ্র এ লগনে লোকান্তর হ'তে কোন্ অলক্ষ্যের ডাক
তবে সেই ভালো, সেই মোর অলোকের আলো
প্রাণে মোর কুহক বুলাক্

শ্যামলীর কোমল চোখের ঐ চাওয়া,
আঁখির তারায় তার নীলিমার অপরূপ মায়া
বহি' আনে সুন্দরের গোপন ইঙ্গিত !
রূপ ছেড়ে তাই অপরূপে, কথা ছেড়ে বচন-অতীতে
ধায় হিয়া অধীর উদ্দাম।
আজি তার নিমন্ত্রণ-লিপি এসেছে আমার দ্বারে,
লেগেছে পরাণে মোর প্রাণেশের প্রেমের পরশ !
আর তারে রুধিব কেমনে ?
আমার প্রাণের সেই চির-বিরহিনী,
সে অভিমানিনী,
সহসা পেয়েছে তার দয়িতের দুর্লভ প্রসাদ,
পূর্ণ আজি তার সর্ব সাধ।
তটিনীর মত তাই চলেছে সে লীলায়িত, ললিত ভঙ্গিতে
অলক্ষ্যের অভিসারে
সুন্দরের আনন্দ-সঙ্গমে।

"উর্ম্মিলা"

সুধাংশুশেখর মিত্র।

রঘুরাজকুল-নববধূ ওগো! চিরদুঃখিনী আয়!
কোন্ দেবতার অভিশাপ নিয়ে এলে গো অশ্রুময়ী।
পদ-পঙ্কজে নাহি পরশিতে স্বর্ণ প্রাসাদ-দ্বার,
বরণ-ডালায় শেষ না হইতে মঙ্গল-উপচার,
প্রভাতের ম্লান শুকতারা সম ডুবে গেলে একেবারে
পতির গৃহের পুণ্য-ধূলির গোধূলি-অন্ধকারে।
আরম্ভ তব উপসংহারে মিশে গেলে অমলিন,
কোথাও বিন্দু সংশয় রেখা রাখেনি মায়ার খণন।
তারপরে আর খুঁজিতে তোমায় যতবার সেথা যাই
ছায়াখানি যেন ব'লে যায় আছে—মূরতি কোথাও নাই।

তন্বীতনুর বিকাশ-বিধুর পদ্মটি মুখ তুলি',
মেলিছে তখন সবে ঢলঢল পল্লবদল গুলি।
ফুল্ল-আঁখির জড়িতপক্ষ্মে তখনো নামেনি ভাষা,
বেষ্টিত-বাহু-পরশে কাঁপিত বেপথু বুকের আশা।
সরম তখনো শিশির-মাখানো শেখেনি সোহাগবাণী,
পরাণ তখনো প্রলাপ-জড়ানো আনেনি প্রণয়খানি।
মিলিত মধুর সান্ত্বনা সনে অধর-পরশ-অনু,
সে কি শিহরণ লীলা-আলস্য লুটায়ে ফেলিত তনু।
ভীরু হৃদয়ের নব প্রেমখানি স্বামীর সোহাগ পরে
আলাপে আভাষে এমনি যখন বিকশিছে থরে থরে,
বিধিলিপি তব অভিশাপ হ'য়ে অভিসারিকার রূপে
নিয়তির কালো অঞ্চলতলে দেখা দিল চুপে চুপে।

ওগো অভাগিনী! রাজ-নন্দিনী! বারেক নয়ন খোলো,
সন্ন্যাসী তব দুয়ারে দাঁড়ায়ে—আঁখি তোলো আঁখি তোলো।

একি অপরূপ! দেবতার রূপ! একি ক্রূর পরিহাস!
বল্কলবাসে বিদায় মাগিছে লক্ষ্মণ তারি পাশ।
অধীর আঁখির মুক্ত-প্রবাহ সবলে বাঁধিয়া বুকে
বিদায় দিয়েছ তোমার জীবন-সূর্য্যরে হাসিমুখে।
হাসিমুখ তব হায় কল্যাণ! তোমারি কামনা লাগি'
বিদায়ের রাতে আঁখিজল হ'তে পাষাণ উঠেছে জাগি;
নায়কের তরে তবু বাধা তারে দাওনি হে দেবী ভুলে,
নির্ম্মম হাতে বক্ষের মণি বুক থেকে দিলে তুলে।
যারা অন্তর ক্ষত-জর্জ্জর তোলে সে-রক্ত রাঙি',
তবুও একটি কুণ্ঠিত রেখা কপোলে ওঠেনি ভাঙি'।
নারী জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ এক অঞ্জলি পাতে
সবটুকু তার ঢালিয়া দিয়েছ বিদায় প্রণামের সাথে।

অর্পিত দিনগুলি গাঁথিয়া উচ্চে তুলিয়া তুলি'
কার কল্যাণে আপন বেদনা পলকে গিয়াছ ভুলি';
বনবাসী করি' বরি' নিলে তুমি তব মন বনবাসে,
ক্লান্তি-মলিন দেহখানি কারে স্মরিয়া গো উপবাসে;
বেদনা-শীর্ণ তনুখানি তব মুদিত কলিকা সম
চরণে তাহার আরতি-আলোর ফুটিয়াছে অনুপম।
স্বার্থ বিহীন সে-দান তোমার ওগো মহা-মহীয়সী;
চির-গৌরবে রমণী জাতিরে করিয়াছে গরীয়সী।

বিদায় দিয়েছ স্বামীরে হে দেবী; প্রণমি কি আঁখিজলে
সরযূ আজিকে শুকায়ে এলো যে তাহারি বাড়বানলে;
অযোধ্যা আজি মরণ-মলিন সে-দুখ-অশ্রু তাপে,
তরু-লতিকার মর্ম্মর-ধ্বনি আজো সে-দুঃখে কাঁপে।
হায় কবিবর! পশ্চাতে তুমি যে ফুল ফুটায়ে এলে—,
তারপানে আর ফিরে একবার চাহিলেনা অবহেলে।
সে কি বা রহিল, সে কি ঝ'রে গেল, কোথা তার পরিণতি,
নির্দ্দয় হাতে চিহ্ন কোথাও রাখিলে না একরতি।

সীতার দুঃখে কেঁদেছে আকাশ, কেঁদেছে দৈত্যপুর,
ক্রন্দনে তার ঝ'রেছে পুষ্প, টলিয়াছে সুরাসুর।
সে-শোক-ধারায় উর্ম্মিলা হায় ভেসে গেল একেবারে,
বিশ্ব তাহার নির্ব্বাক হোলো সীতার অশ্রু-ধারে
সে-ব্যথা অতল সিন্ধু বুকের কল্লোল কলরোলে,
সে-ব্যথা সজল বন-মর্ম্মের মৃদু মর্ম্মরে দোলে।
সে-ব্যথা উদয়-অস্ত-আকাশে রক্ত শিখরে ফোটে,
বাতাসে বাতাসে সারা দিগন্তে গুমরি' গুমরি' ওঠে।
তারপরে আজ গেল কত যুগ তবু সে করুণ গাথা
তিমির মেদুর সন্ধ্যা-ছায়ায় অভিসার অনুরতা।
তাই মনে হয় সে-মহিমা তব লভিল সাধনা-সাথা,
তাহারো উর্দ্ধে ফুটিয়াছে এই নীরব অনাদৃতা।
তাই অপজ্ঞাত দুঃখের পর দীপ্ত বিকাশখানি
আয় গরিমায় স্রষ্টার বুকে লজ্জা দিয়াছে আনি'।

রক্ত-কমল

শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ।

জানি
নিত্য তুমি আনি,
জানাও গোপন কথা তব ;
আকুলি-বিকুলি উঠি নানা ছন্দে নব,
বুক ভরা ঘন-মধু-রসে—মর্ম্ম ভরা গন্ধে গানে,
উতল অধীর প্রেমে চাহি সূর্য্যপানে। জানি, জানি কোন আকর্ষণে
বাঁকাও মৃণাল গ্রীবা বন্ধ আঁখি-দল উন্মোচিয়া আত্মহারা বিহ্বলে ব্যাকুলি
আনন্দ লাবণি অঙ্গে, অতৃপ্ত তৃষিত-ওষ্ঠ-পুটে যৌবনের সুখ-স্বপ্নে দুলি
লীলায়িত বায়ুভরে চাহি পূর্ব্বাকাশে। জানি রবি রূপ বারতায়
যে গান রণিয়া উঠে—সমূর্চ্ছিত হয় দরিয়ায়,
সে সুর ছুঁয়েছে হৃদি তব বক্ষাবাসে
মোহিতে মানসখানি আশে,
দিন সাথে ভাসি—
হাসি।

হাঁস

আছ শুচি চাপি'

সলিলের পঙ্কাগ্রে তপে

দয়িত কান্তার রূপ স্মৃতি ধ্যানে, জপে।

প্রাণমন উৎসুক উন্মুখ পরিপূর্ণ প্রেম পাশে

কখন প্রদীপ্ত রবি উথলিবে হাসি পূর্ব্বদ্বার ঠেলিয়া আকাশে।

কখন লাবণ্যচ্ছুরি আনন্দচঞ্চল হিন্দোলিয়া প্রতিভাত হবে তব বুকে,

অতৃপ্ত চুম্বন রাগ এঁকে দেবে রক্ত-ঘন-দাগ, যৌবন সার্থক হবে সুখে।

আপন অন্তর রসে প্রাণ গন্ধে পুরি' পাত্র গর্ভোদর খানি,

জীবনের অন্ধ-বীজ অঙ্কুরিতে চাহ আত্মদানি।

জানি, জানি গন্ধে গানে তাই চেয়ে প্রাচী

সাধন সমাধি লয়ে বাঁচি

আছ আত্ম সুখে—

দুখে।

ফুটে

স্বপ্ন চিত্ত পুটে

সপ্ত বর্ণচ্ছটা ধনু-লেখা

মোহন প্রণয়খানি বাঁকা বাঁকা রেখা।

বসন্ত বল্লরী জাগে কুসুম পেলব ছন্দ পায়,

প্লাবন উচ্ছলি' হৃদে সুনিবিড় দোলে। জানি তব রহস্য ঘনায়

অরূপ রঙের রূপে তনু মন ঘিরে অনুরাগে। জানি ভরা বসন্ত পূর্ণিমা

ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিয়া উঠে তব তরুণ স্বপনে। জানি তব আরক্ত তনিমা

অধির আনন্দ লয়ে ব্যথা কল্পনায় মাতি হয় ধৈর্য্য-হারা

লুটায় অঞ্চলখানি ক্ষণে ক্ষণে পাগলিনী পারা

অচঞ্চল জল শেজে দখিনার দোলে,

মধুচ্ছন্দা মন্দ বায়ু কোলে

রোমাঞ্চিয়া চলে

দোলে।

ধীরে
সর্ব্ব তীরে তীরে
আকাশে বাতাসে গেল জানি
তোমার লুকান প্রেম চেপে থাকা বাণী
আমার ছন্দের গানে। পুলক গভীর কত তার
রস সমুজ্জ্বল কত—কতঘন—কত প্রসুপ্ত সরম ভার,
অজানিত ছিল সে বারতা উচ্ছল বেদনা ভরা ; আমি কবি করি দিনু দান
অবরুদ্ধ তব মর্ম্মকোষে চুমি' চয়নিয়া আনি। জানি, মোর এই গান
অসহ হরষ-রসে আন্দোলিবে প্রাণ তব ; উঠিবে শিহরি,
অপূর্ব্ব পুলক স্পর্শে, ঘন কম্পে দুরু দুরু করি।
সে কম্পন সহিতে নারিবে তুমি দেহে
ম্লান হয়ে যাবে লাজে লেহে।
সন্ধ্যা যবে হবে----
ভবে।

শরৎচন্দ্রের

মহাপ্রয়াণে

শ্রীমতী শোভা দেবী।

এদেশ আজি বন্ধু হারা
বিপুল শোকের সায়র তলে
হৃদয় ক'রে আর্ত্তনাদ আজ
নিখিল ভাসে নয়ন জলে
'পথের দাবীর' অধিকারের
অসীম সাহস বক্ষে লয়ে
সব্যসাচী ছুটাল রথ
আঁধার পথে আলোর জয়ে

তোমার অমর লেখনীতে
তারি পাঞ্চজন্য বাজে
সুমিত্রাকে সাজিয়ে দিলে
জ্যোতির্ম্ময়ী নারীর সাজে
হে দরদী 'বিপ্রদাসের'
আঁকলে ছবি মানবতার
দীপ্তিময়ী 'বন্দনা' যে
সর্ব্ব নারীর আরাধনার

মহাসতীর অনলে আশিস
এই যুগের 'সতী'র ভালে
দেতা যুগের লক্ষ্মণ ভাই
দ্বিজদাসের অন্তরালে
দরদী ঐ বক্ষে তোমার
সবার ব্যাথার দহণ জ্বালা
'বিরাজ বৌ' ও 'বিন্দুমতী'
তেজস্বিনী পল্লীবালা
'চরিত্রহীন ধন্য হল
নমস্য, তায় করলে কবি
কল্পনা যে সত্যি হল
তোমার হাতের পরশ লভি
'বৈকুণ্ঠের উইল' খানি
'শেষপ্রশ্নের' সমাধানে
'দেনা পাওনা'র হিসাব তোমার
রইল স্মৃতির মধ্যখানে
'ইন্দ্রনাথে করলে সৃজন
মৃত্যু কে যে তুচ্ছ ক'রে
কালের স্রোতে দিচ্ছে পাড়ি
সঙ্গে লয়ে শ্রীকান্তরে

বাঙ্গলা কাঁদে তোমার লাগি
মরমি আজ তোমার তরে
আজ থেকে সে কাঙ্গাল হ'ল
লক্ষ আঁখির অশ্রু ঝরে
অন্তরীণের অন্ধকারায়
কাঁদছে দেশের সবুজ প্রাণ
সবাই যে আজ সর্ব্বহারা
তোমার শোকে মূহ্যমান
মা ভারতীর গলায় মালা
পরিয়ে ছিলে মানস ফুলে
প্রিয়তম পুত্রটি তাঁর
তাই কি কোলে নিলেন তুলে
'শরৎচন্দ্র' সার্থক নাম
সাহিত্যরই নীল আকাশে
রইল চির ছড়িয়ে কিরণ
দীপ্ত মধুর রসোল্লাসে
তোমার তরে সারা জীবন
করব স্মৃতির পুণ্যারতি
চির অমর বন্ধু মোদের
রইল তোমার প্রেমের জ্যোতি।

শরৎচন্দ্রের অস্তগমনে

বঙ্গভাষার গগনে আজিকে
ঘেরিল গহন অন্ধকার,
ছড়াবে না হায় কৌমুদীমালা
শরৎচন্দ্র আলোকে তার।
শরৎচন্দ্র ডুবিল আজিকে
মহামৃত্যুর অস্তাচলে,
শরৎচন্দ্র উদিবে না আর
ডুবিল মরণ জলধি জলে।
বঙ্গভাষায় এলো অমানিশা
এলো অমানিশা সবার মনে,
অসীম আঁধারে তারকার আঁখি
ঝরে অবিরল বিরহ ক্ষণে
শত শত তারা ছিল চারিদিকে
মধ্যে পূর্ণ চন্দ্র সম
শরৎচন্দ্র শোভিল গগন
মহাভাস্বর-সুমনোরম।
নবীন যুগেরে জাগায়ে তুলিল
সাহিত্যে দিল নূতন দান,
দেখিল না শুধু সমাজ মহিমা
মানবের বুকে দেখিল প্রাণ।
মনের মাঝারে বিচিত্র লীলা
চিত্রিত যাঁর তুলিকাপাতে
নারীরে যে দিল দেবীর আসন,
লেখনী মুখর বন্দনাতে।
রাজলক্ষ্মীর মহিমার পাশে
সাবিত্রী নিল আসনখানি

বিরাজের প্রেম, বিন্দুর স্নেহ
পার্ব্বতী নিল জীবন ছানি
কিরণময়ীর জীবনে ঘটি'ল
যত দুঃখের বিড়ম্বনা
সূক্ষ্মবিচারে বিশ্লেষ করি
দেখাইতে পারে সে কয়জনা
চরিত্র যত অতুল জগতে
গঠন করিল লেখনী যাঁর
বঙ্গ রমণী মহাশোকে আজি
আঁখি জলে পূজে স্মৃতিটী তাঁর।
পল্লীনিবাসী মূর্খ গোকুল
ভ্রাতৃস্নেহের পরশ-মণি
পত্নী প্রেমিক উপীনেরে ধ্রুব
রামচন্দ্রের দোসর গণি।
দেবদাস দিল জীবন আহুতি
প্রিয়ার বিরহে "নরের" মত
মহিম আপন মহিমার ভারে
অচলায় করে চরণে নত।
বাস্তব এই জীবনের খেলা
সত্য হইয়া উঠিল জাগি,
কাহিনী লিখিতে গড়িল জীবন
যে জন সমাজে মুক্তি মাগি।
বঙ্গ ভাষারে উজ্জ্বল করি
স্বর্ণ আমার লিখিল নাম,
বঙ্গমাতার আজি দুর্দ্দিন
বঙ্গবাসীরে বিধাতা বাম।
ধরণীর খেলা সাঙ্গ করিয়া
তাপিত আত্মা এ মহাশোকে
গেল চলি হায়, করি প্রার্থনা
শান্তি লভুক অমরলোকে।

শ্রীউমাদেবী কাব্যনিধি।

কাল বৈশাখী

সরোজরঞ্জন চৌধুরী।

তোমারে জানাই নতি, ওগো কালবৈশাখি ভীষণ।

মোর ক্ষীণ ছন্দের সঙ্গীতে।

আমি কবি প্রীতিভরে তোমারে যে করি আবাহন ;

নেমে এস মোর পৃথিবীতে।

সুদূর গগন-প্রান্তে প্রতিদিন গুমরি' হুঙ্কারি'

কেন তুমি ফিরে যাও প্রাণে মোর হতাশা সঞ্চারি ;

বসন্তের পালাশেষ হয়নি এখনো বুঝি, ভাবি'

দ্বিধাভরে ফিরে চ'লে যাও ?

অক্ষম আমার মত করিতে আপন প্রাপ্য দাবি'

তুমিও কি প্রাণে ভয় পাও ॥

বসন্ত চলিয়া গেছে কতদিন হ'য়ে গেল গত,

আছে শুধু স্মৃতিমাত্র তার ;

ম্লান, ক্ষীণ বর্ণ, গন্ধ বিচ্ছেদের বেদনার মত

বহিতেছে পত্র-পুষ্প-ভার।

কোকিল এখনো কুহু কুঞ্জবনে ডাকে থাকি' থাকি',

ভ্রমর এখনো ফিরে গুঞ্জরিয়া পুষ্প-রেণু মাখি' ;

এখনো চাঁদের চোখে প্লাবিয়া অম্বর, ধরাতল

উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না পড়ে ঝরি'।

এখনো বহিয়া চলে উল্লসিত মলয় চঞ্চল,

তবু হায়, মর্ম্ম গেছে মরি' ॥

বসন্ত-শেষের ম্লান স্বপ্ন-জাল ছিন্ন করি দিয়া
এস তুমি প্রচণ্ড, কঠোর!
নিষ্ঠুর আঘাতে তব রুদ্র-বীণা উঠুক্ বাজিয়া
ভুবনের শান্ত মর্ম্ম ডোর।
দুর্ব্বার আবেগে তব ধরণীরে কর আন্দোলিত,
তন্দ্রামগ্ন চরাচর বেদনায় হোক্ সচকিত,
কাঁপিয়া উঠুক্ সবে মৃত্যুসম দারুণ শঙ্কায়
ক্ষমাহীন তোমার প্রহারে।
জাগিয়া উঠুক্ যত স্বপ্নাতুর ভীরু অসহায়
সুকঠিন সত্যের মাঝারে॥

সুকোমল বাল্যে যবে মগ্ন ছিনু তরুণ তন্দ্রায়
তুমি ছিলে বিষম ব্যাঘাত;
সুকুমার শান্তি মম দোলাইতে অশান্তি-দোলায়
সুকঠিন হানিয়া আঘাত।
শঙ্কা-ভরে ক্ষণে ক্ষণে মেলিতাম অবসন্ন আঁখি,
অস্ফুট মর্ম্মের মাঝে বুঝিতাম তুমি যাও হাঁকি'
ব্যাকুল ব্যথার ঘায়ে জাগাইয়া সুপ্ত পৃথিবীরে
বাধাহীন উদ্দাম আবেগে।
উঠিতেছে আর্ত্তনাদ ধরার করুণ বক্ষ চিরে
অকরুণ তব স্পর্শ লেগে॥

মধুর কৈশোরে যবে চাহিতাম স্বপ্নাতুর চোখে
সুন্দরী এ-ধরণীর পানে
তুমি এসে অকস্মাৎ হৃদয় ভরিয়া দিতে শোকে
শ্মশান-ক্রন্দন সম গানে।
নির্ম্মম আঘাতে তব ধরিত্রীর মর্ম্ম যেত ছিঁড়ে;
সুবিশাল বনস্পতি ভূলুণ্ঠিত অবনত শিরে,
কোমল লতিকাগুলা ছিন্ন ভগ্ন ধূলিশয্যা পরে,
পত্র-পুষ্প মাতৃবক্ষ-ছাড়া।
কত নর, পশুপাখী মুদিত নয়ন চিরতরে,
কত গৃহী হ'ত গৃহহারা॥

স্ফুটোন্মুখ চিত্ত মম শিহরি' উঠিত বারে বারে
নেহারি' তোমার নিষ্ঠুরতা ;
শঙ্কা হ'ত তুমি বুঝি ছিন্ন করি ফেলিবে তাহারে,
বুঝি নাই তোমার বারতা।
উচ্ছল যৌবনে যবে ভ্রমিতেছি জাগরিত হয়ে
সাড়া দাও মোর ক্ষুব্ধ প্রস্ফুটিত, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে,
ঝঞ্ঝা, বজ্র, শিলাবৃষ্টি সঞ্চারিয়া এস মোর প্রাণে
ওগো তুমি বাধাবন্ধহীন !
বিগত বসন্তদিন ভেসে যাক্ বিস্মৃতির পানে,
তুমি এস দুরন্ত নবীন ॥

আমার জীবনে আজি তোমারে একান্ত প্রয়োজন,
ওগো তুমি ভীষণ সুন্দর !
তোমারে অন্তর মাঝে যাচে মোর জাগ্রত যৌবন,
ছিন্ন করি' দাও স্বপ্ন-ঘোর।
আমার জীবন-রথে তুমি হবে সুযোগ্য সারথী,
সর্ব্ব বাধা অতিক্রমি' তাহারে চালাবে দ্রুতগতি
পথরেখা চিহ্নহীন সীমাশূন্য কালের প্রান্তরে
বিনির্ম্মিয়া নিত্যনব পথ।
রথের গতির বেগে কাঁপিয়া উঠিবে শঙ্কা-ভরে
শঙ্কাহীন সমুদ্র পর্ব্বত ॥

কাল

শ্রীঅসিত কুমার হালদার।

অন্ধকার জন্ম নিল
সে কোন্ প্রহরে
জীব-হীন দ্বীপে
লুক্কায়িত ছিল যাহা আলোর পশ্চাতে
তিমিত প্রদীপে।
প্রণব তেজের মাঝে ছিল আত্মহারা
অপ্রহত সমাসক্ত তা'তে।
* * *
স্থায়ী কোন্ প্রান্তে............
যুগপৎ যুগান্তর
অসহ্য-আলোকে
অব্যয়, অস্থির দুই বৈসদৃশ্য মাঝে
সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন্ কর্ম্মনাশা কাজে
সমুজ্জ্বল ছিল এক বৈরূপ্য প্রভাবে।
তারি মাঝে ভাসমান ছায়া
দিল দেখা কোন্ কোণে?
...............কোথা যাবে নিয়ে
কেহ তাকি জানে?
সৃষ্টির কিনারে, গগনের পারে
স্পন্দন যে আনে!
তন্দ্রাবেশে যেন সেই কজ্জল তপতী
তপনেরে ছেয়ে দিল আলিঙ্গন ভ'রে
দ্যুলোকের দ্যুতি তায় ক্ষীণ হয়ে গেল
দোঁহার মিলনে;
ভবিষ্যের তরে
প্রত্যাহত বিক্ষোভের পরে।

বিকম্পিত করাল সে কালো
তারি মাঝে হইল উদয়
জ্যোতির সাগর তীরে
সেই এক ভয়।
প্রবল দস্যুর মত দলে দলে আসি
অচকিতে ধীরে ধীরে
সহজ সরল যাহা সর্ব্বকাজ নাশি
দিল দেখা।
তার সেই জন্মের কারণ
জন্ম নিল বিভ্রান্ত মরণ
কালিমাখা ছায়া;.........
তারি পরে হেলে দুলে
ঢেউপরে ঢেউ জাগাল কি মায়া!
অণিমা লঘিমা হেন অষ্টৈশ্বর্য্যহারা
বিমুক্ত নিখিলে—
তিমিরের বেষ্টনীতে যেই ঘিরে নিলে
বিমূঢ়-বিমুগ্ধ তায়, বিবর্ত্তন চাপে
এল ফিরে ফিরে
কালো আর আলো দুই
রাগ অনুরাগ;
তাই অন্ধকার.................
কালের কপোল তলে টানে কালো দাগ।

সাংখ্যের সাংপরায়

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন ঃ—

> ন সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহন মূঢ়ম্—কঠ, ২।৬

"যাঁহারা প্রমত্ত, বিত্তমোহে মূঢ়—'সাংপরায়' তাহাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না।"

সাংপরায়=পরলোকতত্ত্ব—'বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে'—এই প্রশ্নের সদুত্তর। দুইটি গ্রীক্ শব্দ যোগ করিয়া 'সাংপরায়'কে পশ্চিমে বলা হয় Eschatalogy'—'the doctrine of the last or final things, as death, judgment, the state after death'

'সাংপরায়' সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। চার্ব্বাকের মত যাঁহারা জড়বাদী (Materialist), Survival of Man'-এ অবিশ্বাসী—তাঁহাদের নিকট সাংপরায়ের প্রশ্নই উঠে না—তাঁহাদের পক্ষে 'the grave is but his goal'। কিন্তু যাঁহারা জীববাদী (Spiritualists), তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন উঠিবে—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য** ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি? অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়?

নিশ্চয়ই নাস্তিত্ব (annihilation) হয় না,—কারণ, জীববাদীর মতে—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—জীব-রিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।

জড়বাদী বলেন বটে, চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ'—জড় অণু-পরমাণুর chemical reaction বা রাসায়নিক প্রতিস্পন্দ মাত্র। জীববাদী কিন্তু জড়বাদীর এই অতিমাত্র সাহসিকতায় বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ বন্ধু! Consciousness is the absolute world-enigma' (James)—সম্বিৎ বিশ্বের প্রধানতম প্রহেলিকা! সেই অদ্ভুত আজব ব্যাপারকে তুমি এক নিঃশ্বাসে সমাধান করিয়া ফেলিলে! জান না কি? The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us (Schopenhauer)—অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যানের মত বিরাট্ বিয়াকুবি আর নাই।

আত্মার কি জন্ম-মৃত্যু আছে ? ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি—কঠ ২।১৮

নাস্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে জীববাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি ?—'মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি, কিন্তু তাহার কি গতি হয় ?' ইহার দ্বিবিধ উত্তর—প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক,—দ্বিতীয় উত্তর জন্মান্তর। প্রথম উত্তর প্রচলিত খৃস্ট-মতাবলম্বীদের উত্তর —তাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ eternal retribution in heaven or hell-এ বিশ্বাসবান্। অধুনা কিন্তু অনেক খৃষ্টান কার্য্যকারণের ঐরূপ বিপুল অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। সেইজন্য জীবের পরলোকগতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ নরক স্বীকার করা অনাবশ্যক। তদপেক্ষা 'যথা-কর্ম্ম যথা-শ্রুতম্'—যেমন কর্ষণ তেমনি ফলন—'as you sow so shall you verily reap'—যিশুখৃস্টের এই সার উপদেশই শিরোধার্য্য করা সঙ্গত।

সে যাহা হ'ক, 'সাংপরায়' সম্পর্কে সাংখ্যাচার্য্যাদিগের মত কি ? মহাভারত-কার বলিয়াছেন—নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানম্। অতএব এ বিষয়ে সাংখ্যমত নির্ধারণ মন্দ নয়।

সাংখ্যেরা বিশ্বের বিশ্লেষণের ফলে এক চরম দ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ। এই তত্ত্বদ্বয় অত্যন্ত 'বি-রূপ'—'দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী'। পুরুষ চেতন, প্রকৃত অচেতন; পুরুষ বিষয়ী, প্রকৃতি বিষয়; পুরুষ দ্রস্টা, প্রকৃতি দৃশ্য; পুরুষ নির্গুণ, প্রকৃতি ত্রিগুণ; পুরুষ কূটস্থ, প্রকৃতি পরিণামী; পুরুষ অকর্ত্তা, প্রকৃতি কর্ত্রী—এক কথায়, পুরুষ চিৎ, অজড়, Spirit—আর প্রকৃতি অচিৎ, জড়, 'মাতর্' (Matter)—

'an undifferenciated manifold, containing the potentialities of all things'. 'It (প্রকৃতি) is the prius of all creation—the one homogeneous substance, the basis of the world of becoming.'

—Prof : Radha Krishnan

প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ অঙ্গীকারের সার্থকতা কি ? এক কথায় ইহার উত্তর এই—

"The consolidation of our experiences into a synthetic whole, is due to the presence of the Self (পুরুষ) which holds the different concious states together.'

পুনশ্চ—

"The Ego is the psychological unity of that stream of conscious experiencing which I know as the inner life of an empirical self".

এই পুরুষের স্বরূপ কি ? সাংখ্যমতে পুরুষ— নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবস্য তদ্‌যোগঃ তদ্‌যোগাদ্ ঋতে—সাংখ্যসূত্র, ১।১৯

অর্থাৎ পুরুষ নিত্য, পুরুষ শুদ্ধ, পুরুষ বুদ্ধ, পুরুষ মুক্ত-স্বভাব। পুরুষ যখন নিত্য, তখন তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই ক্ষয় বৃদ্ধি নাই—উদয়াস্ত নাই। এক কথায় পুরুষ নিরাকার, নির্বিকার ও নিরাধার। পুরুষ যখন শুদ্ধ, তখন তিনি অপাপবিদ্ধ—পাপতাপহীন,—নির্মল, নির্গুণ, নির্লেপ, নিঃসঙ্গ, কেবল, উদাসীন, সাক্ষীমাত্র।

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বঞ্চ ঔদাসীন্যং চেতি—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১-৩

পুরুষ যখন বুদ্ধ, তখন তিনি চিদ্রূপ, জ্ঞানস্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতিঃ, প্রকাশ-স্বভাব।

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪৫

পুরুষ যখন মুক্তস্বভাব, তখন তিনি বন্ধহীন, (without limitations) অপরিচ্ছন্ন, বিভু, সর্ববব্যাপী।

পুরুষঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ ব্যাপী চেতনঃ—গৌড়পাদ।

যিনি বিভু, পূর্ণ,—তাঁহার কোন ক্রিয়া বা চেষ্টা থাকিতে পারে না। সেই জন্য পুরুষ নিরীহ বা নিষ্ক্রিয়।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।৪৯

পুরুষ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন অবশ্যই তিনি অ-কর্ত্তা।

অহংকারঃ কর্ত্তা, ন পুরুষঃ—৬।৫৪

অথাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। পুরুষঃ অনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতশ্চেতনঃ অগুণোনিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তাঽকর্ত্তা ক্ষেত্রবিদ্ অমলঃ অপ্রসবধর্ম্মীতি—আসুরি-ভাষ্য।

'পুরুষ কিরূপ ? পুরুষ অনাদি, পুরুষ সূক্ষ্ম, পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, পুরুষ চেতন পুরুষ নির্গুণ, পুরুষ নিত্য, পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা, পুরুষ অকর্ত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল ও অপরিণামী।'

এই সকল কথা সংগৃহীত করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

Purusa is without beginning or end, without any qualities, subtle and omnipresent, at eternal seer beyond the senses, beyond the mind,

beyond the sweep of intellect, beyond the range of time, space and causality, which form the warp and woof of the mosaic of the empirical world It is unproduced and unproducing.

সাংখ্যাচার্যেরা বলেন এই পুরুষ এক নয়, বহু।

পুরুষ-বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪৫

যিনি চিরন্তন, সনাতন, সর্ব্বব্যাপী, যিনি বিভু—তিনি বহু হইবেন কিরূপে? এ মত লইয়া প্রচুর বাদ-বিবাদ আছে; কিন্তু এখানে তাহার আলোচনা করিতে চাই না। সাংখ্যের 'সাংপরায়' বুঝিতে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তবে এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের কয়েকটি সারগর্ভ কথা উদ্ধৃত করিয়া দিই—

An absolute, immortal, eternal and unconditioned *Purusa* can not be more than one. If each *Purusa* has the same features of consciousness—all-pervadingness—if there is not the slightest difference between one *Purusa* and another, (since they are free from all variety), then there is nothing to lead us to assume a plurality of *Purusa*

সে যাহা হউক, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু এবং প্রত্যেক পুরুষই শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব—তখন পুরুষে পুরুষে ভেদ সিদ্ধ হয় কিরূপে? সাংখ্যমতে প্রত্যেক পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি স্বতন্ত্র 'লিঙ্গ'-শরীরের সহিত সংযুক্ত। এই লিঙ্গশরীর তাঁহার Psychic Apparntus। এক পুরুষ হইতে অপর পুরুষের স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির চিহ্ন (mark) বা লিঙ্গ বলিয়া উহার নাম 'লিঙ্গ' শরীর। এই 'লিঙ্গ'-শরীর পুরুষের Persona এবং তদুপহিত পুরুষই জীব (Soul)।

জীবত্বং প্রাণিত্বং তচ্চাহঙ্কারবিশিষ্টপুরুষস্য ধর্ম্মো ন তু কেবলপুরুষস্য—বিজ্ঞানভিক্ষু
বিশিষ্টস্য জীবত্বম্ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৩

বৃত্তিকার অনিরুদ্ধেরও ঐ মত—ইন্দ্রিয়-সংযোগেন বিশিষ্টস্য এব জীবত্বম্

The empirical self (জীব) is the mixture of free spirit (পুরুষ) and mechanism (লিঙ্গ শরীর)—Radha Krishnan.

কোথাও কোথাও এই 'লিঙ্গ' শরীরকে 'চিত্ত' বলা হইয়াছে। এভাবে প্রত্যেক পুরুষ এক একটি চিত্তের সহিত অনাদিকাল হইতে সংযুক্ত।

চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু। বাচস্পতি মিশ্রও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—অনাদিত্বাচ্চ সংযোগপরম্পরায়াঃ।

এই লিঙ্গশরীর ছাড়া পুরুষের আর একটি শরীর আছে—স্থূল শরীর। অতএব স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদে শরীর দ্বিবিধ। অস্থি-মাংস-মজ্জা-মেদ-নির্ম্মিত শরীর

—যাহা আমরা পিতা-মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাদের স্থূল শরীর। ইহা ষাট্‌ কৌশিক। সাংখ্যেরা এই শরীরকে মাতাপিতৃ-জ বলেন। এই শরীর বিনাশী,—কিন্তু লিঙ্গশরীর, তাঁহাদের মতে নিয়ত (নিত্য বা কল্পান্ত-স্থায়ী) এবং পূর্বোৎপন্ন (primeval)।

সূক্ষ্মাঃ, মাতাপিতৃজাশ্চ * *

সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে—সাংখ্যকারিকা, ৩৯

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরৎ ন তথা—সাংখ্যসূত্র ৩।৭

ত্রিপিটকের আলোচনা করিলে দেখা যায় বুদ্ধদেবও স্থূলদেহ (রূপকায়) ছাড়া সূক্ষ্মদেহ স্বীকার করিতেন। স্যার অলিভার লজ যাহাকে Ether—Body বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের পরিভাষায় ঐ সূক্ষ্মদেহের নাম —নামকায়।

He distinguishes between নামকায় and রূপকায় - these terms designating the mental and the material body (Grimm)

দীর্ঘনিকায়ে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, ধ্যানযোগী ঐ নামকায়কে রূপকায় হইতে নিষ্কাষিত করিতে পারেন—মুঞ্জা হইতে যেমন ঈষিকা নিষ্কাষিত করা যায়।

With his mind thus concentrated, he (the yogi) directs it to the calling up of the mental body. He calls up from this body (স্থূলশরীর) another body, having form made up of thought-stuff, having all limbs and parts, just as if a man were to pull out a reed from its sheath.—দীর্ঘনিকায়

বলা বাহুলা, স্থূলশরীর এবং 'লিঙ্গ'শরীর উভয়ই প্রাকৃতিক (material)-অর্থাৎ প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষায়—পুরুষেণ সংসৃষ্টা ইয়ম অনাদিকাল-প্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ। অর্থাৎ, ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতির একখণ্ডকে বা ভগ্নাংশকে পুরুষ অনাদিকাল হইতে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন - পুরুষ স্বামী—এই চিহ্ন তাঁহার স্ব। লিঙ্গশরীরের গঠন সম্বন্ধে সূত্রকার লিখিয়াছেন—

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্‌—৩।৯

একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ।

অহংকারস্য বুদ্ধৌ এব অন্তর্ভাবঃ। - বিজ্ঞানভিক্ষু

অর্থাৎ, বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের মিলনে লিঙ্গশরীর। এসম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন —

মহদহংকার একাদশেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্তং। এষাং সমুদায়ঃ সূক্ষ্মশরীরম্‌।

এই লিঙ্গশরীর সাদা শ্লেঠ নহে—ইহাতে জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সংস্কারের হিজি-বিজি আছে।

ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ৪০

অনাদি বাসনানুবিদ্ধং চিত্তম্ (ব্যাসভাষ্য)

কারণ,—উহা তদ্‌অসংখ্যেয়-বাসনাভিঃ চিত্রম্ (যোগসূত্র, ৪।২৪)

অসংখ্যেয়াঃ কর্ম্মবাসনাঃ ক্লেশ-বাসনাশ্চ চিত্তম্ এব অধিশেরতে ব্যাসভাষ্য

পুনশ্চ ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিতেছেন—ন বিনা ভাবৈঃ লিঙ্গম—৫২ কারিকা 'লিঙ্গ-শরীর ভাব-রহিত হইতে পারে না'। ভাব কি ? ভাব ধর্মাধর্মাদি চিত্ত-সংস্কার।

দেহান্তে লিঙ্গশরীরের কি গতি হয় ? ইহার উত্তর—সাধারণ জীবের পক্ষে, মৃত্যুর পর লিঙ্গশরীরের 'সংসৃতি' হয়—

পুরুষার্থং সংসৃতিঃ লিঙ্গানাম্ সাংখ্যসূত্র ৩।১৬

সংসৃতিঃ—দেহাৎ দেহান্তরসঞ্চারঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

ঐ লিঙ্গ-শরীরের স্থূলদেহের সহিত সংযোগই জন্ম এবং বিয়োগই মৃত্যু। ইহারই নাম 'সংসার'। কারিকা বলিতেছেন—

সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ—৪৫ কারিকা

এক কথায়, সর্ব্বো মৃত্বা জনিষ্যতে। ইহারই নাম জন্মান্তর। কেন জন্মান্তর হয় ? ইহার উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।

অর্থাৎ, যখন স্থূলশরীর ব্যতীত লিঙ্গশরীর ভোগহীন, তখন সংসার অবশ্যম্ভাবী—যতঃ ষাট্‌-কৌশিযং শরীরং বিনা সূক্ষ্ম-শরীরং নিরুপভোগং, তস্মাৎ সংসরতি—(তত্ত্বকৌমুদী)।

বলা বাহুল্য, পুরুষ যখন বিভু ও নিশ্চল, তখন পুরুষের সংসৃতি হয় না, হইতে পারে না—

তস্মাৎ ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরিত কিশ্চৎ (পুরুষঃ)—৬২ কারিকা

তবে সংসৃতি হয় কাহার? প্রকৃতির—অর্থাৎ জীবের উপাধিভূত লিঙ্গশরীরের—সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ। এই সংসৃতির প্রকার ও প্রণালী সম্পর্কে কারিকা বলিতেছেন—নটবৎ অবতিষ্ঠতি লিঙ্গম্। ইহার গৌড়-পাদভাষ্য এইরূপ—

লিঙ্গম্ সূক্ষ্মৈঃ পরমাণুভিঃ তন্মাত্রৈরুপচিতং শরীরং ত্রয়োদশবিধ-করণোপেতং মানুষ-দেব-তির্যগ্‌ যোনিষু ব্যবতিষ্ঠতে। কথং ? নটবৎ।

নটবৎ কেন বলিলেন ? ইহার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন- যেমন রঙ্গভূমিতে নট ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে- কখনও পরশুরাম হয়—কখনও অজাতশত্রু হয়- কখনও বৎসরাজ হয়—সেইরূপ লিঙ্গশরীর বিবিধ ও বিচিত্র স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া কখনও দেব, কখনও মনুষ্য, কখনও পশু, কখনও পাদপ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যথাহি নটঃ তাং তাং ভূমিকাং বিধায় পরশুরামো বা অজাতশত্রুর্বা বৎসরাজো বা ভবতি, এবং তৎ-তৎ-স্থূলশরীর গ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যো বা পশুর্বা বনস্পতি র্বা ভবতি সূক্ষ্মশরীরম্।

—তত্ত্বকৌমুদী

সাংখ্যমতে লিঙ্গশরীর-উপহিত জীবের চতুর্ব্বিধ জন্ম হইতে পারে—দেব, মনুষ্য, নরক ও তির্য্যগ্। এ সম্পর্কে যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে প্রাচীন ঋষি জৈগীষব্যের মুখে আমরা শুনিতে পাই -

জৈগীষব্য উবাচ—দশসু মহাসর্গেষু ময়া নরক-তির্য্যগ্-ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমানেন যৎকিঞ্চিদনুভূতম্ তৎ সর্ব্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি।*

বুদ্ধদেবও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তবে তিনি ঐ চতুর্ব্বিধ জন্মের অতিরিক্ত পৈশাচ জন্মও স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মতে স্থূলদেহের নাশের সহিত সূক্ষ্ম-শরীর-উপহিত জীবের বিনাশ হয় না কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার দৈব কিম্বা মানুষ কিম্বা নারক কিম্বা পৈশাচ কিম্বা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর হয়। মজ্ঝিমনিকায়ে রক্ষিত তাঁহার কথা এই—Five in number, Sariputta, are the fates which may befall after death, namely these ;—passage into the hell world, the animal kingdom, the realm of shades, the world of men or the abodes of the gods

(M. N. I p. 73)

সূক্ষ্মশরীরের সংসৃতির কি বিরাম নাই ? সাংখ্যেরা বলেন, বিরাম আছে—লিঙ্গশরীর যখন নিবৃত্ত হইবে, তখনই সংসৃতির বিরাম ঘটিবে।

লিঙ্গস্য আবিনিবৃত্তেঃ—৫৫ কারিকা

দুঃখপ্রাপ্তৌ অবধিঃ আঙা কথ্যতে—লিঙ্গং যাবৎ ন নিবর্ত্ততে তাবৎ ইতি - তত্ত্বকৌমুদী

---

* ব্যাসভাষ্যের অন্যত্রও ঐরূপ কথা আছে—ন হি দৈবং কর্ম্ম বিপচ্যমানং নারকতির্য্যগ্‌মনুষ্য-বাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং সংভবতি। কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে। নারক-তির্য্যগমনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চঃ।

কাহার সংসার নিবৃত্ত হয়? কুশলস্য অস্তি সংসারক্রমসমাপ্তিঃ ন ইতরস্য (৪।৩৩ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্য) অর্থাৎ, প্রত্যাদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে—ইতরস্তু জনিষ্যতে।

অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞানী—যাঁহার তৃষ্ণা অবসিত হইয়াছে—যিনি কুশল পুরুষ—তাঁহারই জন্মান্তর নিবৃত্ত হয়। এখানেই সাম্পরায়ের শেষ—সংসৃতির বিরাম। এই বার সে কথা বলি।

সাংখ্য মতে কুশলস্য অস্তি সংসারক্রম সমাপ্তিঃ অর্থাৎ—'consummation est—it is finished' ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে—ব্যাসভাষ্য।

সাংখ্য-মতে প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত অসংকীর্ণ দোঁহার মধ্যে কোনই তাত্ত্বিক যোগাযোগ (relation) নাই। তথাপি অবিবেক-জন্য উভয়ের মধ্যে একটি কাল্পনিক সম্পর্ক (fancied relation) স্থাপিত হয়। তদ্‌যোগোঽপি অবিবেকাৎ—সাংখ্যসূ. ১।৫৫। এই অবিবেক অনাদি (primeval)—

অনাদিরবিবেকঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১২।

পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই অবিবেককে 'অবিদ্যা' বলিয়াছেন—

তস্য হেতুরবিদ্যা—২।২৪

ঐ অবিদ্যার ফলে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পুরুষ চিত্তবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য (identification)-সিদ্ধি করিয়া নিজকে সুখী, দুঃখী, কামী, ক্রোধী, কর্তা, ভোক্তা জ্ঞাতা—এক কথায় 'বদ্ধ' মনে করে। ইহারই ফলে জীবের সংসৃতি। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষু ১।১৯ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

যথা স্বভাবশুদ্ধস্য স্ফটিকস্য রাগযোগো ন জপাযোগং বিনা ঘটতে, তথৈব নিত্যশুদ্ধাদি-স্বভাবস্য পুরুষস্য উপাধি-সংযোগং বিনা দুঃখসংযোগো ন ঘটতে।

অর্থাৎ, যেমন স্বতঃস্বচ্ছ স্ফটিক (crystal) জবাফুলের সংযোগ ব্যতিরেকে রাগরক্ত দেখায় না, তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধ পুরুষের অবিদ্যা-উপাধির যোগ ভিন্ন দুঃখাদির সংযোগ ঘটে না।

অবিদ্যাবারণের উপায় বিদ্যা, অবিবেকনাশের উপায় বিবেকসিদ্ধি। সেই জন্য সাংখ্যেরা বলেন—

বিবেকতঃ মোক্ষঃ—সাংখ্যসূত্র ৩।৮৪

অবিবেক হইতে যেমন বন্ধ, বিবেক হইতে তেমনি মোক্ষ। সা তু অবিদ্যা পুরুষখ্যাতিপর্যবসানা (ব্যাসভাষ্য)

When Purusa recognises its distinction from the everevolving and dissolving Prakriti, the latter ceases to operate towards it.

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিঃ ধ্বান্তবৎ ১।৫৬

অত্রাপি প্রতিনিয়মঃ অন্বয়-ব্যতিরেকাৎ— সাংখ্যসূত্র, ৬।১৫

অন্ধকারোহি প্রতিনিয়তেন আলোকনৈব নাশ্যতে ন অন্যসাধনেন ইত্যর্থঃ—ভিক্ষু

অবিবেক অন্ধকারতুল্য এবং বিবেক আলোকতুল্য। অবিবেক তত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখে। কিন্তু বিবেক-সূর্য্যের উদয় হইলে সে তমঃ তিরস্কৃত হয়।

অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবৎ চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্।*
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্ বিপ্রর্ষে! বিবেকজম্॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৬২

সেইজন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন—অবিদ্যা অনাদি হইলেও অনন্ত নয়—It dissolves on the rise of true knowledge

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগসূত্র, ২।২৬

প্রধানাবিবেকাদ্ অন্যাবিবেকস্য তদ্ হানে হানম্—১।৫৭

অর্থাৎ—প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক জন্য যখন বন্ধন, তখন সেই অবিবেকের হানি হইলেই বন্ধের হানি। সেই জন্য মোক্ষকে অবিবেকরূপ বাধা বা অন্তরায়ের তিরোধান মাত্র বলা হয়।

মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তেঃ—৬।২০

ঐ বিবেকজ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতি যেন লজ্জিতা হইয়াই পুরুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করে।

প্রকৃতি র্জ্ঞাত-দোষেয়ং লজ্জয়েব নিবর্ত্ততে—নারদীয় পুরাণ

সাংখ্যেরা নানা ভাবে এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন—

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭০

'যেমন কুলবধূ দোষী বলিয়া প্রতিপন্না হইলে স্বামীর নিকট গমন করে না—প্রকৃতি ও যেন সেইরূপ। তাহার বিকারিত্বাদি দোষ পুরুষ যখন জানিয়া ফেলেন—তখন সে আর পুরুষের ত্রিসীমায় যায় না।'

অন্যভাবে বলা হয়—প্রকৃতি নিতরাং সুকুমারী—সে পুরুষের দৃষ্টি সহিতে পারে না। হঠাৎ যদি কোনও পুরুষ তাহাকে দেখিয়া ফেলে, তবে সে বিশেষ সংকুচিতা হইয়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিতে চায়।

---

* ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জাতং জ্ঞানং দীপবৎ, ন সর্বাত্মনা অজ্ঞান নিবর্ত্তকং। বিবেকজং তু জ্ঞানং সূর্য্যবৎ সর্বাজ্ঞান-নিবর্তকম্ ইত্যর্থঃ শ্রীধরস্বামী

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥ —৬১ কারিকা

ইহার ভাষ্যে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—
এবং প্রকৃতিরপি কুলবধূতোপাধিকা, দৃষ্টা বিবেকেন ন পুনর্দ্রক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ।

পুনশ্চ—
দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা ৬৬ কারিকা

'প্রকৃতি আমার দৃষ্টা হইল'—অতএব পুরুষের উপেক্ষা জন্মে—'পুরুষ আমাকে দেখিয়া ফেলিল'—অতএব প্রকৃতি উপরতা হয়।

এই অবস্থাকেই সাংখ্যেরা 'প্রসংখ্যান' বলেন—প্রসংখ্যান = প্রকৃষ্ট সম্যক্ প্রজ্ঞান।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥—৬৭ কারিকা

এই জ্ঞান নিঃশেষ জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। যিনি এই জ্ঞানে জ্ঞানবান্, যিনি 'কেবলী', যিনি বিবেকখ্যাতিতে নিষ্ণাত—তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে।

জীবন্মুক্তশ্চ—সাংখ্যসূত্র ৩।৭৮
ঐ অবস্থায়—ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ—৪।৩০
অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি,
কুশলাকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ তখন অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং সুকৃত দুষ্কৃত সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। সুতরাং—ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি (ব্যাসভাষ্য)—ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে সাধক জীবন্মুক্ত পদবী লাভ করেন।

তাহার সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব!
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥
উদাসীনবদ্ আসীনঃ গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥—গীতা, ১৪।২২-৩

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত'-বিনির্মুক্তি—ইহা নির্ব্বাণের সমীপস্থ দশা। 'নির্ব্বাণসমেব অন্তিকে'।

বুদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

যে মে দুক্খং উপাদস্তি যে চ দেস্তি সুখং মম।
সর্ব্বেসং সমকো হোমি দেন্যো কোপি ন বিজ্জতি ॥
সুখদুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বত্থ সমকো হোমি এসা মে উপেক্খাপরং ॥ —চর্য্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ, যশঃ ও অযশঃ আমার নিকট তুল্যমূল্য। সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (Perfection of my equanimity)। ইহাকেই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিলেন—দৃষ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক একঃ।

যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির ব্যাপার ও বিকার নিবৃত্ত হয়।

মুক্তং প্রতি প্রধান-সৃষ্ট্যুপরমঃ—৬।৪৪ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

অর্থাৎ, প্রকৃতি তখন 'relapses into inactivity'।

বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ—৬।৪৩

এই মর্ম্মে কারিকা বলিয়াছেন—

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥ ৫৯

সূত্রকারও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ—৩।৬৯

অর্থাৎ নর্ত্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়।

সে অবস্থায় পুরুষ সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে অবস্থান করিয়া 'প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎ (as a spectator) অবস্থিতঃ স্বস্থঃ—(৬৫ কারিকা) অর্থাৎ, **the released Soul is a disinterested spectator of the world-show.**

তন্নিবৃত্তৌ শান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৪

পুরুষের এই উদাসীনভাবকে 'অপবর্গ' বলে।

দ্বয়োরেকতরস্য বা ঔদাসীন্যম্ অপবর্গঃ—৩।৬৫

এই অপবর্গের অপর নাম 'কৈবল্য',—কারণ, ঐ অবস্থায় পুরুষ চিত্তবৃত্তির দ্বারা অপরামৃষ্ট হইয়া শুদ্ধ বা কেবল ভাবে অবস্থিত থাকেন।

কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেঃ—যোগসূত্র, ৪।৩৪

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব উভয়ই তিরোহিত হয়।

নোভয়ং তত্ত্বাখ্যানে—১।১০৭ সূত্র

সে অবস্থায় পুরুষ বুঝিতে পারেন যে, আমি কর্ত্তা নই, ভোক্তা নই, আমার কোন কিছু ব্যাপার নাই। বলা বাহুল্য, এইরূপ মুক্ত পুরুষের আর বন্ধন হয় না।

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধ-যোগোপি অনাবৃত্তিশ্রুতেঃ—৬।১৭

এইরূপ জীবন্মুক্তের সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ ও ক্রিয়মান কর্ম্মের অশ্লেষ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের সংস্কারাবশেষ দ্বারা কিছুদিন দেহস্থিতি প্রচলিত থাকে।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ

—৬৭ কারিকা

সংস্কার কি?

প্রক্ষীণানাদ্যবিদ্যাবিশেষশ্চ সংস্কারস্তদ্বশাৎ তৎসামর্থ্যাৎ ধৃতশরীরস্তিষ্ঠতি বাচস্পতি

সূত্রকারও ঐ মর্ম্মে বলিয়াছেন -

চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ—৩।৮২

সংস্কার-লেশতঃ তৎসিদ্ধিঃ—৩।৮৩

ঐরূপে ধৃত শরীরই তাঁহার অন্তিম দেহ। বুদ্ধদেবের ভাষায়,

সবে অন্তিম সারীরো মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসো তি বুচ্চতি ধম্মপদ

ঐরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ বুদ্ধবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন -

গহকারক! দিট্ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি

'হে গৃহকারি! এইবার তোমার 'হদিস' পাইয়াছি, তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়াছ! আর নূতন ঘর গড়িতে পারিবে না।'

সংস্কারাবসানে জীবন্মুক্তের ঐ অন্তিম শরীরের পাত হইলে কি হয়? উত্তরে কারিকা বলিয়াছেন, তিনি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করেন।

প্রাপ্তে শরীর-ভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান-বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ং কৈবল্যম্ আপ্নোতি ৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি ঐকান্তিক (অবশ্যম্ভাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য লাভ করেন।'

পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তি গুর্ণানাম্—৪।৩২

নাহি কৃত-ভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ (গুণাঃ) ক্ষণমপি অবস্থাতুম্ উৎসহন্তে

—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণাম-প্রয়োজন (ভোগ ও অপবর্গ) চরিতার্থ হওয়ায়, গুণত্রয় ঐরূপ কৃতার্থ পুরুষের সম্বন্ধে আর পরিণাম-গ্রস্ত হয় না।

অধিকন্তু প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের লিঙ্গশরীররূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও নাশ হয়, অর্থাৎ—'**his personality** becomes extinguished'। ইহাকেই কারিকা বলিয়াছেন—'লিঙ্গস্য আ-বিনিবৃত্তেঃ'—এই লিঙ্গশরীরই যখন চিত্ত, তখন সঙ্গে সঙ্গে চিত্তেরও লয় অবশ্যই সাধিত হয়।

ব্যুত্থান-নিরোধ-সমাধি প্রভবৈঃ সহ কৈবল্য-ভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈঃ চিত্তং স্বস্যাং প্রকৃতৌ অবস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে **চেতসি প্রলীনে (পঞ্চ ক্লেশাঃ) তেনৈব অস্তং গচ্ছন্তি—১।৫১ ও ২।১০ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ ব্যুত্থানদশার নিরোধসংস্কার ও সমাধিদশার নিরোধসংস্কার—এতদুভয়ের সহ যোগসিদ্ধের চিত্ত নিজের নিত্যা প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং চিত্ত বিলীন হইলে তদনুবিদ্ধ অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশও তৎসহ অস্তমিত হয়।

এইরূপে চিত্তের লয় হইলে পুরুষ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ স্বচ্ছ কেবল অবস্থায় চিরকালের জন্য অবস্থান করেন—'**remains in a passive state** of *eternal* isolation'*

তস্মিন্ (চিত্তে) নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে

— ব্যাসভাষ্য

ইহাই সাংখ্যের মুক্তি।

সাংখ্যমতে মুক্তির স্বরূপ কি ? এক কথায় বলিতে গেলে—

'In Mukti, ***Purusas*** will be seers with nothing to look at, mirrors with nothing to reflect, and will subsist in lasting freedom from *Prakriti* and its defilements as pure *chits* in the timeless void'.—Prof: Radha Krisnan.

সাংখ্যসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। সূত্রকার বলিতেছেন—

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিঃ তদ্বৎ—৫।৭৫

ন বিশেষগতি নিক্রিয়স্য—৫।৭৭

* প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগস্য আত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্—২।২৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

'আত্মার বিশেষ গুণের উচ্ছেদ বা বিশিষ্ট লোকে গতি মুক্তি নহে।'

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদি দোষাৎ—৩।৭৭

ন সর্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্বাদি দোষাৎ—৩।৭৮

এবং শূন্যম্ অপি—৩।৭৯

'বাসনারূপ উপরাগের উচ্ছেদ অথবা সর্ব্বোচ্ছেদ কিম্বা শূন্যতাসিদ্ধি মুক্তি নহে।'

ন দেশাদিলাভোপি - ৫।৮০

ন ভাগিযোগো ভাগস্য ৫।৮১

'উৎকৃষ্ট দেশাদিলাভ বা অংশীর সহিত অংশের যোগও মুক্তি নহে।'

নাণিমাদিযোগোপি অবশ্যং-ভাবিত্বাৎ তদুচ্ছিত্তেঃ—৫।৮২

নেন্দ্রাদিপদযোগোপি তদ্বৎ—৫।৮৩

'অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি বা ইন্দ্রাদিপদ-প্রাপ্তিও মুক্তি নহে।'

'মুক্তি কি কি নহে—আমরা জানিলাম। কিন্তু এই অভাব-নির্দেশ দ্বারা মুক্তির স্বরূপ ত' জানা গেল না। সেই জন্য সূত্রকার বলিলেন--

নিঃশেষ দুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা ৩।৩৮ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা—৬।৫

অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দুঃখের নিঃশেষে নিবৃত্তিই মুক্তি।

সাংখ্য মতে পুরুষ চিন্মাত্র—'কেবল' অবস্থায় তাঁহার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্- যোগসূত্র, ৩।৫৫। তদা পুরুষঃ স্বরূপ মাত্র জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ মুক্তির অবস্থায় পুরুষ অমল কেবল হইয়া স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সেই জন্যই মুক্তির নাম 'কৈবল্য'।

Kaivalya—from Kevala (alone)—means the isolation of the soul from the universe and its return to *itself*—Max Muller's Indian Philosophy: এ মুক্তি অনেকটা গ্রীক্ মনীষী এরিস্টটলের State of blessedness-এর অনুরূপ—which is eternal thinking free from all activity.

কিন্তু বেদান্ত মুক্তিকে যে আনন্দরূপতা ('অভিনীম্ আনন্দম্') বলেন, তৎসম্পর্কে সাংখ্যের বক্তব্য কি ?

সাংখ্যমতে আত্মা চিৎস্বরূপ মাত্র -

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪০

সে মতে আত্মা আনন্দরূপ নহেন

ন একস্য আনন্দ-চিদ্রূপত্বে, দ্বয়োর্ভেদাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৬

'অখণ্ড আত্মার একাধারে চিদ্‌রূপত্ব ও আনন্দরূপত্ব অসম্ভব।' অতএব সাংখ্যকার বলেন—

ন আনন্দাভিব্যক্তি র্মুক্তিঃ নির্দ্ধর্মত্বাৎ—৫।৭৪

অর্থাৎ, আনন্দ যখন আত্মার ধর্ম্ম নয়, তখন আনন্দাভিব্যক্তি মুক্তি হইতে পারে না। অথচ সূত্রকার অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সমাধি, সুষুপ্তি ও মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মরূপতা হয়।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা—৫।১১৬

তন্মধ্যে সমাধিতে ও সুষুপ্তিতে বন্ধবীজ রহিয়া যায়, কিন্তু মুক্তিতে ঐ বীজের ধ্বংস হইয়া নিপট ব্রহ্মরূপতা হয়।

দ্বয়োঃ সবীজম্‌, অন্যত্র তদ্ধতিঃ—৫।১১৭

আমরা জানি, ব্রহ্ম কেবল বিজ্ঞানঘন নহেন, তিনি আনন্দঘন—বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮)। অতএব মুক্তিতে জীবের যখন ব্রহ্মরূপতা হয়, সে অবস্থা অবশ্য ভূমানন্দের অবস্থা—যে আনন্দ বাক্যমনের অতীত, ভাষায় যাহার বর্ণনা করা অসাধ্য।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন

—তৈত্তিরীয়, ২।৪

নীল সঙ্ঘর্ষের নেতৃদ্বয়

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

খ্রীষ্টীয় ১৮৩৩ অব্দে প্রধানতঃ বিশ্বহিতৈষী উইলবার কোর্সের কল্যাণে ইংরাজ রাজত্ব হইতে পশুর ন্যায় জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ক্রীতদাসগণ মানবোচিত ব্যবহার প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জননায়ক হ্যাম্পডেনের প্রচেষ্টায় অর্ণবযান সংক্রান্ত কয়েকটী অন্যায় কর ইংলণ্ড হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। যে সময়ে ইংরাজ রাজত্ব হইতে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইতেছিল সেই সময়ে মহামনা উইলবার কোর্স ও হ্যাম্পডেনের স্বদেশীয়গণ এদেশের নিরীহ জনসাধারণের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছিল এবং তাহা দূরীভূত করিবার জন্য কিরূপে একজন উইলবার কোর্স ও একজন হ্যাম্পডেন অকম্পিত পদে দণ্ডায়মান হন এই প্রবন্ধে সেই পুণ্যকাহিনী বিবৃত করিব।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে তাঁহাদের বহু সগোত্র কোথাও ব্যবসায়ীরূপে কোথাও কৃষকরূপে অপকর্ম্মজনিত যে সকল কুকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ লিখিত না থাকিলেও তাহার স্মৃতি দীর্ঘ একশতাব্দীর পরেও অটুট রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু শ্বেতাঙ্গ কৃষক নীলচাষ ব্যপদেশে মধ্যবঙ্গে অবস্থান করে। প্রথমে ইহাদের মধ্যে সহৃদয় ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু ক্রমে নীল চাষে লভ্যাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। উহারা প্রজাকে দাদন লইতে ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিতে নীলচাষ করিতে বাধ্য করিত। অস্বীকৃত প্রজা নীল কুঠীর গুদামে আবদ্ধ থাকিয়া অবর্ণনীয় ক্লেশ ভোগ করিত। সেই কারাগৃহেই কাহারও কাহারও জীবনের শেষ অঙ্কের যবনিকাপাত হইত। কাহারও কাহারও গৃহ, এমন কি দু' একজনের তথাকথিত অপরাধে সমগ্র গ্রাম ভস্মীভূত হইত!

এই অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে করুণারশ্মোদ্ভাসিত বক্ষে যে দুইজন নিরীহ বাঙালী সর্ব্বপ্রথম দণ্ডায়মান হইলেন তাঁহারা নদীয়া জেলারই অধিবাসী। প্রথম ব্যক্তি পোড়াগাছা নিবাসী স্বর্গীয় দিগম্বর বিশ্বাস ও দ্বিতীয় ব্যক্তি চৌগাছা নিবাসী স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। পোড়াগাছা ও চৌগাছা গ্রাম কৃষ্ণনগর হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত!

চম্পারণের নীলকর অত্যাচার প্রশমন কল্পে মহাত্মা গান্ধী কেয়েরাজারাম শুক্ল প্ররোচিত করিয়াছিলেন। স্বীয় আত্মচরিতে গান্ধীজী তাঁহাকে সরল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন। ১৮৮০ সালের কোন এক সংখ্যা 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ লিখিত A Story of Patriotism in Bengal শীর্ষক এক প্রবন্ধে উক্ত বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে—"তাঁহাদের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাঁহারা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ হইলেও অদম্য সাহসী, অধ্যবসায়ী, সহৃদয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। এক কথায় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সমুদয় গুণই তাঁহাদের ছিল।" এই প্রবন্ধটী শিশির বাবুর Indian Sketches এবং 'নীল দর্পণ' প্রণেতা দীনবন্ধুর স্বর্গীয় পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্রের History of Indigo Disturbance in Bengal গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নদীয়া জেলায় অবস্থিত নীলকুঠী সমূহের মধ্যে বাঁশবেড়িয়া, কাথুলি, নিশ্চিন্তপুর ও কাঁচিকাটা ছিল প্রধান। সিপাহী বিদ্রোহের বৎসরে উদ্ধত প্রকৃতির জেমস্ হিল নিশ্চিন্তপুরে ও শান্ত প্রকৃতির জন হোয়াইট বাঁশবেড়িয়া কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। হোয়াইট পরে ঐ কুঠীর সহিত আরও কয়েকটীর মালিক হন, বার্দ্ধক্যে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার আত্মীয়ও তৎপ্রকৃতির জেমস্ স্মিথ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দিগম্বর এই সময়ে এই কুঠীর পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। স্মিথের সদয় আচরণের বিরুদ্ধে কুঠীর তদানীন্তন মালিক উইলিয়ম হোয়াইটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইলে সে ইংলণ্ড হইতে আসিয়া দেখিল যে দিগম্বরের প্ররোচনায় জেমস্ এইরূপ কোমল ব্যবহার করিতেছেন এবং তাহার ফলে অন্যান্য কুঠীর তুলনায় ইহার লাভের অঙ্ক প্রত্যহ বর্দ্ধিত হইতেছে না। উইলিয়ম প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার জুড়িয়াছিল। দেশে হাহাকার উঠিল। সর্ব্বস্বান্ত প্রজা দিগম্বর ও উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট করুণ আবেদন জানাইল। কিন্তু শত চেষ্টায়ও অত্যাচার প্রশমিত হইল না। অগত্যা বাঁশবেড়িয়া হইতে দিগম্বর ও কাথুলি হইতে বিষ্ণুচরণ নীলকুঠীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে চলিয়া আসেন এবং অত্যাচার দমনে কৃতসঙ্কল্প হন।

প্রেমশূন্য শক্তি ও প্রতিভা কখন কোন স্থায়ী কল্যাণ-কর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না বরং প্রেমই শক্তি জাগরিত করে। দিগম্বর এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতাপান্বিত শ্বেতাঙ্গ কুঠীয়ালগণের অত্যাচার দূরীকরণার্থ আশু কোন সুগম পথ পাইলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের দুইজনের নামে হিসাব নিকাশের অভিযোগ উপস্থিত হইল। স্বপ্রকৃতির অনুচরবৃন্দ পরিবৃত হইয়া উইলিয়ম অশ্বারোহণে

গ্রামে গ্রামে গিয়া দিগম্বরের প্রত্যেক ধান্যের গোলা চাবি বন্ধ করিয়া তাঁহার 'দাদন' ধান্য পরিশোধ করিতে লোককে নিষেধ করিল। কেহ কেহ অবশ্য এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু দিগম্বর স্থির চিত্তে ইহা সহ্য করিলেন।

নদীয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে অত্যাচারপীড়িত প্রজাবৃন্দ প্রত্যহ তাঁহার শরণাপন্ন হইতে লাগিল। বিষ্ণুচরণ প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া দিগম্বর কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিলেন। গ্রামে গ্রামে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু হাঁসখালির নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর ব্যতীত অন্য কোন স্থানের কেহই প্রথমে তাঁহাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে সাহসী হইল না। দিগম্বর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অত্যাচার কাহিনী লিখিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না। বরং যাহারা নীল বপনে অস্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদের উপর অত্যাচারের প্রচণ্ড অশনি পাত হইতে লাগিল। সকল প্রকার নির্য্যাতন প্রকাশ্য দিবালোকেই চলিতে লাগিল (১)

নীলকরগণ একদিন প্রচার করিল যে তাহারা বিষ্ণুচরণের চৌগাছা আক্রমণ করিবে। গ্রাম রক্ষার্থে বিভিন্ন স্থান হইতে লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা সংগৃহীত হইল। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের স্বগোত্র এই নীলকরগণ অরক্ষিত গোবিন্দপুর আক্রমণ করায় গ্রামবাসী বিপর্য্যস্ত হইল, অগ্নির লেলিহান জিহ্বা শ্বেতাঙ্গগণের জয় ঘোষণা করিল। দুই তিনবার দিগম্বরের অট্টালিকা আক্রান্ত হইল কিন্তু বিখ্যাত লাঠিয়ালগণ কর্ত্তৃক উহা পরিবৃত থাকায় বিশেষ কিছু অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। আর নিরাপদ নহে মনে করিয়া তাঁহার পরিজনবর্গ রাত্রিতে অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নীত হইতে লাগিলেন। অনেকে আশ্রয় দিতে শঙ্কিতও হইলেন। সঙ্গিগণের কেহ কেহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, আবার কেহ কেহ বলিল আমরা সাহেবদের নিকট ঋণগ্রস্ত; এই ঋণ পরিশোধ করিয়া না দিলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে উহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ ঘণীভূত বিপদের মধ্যে এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রবীন স্বেচ্ছাসেবক পথভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বহুজনের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

ক্রমে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। রাণাঘাটের পালচৌধুরীগণ, শান্তিপুরের ৺উমেশচন্দ্র রায়, উলার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায়;

---

(১) "that raiyots obnoxious to the factory were frequently kidnapped and other acts of great violence were commited in open day."—Bengal under L. G.—C. E. Buckland.

ভোলাডাঙ্গার ৺যাদবচন্দ্র বিশ্বাস, ক্ষেমিরদীয়ারের ৺কৃষ্ণদাস ভৌমিক প্রভৃতি প্রজাবর্গকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। পালচৌধুরী মহাশয়েরা কয়েকজন লাঠিয়ালকে দিগম্বরের শরীর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পরিজনবর্গকে স্থানান্তরে গমনের জন্য যানবাহনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিলেন। বহুক্লেশ ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া দিগম্বর দারিয়াপুর, মাধবপুর ও কলিঙ্গা গ্রামে আত্মীয় ভবনে পরিজনবর্গকে স্থানান্তরিত করিয়া আরব্ধ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময় একদিন কান্তরহুদা গ্রামে নীলকর বাহিনীর সহিত গ্রাম বাসীর সঙ্ঘর্ষ হয়। সংবাদ পাইয়া গবর্ণমেণ্ট পুলিশ প্রেরণ করেন। বিচারে কয়েক-জন নীলকর্ম্মচারীর শাস্তি হয়। দিগম্বর লোক দ্বারা Hindu Patriot এ সকল সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহার এইরূপ কার্য্যকারিতা ও দৃঢ়তায় একদিকে যেমন জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল অন্য দিকে তেমনই মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণও অসহায় প্রজার দুঃখে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রেভারেণ্ড লংও রেভারেণ্ড বমওরেসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যিনি উত্তরকালে হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সেই মিঃ আর, এল, টটেন হাম এই সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। তাঁহার ন্যায়পরতায় নীলকর শ্বেতাঙ্গগণ বহু মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হয়। উহার ফলে দিগম্বরের উপর জনসাধারণের আস্থা অধিকতর দৃঢ় হয়।
পূর্ব্ববৎ বলপ্রয়োগ না করিয়া উদ্ধত নীলকরগণ প্রজাবর্গের নামে বহুতর চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ উপস্থিত করে। ইহার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে অতিরিক্ত নবনিযুক্ত বিচারকগণ তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নদীয়া জেলার অন্যান্য নিয়মিত রাজকার্য্যও স্থগিত হইয়া যায়। (২) এইরূপ অভিযোগের ফলে বহু প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তৎপূর্ব্বে তাহারা দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণের অলৌকিক আত্মত্যাগ অপূর্ব্ব সৃজনীশক্তিতে দৃঢ়সঙ্কল্প সত্যাগ্রহীর ন্যায় আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়াছিল; কৃতকার্য্যতার স্বাদও পাইয়াছিল। ১৮৫৯ অব্দে সকলে একযোগে নীলচাষ বন্ধ রাখিল। এই সাঙ্ঘাতিক আঘাতের প্রতিক্রিয়াও হইল গুরুতর রকমের।

(২) "The number of Suits under the Act in the Nadia District increased so largely towards the end of May as to threaten to stop all the regular work of the District"—Bengal under Lieutenant Governors,—C. E, Buckland.

মহদাকাঙ্ক্ষা মহদানুষ্ঠান কখন বিফল হয় না। নদীয়া জেলাই নীলচাষের কেন্দ্রভূমি ছিল। সেই জন্য বোধ হয় নদীয়াতেই নীলবিদ্রোহের সূচনা। ক্রমে নদীয়ার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন জেলার প্রজাগণ নীল বপন বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। নীলকরগণ চরম আঘাত দানের জন্য এমন ভাবে প্রস্তুত হয় যে গবর্ণমেণ্টকে শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্যের সাহায্য লইতে হয়। (৩) গবর্ণমেণ্ট যখন সংবাদ পাইলেন যে রায়তগণ অক্টোবরের নীলচাষে সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিবে তখন যে সকল জেলায় নীলচাষ হইত তথায় গভর্ণমেণ্ট সাময়িক পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। নদীয়া ও যশোহরের নদীগুলিতে দুইটী গানবোট প্রেরিত ও উক্ত দুই স্থানে দেশীয় পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত হয়। (৪)

দিগম্বর বহু প্রজার স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। তদানীন্তন লেফটনাণ্ট গভর্ণর স্যার পিটার গ্রাণ্ট স্বয়ং এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত আমার প্রত্যাগমন পথে নদীর দুইধারে সহস্র সহস্র নরনারী, বালক বালিকার জনতা শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক প্রতিবিধান চাহিতেছিল। (৫)

এই সময় ব্যাপার এমন জটিল হইয়া উঠিল যে লর্ড ক্যানিং এর ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি ছোট লাট স্যার পিটার গ্রাণ্টকে লিখিয়াছেলেন—নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আমি এক সপ্তাহ কাল এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। আমি অনুভব করি কোন নির্ব্বোধ নীলকর যদি ক্রোধে বা ভয়ে একটী মাত্র গুলি চালায় তবে নিম্ন বঙ্গের প্রত্যেক কুঠীতে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে। (৬)

এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিষয়টার তদন্তের জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত হয়। উহা সরকারী বেসরকারী সকল শ্রেণীর

(৩ "The endeavours made by the planters to compel them (the rayats) to do so led to serious rioting which was not suppressed until they were called out" Imperial Gazetter XVIII P. 273.

(৪) "Report that the raiots would prevent the October sowing led Government to strengthen militory notice in the Indigo District to send 2 gunboats to the rivers of Nadia and Jessore and Native infantry to these two stations." Buckland's Bengal under the L. Gs.

(৫) Vide Sir J. P. Grant's Minute of 17th Sept 1860.

(৬) Ibid

পদস্থ ভদ্রলোকগণের স্বাক্ষ্য গ্রহণ ও নীল সম্পর্কিত কাগজপত্র পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট উহার অশেষবিধ দোষ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন।

অত্যাচার অবিচার কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ইহার অত্যল্পকাল পরেই নীলকরগণের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। বহু নীলকুঠী ও নীলকর-গণের ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল। বর্ত্তমান কালের সত্যাগ্রহ যুদ্ধে অর্থের আবশ্যকতা যেমন অল্প তৎকালেও তাহাই ছিল তথাপি এই ব্যাপারে বিদ্রোহী দিগম্বরের লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বিপ্লব দ্বারাই সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটী দূরীভূত হইয়াছে। প্রত্যেক শক্তিশালী ধর্ম্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রনীতিক নেতার আন্দোলন এক একটী বিপ্লব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিদ্রোহী দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণের জন্য নদীয়াবাসী গর্ব্ব অনুভব করেন কিনা জানি না কিন্তু এই জেলায় অশীতিবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহাদের নেতৃত্বে এইরূপে সত্যাগ্রহের এক অধ্যায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভারতবর্ষে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে উঠিয়াছিল। বাঙ্গলা ও বিহারের জন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট উপস্থিত করেন। তখন ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্য বলিতে অবশ্য বঙ্গ ও বিহারকেই বুঝাইত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যে যাহাদের স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ একদল ইংরাজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণের নিকট এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীত টাকার বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত নানা আর্থিক ব্যাপারে সহায়ক হিসাবে ভারতে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সময় ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং যদিও ইহা সমস্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না তথাপি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি করিত। এই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের মত চাওয়া হয় এবং ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য করিতে রাজি হওয়ায় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক মত ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রসারিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইংরাজ বণিকগণের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে প্রস্তাব আর অগ্রসর হয় নাই।

অর্থসচিব জেমস্ উইলসন্ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এদেশে এমন একটী জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন যাহা ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখা দ্বারা সমগ্র দেশের নগরগুলি ছাইয়া ফেলিবে। তাঁহার পরবর্ত্তী অর্থসচিব ল্যাং (Lang) সাহেবও স্বীকার করেন যে এইরূপ একটী ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় এবং বিপদের সময় এইরূপ একটী ব্যাঙ্ক দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য হইতে পারে। এইরূপ ব্যাঙ্ক দ্বারা আপাততঃ ব্যবসা বাণিজ্যের সাহায্য প্রত্যক্ষ না হইলেও উহাদের উন্নতি ও এই ব্যাঙ্ক দ্বারা সম্ভব তাহাও ল্যাং সাহেব স্বীকার করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য এলিস্ (Ellis) সাহেব মত প্রকাশ করেন যে এদেশে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক তাহাদের মধ্যে সরকারী (state) ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তাঁহার মতে ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্সের অনুকরণে কিঞ্চিত অদল বদল করিয়া ভারতে একটা ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইহার পরে কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত থাকে। রূপার দাম ক্রমে কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে ক্রমেই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ভারতের খাজনা ও অন্যান্য আয় হইত রূপার টাকায় এবং বিলাতের খরচ যোগাইতে হইত সোণার পাউণ্ডে সুতরাং যতই রূপার দাম কমিতে লাগিল ততই পাউণ্ডের দেনা চুকাইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের খরচা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হার্সেল কমিটি নিযুক্ত করিলেন এবং ইহার নির্দ্দেশমত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আইন প্রনয়ন করিয়া (য়্যাক্ট সেভেন অফ ১৮৯৩) রূপার টাকার অবাধ তৈয়ার (Free coinage of silver) বন্ধ করিয়া দিলেন। বলা প্রয়োজন যে এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে কেহ রৌপ্য টাঁকশালে জমা দিয়া নিয়মিত সংখ্যক টাকা পাইত এবং এইরূপে বাজারের রৌপ্য টাকায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। দ্রব্যের সংখ্যা কমিলে দাম বাড়িবে ধন বিজ্ঞানের এই সূত্র ধরিয়া হার্সেল কমিটি টাকার অবাধ নির্ম্মাণ স্থগিতের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এবং এই ব্যবস্থা দ্বারা বাজারের রৌপ্য এবং টাকার রৌপ্যের দামের পার্থক্যের সৃষ্টি হইল অর্থাৎ টাকার দাম বাড়িয়া গেল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ফাউলার কমিশন নিয়োগ করিলেন। ফাউলার কমিশনের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় ছিল টাকা ও বিলাতী পাউণ্ডের লেন-দেন সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন। এই কমিশনের অন্যতম সদস্য সার এভারার্ড হ্যাম্ব্রো (Sir Evarard Hambro) এবং সাক্ষী হিসাবে শ্রীযুক্ত এলফ্রেড্ দি রথচ্ চাইল্ড্ (Alfred de Rothschild) টাকার দাম নিয়ন্ত্রিত করিতে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু তখন বঙ্গ, মাদ্রাজ এবং বোম্বে এই তিন প্রদেশে বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগীতা ও বন্ধুত্বের অভাব হেতু এই বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচিত হইতে পারে নাই। ১৮৯৯ হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত আলোচনার পর ভারত সচীব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং এইরূপ আশ্বাস দিলেন যে ভবিষ্যতে কোন সুযোগ হইলেই এইরূপ একটী ব্যাঙ্কের

প্রতিষ্ঠার বিষয় উত্থাপিত করা যাইবে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে চেম্বারলেন কমিশন নিযুক্ত হইল। এই কমিশনের সম্মুখে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দুইটী খসড়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার একটা স্যার লিওনেল এব্রাহামস্ (Sir Lionel Abrahams) এবং অপরটী সুবিখ্যাত ধন-বিজ্ঞানবিদ্ জে, এম্, কেন্স লিখিত। এই কমিশন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন বা উহার বিরুদ্ধে কোন মতামত জ্ঞাপন করিলেন না এবং মত দিলেন যে এই বিষয় বিচারের জন্য আর একটী ছোট কমিটি নিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেন্স সাহেব যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ঠ এই যে পরে ১৯২৬ সনে হিল্টন ইয়ং কমিশন যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলিই কেন্সের রিপোর্টে পাওয়া যায়।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ মহাযুদ্ধে কাটিয়া গেল এবং এই মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা আরও অনুভূত হইল। গবর্ণমেণ্ট এবং তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের আলোচনার ফলে ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে একীভূত করিবার জন্য আইন পাশ হইল এবং ১৯২১ সনের ২৭শে জানুয়ারী হইতে এই বিধি বলবৎ হইল। কিন্তু তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক একীভূত হইয়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে পারিল না। এই সকল প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের ব্যবসা পদ্ধতি অন্যান্য জয়েণ্টস্টক ব্যাঙ্কের মতই এবং ইহাদের স্থাপন ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও ইহাদিগকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে দিল না। নব প্রতিষ্ঠিত ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মত নোট চালাইবার অধিকারী হইল না।

হিল্টন ইয়ং কমিশন (১৯২৬) মন্তব্য করিলেন যে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া যেরূপ ভাবে সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসা করে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগীতায় লিপ্ত তাহাতে ইহা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব নহে। একটী পৃথক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন আছে। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক বহু শাখা প্রশাখা দ্বারা সমগ্র দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত এইরূপ ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে এই সকল ছাড়িয়া ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের স্যার নরকোট ওয়ারেণ ও তৎসম্পর্কীত আরও চারিজন সভ্য হিল্টন ইয়ং কমিশনে থাকা সত্ত্বেও কমিশন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহাতে অবাক্ হইবার কিছু নাই। কারণ কোন সাধু সমিতি এইরূপ মত প্রকাশ

করিতে পারেন না যে একদিকে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক বিনাসুদে সরকারী মজুত তহবিল খাটাইয়া দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগীতা করিবে এবং অন্যদিকে আবার নোট চালাইবার অধিকারী হইবে। সমস্ত দেশের ধন সঞ্চয়ের আধার এবং সমস্ত দেশের ক্রেডিট্ যন্ত্র এবং কাগজীমুদ্রা চালাইবার অধিকারী যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা কখনও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত ব্যাঙ্কিং করে না। উহার কার্য্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের মারফত ব্যাঙ্কিং করা। এজন্যই ইহাকে ব্যাঙ্কারের ব্যাঙ্ক বলা হয়। এই কার্য্য করা একটা নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভব। হিল্টন ইয়ং কমিশন এরূপ একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা দিলেন।

১৯২০ অব্দে ব্রাসেল্স্ সহরে যে অন্তর্জাতিক আর্থিক সম্মিলন হয় তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে যে সকল দেশে কাগজীমুদ্রা পরিচালনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank of Issue) নাই সেখানে অগৌণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ১৯২২ অব্দে জেনোয়া সহরে অন্তর্জাতিক আর্থিক সম্মিলনের দ্বিতীয় বৈঠক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই রাষ্ট্রীয় আওতার বাহিরে থাকা উচিত।

হিল্টন ইয়ং কমিশন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে মতামত দিলেন তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ঃ—

(১) নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবে অন্য কিছু করিবে না যথা

(ক) ইহা ব্যাঙ্কারের ব্যাঙ্ক হইবে এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের তহবিল রাখিবে।

(খ) আইন অনুযায়ী রিজার্ভ রাখিয়া নোট বা কাগজীমুদ্রার সরবরাহ সম্বন্ধে ইহার একচেটিয়া অধিকার থাকিবে।

(গ) ইহাকে টাকার তহবিল (Currency Reserve) রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং তহবিলের প্রসার ও সঙ্কোচনের এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে কোনরূপ আর্থিক গোলযোগ উপস্থিত না হয়।

(ঘ) এই ব্যাঙ্ক কোন বাণিজ্যিক কারবার করিতে পারিবে না।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অংশীদার বা সেয়ার হোল্ডারগণের প্রতিষ্ঠান হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের আওতার বাহিরে থাকিবে। হিল্টন ইয়ং কমিশনের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়াই অর্থ সচিব স্যার বেসিল ব্লাকিট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রথম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-বিল উপস্থাপিত করেন। ১৯২৭ সনের ১৩ই জানুয়ারী

এই বিলের খসড়া প্রকাশিত হয় এবং ২৫শে জানুয়ারী ইহা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হয়। অবশ্য হিল্টন ইয়ং কমিশনের সকল মন্তব্যই এই বিলে স্থান পায় নাই। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অংশীদারের ব্যাঙ্ক না সরকারী ব্যাঙ্ক হইবে ইহা লইয়া ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এবং ২৫ জন সভ্যের সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনার জন্য বিল প্রেরিত হয়। সিলেক্ট কমিটিতে বিলের চেহারা একেবারে বেমালুম বদলাইয়া যায়। সংখ্যা গরিষ্ঠগণ মন্তব্য করিলেন যে অংশীদারের ব্যাঙ্ক হইলে ইহার পরিচালকগণ দেশের স্বার্থ না দেখিয়া লাভের আশায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিবেন ইহা কখনও হিতকর নহে। স্যার ব্যাসিল্ ব্লাকিট্ প্রভৃতি সাতজন সভ্য এরূপ মন্তব্য করিলেন যে ব্যাঙ্কের সমস্ত মূলধন গবর্ণমেণ্ট হইতে লইলে এই ব্যাঙ্কের কোন স্বাধীন স্বত্বা থাকিবে না এবং এইরূপ একটী ব্যাঙ্কের পৃথক অংশ স্বাধীন স্বত্ত্বা না থাকিলে ইহা দ্বারা কোন সুফল আশা করা যায় না। ইহাদের মতে রাষ্ট্রীয় শক্তির আওতায় কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী পরিচালিত হওয়া মঙ্গলজনক নহে।

২৯শে আগষ্ট অর্থ সচিব পরিবর্ত্তিত আকারের বিল ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থাপিত করিলেন। স্যার বেসিল জানাইলেন যে ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ নাই। ডাইরেক্টর নিয়োগ এবং মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে যথেষ্ট মত বিরোধ রহিয়াছে। স্যার বেসিল অংশীদারী ব্যাঙ্কের প্রস্তাব ত্যাগ করিলেন এবং যাহাতে সকল মতের সমন্বয় হয় সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ যাহাতে এই ব্যাঙ্কে ডাইরেক্টর হইতে পারেন তাহাতেও রাজী হইলেন। এই সময় লণ্ডন হইতে ভারত সচিব এক তার করিয়া সমস্ত বোঝাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯২৭ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর পরিষদের সভায় অর্থ সচিব জানাইলেন যে গবর্ণমেণ্ট এই বিলের আলোচনায় এই সেসনে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন না। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করিল এবং স্যার বেসিল্ চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন কিন্তু তাহা মঞ্জুর হইল না। ২৭শে অক্টোবর ঘোষনা করা হইল যে স্যার বেসিল্ ছুটী লইয়া ভারত সচিবের সহিত পরামর্শ করিতে ইংলণ্ডে যাইতেছেন। বড়দিনের পূর্ব্বেই অর্থ সচিব ভারতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ৭ই জানুয়ারী ১৯২৮ আবার নূতন করিয়া (৩য় বার) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল প্রকাশিত হইল।

এই তৃতীয় বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভায় উপস্থাপিত বা আলোচিত হয় নাই। কারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল এইরূপ নির্দ্দেশ দিলেন যে

এই সম্পর্কীত আর একটা আইনের খসড়া (অর্থাৎ ২য় বিল) তখনও সভার সম্মুখে উপস্থাপিত থাকার দরুণ সভার নিয়মানুযায়ী কোন নূতন বিল উপস্থাপিত বা আলোচিত হইতে পারিবে না। স্যার বেসিল তখন পূর্ব্বেকার স্থগিত বিল সভায় উপস্থাপিত করিলেন কিন্তু আলোচনার সময় বিলের ৮ ধারায় সেখানে ডাইরেক্টর নিয়োগের বিষয় বিধিবদ্ধ ছিল। সেই স্থানে গবর্ণমেণ্ট এক ভোটে পরাজিত হইলেন। অর্থ সচিব ভাবিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় বিলকে সংশোধিত করিয়া প্রচারিত ৩য় বিলের আকার দেওয়া যাইবে। কিন্তু সে আশাও যখন নির্ম্মুল হইল তখন তিনি পরিষদকে জানাইলেন যে গবর্ণমেণ্ট আর এই বিল লইয়া অগ্রসর হইতে চাহেন না। ১৯২৮, ৯০ই ফেব্রুয়ারী অর্থ সচিব ঘোষণা করিলেন যে বর্ত্তমানে যে ভাবে মুদ্রানীতি এবং ক্রেডিট্ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যতদিন তাহা অপেক্ষা নূতন কিছু দরকার না হইবে ততদিন কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। ঐ দিনই এই বিলের আলোচনা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইয়া যায়। সভার নিয়ম অনুযায়ী ঐ দিন হইতে দুই বৎসর মধ্যে ঐ ধরণের কোন বিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইতে পারে না।

ইহার পরে শাসন সংস্কার সম্পর্কে আবার একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা উঠে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সনের ৯০ই সেপ্টেম্বর তাহাদের ডেস্‌পেচ্ ভারতী সচিবকে জানান যে বৃটিশ পার্লামেণ্টের হস্ত হইতে ভারত শাসনের আর্থিক দায়িত্ব ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের হস্তে যাওয়ার পূর্ব্বেই খুব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

কিছুদিন হইতেই গবর্ণমেণ্টের তরফে সমগ্র ভারতের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণের নিকট হইতেও ইহার তাগিদ কিছু কম ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে ভারতের মুদ্রা বিনিময় সমস্যা, সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। খুব সন্তোষজনক ভাবে ইহার মীমাংসা হয় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকার দরুণ সমস্ত ভারতে টাকার বাজার বলিয়া কিছু নাই। দেশের বিভিন্ন অংশে এবং বৎসরের বিভিন্ন মাসে সুদের হার এত উঠানামা করে যে তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হয় এবং শক্তিশালী ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্ক সংজ্ঞের অভাবে সমগ্র দেশের কৃষককুল কুশীদ জীবিগণের হস্তে দিন দিন নিঃস্ব হইতেছিল। কোন দেশেরই গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আর্থিক অমঙ্গলকে বেশীদিন নীরবে দেখিতে পারে না। সমবায় ঋণদান সমিতি বা সমবায় ব্যাঙ্ক কয়েক বৎসর হইতে প্রসার লাভ করিলেও তাহাদ্বারাও কৃষকের

যথাযত উপকার হইতে ছিল না। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ভারতের কোন কোন স্থানে স্থাপিত হইলেও সমবায় নীতিতে উহার আরও প্রসার বাঞ্ছনীয় ছিল। ১৯২৯ সনের ২২শে জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্ট সমগ্র দেশের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য এবং ব্যাপকভাবে প্রত্যেক প্রদেশের ব্যাঙ্কিং, ক্রেডিট্, সমবায় আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান এবং সকল রকম লেন-দেন কারবার সমূহের অনুসন্ধান করিবার জন্য দশটী প্রদেশে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হইল। ইহা ব্যতীত ৯৭টী দেশীয় রাজ্যেও কমিটি নিযুক্ত হইয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। প্রদেশগুলির অভাব, অভিযোগ ও অসুবিধা ঠিক এক নহে সুতরাং এতগুলি কমিটির আবশ্যকতা যে ছিল না তাহা নহে। এই সকল প্রাদেশিক কমিটির অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত দ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সাহায্য হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটিতে মোট ২১ জন সভ্য ছিল এবং স্যার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র সদ্য ভারত সরকারের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইহার সভাপতি হইলেন।

এই কমিটির সাহায্যের জন্য ১৯৩০ সনের ৬ই অক্টোবর ভারত গবর্ণমেণ্ট পাঁচ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা ঐ বৎসরই ৭২ই ডিসেম্বর ভারতে আসিয়া পৌছান। কেন্দ্রীয় কমিটি এইরূপে একদিকে যেমন প্রাদেশিক কমিটিগুলির মারফত দেশের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইলেন অন্যদিকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৯২৮ সনের উপস্থাপিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল যাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাও এই কমিটি আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পক্ষে মত দিলেন,—

১। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের আইন দ্বারাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইবে ;

২। এই ব্যাঙ্কে মূলধন রাষ্ট্র সরবরাহ করিবে ;

৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত হইবে ;

৪। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট ১৯৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৩০-৩১ সালে লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসিল। রাষ্ট্রীয় কাঠামো আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আর্থিক সমস্যার বিষয়ও আলোচিত হইল।

প্রথম গোলটেবিল ফেডারল্ ষ্ট্রাক্চার শাখা সমিতি (**Federal Structure Sub-Committee**) মন্তব্য করিলেন যে সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির বাহিরে থাকিয়া মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময়ের পরিচালনা করিতে পারে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের আদর্শে, ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া উচিৎ। ১৯৩২ সালে যখন তৃতীয় বার গোলটেবিল বৈঠক বসিল তখন রাজস্ব-রক্ষক কমিটি (**Financial Safeguards Committee**) অভিমত করিল যে পার্লামেণ্টের নিকট, হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্ব্বেই ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে যে হোয়াইট পেপার (**White paper**) বাহির হইল তাহাতে খুব জোরের সহিত বলা হইল যে ভারতে এরূপ একটী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দরকার যাহা রাজনীতির আওতার বাহিরে থাকিয়া মুদ্রা বিনিময় প্রভৃতি কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবে। এইরূপ ব্যাঙ্ক ব্যতীত নির্ব্বাচিত মন্ত্রীগণ দ্বারা মুদ্রাসম্পর্কীয় ব্যাপার কার্য্যের পারম্পর্য্য রক্ষা হওয়া সম্ভব নহে। ঐ বৎসরই ভারত সচিব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য লণ্ডনে একটী কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটিতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞগণ এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ ছিলেন। জুলাই মাসে কমিটির কার্য্য আরম্ভ হয় এবং আগষ্ট মাসে রিপোর্ট বাহির হয়।

লণ্ডন কমিটির রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৩৩ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তৃতীয়বার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল উপস্থাপিত করা হইল। এই বিল আলোচনার ও মন্তব্যের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের ২৮ জন সভ্যের এক যুক্ত-কমিটিতে প্রেরিত হইল। ১৬ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রস্তাবিত বিল প্রকাশিত হইল। ২৩শে অক্টোবর হইতে ৯৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত কমিটির অনেকগুলি অধিবেশন হইল। কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত বিল ২৭শে নবেম্বর আবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হইল এবং ৩০শে নবেম্বর মোটামুটী ভাবে গৃহীত হইল। ১লা ডিসেম্বর হইতে পরিষদের নিয়মানুযায়ী বিলের প্রত্যেক ধারা আবার বিবেচিত হইতে লাগিল এবং ২২শে ডিসেম্বর সমস্ত ধারাগুলি বিবেচিত হইয়া গৃহীত হইয়া গেল। অতঃপর রাষ্ট্রীয়

পরিষদে (Council of State) বিল গৃহীত হইলে পুনরায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইয়া ১৯৩৪ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইল। ঐ বৎসরই ৬ই মার্চ গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি পাইয়া বিল আইনে পরিণত হইল (Reserve Bank of India Act 1934 II of 3934) ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার কথা প্রথমে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭৩ সনে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীগণ একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৬ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন এতদিনে তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। ১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত আইনের ব্যাবস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য :—

মূলধন :—এই ব্যাঙ্কের মূলধন পাঁচ কোটী টাকা করা হইল এবং বোম্বে, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ এবং রেঙ্গুন এই চারিস্থানে অংশীদারগণের নামের তালিকা রাখার ব্যবস্থা হইল এবং যে সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর বহিষ্কার মূলক আইন আছে সেই সকল দেশবাসী যাহাতে এই ব্যাঙ্কে অংশীদার না হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা রহিল। (৪ ধারা) ইহা ব্যতীত সপরিষদ গবর্ণর জেনারেল রিজার্ভ ফণ্ডের জন্য পাঁচ কোটী টাকার কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কের হস্তে দিবেন তাহাও ঠিক হইল। (৪৬ ধারা)

ব্যাঙ্কের অংশ ও তাহার বণ্টন :—

ব্যাঙ্কের প্রত্যেক অংশ ১০০ মূল্যের হইল এবং পাঁচটী সেয়ারের মালিককে একটা করিয়া ভোটের অধিকার দেওয়া হইল কিন্তু কেহই অংশীদার হিসাবে ১০টার অধিক ভোট দিতে পারিবেন না তাহারও ব্যবস্থা রহিল। এইরূপে যাহাতে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্ব না যায় তাহার ব্যবস্থা হইল। বোম্বাই, কলিকাতা দিল্লী, মান্দ্রাজ এবং রেঙ্গুন রেজিষ্টার সমূহের ভাগে যথাক্রমে ১,৪০,০০,০০০, ১,৪৫,০০,০০০, ১,১৫০০,০০০, ৭৫,০০,০০০, ৩০,০০,০০০, টাকার সেয়ার পড়িল। প্রথম অংশ বণ্টনের ব্যবস্থা উক্তরূপ হইলেও পরে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা এক রেজিষ্টার হইতে অন্য রেজিষ্টারে সেয়ার বদলি হইতে পারিবে তাহার ব্যবস্থা রহিল কিন্তু একই ব্যক্তির নাম দুইস্থানে থাকিতে পারিবে না এবং যাহাতে খুব বেশীসংখ্যক লোকের মধ্যে অংশগুলি বিলি হয় আইনে সেরূপ ব্যবস্থা থাকিল। (৪-৭ ধারা)

পরিচালন (কেন্দ্রীয় বোর্ড) ঃ—

এই ব্যাঙ্কের গবর্ণর এবং ডেপুটী গবর্ণর সপরিষদ্ গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন, অবশ্য এই সম্পর্কে ব্যাঙ্কের বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াই কার্য্য করা হইবে। ইহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট আরও পাঁচ জন ডাইরেক্টর মনোনীত করিবেন এবং ইঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইবেন। অংশীদারগণ বোম্বাই হইতে দুইজন, কলিকাতা হইতে দুইজন, দিল্লী হইতে দুইজন মান্দ্রাজ এবং রেঙ্গুন প্রত্যেক স্থান হইতে এক একজন মোট আট জন ডাইরেক্টর নির্ব্বাচন করিবেন। গবর্ণর এবং ডেপুটী গবর্ণর বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী হইবেন। ডাইরেক্টরগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হিসাবে যিনি ডাইরেক্টর হইবেন তিনি অল্প বা অধিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ডেপুটী গবর্ণরের কোন ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না (৮ ধারা)

স্থানীয় বোর্ড ঃ—ইহা ব্যতীত পরিচালনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক স্থানীয় কেন্দ্রে একটী করিয়া বোর্ড থাকিবে, তাহাতে পাঁচজন নির্ব্বাচিত এবং অনধিক তিনজন গবর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্য থাকিবে (৯ ধারা)

ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী ঃ–

(ক) বিনাসুদে টাকা জমা লওয়া ;

(খ) ভারতবর্ষের যে কোন স্থানের নব্বই দিনের অনধিক মিয়াদী হুণ্ডী ক্রয়, বিক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় (Re-discount) যদি এই সকল বিল খাঁটী ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে কাটা হইয়া থাকে এবং ইহাতে কোন একটী তপশীল ভুক্ত (Scheduled) ব্যাঙ্ক সহি দিয়া থাকে।

(গ) নয় মাসের অনধিক মিয়াদী কৃষি সম্পর্কীয় বা কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় ও চালান সম্পর্কীয় ভারতবর্ষীয় হুণ্ডি কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সহি থাকিলে তাহা ক্রয় বিক্রয় এবং পুনঃ ক্রয়।

(ঘ) অনধিক নব্বই দিনের মিয়াদী হুণ্ডী যাহা কোম্পানীর কাগজ (Govt. Securities) ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কে ভারতবর্ষে কাটা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের পরিশোধণীয় এবং যাহাতে কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সহি আছে এরূপ হুণ্ডী ক্রয় বিক্রয় বা পুনঃ ক্রয়।

(ঙ) তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের নিকটে বা নিকট হইতে অন্যূন একলক্ষ টাকার পাউণ্ড মুদ্রা বিক্রয় বা ক্রয়।

(চ) ইংলণ্ডের যুক্ত রাজ্যের যে কোন স্থানের উপর অনধিক নব্বই দিনের মিয়াদী বিলাতী হুণ্ডি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মারফত ক্রয় বিক্রয় বা পুনঃ ক্রয়।

(ছ) যুক্ত রাজ্যের কোন ব্যাঙ্কের তহবিল রাখা।

(জ) গবর্ণমেণ্টকে, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে হুণ্ডি, সোনারূপা, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি জামিন রাখিয়া অনধিক নব্বই দিনের মিয়াদে বা চাহিবা মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে কর্জ্জ দেওয়া।

(ঝ) ভারতীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে অনধিক তিন মাসের জন্য কর্জ্জ দেওয়া।

(ঞ) ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্‌ট্ (Demand Draft) বা ব্যাঙ্ক পোস্ট বিল বিক্রয়।

(ট) অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় এইরূপ যুক্ত রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বা ভারতীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র ক্রয় কিন্তু এরূপ ক্রীত কাগজের পরিমাণ ব্যাঙ্কের মূলধন রিজার্ভ এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগের দেনার (Liabilities) $\frac{3}{5}$ অংশের বেশী হইবে না, অথবা এইরূপ ক্রীত ঋণ পত্রগুলির যে অংশের আসল টাকা এক বৎসর পরে পাওয়া যাইবে তাহা ব্যাঙ্কের মূলধন রিজার্ভ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের দেনার $\frac{2}{5}$ অংশের বেশী হইবে না; অথবা এইরূপ ক্রীত ঋণ পত্রগুলির যে অংশের আসল টাকা দশ বৎসরের পরে পাওয়া যাইবে তাহা ব্যাঙ্কের মূলধন রিজার্ভ এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগের $\frac{1}{5}$ম অংশের অতিরিক্ত হইবে না।

(ঠ) ভারত সচীব, ভারত গবর্ণমেণ্ট, কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, কোন মিউনিসিপ্যালিটী, জেলাবোর্ড এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে সোনা রূপার ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি কার্য্য, সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ (Public Debt) সংক্রান্ত বিষয় পরিচালন, অনধিক একমাসে শোধনীয় অর্থের কর্জ্জ গ্রহণ (এরূপ কর্জ্জ কেবলমাত্র তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে লওয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন অপেক্ষা অধিক কর্জ্জ লইতে পারিবে না) এবং তৎসম্পর্কে বন্ধকী রাখা, কাগজী মুদ্রা বা নোট তৈয়ার এবং সরবরাহ।

(ড) ব্যাঙ্ক পরিচালনের জন্য এই আইন অনুযায়ী অন্যান্য কার্য্যকরা (১৭ ধারা)

বিশেষ ক্ষমতা :—

উপরোক্ত ক্ষমতা ব্যতীত দরকার হইলে ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সহি ব্যতীতও ভারতীয় ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কৃষির হিতার্থে সরাসরি কর্জ্জ দিতে পারিবে বা বিল ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে কিন্তু একলক্ষ টাকার কম মূল্যের পাউণ্ড মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিতে কিংবা চাহিবামাত্র শোধনায় বা নব্বই দিনের অতিরিক্ত মিয়াদে কর্জ্জ দিতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ কার্য্য ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের আদেশ অনুসারে হইবে অন্যথা নহে। (১৮—১৯ ধারা)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী :—

ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ভাবে সকল কার্য্য করিবার অধিকারী হইবে। কেবল মাত্র এই ব্যাঙ্কই কাগজী মুদ্রা বা নোট পরিচালনের ও সরবরাহের অধিকারী থাকিবে এবং যে দিন হইতে ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিবে সেইদিন হইতে সরকারী নোট প্রচলন বন্ধ হইবে।

এজন্য ব্যাঙ্কের একটী পৃথক কাগজী মুদ্রা বিভাগে (Issue Dept) থাকিবে এবং উহা ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে পৃথক হইবে। ব্যাঙ্ককে নোট সম্পর্কে স্ট্যাম্প ডিউটী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। (২৯ ধারা) যাহাতে কাগজী মুদ্রার সম্পর্কে যথাযথ রিজার্ভ থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা হইল (৩৩ ধার) সরকারী তহবিলে স্বর্ণমান বিনিময় ভাণ্ডারের (Gold Standard Reserve) এবং কাগজী মুদ্রা ভাণ্ডারের (Paper Currency Reserve) সকল ধাতু মুদ্রা, ধাতু এবং সিকিউরিটি গবর্ণমেণ্ট এইরূপে ব্যাঙ্কের হস্তে দিলেন। (৩৫ ধারা) অতঃপর গবর্ণমেণ্ট ধাতু মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া একমাত্র ব্যাঙ্ককেই দিবেন এবং ব্যাঙ্কই তাহা সরবরাহ করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। টাকশাল সরকারের হাতেই রহিল। যদি কখনও কাগজী মুদ্রার দরুণ ব্যাঙ্করে নিকট আইন অনুযায়ী রিজার্ভ না থাকে তাহা হইলে, অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অন্যূন শতকরা ৬৲ হিসাবে সুদ আদায়ের ব্যবস্থা রহিল। (৩৭ ধারা) যাহাতে ইংলণ্ড তথা বিদেশের সহিত মুদ্রা বিনিময়ে অসুবিধা বা বিঘ্ন না হয় এবং অন্তর্জাতিক টাকার বাজারের ভারতীয় মুদ্রার দাম ঠিক থাকে এজন্য কেহ অন্ততঃ ১০,০০০, পাউণ্ড লণ্ডনে প্রেরণ করিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক প্রতি টাকার অন্যূন ১ শিলিং ৫ $\frac{৪৯}{৬৪}$ পেন্স দিতে বাধ্য থাকিবে। আবার কেহ

ইংলণ্ড হইতে অন্যূন ১০,০০০, পাউণ্ড ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক ভারতে দেয় প্রত্যেক টাকার জন্যই ইংলণ্ডে ১ শিলিং, ৬ $\frac{৩}{১৬}$ পেন্সের বেশী আদায় করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থা দ্বারা অন্তর্জাতিক টাকার বাজারে যাহাতে ভারতের টাকার দাম উঠানামা না করে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। (৪০ ধারা)

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি যথাক্রমে চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় এবং মিয়াদী জমার শতকরা ৫ এবং ২ অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবে তাহাও নির্দিষ্ট হইল। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে কিরূপ অর্থদণ্ড দিতে হইবে আইনে তাহারও ব্যবস্থা রহিল। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন এবং অবণ্টনীয় লভ্যাংশ (রিজার্ভ) অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা সেই সমস্ত ব্যাঙ্কই তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্য। (৪২ ধারা।)

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত এই ব্যাঙ্কের পনের বৎসরের জন্য একটী চুক্তি হইল এবং যে স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে না গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সেখানে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কই করিবে এবং তজ্জন্য আইন নির্দ্দিষ্ট হারে কমিশন পাইবে। ১৫ বৎসর পরে ৫ বৎসরের নোটিশ দ্বারা এই চুক্তি বাতিল হইতে পারিবে। (৪৫ ধারা)

অন্যান্য ব্যবস্থা :—ব্যাঙ্ককে আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। "ব্যাঙ্করেট্" (Bank-rate) সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যবস্থা রহিল। হিসাব পরীক্ষকগণ অংশীদারগণ নির্ব্বাচন করিবেন। প্রতি সপ্তাহে ইস্যু ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের পৃথক পৃথক হিসাব প্রকাশিত হইবে ইহা বাধ্যতামূলক করা হইল। ব্যাঙ্কের একটী পৃথক কৃষিঋণ বিভাগ থাকিবে এবং ব্যাঙ্ক স্থাপনের তিন বৎসরের মধ্যে সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের নিকট কি ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন দ্বারা কৃষিঋনের সুব্যবস্থা করা যায় তাহা জানাইতে হইবে। ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের নির্দ্দেশমত বার্ষিক শতকরা অনধিক পাঁচ টাকা হারে সুদ পাইতে পারিবেন।

১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রেল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইল। পাঁচ কোটী টাকার অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগৃহীত হইল এবং আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টে রিজার্ভ ফণ্ডে পাঁচ কোটী টাকার কোম্পানীর কাগজ দিলেন। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কাগজী মুদ্রার ভার ব্যাঙ্কের হাতে আসিল এবং উহার রিজার্ভ রক্ষার জন্য এবং টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষার ও পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন অনুযায়ী কাঁচা সোণা, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য

মুদ্রা এবং ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী ব্যাঙ্কের তহবিলে দিলেন। কাগজী মুদ্রা ধাতু মুদ্রায় পরিণত করিবার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর পড়িল এবং ভবিষ্যতে যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট বা কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয় তাহার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। পঞ্চাশটী ব্যাঙ্কের নাম সিডিউল বা তপশীলভুক্ত হইল। এই সকল ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব রাখিতে ও আংশিক তহবিল রাখিতে বাধ্য হইল। আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "ব্যাঙ্ক-রেট্" অর্থাৎ যে সুদে কর্জ্জ দিতে পারিবে তাহা বিজ্ঞাপিত করিতে বাধ্য রহিল।

ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং ও ইস্যু বিভাগের হিসাবে সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যবস্থা হইল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সময় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল মোট পঞ্চাশ কোটী এবং ইহাদের মধ্যে আটাশটী ভারতীয়। বোম্বাই প্রেসীডেন্সী ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের ব্যাঙ্কগুলি আকারে বিশেষ বড় ছিল না। বিগত তিন বৎসরে আরও তিনটী বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সহিত তুলনা করিলে অধিকাংশ ভারতীয় ব্যাঙ্কই খুব ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু দিন দিন যে ভাবে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস বাড়িতেছে তাহাতে শীঘ্রই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি এদেশের টাকার বাজারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যদিও কৃষিঋণ সম্পর্কে আইন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে তথাপি এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই কার্য্য দেখা যাইতেছে না। ১৯৩৬ সালে কৃষিঋণ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের প্রথম রিপোর্ট বাহির হয়।

এই রিপোর্টে কৃষক ও কৃষিঋণ সম্পর্কীয় নানা বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ব্যাঙ্ক মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কৃষকের ঋণ গ্রহণে সুবিধা হইবে ব্যাঙ্ক তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। কৃষির উপরেই ভারতীয় রাষ্ট্রের একটি বৃহৎ আয় নির্ভর করে। কিন্তু কৃষির সফলতা কেবল মানুষের হাতে নহে, প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে। ভারতের কৃষক আবার কেবলমাত্র প্রকৃতির হাতের পুত্তলিকা নহে। বংশ পরম্পরায় সংস্কার, অশিক্ষা, সর্ব্বোপরি অসহনীয় ঋণভার তাহার উপরে পাহাড়ের মত চাপিয়া আছে। এই হেন কৃষকের ঋণ-মুক্তির ভার পড়িল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ এই দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতেছেন এরূপ অভিযোগ করা চলে না। তবে ভারতের

কৃষকের ঋণ সম্পকীয় দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের অনেক দায়িত্ব পালন করিতে হইতেছে।

একদিকে টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষার দায়িত্ব অন্য দিকে সমগ্র দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে কাগজী মুদ্রার নগদ তহবিল রক্ষা এবং সর্বোপরি সমগ্র ভারতীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক ইস্ট রক্ষার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর। ইহার পক্ষে এরূপ কোন কার্য্য করা উচিত নহে যাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা কোনরূপে বিপন্ন হইতে পারে বা যাহাতে কোন প্রকার ক্ষতির বা বেশীদিনের জন্য টাকা আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান কৃষককে ঋণ দিতে চাহে বা যাহারা কৃষকের সঙ্গে সচরাচর লেন-দেন কারবার করিয়া থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য করা অর্থাৎ অল্প সুদে কর্জ্জ দেওয়া, হুণ্ডী ভাঙ্গান ইত্যাদি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব কেবল স্বীকার করে নাই গ্রামের মহাজন এবং কুশীদজীবিগণ যাহারা কৃষকের সহিত সাক্ষাৎভাবে লেনদেন করে তাহারা যাহাতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মারফত হুণ্ডীর দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকার সাহায্য পায় তাহার প্রস্তাব করিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে এইরূপ প্রস্তাব রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ককে চিঠি লিখিয়া এই সম্পর্কে তাহাদের সহায়তা চাহিয়াছেন তবে কৃষিঋণ সম্পকীয় ব্যাপারে যাহাতে কেবলমাত্র মধ্যবর্ত্তী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি বা মহাজন লাভবান না হয় সত্য সত্যই কৃষক উপকৃত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সজাগ আছেন। যাহাতে কৃষিজাত পণ্যের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে হুণ্ডী প্রচলিত হয় এবং এইরূপে হুণ্ডীর ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে কৃষকের সহিত মহাজন এবং তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক মারফত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত চাষীর আর্থিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান রিপোর্টে এরূপ ইঙ্গিত আছে। তবে এই কার্য্যের জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি বা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিই বিশেষভাবে উপযুক্ত দীর্ঘ কালের জন্য কর্জ্জ দিয়া মূলধন আটকান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা হইতে পারে না এবং কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই এরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায় না।

কৃষককে টাকার বাজারের মধ্যে টানিয়া আনিতে গেলে তাহার মহাজনকেও সঙ্গে লইতে হইবে। যেরূপ আইন করিয়া তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের টাকা আংশিক ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে সেইরূপ আইন করিয়া

প্রত্যেক মহাজনকে হিসাব পত্রাদি রাখিতে বাধ্য করিতে হইবে এবং মহাজনকে এবং বর্ত্তমানে তপশীল বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলি আর একটী তপশীলে পুরিয়া তাহাদের তহবিলের একভাগ যাহাতে বর্ত্তমান তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির নিকট জমা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটী টাকার বাজার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই ভারতের আর্থিক মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃষক ঋণ-ভার হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ পাইবে এবং অল্প সুদে কর্জ্জ পাইয়া কৃষিকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিবার সুবিধা লাভ করিবে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কৌলিন্য প্রথা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

এল, এম, এস।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা একটী অভিনব ব্যাপার। যদিও অধুনা অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ এই প্রথার বিষয় কিছুই জানেন না এবং সামান্য যাহা জানেন তাহাও ভাসা ভাসা রকমের, তজ্জন্যই সকলের অবগতির জন্য সংক্ষেপে ইহার বিষয় বর্ণিত হইল।

এই কুপ্রথা বাংলার যে কতদূর সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই হয়তো উপলব্ধি করেন না। এই কৌলিন্য প্রথা পশ্চিমবঙ্গে যদিও কিঞ্চিত শিথালতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কৌলিন্য প্রথার ভীষণ সমাজধ্বংসী মূর্ত্তী এখনও পুরাকালের ন্যায় পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে। এখনও শত শত অবিবাহিতা বৃদ্ধা কুলীন কন্যা হইতে যুবতী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মুখে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে এই পাপ কৌলিন্য প্রথা প্রায় লয়ের পথে বসিয়াছে অথচ বাস্তবিক সেই তথাকথিত কুলীনগণই ইহাকে যথাশক্তি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতেছেন। আমার মনে হয়, লয়ের পথে বসা তো দূরের কথা, ইহা—এখনও পূর্ণ জীবনীশক্তিবিশিস্ট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কুলীন, শ্রোত্রীয়, বংশজগণ মধ্যে পুত্র কন্যা আদান প্রদান তো দূরের কথা, বিবাহ বাসরে বংশজের সহিত পংক্তি ভোজন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। কুপ্রথার দ্বারা রাঢ়ীয় সমাজ যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও দেশে অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে বংশ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারা যায় সেই বংশে কন্যা দান করিলে পতিত হইতে হয়, এরূপ অস্বাভাবিক নিয়ম বাংলার ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃস্ট হয় না। এখন দেখা যাক্ সামান্য বীজ হইতে ইহা কিরূপ বিশাল মহীরূহে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে কনৌজ হইতে আগমন করেন। সাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্ট নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ, বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ, সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ, স্ত্রী পুত্র পরিচালকগণ সহ আসিয়াছিলেন। ইহার পর

ভট্টনারায়ণের ৯৬টী শ্রীহর্ষের ৪টী দক্ষের ১৬টী, বেদগর্ভের ১২টী, ছান্দড়ের ১১টী পুত্র জন্মিল। ইহারা সকলেই পণ্ডিত এবং শ্রোত্রীয় (শাস্ত্রজ্ঞ)। এই সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যখন তাহাদের একস্থানে বাস সম্ভব হইল না তখন তাহারা বিভিন্ন গ্রামে বাস করিতে গেলেন এবং তাহারা বিভিন্ন গ্রামী অর্থাৎ গাই বলিয়া গ্রামের নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে এই গাই তাহাদের উপাধি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশে—যথা, আদি বরাহ—বন্দঘটী গাই। রাম—গড়গড়ী। নীপ—কেশর কুনি। লাল—কুসুম কুলি। বাটু—পরিহাল। গুই—কুলড়ী। গুণমনী—ঘোষলী। সাত—সয়েক। গণপতি—মাস চটক। বিকর্ত্তন—বটব্যাল। নীল—বসুয়ারী। মধুসূদন—কড়াল। কোয়—কুশারী। বাসু—কুলকুলী। মাধব—আকাশ। মহামতা—দীঘাঙ্গী।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশে, যথা—ধান্দু—মুখোটী। জনার্দ্দন—ডিংশায়ী গাই। লাল—সাহরী গাই। রাম—রায়ী।

কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ বংশে, যথা—ধীর—গুড় গাই। নীর—অম্বুলী গাই। শুভ—ভূরাশ গাই। শম্ভু—তৈল বাটী। কৌতুক—পীত মুণ্ডি। সুলোচন—চট্টো গাই। পালু—পলশায়ী। কাক—হড়। কৃষ্ণ—পোড়ারী। রাম—পালধি জন—কোঁয়ারী। বনমালা—পাকড়াশী। শ্রীহরি—সিমলায়ী। জট—পূষিলাল শশীধর—ভট্টগ্রামী। কেশব—মূলগ্রামী।

বাৎস্য গোত্রে ছান্দড় বংশে, যথা—রবি—মহিন্তা গাই। সুরভি—ঘোষাল। কবি শিমলাই। মহীযশ—বাপুলী। শঙ্কর—পিপলাই। ধীর—পতিতুণ্ড। বিশ্বাম্বর—পূর্ব্বগ্রামী। শ্রীধর—কাঞ্জিলাল। নারায়ণ—কাঞ্জারী। নিলাম্বর—চোট খণ্ড। মনো—দীঘাড়ী গাই।

সাবর্ণ্য গোত্রীয় বেদগর্ভ বংশে, যথা হল—গাঙ্গুলি। রাজ্যধর—কুন্দ। বশিষ্ট সিদ্ধল। মদন—দায়ী। বিশ্বরূপ—নন্দীগ্রাহী। কুমার—বালীগ্রামী। যোগী—সিয়ারী। রাম—পুংসিক। দক্ষ—ষাটক। মধুসূদন—পারী। মুরারি—ঘণ্টেশ্বরী। গুনাকর—নায়ারী গাই।

এই ভাবে গাই দ্বারা পরিচিত হইয়া কণৌজাগত ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিভিন্ন গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে উল্লিখিত ৫৯ গ্রামী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং গুণবিচারে ২২ গ্রামী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ সম্মানিত হইলেন। ইহারা কুলীন আখ্যা পাইলেন। এই প্রথম কৌলিন্যের

সৃষ্টি হইল। এই ২২জন কুলীনের গাই যথা—বন্দঘটী, গড়গড়ি, কুলভি, কেশর কুনী, দীঘাঙ্গী, চট্ট গুড়, হড়, পীতমুণ্ডি, ঘোষাল, পতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল মহিন্তা, চোটখণ্ডি, পিপপলী মুখোটী, রায়ী, ডিংসাই, গাঙ্গুলী, কুন্দ, ঘণ্টেশ্বরী, পারি।

কিছুদিন পরে এই ২২ গ্রামী কুলীন সন্তানগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। কি কারণে এবং কোন সময়ে এই বিভাগ হইল তাহার বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইল। এই দুই ভাগের ৮ গ্রামী মুখ্য এবং ১৪ গ্রামী গৌণ কুলীন বলিয়া খ্যাত হইলেন। ৮ গ্রামী মুখ্য কুলীন, যথা—বন্দ্যোঘটী, চট্ট, মুখোটী, ঘোষাল, পতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলী ও কুন্দলাল। বাকী ১৪ গ্রামী কুলীনগণ গৌণ কুলীন বলিয়া খ্যাত হইলেন। এবং এই কুলীন সম্প্রদায় ব্যতীত অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তানগণ শ্রোত্রীয় রহিয়া গেলেন। তাহা হইলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণগণ মুখ্য এবং গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রীয় এই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন। এই ৩ ভাগের মধ্যে পুত্র কন্যাগণের বিবাহাদি অবাধে চলিতে লাগিল। তৎকালে বিবাহ ব্যাপারে কোনও অসুবিধা ছিল না। এই ভাবে বহুকাল চলিয়া গেল এবং কুলীন শ্রোত্রীয়গণ সংখ্যায় বহু বৰ্দ্ধিত হইলেন। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ, সকলে সমভাবে আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। বিশেষতঃ গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রীয়দের মধ্যে নানা প্রকার দোষ প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহার ফলে গৌণ কুলীনগণ আর কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন না। শ্রোত্রীয়-দের নিচেয় তাহারা পড়িয়া গেলেন। তখন নিয়ম হইল যে ৮ গ্রামী মুখ্য কুলীন কেবল মুখ্য কুলীনগণের এবং শ্রোত্রীয়দের সহিত বিবাহে আদান প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু গৌণ বলিয়া যাহারা অখ্যাত ছিলেন, তাহাদের সহিত কুলীন শ্রোত্রীয়গণ কোনরূপ বিবাহ সংস্রব রাখিতে পারিবেন না, কারণ তাহাতে বংশে দোষ আসিবে। এই সময় হইতেই কৌলীন্য প্রথাজনিত ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইল। "নুলো পঞ্চানন" একজন প্রসিদ্ধ ঘটক তাঁহার "গোষ্ঠী কথা" গ্রন্থে বলিয়াছেন,

পুত্র গত কুলে রক্ষা হয় কিছু ধর্ম্ম,
কুলীনে শ্রোত্রীয়ে পালটী ছিল কুলধর্ম্ম।
পূর্ব্বে ছিল সর্ব্বদ্বারী
নাম আছে সারি সারি
পরিবর্ত্ত কুলীনে শ্রোত্রীয়ে॥

ইহার কিছুকাল পরে গৌণ কুলীনগণ আর ততটা অস্পৃশ্য রহিলেন না। কারণ মুখ্য কুলীন ও শ্রোত্রীয়গণ মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের সহিত আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রোত্রীয়গণের এই গৌণ কুলীন সংস্পর্শ দোষ, সমাজে অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ্য কুলীনগণের, গৌণ কুলীন সংস্পর্শ তাহাদের কুলে দোষ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। সমাজের এই প্রকার অবস্থার কিছু পরে লক্ষণ সেনের স্বর্ণ ধেনু যজ্ঞে মুখ্য কুলীন এবং শ্রোত্রীয়গণ মধ্যে কয়েক-জন ব্রাহ্মণ ঐ স্বর্ণ ধেনু দান গ্রহণ করিলেন। কেবল তাঁহারা স্বর্ণ দান গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হইলেন না, সেই স্বর্ণ নির্ম্মিত ধেনুটী কাটিয়া ভাগ করিয়া লইলেন। ইহাতে সমাজে প্রকাণ্ড আন্দোলন উত্থিত হইল। স্বর্ণ ধেনু গ্রহণকারী ২৫ জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ২৫ জনকে গো-বধের পাপে লিপ্ত বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজ পতিত ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রাহী আখ্যা দিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত করিলেন। নিয়ম হইল কুলীন শ্রোত্রীয়গণ মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি ইহাদের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইবেন, তাহারাও পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু অর্থ লোভে কুলীন শ্রোত্রীয়গণ মধ্যে ৬য় ব্যক্তি এই ভীষণ আইন উপেক্ষা করিয়া ঐ পতিত ব্রাহ্মণগণের কন্যা বিবাহ করিলেন। এই ৬ ব্যক্তি বংশজ নামে অভিহিত হইলেন। বন্দ্যোবংশীয় দান গ্রহণকারী "গণ" নামে এক ব্যক্তির কন্যা ভরদ্বাজ গোত্রীয় "বশিষ্ঠ" নামে এক ব্যক্তি বিবাহ করেন। এই প্রকার দান গ্রহণকারী চট্টোবংশীয় "শকুনীর" কন্যা ভরদ্বাজ গোত্রীয় "ঠোট" বিবাহ করেন। দান গ্রহণকারী বন্দ্যোবংশীয় "হাড়োর" কন্যা ভরদ্বাজ গোত্রীয় "দায়ী" বিবাহ করেন। গাঙ্গুলীবংশীয় দান গ্রহণকারী "হাস্থের" কন্যা বন্দ্যোবংশীয় "কুবের" বিবাহ করেন। তৈলবাটী বংশীয় দান গ্রহণকারী "নায়ীর" কন্যা "চক্রপাণি" বিবাহ করেন। বন্দ্যোবংশীয় দান গ্রহণকারী "বিটের" কন্যা "কুল ভূষণ চট্ট" বিবাহ করেন। ইহারাই বঙ্গের আদি বংশজ এবং ইহাদের সহিত যে কোন ব্রাহ্মণ আদান প্রদান করিবেন, তিনি কুল নষ্ট করিয়া বংশজত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এই ভাবে ধন লোভে বংশজের সহিত ক্রিয়াদি করিবার জন্য বংশজ সমাজ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় রাষ্ট্র বিপ্লবাদি কারণের জন্য সমাজের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়া অনেক নিয়ম শিথিল হইয়া গেল এবং সমাজ মধ্যে নানা প্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করিতে লাগিল, এই যুগ পরিবর্ত্তন কালে দেবীবর ঘটক নামে মহাতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইল। তিনি এতদূর ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন যে সমস্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ

তাহার হস্তের পুত্তলিকার মতন চালিত হইতে লাগিল। তিনি সমাজ মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতি দূরীকরণার্থ শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে একটী বিপ্লব উৎপাদন করিলেন। তিনি দেখিলেন, যে পাণ্ডিত্যে ও গুণবিচারে কুলীন সৃষ্টি হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সেই সব গুণের পরিবর্ত্তে নানাবিধ দুর্নীতি ও দোষে কুলীন সমাজ কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি কুলীনদের গুণ বিহীনতার জন্য, তাহাদের দোষাবলীকে ভিত্তি করিয়া ৩৬ ভাগে কুলীন সমাজকে বিভক্ত করিলেন। এই বিভাগের নাম "মেল বন্ধন" কুলীনগণ মধ্যে যাহারা যাহারা মদ্যপায়ী ছিলেন, তাহারা এক মেল ভুক্ত। যাহারা যবন কর্ত্তৃক বিধ্বস্তা কন্যা বিবাহ করিলেন তাহারা এক মেল ভুক্ত হইলেন। যাহারা যাহারা নিকৃষ্ট গৌণ কুলীনের সহিত আদান প্রদান করিয়াছেন তাহারা এক মেল ভুক্ত হইলেন। এইরূপে দেবীবর বিশারদ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে ৩৬ ভাগে "মেল বন্ধন" করিয়া সমাজের মস্তকে কঠোর আঘাতের দ্বারা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিলেন। আর একটী আশ্চর্য্য নিয়ম হইল যে কুলীনগণ মধ্যে যিনি বিশেষ দোষী, তিনি সেই মেলের "প্রকৃতি" এবং যিনি সেই মেলে অল্প দোষী, তিনি তাহার "পাল্‌টী" ঘর—যেমন ফুলিয়া মেলে মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য "প্রকৃতি" ও শ্রীনাথ বন্দ্যো তাহার "পালটী" খড়দ মেলে মুখোটী যোগেশ্বর পণ্ডিত "প্রকৃতি" এবং মধু চট্টো তাহার "পাল্‌টী"। এই পালটী ও প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল যে বৈবাহিক কার্য্য ইহাদের দুই ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। এই নিয়মের অন্যথা করিলে কিম্বা স্বমেল ছাড়িয়া অন্য মেলে বৈবাহিক কার্য্য করিলে একেবারে কুলধ্বংশ হইবে। দেবীবর ঘটক এই প্রকার শ্রোত্রীয়দিগকেও তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—যথা "সাধ্য, সিদ্ধ ও অরি" এবং গৌণ কুলীনদিগকে নিকৃষ্ট শ্রোত্রীয় আখ্যা দিলেন। দেবীবর নিয়ম করিলেন যে মেলী কুলীনগণ কেবলমাত্র সাধ্য শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু তাহাদিগকে কন্যা দান করিতে পারিবেন না। আর সিদ্ধ, অরি ও নিকৃষ্ট শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুল মর্য্যাদা হীন হইবে ও কুল দোষনীয় হইয়া যাইবে। কিন্তু অর্থলোভে কুলীনগণ এই সকল নিম্নশ্রেণীর শ্রোত্রীয় কন্যা গ্রহণ করিতে নিরত ছিলেন না। এবং তাহাতে যে কুলে দোষ আসিত তাহা—আবার অর্থ দানে ঘটকগণকে বশীভূত করিয়া সেই দোষ চাপা দিতেন। তখন নিয়ম ছিল যে সৎ শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুল মর্য্যাদা ও সম্মান বাড়িত এবং গণ পনের জন্যে অর্থ প্রাপ্তিরও সুযোগ

হইত। ইহা ছাড়া শ্রোত্রীয়ের দৌহিত্রগণ, কুলীনের দৌহিত্র অপেক্ষা অধিকতর সম্মানভাজন হইতেন। কারণ শ্রোত্রীয়গণ কুলীনের দৌহীত্রের সহিত কন্যা দান করিতে সহজে সম্মত হইতেন না, সে কারণ কুলীনগণ সৎ শ্রোত্রীয়ের কন্যা বিবাহ করিতে পারিলে সম্মানিত এবং মহা ভাগ্যবান বলিয়া, বিবেচনা করিতেন। সে কারণ কুলীনগণ সৎ শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকিতেন, ফলে এই হইল যে, শ্রোত্রীয়ের কন্যা বিবাহ অতি সহজ সাধ্য হইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলীন কন্যাগণের বিবাহ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন এক ব্যক্তিকে একাধিক কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হইল। অন্যথা কুলীন কন্যাগণ অনূঢ়া থাকিয়া যায় এবং কুলীনগণকে কুলভ্রষ্ট হইতে হয়। অথচ তাঁহারা শ্রোত্রীয় কন্যা বিবাহ এবং তৎগর্ভজাত সম্মানিত পুত্র লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারে না কাজেকাজেই তাহাকে শ্রোত্রীয় কন্যা বিবাহ, এবং বহু কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইত। এই প্রকারে কুলীন-গণ মধ্যে বহু বিবাহের অবাধ প্রচলন আরম্ভ হইল তথাপিও বহু কুলীন কন্যাকে পাত্রাভাবে চিরকুমারী ব্রত ধারণ করিতে হইত। অপর পক্ষে শ্রোত্রীয় কন্যা অন্ধ, খঞ্জ কুৎসিৎ হইলেও কুলীনগণ বিনা আপত্তিতে বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই কারণে শ্রোত্রীয়গণ যখন সহজে কুলীন পাত্র পাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা শ্রোত্রীয় পাত্রে কন্যা দান করা বর্জ্জন করিয়া দিলেন। কারণ সে কালে কুলীনে কন্যা দান করাটা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। ধনাঢ্য জমিদার শ্রোত্রীয়গণ বহু টাকার দ্বারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেন এমন কি, তাহারা যে কোনও ব্রাহ্মণের কন্যা পাইলেই ঘরে আনিতেন, অপর পক্ষে, দরিদ্র শ্রোত্রীয়গণ পাত্রীর অভাবে নির্ব্বংশ হইতে লাগিলেন। শ্রোত্রীয়দের আরও একটী সুবিধা ছিল যে তাহারা যে কোন ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করুন না কেন, তৎগর্ভজাত পাত্রীকে কুলীনগণ বিবাহ করিতে দ্বিধা করিতেন না। সেই পাত্রীর মাতৃকুল সময় সময় নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইলেও তৎগর্ভজাত কন্যার জন্য বিবাহার্থী কুলীন পাত্রের অভাব হইত না। এই প্রকারে কুলীন ও শ্রোত্রীয় বংশ উভয়ই ক্রমে কলুষিত হইতে লাগিল কিন্তু কুলীনগণ তাহাদের কৌলীন্যের অসার স্পর্দ্ধা জাহির করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশের কন্যার গর্ভজাত পাত্রী বিবাহ করিলে কুল কখনও বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। কারণ, কুলীন শ্রোত্রীয়ে অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, একের দোষে অন্যে দোষিত হয়।

পূর্ব্বে বংশজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বংশজগণ কুলীন শ্রোত্রীয়-গণের এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া জেদের সহিত কুলীনদের কুলভঙ্গ করিবার জন্য এই সময় বদ্ধপরিকর হইলেন। ধনাঢ্য বংশজগণ বহু অর্থের দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর কুলীন বংশ হইতে পাত্র এবং উচ্চ শ্রেণীর দরিদ্র শ্রোত্রীয় বংশ হইতে পাত্রী ক্রয় করিয়া আনিতে লাগিলেন, এই কারণে শ্রোত্রীয়দের কন্যা বিবাহ আরও সহজ হইয়া গেল। অথচ নিজেরা পাত্রীর অভাবে ক্রমে নির্ব্বংশ হইতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে যখন বংশজ সংস্পর্শে কুলভঙ্গ ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া গেল তখন বংশজ সমাজে তাহারা "ভঙ্গ কুলীন" নামধারন করিলেন। তাহাদের মধ্যেও নিয়ম হইল যে এই ভঙ্গকুলীণগণ উল্লিখিত আদিবংশজগণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু তাহাদিগের কন্যা দান করিবেন না। এই ভঙ্গকুলীন স্ব, স্ব, মেল খাঁটি কুলীণগণের ন্যায় বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টিত হইতে লাগিলেন। খাঁটি কুলীনগণও আপনাদিগকে ভঙ্গকুলীন হইতে উচ্চে থাকিবার জন্য "স্বভাব" কিম্বা "নৈকষ্য' নাম ধারণ করিলেন। ভঙ্গকুলীনগণ কিন্তু তাহাদের মধ্যে মেল পদ্ধতি বজায় রাখিতে বেশীদিন সক্ষম হন নাই। তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র বংশজ ও ভঙ্গকুলীন এই দুই শ্রেণী রহিয়া গেল। মেলের গোলমাল তাহারা ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় স্বভাব কুলীনও শ্রোত্রীয় একদল এবং বংশজ ও ভঙ্গকুলীন আর একদল হইয়া এমন রেষারিষি করিতে লাগিলেন যে, বৈবাহিক আদান প্রদান তো দূরের কথা এমন কি সামাজিক কার্য্যে তাহাদের মধ্যে পংক্তি ভোজন পর্য্যন্ত উঠিয়া গেল, কিন্তু দাবা অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি হইলে স্বভাব কুলীনগণ বংশজ ও ভঙ্গকুলীনদের বাটীতে ভোজন করিতে আপত্তি করিতেন না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্বভাব কুলীন ও শ্রোত্রীয়গণ মধ্যে যিনি বংশজ সংস্পর্শ করিতেন, অর্থাৎ বংশজের সহিত যিনি আদান কিম্বা প্রদান করিতেন তিনি তৎক্ষনাৎ বংশজ হইয়া যাইতেন। কিছুকাল পরে এই নিয়ম বদলাইয়া গিয়া শ্রোত্রীয়েরা রেহাই পাইয়া গেলেন কারণ তাহারা পুত্র কন্যা যেখানে ইচ্ছা আদান প্রদান করুন না কেন তাহাদেব আর বংশজ হইতে হইত না। শ্রোত্রীয়েরা এক কন্যা কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করিতেন, অপর কন্যা কোনও শ্রোত্রীয় কিম্বা বংশজের নিকট বিক্রয় করিতেন, তথাপি তাহাতে কোনও দোষ হইত না। কিন্তু স্বভাব কুলীনদিগের মধ্যে পূর্ব্ব নিয়মই রহিয়া গেল। ইহাদ্বারা শ্রোত্রীয়গণের কন্যা বিবাহ সহজ হইয়া গেল বটে,

কিন্তু তাহাদের নিকট বংশজ ও ভঙ্গকুলীনগণ কন্যা বিবাহ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কাজেকাজেই শ্রোত্রীয়দের বিবাহের জন্য পাত্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়া

কুলীন, শ্রোত্রীয়, বংশজ ছাড়াও সপ্তশতী নামে আর একদল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করিতেন। তাহারা কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এই দেশে প্রকৃত বাঙালী ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কুলীনগণ মধ্যে অনেকে অর্থলোভে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়াছেন তাহাতে কেবলমাত্র কুলে দোষ আসিয়াছে, কিন্তু কুল ভঙ্গ হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ বংশজ কিম্বা ভঙ্গ কুলীনদের ন্যায় সমাজে ততটা হীন ছিলেন না। কুলীনদের মধ্যে যে "কাশ্যপ কাঞ্চারী" "মুল্লুকজুরী" "পিতাড়ী" ইত্যাদি থাক্ হইয়াছে তাহার কারণ ঐ নামীয় সপ্তশতী ঘরে বিবাহ। সাতক্ষীরার, ধলার জমিদার বংশ, শিবপুরের সাগাই ভট্টাচার্য্য বংশ খানাকুলের কেঁায়াড়ীবংশ ইত্যাদি সপ্তশতী ব্রাহ্মণ দলভুক্ত।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কুলীনগণ শ্রোত্রীয় এবং কুলীন উভয় বংশের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন। এই সুবিধা পাইয়া তাহারা একশত দেড়শত বিবাহ করিতেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাহাদের বহু বিবাহ উপার্জ্জনের পথ এবং ব্যবসার মধ্যে চলিয়া গেল। ফলে এই হইল যে সমাজ মধ্যে বহু ঘৃণিত দুর্নীতি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন এই কৌলীন্যের মোহ এতদূর ছিল যে শ্রোত্রীয় এবং কুলীনগণ নানাবিধ কুকাণ্ড উপেক্ষা করিয়া কুলীন নামের মর্য্যাদা করিতে লাগিলেন এবং ঘটকগণ এই কার্য্যের সহায়কারী থাকিয়া সমাজের উপর বিশেষ প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। এই ঘটকদের এতদূর ক্ষমতা ছিল যে তাহারা ইচ্ছা করিলে যে কোনও উচ্চপদস্থ কুলীনকে এক কথায় নিকৃষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিতে পারিতেন। অর্থের দ্বারা এই ঘটক সম্প্রদায়কে বশীভূত করিয়া বহু কুলীন ও শ্রোত্রীয় সাধারণ সামাজিক অবস্থা হইতে অতি উচ্চপদ এবং সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই ঘটক সম্প্রদায়ের চাটুকারীতার দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে দেখা যাইবে।

কুলীনঃ দেবতা স্বয়ং
শ্রোত্রীয় সুমেরু স্তথা।
ঘটকাঃ কুল মধ্যস্তা
অথবা স্তুতি পাঠকাঃ॥

অধুনা ঘটক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বিলুপ্তের সঙ্গে তাহারাও লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কৌলীন্য প্রথার প্রভাব পূর্ব্বেকার ন্যায় প্রখর না থাকিলেও প্রায় পূর্ব্বের মতই আছে। কোলীন্য মর্য্যাদার সূক্ষ্ম বিচার উঠিয়া গিয়া এখন উপাধিও নামে ন্যস্ত হইয়াছে। অধুনা নামের পশ্চাতে যে কেহ মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি বসাইবেন তিনিই কুলীন বলিয়া আখ্যাত হইবেন। এই উপাধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কেবল মাত্র উপাধি পতাকা উড্ডীন রাখিয়া তাহাদের কৌলীন্য বজায় রাখিতেছেন। এই তথাকথিত কুলীনগণ সমমেলে সমঘরে আদান প্রদান দ্বারা কুলকার্য্য করিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষা করা যদিও বর্জ্জন করিয়াছেন তথাপি উপাধির দোহাই দিয়া উপাধি বিহীন ব্যক্তির গৃহে কন্যা দান করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। অবস্থার তাড়নে ইহার বিপর্য্যয় করিতে কেহ কেহ বাধ্য হওয়াতে লোকলোচনে নিজেদের উদার এবং সমাজ সংস্কারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। কৌলীন্যের অবস্থা এখন মরা গাঙের ঢেউয়ের মতন হইলেও এই কুপ্রথা বঙ্গে এমন সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে ইহা অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বিনস্ট না হইলে ইহা অন্য কোনও প্রকারে বিলুপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রথা জাতীয় জীবনের পক্ষে এত অনিষ্টকর যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক বহ্নি জ্বালিয়া রাখিয়াছে। যাহা বঙ্গদেশেব অন্য সাম্প্রদায়িক অনৈক্যতা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সামাজিক ভেদ-বহ্নি অচিরে নির্ব্বাপিত না হইলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ কালে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে।

নদীয়ার সাহিত্য সাধনা

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

বাংলার সাহিত্য খুব বেশীদিনের প্রাচীন নহে। আনুমানিক মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য প্রেরণার যে ক্ষীণ স্রোতধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনি উৎসারিত হইয়াছিল, তাহাই পরে নব নব ভাবের ও সাধনার সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ বাহিয়া আজ উত্তাল তরঙ্গায়িতরূপে মহামানবের সাগরকূলে উপনীত হইয়াছে। ইহা বাংলা সাহিত্যের গৌরব, বাংলার গৌরব এবং আরও একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে এই গৌরবমাল্য অর্জ্জনের সমধিক কৃতিত্ব নদীয়ারই প্রাপ্য। সূচনা হইতে সুরু করিয়া যুগে যুগে এই নদীয়াই ভগীরথের মত সাহিত্যধারাকে বিচিত্র পথে পরিচালিত করিয়া আনিয়াছে বিশেষজ্ঞগণের তাহা অবিদিত নাই।

সাহিত্য পুরাবৃত্তের সূচনায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা জাতীয় যে কতকগুলি পদাবলীর উল্লেখ করা হইয়া থাকে, সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আজ জানিবার উপায় নাই। এই একান্ত দুরূহ ও অপ্রচলিত ভাষার পদ কয়টি ও বড়ু চণ্ডী-দাসের ভণিতা সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের কতকগুলি অমার্জ্জিত ও দুর্ব্বোধ্য পদাবলীর কথা ছাড়িয়া দিলে নদীয়ার কবি কৃত্তিবাসকেই বঙ্গ সাহিত্যের আদি কবি বলিতে হইবে। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ পদাবলী কয়েকটুকরা রচিত হইয়া থাকিলেও বাংলা সাহিত্যের তখনও নীহারিকা অবস্থা।

চণ্ডীদাসের যে সকল অনুপম পদলহরী আজ আমাদের কাণের ভিতর পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে, বলাই বাহুল্য পণ্ডিতবর্গের মতে সে গুলি অনেক পরবর্ত্তী কালের রচনা এবং মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সুললিত কণ্ঠ বংলার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইলেও তাহা বাংলার নিজস্ব নহে। এই হিসাবে বঙ্গভাষার আদি সাহিত্যিক বলিয়া নদীয়ার কবি কৃত্তিবাসের দাবীই যে সমধিক সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। আনুমানিক ১৪৩২ খৃঃ শান্তিপুরের সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামে সুবিখ্যাত ফুলের মুখুটি ব্রাহ্মণ বংশে কবি কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কবির বড় আদরের গ্রামরত্ন ফুলিয়া কাল-চক্রে আজ জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র এবং একটি দোলমঞ্চ ছাড়া কবির কোন

নিদর্শনই সেখানে পাওয়া যায় না। এই ফুলিয়া গ্রাম বাংলার একটি গৌরবময় পীঠস্থান। শুধু মাত্র কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান বলিয়া নহে, ইহারই অনতিদূরে মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ যবন হরিদাসের সাধনপীঠ এবং এইখানেই বসিয়াই দেবীবর ঠাকুর মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ফুলিয়া মেল বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক কবির স্বলিখিত আত্মবিবরণী জ্ঞাপক একটী কবিতা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই আদি কবি সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ জানিতে পারা যাইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষাদি শেষ করিয়া বিষয়নিস্পৃহ কবি যে দিন পঞ্চগৌড়াধিপতির রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তুচ্ছ রাজদণ্ড সম্মান অপেক্ষা আপনার কবিত্ব গৌরবে আপনাকে অধিক গৌরবান্বিত মনে করিয়া বলিয়াছেন—

কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

সেইদিন বঙ্গভাষার এক স্মরণীয় শুভদিন। গৌড়েশ্বরের উৎসাহে রামায়ণ রচনার প্রেরণা লাভ করিয়া সেইদিন তিনি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। মহাকবি বাল্মীকির অমর লেখনীপ্রসূত রামায়ণ মহাকাব্যের অন্তরে রসের যে অমৃত উৎস লুক্কায়িত ছিল নদীয়ার কবি কৃত্তিবাস অঞ্জলি পুরিয়া সেই রস বাংলার ঘরে ঘরে পরিবেশন করিয়া দিয়া বঙ্গ সাহিত্যের শুভ উদ্বোধন করিলেন।

কৃত্তিবাসের পর কিছুকাল ধরিয়া মুসলমান রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় খান কয়েক রামায়ণ মহাভারতের খণ্ডানুবাদ ও চণ্ডী শীতলা, মনসার বিবিধ ছড়া পাঁচালী ব্রত কথা রচনায় বাংলার সমগ্র কবিপ্রতিভা নিয়োজিত হইল। এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনই এমন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু অকস্মাৎ দেবতার আশীর্ব্বাদে গৈরিক বিপ্লবের মত নদীয়ার বৈষ্ণব সাধকগণের অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদনার বিপুল প্রবাহ বঙ্গসাহিত্যের অনুর্ব্বর ভূমিকে পত্রপুষ্পে সুশোভিত করিয়া প্রবাহিত হইল ১৪৮৫ খৃঃ শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সেই লোকান্তর জীবন কাহিনীর পর্য্যালোচনা অবশ্য বর্ত্তমানে অপ্রাসঙ্গিক ; কিন্তু নদীয়ার এই প্রেমিক পাগলের করুণাভিষিক্ত নয়নধারা বাংলার সাহিত্যকে কি যে মোহন স্পর্শ

দিয়া অকস্মাৎ এমন প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙ্গলার আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতে এমন যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। বর্ষার নবমেঘধারায় সঞ্জীবিত হইয়া শুষ্ক বনভূমি যেমন দেখিতে দেখিতে পত্রে পুষ্পে শ্যামায়মান হইয়া উঠে, তেমনি মহাপ্রভুর প্রেমধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্য হইতে অজস্র কবির উদ্ভব হইতে লাগিল। বৈষ্ণবযুগেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত ইহার দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তেরা তাঁহারি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অবজ্ঞাত মাতৃভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মের মর্ম্মকথা জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজসভার রাজানুগ্রহপুষ্ট সাহিত্য নদেরচাঁদের পুণ্য পরশ লাভ করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল কবিবৃন্দের মধ্যে কেহবা নদীয়াতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহবা নদীয়ায় আজীবন বসবাস করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, কেহবা নদীয়াকে ভালবাসিয়া, নদীয়ার প্রেমে পাগল হইয়া, নদীয়া-বিনোদের গুণকাহিনী গাহিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণবকবি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, নবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমধারায় অভিষিক্ত হইয়াই তাঁহাদের কবিপ্রতিভার উন্মেষ, নদীয়াকে ভালবাসিয়াই তাঁহারা কবি। এই হিসাবে সকল বৈষ্ণব কবির উপরেই যে নদীয়ার দাবী আছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নদীয়ার নিজস্ব বৈষ্ণবকবি বলিতে সর্ব্বপ্রথমেই বৃন্দাবনদাসের নাম মনে পড়ে। বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণবপণ্ডিত সমাজে ব্যাসবতার বলিয়া সম্মানিত ও তাঁহার চৈতন্য ভাগবত একখানি বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বৈষ্ণবগণের নিকটে পরম সমাদৃত।

এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপের জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ, স্বরূপদামোদর ; কাঁচড়াপাড়ার সেন শিবানন্দ, কবি কর্ণপুর ; কুলিয়া গ্রামের বংশীবদন, প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণের কথা আর বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

মহাপ্রভুর শ্যালক মাধবাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নামে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের একখানি অতি প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এই জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের অধিবাসী। বহুবিধ উৎকৃষ্ট ও সুবিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ ছাড়াও ইনি ক্ষণদা গীত চিন্তামণি নামে একখানি বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত যতগুলি

প্রাচীন পদ-সংগ্রহের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে এইখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম।

এইভাবে নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম সাধনাই বহুকাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়াছে। তৎসহ সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বহুতর মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি রচিত হইয়া সাহিত্য যখন ক্রমশঃই বৈচিত্র্যহীন ও মৌলিকতা বর্জ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে নদীয়ার রাজকবি ভারতচন্দ্রের অনুপম রসকাব্য অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রকাশিত হইল। অষ্টাদশ শতকে বাংলার জাতীয় জীবনে সর্ব্বদিক দিয়াই বিপর্য্যয়। মুসলমান নবাব ও ইংরাজ বণিকদিগের দুরভিসন্ধিতে বাংলার ভাগ্য-গগন ক্রমশঃই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘন কৃষ্ণমেঘজালে আবৃত হইয়া আসিতেছিল। এই যুগসন্ধিক্ষণে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বিজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। কূটরাজনীতি চক্রান্তে ও প্রভাব প্রতিপত্তিতেও তৎকালিক দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। উল্লিখিত দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক ঝটিকা সত্ত্বেও এই মহিমান্বিত রাজচক্রবর্ত্তীর ছত্রচ্ছায়ার অন্তরাল হইতেই অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় ভারতচন্দ্র ও রাম-প্রসাদের অনুপম কণ্ঠ ধ্বনিত হইতে পারিয়াছিল। ইঁহাদের জন্মস্থান নদীয়ায় না হইলেও, নদীয়ায় আসিয়া, ও নদীয়া রাজের কৃপারশ্মি লাভ করিয়া যে তাঁহাদের কাব্যপ্রতিভার অমলকমল সহস্রদলে বিকশিত হইয়া উঠে তাহা কাহারো অজ্ঞাত নাই।

বিদ্যাসুন্দর এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম রোমাণ্টিক কাব্য। ধর্ম্মগাথা বা দেবস্তুতিমুখর উপাখ্যান প্লাবিত সাহিত্যের মধ্য হইতে নরনারীর লৌকিক প্রণয় কাহিণী মূলক রোমান্সের প্রথম উদ্ভব তৎকালিক রসজ্ঞচিত্তে কতখানি চমক লাগাইয়া দিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ভাব ও ভাষার পরিপক্কতার, কিম্বা ছন্দ ও অলঙ্কারের পারিপাট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতচন্দ্রকে প্রাক্ বৃটিশ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না বলিয়া উপায় নাই। শুধু ছন্দ ঝঙ্কারের কলগুঞ্জনে নহে, চরিত্রচিত্রাঙ্কনের তীক্ষ্ণ মনীষা ও অন্তঃদৃষ্টির প্রাখর্য্যে ভারতচন্দ্র একেবারেই অপ্রতিদ্বন্দী।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেই সাধক কবি রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা তাঁহার অপূর্ব্ব প্রসাদী পদাবলীই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতেছে। মাতৃভক্ত সাধক কবি শ্যামামায়ের পূজায়

আপনাকে কায়মনবাক্যে উৎসর্গ করিয়া যে ভাবে স্বতোৎসারিত মাতৃনাম গানে আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহারই অপূর্ব্ব ভাবমাধুরী পরবর্ত্তী-কালের বহু ভক্ত কবি হৃদয়ে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণনগর রাজ-বংশের নাম এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ স্বয়ং অনেকগুলি বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতের পদ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ বংশে মহারাজ শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, নরচন্দ্র, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উৎকৃষ্ট মাতৃ পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার কিছু পরে আর একজন সুবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি নদীয়ায় আবির্ভূত হ'ন।—ইনি কৃষ্ণকমল গোস্বামী। কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃঃ নদীয়ার অন্তর্গত ভাজন-ঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার 'রাই উন্মাদিনী', 'স্বপ্নবিলাস,' 'সুবল সংবাদ' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ করুণরসাত্মক বৈষ্ণবপালাকাব্য আছে। সঙ্গীত রচনাতেও ইঁহার কবিপ্রতিভা পূর্ব্বতন যে কোন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবির সহিত তুলিত হইতে পারে বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

এইখানেই প্রাগ্‌বৃটিশ যুগের প্রাচীন সাহিত্যের অবসান বলিতে হয়। তারপর বর্ত্তমান ইংরাজীযুগের প্রাক্কালে যে সকল মনীষি আপনার প্রতিভা বলে নূতন ভাবে, নূতন ধারায়, আপনাদের নূতন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের লালনপালন করিয়াছিলেন, নদীয়ার কবি ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় তাঁহাদের অগ্রণী।

গুপ্তকবি ১৮১১ খৃঃ কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার সাহিত্যে কিছু না থাকিলেও ইঙ্গ সভ্যতার রুচি ও রীতির ছাপ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সংবাদপত্র পরিচালনায়, সাহিত্য সমালোচনায়, প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহে, নবীন সাহিত্যিকগণকে উৎসাহ প্রদানে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ যুগীয় বঙ্গ সাহিত্যের অগ্রদূতের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩১ খৃঃ ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই সংবাদ প্রভাকরই বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগকে আবাহন করিয়া আনিবার নিমন্ত্রণ পত্র।

গুপ্ত কবির উপযুক্ত কবিশিষ্য স্বনামধন্য দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও নদীয়ার কবি। বাং ১২৩৬ সালে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। গুপ্ত কবির বাস্তবপ্রিয়তা ও পরিহাস রসিকতা তাঁহার বালক ভক্ত দীনবন্ধুর কল্পনাকে হয়ত অনেকখানি পরিচালিত করিয়াছিল, তাই

কবির অধিকাংশ রচনাই নির্ম্মল হাস্যপরিহাসে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। যে চরিত্রে চিত্রাঙ্কনে তিনি হাস্যরসের রঙ্গে তুলিকা রাঙ্গাইয়াছেন সেই চিত্রই তাঁহার অনুপম হইয়াছে। নীলদর্পন দীনবন্ধুর প্রথম নাটক, এবং এই নাটকখানি হইতেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'নিলকর বিষধর-দংশন-কাতর' জন-সাধারণের আকুল মর্ম্মবেদনা এই নীলদর্পণের ছত্রে ছত্রে যেন রুদ্ধ হইয়া আছে।

অতঃপর নদীয়ার সুবর্ণপুর গ্রাম নিবাসী যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশে যে সকল দেশপ্রেমিক আপনাপন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্ব্বস্বত্যাগের মহানব্রত গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, যোগেন্দ্র নাথ তাঁহাদের সেই সকল বীরত্ব গৌরব মণ্ডিত জীবনীকথা ও নানাজাতির মুক্তির ইতিহাস শুনাইয়া নিরীহ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নব আশার সঞ্চার করিয়া দেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে খৃষ্টীয় মিশনারী ও ইংরাজ রাজ পুরুষগণ অমানুষিক যত্ন, অধ্যবসায় ও ভালবাসা সহকারে যে সময়ে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও লালন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সময়েও নদীয়ার বহু ইংরাজী শিক্ষিত নবীন সাহিত্যিক এই মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিল। পাদ্রী উইলিয়ম কেরী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের সাহায্যকারী হিসাবে নদীয়ার জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। চারি পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন ভাষায় লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশিদাসী মহাভারত যে আজিও বাংলার ঘরে ঘরে পরম সমাদরে পঠিত হইতেছে তাহা যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যুগোপযোগী সংস্কৃতির ফলেই তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইবার বিখ্যাত কবি ও লেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম করিতে হয়। মদনমোহন ১৮১৫ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদে মূলের ছন্দ রস ও অনুপ্রাসাদি ঝঙ্কার অবিকৃত রাখিয়া তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব! ভারতচন্দ্র ছাড়া কেহই এমন সুন্দর সুমধুর ও অলঙ্কারবহুল ছন্দ রচনা করিতে পারেন নাই বলা যাইতে পারে।

কুমারখালীর সাধক কবি হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল হরিনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'বিজয় বসন্ত' প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া ফিকির চাঁদ ফকির ভনিতা সম্বলিত তাঁহার অপরূপ সাধন সঙ্গীতাবলীর কথা আশা করি কাহারও অজ্ঞাত নাই। নদীয়ার স্বনামধন্য কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম এতক্ষণ উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার উদ্দীপনাময় স্বদেশী সঙ্গীতগুলি

সমগ্র বাংলার বুকে দেশাত্মবোধের চির জাগরূক অভয় মাত্র। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কবি ও নাট্যকার হিসাবে বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের আসন আজ সুনির্দ্দিষ্ট এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁহার হাসিরগান ও রস রচনা, আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর কবিরত্ন, লোহারাম শিরোরত্ন, রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী প্রভৃতি নদীয়ার সুসন্তানগণের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল। পরবর্ত্তীকালের স্বনামধন্য সাহিত্যরথীবর্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ঔপন্যাসিক জলধর সেন, রহস্য লহরীর দীনেন্দ্রকুমার রায়, দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক জগদানন্দ রায়, গিরীন্দ্র শেখর বসু, ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রভৃতি লেখকগণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিবার কোনই আবশ্যক নাই। বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসরসিক রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামও নদীয়া জেলার লোক। এমন কি রবীন্দ্রনাথের উপরেও নদীয়ার দাবী নগণ্য নহে। বিশ্বকবিকে অন্তরঙ্গতার সঙ্কীর্ণ-পটভূমি স্থাপন করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমেই শিলাইদহের কবি বলিতে হয়। শিলাইদহের দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র, নির্জ্জন নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ প্রান্তর, ছায়াঘন পল্লীকুঞ্জ ও অনাড়ম্বর সরল গ্রাম্যজীবন যাত্রা রবীন্দ্রনাথের বিমুগ্ধ কবিচিত্তে যে কী অপরিসীম সৌন্দর্য্য ও বিচিত্ররস-ব্যঞ্জনা জাগ্রত করিয়াছিল তাহা তখনকার গল্পে, কবিতায়, ও চিঠিপত্রে আমরা খানিকটা আভাষ পাই। এই সময়কার অধিকাংশ রচনাতেই প্রায় এই নদীয়ার শান্ত পল্লীজীবনের ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির ছায়া রৌদ্রালোকিত শ্যামল আবেষ্টনীর অভিনব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করিবার আবেগ পরিস্ফুট।

শিলাইদহেই কবির সাধনার সূচনা। দেশকে নূতন করিয়া ভাবাইয়া, মাতাইয়া, পাগল করিয়া দিবার প্রবলতর উৎসাহে একই সাথে সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, দর্শন রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বদিকেই গদ্য পদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া কবি যে কী বিরাট অসাধ্য সাধন করিরাছিলেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

এম্নিভাবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নদীয়ার আকাশ বাতাস পল্লীপ্রান্তর কবি-চিত্তের খোরাক জোগাইয়াছে, গ্রাম্য জীবনের বিচিত্র রসনাভূতি গানে গল্পে গাথায় অজস্রধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান সম্মেলনের মাননীয় সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের উপরেও নদীয়ার দাবী কম নহে, ছাত্র জীবন হইতে সুরু করিয়া বহুকাল অবধি ইনি কৃষ্ণনগরেই বসবাস করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাস করিলেও অদ্যাবধি নদীয়ার সহিত তাঁহার সূত্র ছিন্ন হয় নাই। প্রমথ বাবুর অভিনব ভাষা ও লিখনভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করা বর্ত্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা আমরা স্মরণ রাখিব যে বাংলা সাহিত্য রচনায় কথ্যভাষা প্রচলনের জন্য যে সাহস ও কৃতিত্বের প্রয়োজন তাহা প্রায় সমস্তই চৌধুরী মহাশয়ের প্রাপ্য এবং তাঁহার অসাধারণ বীরবলী রচনাধারাই বর্ত্তমানে সাহিত্যে অনুসৃত হইতেছে বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নদীয়ার যে সকল লোকোত্তর প্রতিভা প্রদীপ্ত মনীষী সাহিত্যিকগণের আপ্রাণ সাধনায় বাংলা সাহিত্য আজ এতখানি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের জনকয়েকের মাত্র নামোল্লেখ করিবার চেষ্টা করিলাম। ইহা ছাড়া আরও কত বিখ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যসেবী আপনাদের আন্তরিক সাধনায় বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নদীয়াতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের গঠন ও পুষ্টি। সুদূর অতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে বাংলা-সাহিত্যের স্রোতধারা যেখানেই মোড় ফিরিয়াছে সেইখানেই আমরা নদীয়ার কোন সাহিত্যরথীকে অগ্রদূতরূপে দেখিয়াছি। এবং আশা করি এম্নি করিয়া অনাগতকালের ঘনান্ধকারেও নদীয়াই তাহার প্রদীপ প্রতিভার মশাল ধরিয়া ভবিষ্যতের সাহিত্যকে নব নব অভিজ্ঞতার পথে পরিচালিত করিতে থাকিবে।

"নবদ্বীপের লেখক পঞ্জী"

শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ

বাংলার ইতিহাসে নবদ্বীপ একদিন যে সূর্য্য-কেতন উড়িয়েছিল, তার গৌরবের উচ্চতম দেউল চূড়ায়—বোধকরি, বিশ্বের ইতিহাসে এমনটি আর কোন দেশ পারেনি। বাঙালীর সামাজিক জীবন, নৈতিক জীবন, রাষ্ট্রগত জীবন, ধর্ম্মজীবন —সব কিছুর দিক্ দিয়াই একদিন এই দেশই জগতে রসমঙ্কে আদর্শ স্থাপন করেছিল। ন্যায়, তন্ত্র, স্মৃতি এগুলি যেমন নবদ্বীপের বিশেষ দান, বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্যও তেমনি ইহার অপূর্ব্ব পরিবেশন। বর্ত্তমান জগতে আজ যে বাঙলার মধুময মূর্ত্তি বিশ্বের সাহিত্য ভাণ্ডারে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর আসন দখল করেছে —বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্য যে ইহার মূলে নাই—এ-কথা ভুল করেও কেহ বল্‌তে পারেন না।

ওপারের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আর এপারের বর্ত্তমান বাঙলা, এর মধ্যে যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই—উভয় কূলকে সংযুক্ত করে পবিবর্দ্ধিত করেছে— কলহমুখ সাহিত্যের ভাষা ও ভাবের দ্যোতনা। সংস্কৃতের সেই পারে ছিল জটিলতম বিচার, তীক্ষ্ণ-ধী-বাক্‌নৈপুণ্য, ব্যাকরণের ঘনঘটা,—মোট কথা, সব কিছুতেই ভাষার প্রাধান্য; কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ব্বেকার সবকিছু বিশেষণ সংযুক্ত থাকলেও—সে সহজ, সে প্রাঞ্জল, অথচ তা'র মধ্যে ভাবের প্রাধান্য।

কলহমুখ কথাটা হচ্চে বাদাবাদি লড়াই, একজন যুক্তি বিচারে যা সিদ্ধান্ত করেছে, অন্যে তা'কে খণ্ডণ করতে তর্কের পর তর্কের অবতারণা করেছে, যুক্তি দিয়েছে, সিদ্ধান্ত করেছে—কিন্তু এখানেই আবার সব শেষ নয় খণ্ডণ-মণ্ডণও চলেছে, ন্যায়ের ন্যায্য বিচার ধরে। বর্ত্তমান তরজা, কবি প্রভৃতির লড়াই এই পন্থারই আভাষ আনে। ভাষার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, অঙ্গসংস্কার এই পন্থাতেই ক্রমোন্নতি লাভ করেছে; বিচিত্র আবহাওয়ার সংস্পর্শে সংস্কৃত সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে।

নবদ্বীপকে যদি অতীতের বুক হ'তে বর্ত্তমানের আলেখ্যপটে টেনে এনে প্রতিবিম্বিত করি, দেখি—এর তিনটি জ্বলন্ত দিক্। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাষায় যাকে বলে—গৌড়ীয় যুগ ও কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ আর বর্ত্তমান যুগ।

এই তিনটি যুগের গর্ভাবাসে যাঁহারা এদেশে জন্মেছিলেন, পরিবর্দ্ধিত হয়েছিলেন, প্রতিপালিত হয়েছিলেন—বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহাদেরই 'নাম-পঞ্জী' প্রণয়ন করতে প্রয়াসী।

গৌড়ীয় যুগ

অর্থাৎ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আমল, তৎসমসাময়িক কালে, কয়েক বৎসর আগে ও কয়েক বৎসর পরের কথা। শ্রীশ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি ফাল্গুনি পূর্ণিমা ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফণিভূষণ দত্ত মহাশয় কৃত শ্রীচৈতন্য জাতক দ্রষ্টব্য।

এই সময়ের যাঁ'রা লেখক, তাঁ'দের নামের তালিকা করতে হ'লে, প্রথমতঃ ঐ সময়টিকে লেখকগণের লেখ-অনুসারে বিভাগ করতে হয়, ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র, ব্যাকরণ—ইত্যাদি ক্রমে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই অনুসরণ করছি।

ন্যায় শাস্ত্রে - ইঁহাদের নাম পাই—

(১) মহেশ্বর বিশারদ, (২) তৎপুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম, যিনি মিথিলা হ'তে শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে নবদ্বীপে প্রাচীন ন্যায় অর্থাৎ গঙ্গোপাধ্যায় কৃত চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ লিপিবদ্ধ করে' 'সার্ব্বভৌম নিরুক্তি', নামে তার টীকা প্রণয়ন করে ছাত্র শিক্ষা দেন। (৩) তাঁহার কৃতিছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি, যিনি নব্য ন্যায়ের প্রণেতা, যিনি নবদ্বীপকে সংস্কৃত পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলেছিলেন। (৪) 'হরিদাসী টীকা'কার—হরিদাস ন্যায়া-লঙ্কার। (৫) ন্যায় সিদ্ধান্ত মঞ্জরী প্রণেতা জানকী নাথ তর্কচূড়ামণি। (৬) মাথুরী টীকাকার—মথুরা নাথ তর্কবাগীশ। (৭) তর্কদীপিকা-প্রকাশ প্রণেতা—রামরুদ্র সার্ব্বভৌম। (৮) ভবানন্দী টীকাকার—ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। (৯) রৌদ্রী টীকাকার–রামরুদ্র তর্কবাগীশ। (১০) 'অদ্বৈত মকরন্দ' নামক (বেদান্তের) টীকাকার দ্বিতীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম। (১১) 'ধাতুদীপিকা' টীকাকার—দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ। (১২) হরিরাম তর্কবাগীশ—'অনুমিতি বিচারাদি গ্রন্থকার ছিলেন।

স্মৃতি শাস্ত্রে ইঁহাদের নাম পাই।

(১) শ্রীকর আচার্য্য। (২) তৎপুত্র শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি—'দায়-তত্ত্বার্ণব' প্রণেতা। (৩) রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য—'অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব' প্রণেতা, যিনি চিরাচরিত স্মৃতির সংস্কারক। আজো যাঁ'র স্মৃতি সমগ্র বাঙলায় প্রাধান্য লাভ করে চলেছে। (৪) 'সময় প্রদীপকার'—হরিহরাচার্য্য। (৫) সিদ্ধান্ত কুমুদ চন্দ্রিকাকার রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। ইঁহারা ছিলেন।

আগম বা তন্ত্র শাস্ত্রে—ইঁহাদের নাম আছে।

(১) শ্যামামূর্ত্তির প্রকাশ তথা পূজাপদ্ধতির আবিষ্কারক—তন্ত্রশাস্ত্রকার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। মূর্ত্তি বিশেষ করে মৃণ্ময়ী, পূজার ইহাই প্রথম সূচনা, ইতিপূর্ব্বে শুধু ঘটে বা যন্ত্রে পূজা চলিত। (২) তন্ত্র দীপিকা'কার—গোপাল আগমবাগীশ—ছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে—ইঁহাদের নাম দেখি—

(১) 'করচা'কার মুরারী গুপ্ত। (২) করচাকার অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিবাস, গদাধর, নিত্যানন্দ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ নাম করা অহেতুক মনে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে সমগ্র পদাবলীকারগণ অল্প-বিস্তর এই দেশেই থাকিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। 'গৌরচন্দ্রিকা'তাহাদের এই রচনার মূল। আজ বর্ত্তমানে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম, যে পদাবলী সাহিত্য, যে রসশাস্ত্র বাঙলা ভাষার দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপন করে, বাণীর বেদিকা মূলে মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছে—এই নবদ্বীপ তার প্রকাশভূমি, আর মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি করচাকারই সেই পথ প্রদর্শক।

অতঃপর :—

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ।

অর্থাৎ নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আসন, তৎসমসাময়িক কাল। এই সময়ের যাঁরা লেখক তাঁদের নামের তালিকায় পূর্ব্বানুরূপ ক্রমে গ্রথিত হইল।

ন্যায় শাস্ত্রে—

(১) 'দানকাণ্ড' প্রণেতা কাশীশ্বর বিদ্যানিবাস। (২) রৌদ্রীটীকাকার—রুদ্র নাথ ন্যায় বাচস্পতি। (৩) ভাষাপরিচ্ছেদকার—বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন। (৪) শব্দশক্তিপ্রকাশিকা প্রণেতা জগদীশ তর্কালঙ্কার। (৫) শব্দশক্তিপ্রকাশিকার 'সুবোধিনী' টীকাকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। (৬) গদাধরী টীকাকার—গদাধর শিরোমণি। (৭) 'ন্যায়রহস্য' প্রণেতা গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ। (৮) গূঢ়ার্থতত্ত্ব দীপিকা'কার—রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার। (৯) ভাবদীপিকাকার—শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার। (১০) আলোক বিবেককার—জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন। (১১) শক্তিবাদ গ্রন্থের টীকাকার—জয়রাম তর্কালঙ্কার। (১২) মুক্তিবাদের টীকাকার—শিবরাম বাচস্পতি। প্রভৃতি ছিলেন।

স্মৃতি শাস্ত্রে

(১) স্মৃতিপ্রদীপকার চন্দ্রশেখর বাচস্পতি। (২) দায়ক্রম, সাহিত্য বিচার প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ছিলেন। (৩) পুরাণসার গ্রন্থ প্রণেতা মহারাজ রুদ্র। ছিলেন।

দূত-কাব্যে।

(১) ভ্রমরদূতকার—রুদ্রনাথ বাচস্পতি। (২) পদাঙ্কদূতকার—শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম। ছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে।

ন্যায় শাস্ত্রে—

(১) বুনোরাম নাথ। (২) ন্যায়রত্নাবলীকার-কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ। (৩) তিথিতত্ত্বপ্রণেতা শঙ্কর তর্কবাগীশ। (৪) সুবোধা টীকাকার—মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। (৫) গোলোক ন্যায়রত্নীয়ম্—প্রণেতা গোলোক নাথ ন্যায়রত্ন। (৬) সামান্যলক্ষণা ব্যাখ্যাকার- হরমোহন চূড়ামণি। (৭) ন্যায়তত্ত্ব প্রবোধিনীকার—হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। (৮) সটীক ন্যায়দর্শনের (বঙ্গানুবাদ) প্রণেতা সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম। (৯) মঃ মঃ কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদক ও কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতির টীকাকার। ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ইঁহার ছাত্র। (১০) মঃ মঃ আশুতোষ তর্কভূষণ কুসুমাঞ্জলীর সটীক বঙ্গানুবাদক। (১১) মঃ মঃ সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি, গীতাঞ্জলির সংস্কৃতানুবাদক। ৺সুধেন্দুকুমার দাস এম. এ, পিএইচ. ডি ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

স্মৃতি শাস্ত্রে।

(১) নির্ণয়াদি প্রণেতা গোপাল ন্যায় পঞ্চানন। (২) Hindu Law সঙ্কলনকারী বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন। (৩) 'কৃত্যরাজ' প্রণেতা রামানন্দ বাচস্পতি। (৪) রণপদ্ধতি প্রণেতা লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ। (৫) স্মৃতিবিচার সার কৌমুদীকার শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। (৬) মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন—স্মৃতি সিদ্ধান্ত প্রণেতা। ইঁহারই ছাত্র মঃ মঃ শিতিকণ্ঠবাচস্পতি। (৭) মঃ মঃ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি- অলঙ্কার দর্শন, ভারতের দণ্ডনীতি, প্রণেতা। (৮) 'সৎকাব্যকল্পদ্রুম' প্রণেতা কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন। (৯) 'রাজসরণী' ব্যাখ্যাকার মঃ মঃ অজিত নাথ ন্যায়রত্ন। মঃ মঃ সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ইঁহারই ছাত্র।

দূতকাব্য।

(১) বাতদূত প্রণেতা মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন। (২) বকদূত প্রণেতা মঃ মঃ অজিত নাথ ন্যায়রত্ন। (৩) পাদপদূত প্রণেতা—গোপেন্দ্র বেদান্তরত্ন।

অন্যান্য গ্রন্থকার।

নাটক ঃ—

(১) রাই উন্মাদিনী প্রণেতা—কৃষ্ণকমল গোস্বামী। (২) তরণীসেন বধ

মতিলাল রায়। (৩) ধর্ম্মদাস রায় কৃত 'কবচসংহার'। (৪) মনোহরের মহা-মুক্তি প্রণেতা ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়। (৫) দাতাকর্ণ প্রণেতা নীলকণ্ঠ দত্ত। (৬) 'হেস্তনেস্ত' প্রণেতা দেবকণ্ঠ বাগচী। প্রভৃতি ছিলেন।

ইতিহাস :—

(৭) ভারতের ইতিহাস —তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত। (৮) মঃ মঃ ডাঃ সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ M. A. Ph. D.—A short History of the Mediaeval School of Indian Logic, লিখিয়া Griffith memorial Prize ও ভারতীয় ন্যায় শাস্ত্রের A History of Indian logic লিখিয়া Cal. University হইতে Ph. D. উপাধি পান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ইনি সম্পাদক ছিলেন। পালি ব্যাকরণ আদি ইঁহার অপর গ্রন্থ। (৯) ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার M. A Ph. D. ভাগবতরত্ন, চৈতন্য চরিতামৃতের গবেষণায় ইনি যুগান্তর আনিয়াছেন, History of Political thoughts from Ramananda & Dayananda—M. A. পরীক্ষার পাঠ্য প্রণেতা। বাঙলা ভাষায় ইনিই প্রথম ডাঃ উপাধি পান। (১০) জষ্টিস বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় M. A. DL.—The Problems of Aerial Law প্রণেতা।

বৈষ্ণব :—

(১১) কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ 'চৈতন্যচিন্তামৃত'কার। (১২) ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' প্রণেতা। (১৩) মঃ মঃ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রণীত 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়াঙ্ক প্রকাশ'। (১৪) শরচ্চন্দ্র গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ— 'গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিচয়' প্রণেতা। (১৫) শশিভূষণ ভাগবত রত্ন—চৈতন্যতত্ত্ব দীপিকাকার। (১৬) প্রেমদাস প্রণীত বংশী শিক্ষা। (১৭) অদ্বৈত প্রকাশ কার ঈশান নাগর। (১৮) মঃ মঃ ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন প্রণীত 'রাধা প্রেমতরঙ্গিণী'।

বিবিধ :—

(১৯) ক্যাথারীণের উপাখ্যান—দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য রায়বাহাদুর প্রণীত। (২০) বিজ্ঞানরহস্য—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। (২১) ব্যবস্থাকল্পদ্রুম প্রণেতা ডাঃ যোগীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত শিরোমণি। (২২) Manual of Translation প্রণেতা বিশেশ্বর চক্রবর্ত্তী। (২৩) হাঁসি—প্রণেতা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। (২৪) খেয়াল, উজ্জ্বলে মধুরে—প্রণেতা দোকণ্ঠ বাগচী।

ইহা ছাড়া :—

(২৫) মহারাজ শিবচন্দ্র কৃত 'দেবীস্তুতি'। (২৬) কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি

সরস্বতী কৃত 'অন্তর্ব্যাকরণ নাট্যপরিশিষ্ট'। (২৭) ভরত চন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল। (২৮) শিবনারায়ণ শিরোমণি কৃত সংস্কৃত কলিকা। (২৯) রাঘবাচার্য্য কৃত 'সিদ্ধান্তরহস্য'। (৩০) রামরুদ্র বিদ্যানিধি কৃত জ্যোতিঃ সাগর সার। (৩১) ভাগবতের বঙ্গানুবাদক মাধব মিশ্র। (৩২) নবদ্বীপ মহিমা প্রণেতা কান্তি চন্দ্র রাঢ়ী। (৩৩) গোবিন্দ দাসের করচা প্রকাশক জয় গোপাল গোস্বামী। (৩৪) গীতগোবিন্দ কার জয়দেব গোস্বামী। (৩৫) রামায়ণ কার কীর্ত্তিবাস ওঝা। (৩৬) পবনদূত প্রণেতা ধোয়ী। (৩৭) সদুক্তি কর্ণামৃত প্রণেতা শ্রীধরদাস। (৩৮) ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব প্রণেতা হলায়ুধ। (৩৯) স্মৃতি বিবেক প্রণেতা শূলপাণি। (৪০) আদিরসাত্মক নৈষধ চরিত কাব্য প্রণেতা শ্রীহর্ষ। (৪১) বেণীসংহার নাটক প্রণেতা ভট্টনারায়ণ। (৪২) আহ্নিক পদ্ধতি প্রণেতা ঈশান। (৪৩) পশুপতি পদ্ধতি প্রণেতা পশুপতি। (৪৪) অদ্ভুত সাগর প্রণেতা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেন। (৪৫) সাধের বীণা প্রণেতা—আনন্দ গোপাল গোস্বামী। (৪৬) বাঙ্গালীর ঠাকুর গৌরাঙ্গ প্রণেতা হরিদাস গোস্বামী (৪৭) কীর্ত্তনমঙ্গল প্রণেতা ভুবনেশ্বর শর্ম্মা, (৪৮) চৈতন্য জাতক প্রণেতা ফণিভূষণ দত্ত, (৪৯) "অনীতা' উপন্যাস লেখিকা প্রফুল্লময়ী দেবী।

প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

এই ভাবে সহজেই দেখা যে নবদ্বীপ বাঙলার মনীষাকে কত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। লেখক পঞ্জী হ'তে এ সত্য অস্বীকার করবার কোন হেতু নাই। নবদ্বীপ বাঙলার গুরু স্থানীয়—বাঙলার সভ্যতা গঠনে নবদ্বীপের অবদান সর্ব্বজন-স্বীকৃত।

ভারতের কয়লা সম্পদ ও তাহার সংরক্ষণ।

(Coal conservation in India.)

শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়—ভূতত্ত্বের অধ্যাপক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রত্নপ্রসূ ভারতের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের মধ্যে পাথুরে কয়লা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এবং এই কয়লার ব্যবসা ও সম্পদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকাতে অনেক পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ কিছুদিন হইতে মতামত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ঝরিয়া, রাণিগঞ্জ ও গিরিডি খনিগুলিতে কয়েকটী ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বিপত্তির কথা সকলেই অবগত আছেন ও এ বিষয়ে জনসাধারণের তথা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতের কয়লার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এবং কয়লা সম্পদ সংরক্ষণের বিষয় কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ভারতের ভূতত্ত্ববিদগণ বহুবৎসের পরিশ্রমের ফলে প্রমান করিয়াছেন যে ভারতে সর্ব্বসমেত ২০০ কোটী টন উচ্চশ্রেণীর কোক্ উৎপাদনকারী কয়লা Caking Coal ও ২৫০ কোটি টন উচ্চশ্রেণীর কোক্ অনুৎপাদনকারী কয়লা Non-caking Coal ভূগর্ভে মজুত আছে। এবং নিম্নশ্রেণীর কয়লা বহুল পরিমাণে (প্রায় ১৫০ কোটী টন) বিদ্যমান। কিন্তু বর্ত্তমানে যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা খনি দুর্ঘটনার ফলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে ও উচ্চশ্রেণীর কয়লা যে ভাবে অসঙ্গত উপায়ে ব্যবহৃত হইয়া অপচয় হইতেছে তাহাতে ভারতের উচ্চশ্রেণীর কয়লা সম্পদের পরমায়ু বা স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এবং এই অপচয়ের ফলে ভারতের লৌহ শিল্পের ভবিষ্যৎ বিস্তারের যে বিশেষ কোন আশা নাই তাহাও অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতের কয়লা সম্পদ যাহাতে বহুকাল স্থায়ী হইয়া ভারতবাসীর ও দেশের নানারূপ শিল্প ও কারখানার প্রভূত উপকার সাধন করিতে থাকে ইহাই সকল ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেশের কয়লা সম্পদের স্থায়িত্ব বা পরমায়ুর কথা চিন্তা করিতে থাকিলে সর্ব্বাগ্রে দুইটী বিষয় মনে উদিত হয় যথা ঃ—

১। কয়লা খনন কার্য্যপ্রণালী বিজ্ঞানসম্মত এবং বিশেষ পরিমার্জ্জিত হওয়া ও সমস্ত কয়লা সুচারুরূপে উত্তোলন করা।

এবং ২। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার সদ্ব্যবহার।

এই দুই প্রণালীর দ্বারাই ভারতের কয়লা সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ ও পূর্ণ পরমায়ু লাভ সম্ভবপর হইতে পারে।

১। উপরোক্ত প্রথম উপায়ে অর্থাৎ খনন কার্য্য (mining) সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে ভূগর্ভ হইতে অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ খনিতে যে উপায়ে কয়লা খনন ও উত্তোলন করা হয় তাহাতে অনেক পরিমাণে (প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী) কয়লা ভূগর্ভেই পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে ও ভবিষ্যতে দহন কার্য্যের সহায়তা করে ও ইহাই বর্ত্তমানে অনেক খনির অগ্নি-উৎপাতের অন্যতম কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯২৫ সালের ভারত সরকারের গঠিত Coal Grading Boardএর কার্য্য পরিচালনার ফলে অনেক শ্রেণীর কয়লাস্তর খনি হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করা অসম্ভব বিধায় চিরতরে ভূগর্ভে আবদ্ধ থাকিতেছে এবং পরিশেষে অগ্ন্যুৎ-পাদনের সৃষ্টি করিয়া বহু অনর্থ ও দুর্ঘটনার কারণ হইতেছে ও হইবে সন্দেহ নাই। বিগত কয় বৎসরের খনি দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত দুইটীই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয় :—

১। ভারত সরকারের Coal Grading Boardএর কার্য্যপ্রণালী।

২। বর্ত্তমান খনন প্রণালী।

এই দুই বিষয়ের আশু পরিবর্ত্তন না হইলে ভারতের কয়লা খনিগুলিতে এইরূপ দুর্ঘটনার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে এবং ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাদনের ফলে কয়লা সম্পদের অচির ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ভারত সরকার যে গত বৎসর একটী কমিটি (Burrows Committee) গঠিত করিয়া এ সকল প্রশ্নের যথাযথ উপায় নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিশেষ সময়োচিত হইয়াছে। তবে এই কমিটি যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভাল হইলেও তাহাতে অনেক ত্রুটীর সমাবেশ আছে। এ সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিলে এ জটিল সমস্যার সামাধানের চেষ্টা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কয়লা খনন ও উত্তোলন সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইয়াছেন যে কয়লা উত্তোলন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত শূন্য স্থান বালুকা বা ঐ জাতীয় পদার্থের দ্বারা ভরাট করা কর্ত্তব্য। ইহার ফলে কয়লার উদ্ধার অনেকাংশে সাধিত

হইবে (অন্ততঃ শতকরা ৭৫ ভাগ) এবং ভূগর্ভ নিহিত কয়লা সম্পদ বহুল পরিমাণে মানবের কর্ম্মে প্রযোজিত করা যাইবে। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই "বালুকা পূরণ" প্রণালী (Sand Stowing) বিজ্ঞানসম্মত ও বিশেষ ব্যয়-সাধ্য। এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে কয়লার দর অবশ্য কিছু বৃদ্ধি পাইবে তবে এই প্রণালী অবলম্বনে ভারতের কয়লা সম্পদ যে অধিকতর দিন স্থায়ী হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ প্রণালী অধুনা বাংলা দেশে কোন কোন খনিতে প্রচলিত আছে দেখা যায়। এই "বালুকা পূরণ" প্রথা সকল খনিতে প্রযোজিত করিতে হইলে তাহার খরচ বহন করিবার জন্য Burrows Committee প্রতি টন কয়লার উপর আট আনা ও প্রতি টন কোক্ কয়লার (hard Coke) উপর বার আনা শুল্ক বা কর ধার্য্য করিয়াছেন। এই পরিমাণ শুল্ক ধার্য্য করার বিপক্ষে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এ সম্বন্ধে রিপোর্টের কয়েক পৃষ্ঠা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে এই কর অতি বেশী মাত্রায় ধার্য্য করা হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় এক আনা কর ধার্য্য করিয়া কার্য্য করা উচিত কারণ কয়লা খননের প্রথমাবস্থায় বালুকাপূরণ আবশ্যক হয় না। কার্য্য সূচনার পর ভবিষ্যতে যদি করের হার বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে তাহা উন্নত হারে ধার্য্য করা যাইতে পারিবে। এরূপ মত প্রকাশের স্বপক্ষে আমার একটী বিশেষ প্রমাণ আছে। ভারত সরকারের ১৯২৫ সালের কয়লা কমিটির রিপোর্ট দাখিলের পর ১৯২৯ সালে Soft Coke Cess Committee প্রস্তাবিত প্রতি টন পোড়া কয়লার (Soft Coke) উপর দুই আনা কর ধার্য্য করা ভারত সরকার অনুমোদন করেন। এই কর ধার্য্য করার দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১। ভারতের নানা স্থানে গৃহস্থোপযোগী পোড়া কয়লার (Soft Coke) প্রচারকল্পে নানারূপ পন্থা ও বিজ্ঞাপন প্রণালীর উদ্ভাবন ও চেষ্টা।

২। পোড়া কয়লার (Soft Coke) প্রস্তুত প্রণালীর সম্যক পরিবর্ত্তন এবং এই চেষ্টার ফলে পোড়া কয়লার গুণাবলীর বিশেষ মাত্রায় উন্নতি করিয়া ইহা লোক সমাজের অধিকতর কার্য্যকরী করা।

ভারত সরকারের অনুমোদিত এই কর আদায়ের কার্য্য গত ১০ বৎসর যাবৎ সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। উপরের লিখিত প্রথম ব্যবস্থার জন্য প্রতি বৎসর অর্থের ব্যয় হয় কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থার প্রতি আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হয় নাই এবং গত দুই চার বৎসর হইতে যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে তাহার কোনও ফলাফল আজ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই এবং

অথবা পোড়া কয়লা বা কোক শিল্পের কোনও উন্নতি বা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গৃহস্থোপযোগী পোড়া কয়লা প্রথমে বৈজ্ঞানিক সম্মত প্রণালীতে উৎপাদন করিতে পারিলে তাহা সকলেই সাদরে গ্রহণ করিবে ও কিছু অধিক মূল্যেও খরিদ করিবে। এই ভাবে উচ্চ শ্রেণীর পোড়া কয়লা প্রস্তুত হইলে তাহার প্রচার কল্পে অর্থ ব্যয় করা সমীচীন হইবে এবং সে বিষয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টা ফলবতী হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। এযাবৎকাল গৃহস্থ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পোড়া বা কোক কয়লা প্রাপ্তির আশায় কর আদায় দিয়া আসিয়াছে কিন্তু সেই চিরন্তন ও অনুন্নত প্রথায় উৎপন্ন নিকৃষ্ট কোক কয়লা প্রচলিত হইতেছে ও আরও কতযুগ ধরিয়া হইবে তাহা কে বলিবে। এই প্রকার আলোচনার ফলে আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে ভারত সরকার কোক্ কয়লার (Soft Coke) উপর এই দুই আনা কর ধার্য্য করিয়া কোন মতেই সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। এবং যদি অনতিকাল মধ্যে কোক কয়লা প্রস্তুত প্রণালীর সম্যক পরিবর্ত্তন না হয় বা কোক কয়লা অধিকতর উৎকৃষ্টরূপে গৃহস্থের নিকট উপস্থাপিত করা না হয় তবে আমার মতে এই কর শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দিলে ভারত সরকার একটী মহৎ কার্য্য করিবেন। এই সকল কারণেই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে খনন প্রণালীতে Burrows Committeeএর অনুমোদিত "বালুকা পূরণ" (Sand Stowing) প্রথা প্রয়োগ করিবার কল্পনা যদি শীঘ্রই সত্যে পরিণত না হয় তবে এরূপ কর ধার্য্য না করাই বাঞ্ছনীয় এবং "বালুকাপূরণ" প্রণালী আইন বদ্ধ হওয়ার সময় এ বিষয়ে উপযুক্ত সর্ত্তের উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের বিশেষ মনোযোগ আমি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে আজ প্রায় ১৯ বৎসর পূর্ব্বে ভারত সরকার গঠিত Treharne Rees Committee কয়লা খনন কার্য্যে "বালুকাপূরণ" প্রণালীর ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহা সত্ত্বেও সরকার যে এই প্রথার প্রচলন বা প্রবর্ত্তন কেন বিধিবদ্ধ করেন নাই তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। সে সময় যদি এরূপ কার্য্য প্রণালীর সূচনা হইত তাহা হইলে আজ বাংলা ও বিহারের কয়লা খনিগুলিতে বোধ হয় এই প্রকার ভয়াবহ দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইত না।

সম্প্রতি Burrows Committee ভারত সরকারের Coal Grading Board কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার পর যেরূপ পরিবর্ত্তন অনুমোদিত করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে বিধিবদ্ধ হইলে কয়লা সম্পদের সমূহ অপচয় নিবারিত

হইবে সন্দেহ নাই এবং খনিদুর্ঘটনার ও আশানুরূপ লাঘব হইবে বলিয়া বিশ্বাস। খনি সমূহে এই সকল পরিশোধিত কার্য্য প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ভূগর্ভ নিহিত কয়লা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে উদ্ধার করা ক্রমশঃ সম্ভবপর হইবে এবং উপরোক্ত চরম উদ্দেশ্যগুলির প্রতি খনি বিশেষজ্ঞগণ সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে দেশের ও দশের উপকার সাধিত হইবে।

ভারতের কয়লা সম্পদের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন। কয়লা সম্পদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সার লুই ফারমোর (Sir Lewis Fermor) এ সম্বন্ধে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন (Indian Industries and Labour Bulletin No. 5:, 1935) এবং তাহাতে ভারতে কোক উৎপাদনকারী উচ্চশ্রেণীর কয়লার পরমায়ু মাত্র ৩০।৩৫ বৎসর স্থির করিয়াছেন। যদি এই সিদ্ধান্তই সঠিক অনুমান হয় তবে ভারতের কোক উৎপাদনকারী কয়লা অচিরেই নিঃশেষিত হইবে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রভূত লৌহ খনিজ প্রস্তর বিদ্যমান আছে এবং যদি এই শ্রেণীর কোক কয়লা (metallurgical coke) যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া যায় তাহা হইলে ভারতের লৌহ শিল্পের ভবিষ্যৎ সমূহ বিপদগ্রস্ত এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। এইরূপ একটী অতি প্রয়োজনীয় ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ বিপদ জাল হইতে মুক্তি কল্পে কোনরূপ ব্যবস্থাই যে সার লুই করিয়া যান নাই ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। তিনি চেষ্টা করিলে তাঁহার বিভাগের বহুকর্ম্মী দ্বারা ভারতের কয়লা ও অন্যান্য খনিজ শিল্পের অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন।

কয়লা শিল্পের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে এরূপ অবস্থার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী হইতেছে —

১। ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড (Railway Board) এর কয়লা ব্যবহার প্রথা।

২। ভারত সরকারের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভাগের কর্ম্মীবৃন্দের কয়লার ব্যবহার প্রণালীর উন্নতিকল্পে গবেষণার নিশ্চেষ্ট ভাব।

৩। বে সরকারী গবেষণাকারীদের উক্ত কার্য্যে অবহেলা।

৪। Coal Grading Board এর কার্য্য প্রণালী ও কয়লার শ্রেণী বিভাগ প্রণালী।

১। প্রথম প্রশ্ন হইতেছে যে যত পরিমাণ কোক উৎপাদনকারী কয়লা উত্তোলন করা হয় তাহার সমস্তই কি ধাতু নিষ্কাষণের জন্য ব্যবহৃত হয় না? উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব নিকাশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধাতু নিষ্কাষণ ছাড়া অন্য কার্য্যে এইরূপ কয়লা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সরকারের Railway Board তাহাদের রেলওয়ের বাষ্পীয় শকটের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লাই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং দেশের বেসরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও নানাবিধ কলকারখানায় এই শ্রেণীর কয়লাই (বাৎসরিক এক কোটী টনের অধিক) অবাধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ কার্য্যে ভারত সরকার নিজেই যখন দায়ী তখন অপরের পক্ষে অন্যরূপ দোষারোপ করা অসঙ্গত। ভারতীয় রেলওয়ের বাষ্পীয় শকটে যে শ্রেণীর বয়লার (Boiler) নিযুক্ত আছে তাহাতে মধ্যম শ্রেণীর কয়লা দ্বারাও যে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে (Report Coal Mining Committee, 1937, p. 174)। তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে উচ্চশ্রেণীর কয়লার দ্বারা আরও অধিক ফল লাভ হইবে। বর্ত্তমান যুগে বয়লারের কিছু পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর বহুদেশে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা চূর্ণীকৃত অবস্থায় (pulverised) সদ্ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞান সুফল উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ঘাটশিলায় তাম্র নিষ্কাষণের ও বিভিন্ন সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার চুল্লীতে এই প্রকার চূর্ণীকৃত কয়লার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ব্যবহারে যে কয়লার প্রতি অনু কার্য্যকরী হইয়া থাকে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণিত করিয়াছেন। এই চূর্ণীকৃত কয়লা বর্ত্তমানে পৃথিবীর নানা দেশের বাষ্পীয় শকটে ও নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ভারত সরকারের এদিকে যে বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায় না তাহা দারুণ পরিতাপের বিষয় এবং ইহা ভারতের তথা দেশীয় খনিজ সম্পদের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ। এ বিষয়ে আমি আইন বিধিবদ্ধ কারী সজ্জন মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি: এরূপ চূর্ণীকৃত ভাবে নিম্নশ্রেণীর কয়লার ব্যবহারের ফলে বৎসরে এক কোটী টনের অধিক কোক উৎপাদনকারী কয়লা ধাতু নিষ্কাষণের জন্য মজুত থাকিতে পারিবে। কেবলমাত্র এই উপায় অবলম্বন করিলে

কোক উৎপাদনকারী কয়লার পরমায়ু সমস্যার সমাধানে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারা যাইবে। এবং সার লুই ফারমর প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অভিমত অনায়াসে খণ্ডিত হইয়া ভারতের কয়লা সম্পদের পরমায়ু বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগে ইহা বিশদভাবে প্রমাণিত করা হইয়াছে ও তাহা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। চূর্ণীকৃত অবস্থায় কয়লার ব্যবহারের প্রচলন আরম্ভ হইলে কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ নিম্নশ্রেণীর কয়লা ভারতে বহু পরিমাণে বিদ্যমান।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে কোক উৎপাদনকারী নানাশ্রেণীর নিকৃষ্টতর কয়লা যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর উন্নত উপায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে সে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণকে সর্ব্বদাই গবেষণা করিতে হইবে এবং এইরূপ গবেষণার ফলাফল সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দেশীয় কয়লা শিল্পের উন্নতির পথ পরিষ্কারের চেষ্টায় যত্নবান হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের বিবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও বৈজ্ঞানিক বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত না করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা সঙ্গত মনে করি না। ভারত সরকারের বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিভাগ যথা ভূতত্ত্ব বিভাগ, আলিপুর গবেষণাগার, কানপুর গবেষণাগার ধানবাদ খনিবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানের দৈনন্দিন কার্য্য তালিকাতে নানাশ্রেণীর কয়লার ব্যবহার প্রণালীর উন্নতি সাধনকল্পে প্রভূত গবেষণা কার্য্য অন্তর্ভুক্ত করা অবিলম্বে কর্ত্তব্য। নিজ তত্ত্বাবধানে উন্নত গবেষণাগার ও সুযোগ্য কর্ম্মীবৃন্দ থাকা সত্ত্বেও যে কেন ভারত সরকার এ যাবৎ এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন তাহা আমাদের ধারনাতীত। এ বিষয়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিশিষ্ট বিজ্ঞানাগারেও সময়োচিত গবেষণা পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ প্রচেষ্টার ফলে যে দেশের খনিজ শিল্পের ক্রমোন্নতি হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগে অনেক উপযুক্ত কর্ম্মীবৃন্দ আছেন এবং ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মহোদয় (সার লুই ফারমর) এ বিষয়ে যত্নবান হইলে কেবল কয়লা সম্পদের ভবিষ্যৎ দুরবস্থার কথা উল্লেখ না করিয়া নিজ অধীন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারীকে এইপ্রকার গবেষণা কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিতেন এবং অপরাপর সরকারী ও বেসরকারী বিভাগেও কিছু কিছু গবেষণা সম্পন্ন হইলে ভারতের কয়লা শিল্প ও বাণিজ্যের আসরে ইহার ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য

পরিবেশিত হইত এবং তাহা হইলে আজ জাতীয় সম্পদের ও কয়লা বাণিজ্যের অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিতে পারিত এবং অদ্যকার এই প্রবন্ধের অবতারণার বোধ হয় কোন প্রয়োজন হইত না। এ প্রসঙ্গে Burrows Committee ভারতে একটী বিরাট গবেষণাগার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এই কমিটির কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে হইলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থায় এই বিরাট প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই গঠিত হইবে কিনা জানি না। ভারতের কয়লা সম্পদের ও জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে অচিরে নানাবিধ গবেষণা পরিচালনা কি ভাবে অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে আমি Geological, Mining and Metallurgical Society of India এই সমিতির পত্রিকায় (Bulletin, No. 1, 1937) কিছু আভাস দিয়াছি এবং উপরিউক্ত প্রবন্ধের প্রতি আমি সরকারের ও সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমার মতে যদি Burrows Committee অনুমোদিত বিরাট ও পৃথক একটী গবেষণাগার স্থাপনে কোনও বাধা বিপত্তি ঘটে তবে অবিলম্বে ভারত সরকারের অধীন গবেষণাগারে (ভূতত্ত্ব বিভাগ, আলিপুর গবেষণাগার, কানপুর গবেষণাগার, ধানবাদ খনি বিদ্যালয় প্রভৃতি) কতক পরিমাণে কয়লা শিল্পের উন্নতিকল্পে গবেষণার পরিচালনা আরম্ভ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এবং একটী তত্ত্বাবধায়ক সমিতির (Fuel Research Board) উপর এইরূপ নানাবিধ গবেষণা পরিচালনের ভার ন্যস্ত করা উচিত। এইরূপ কার্য্যপ্রণালী সকলেরই অনুমোদিত হইবে ও অল্প ব্যয়ে ও অনতিবিলম্বে কর্ম্ম সূচনা হওয়া সম্ভবপর হইবে। এতদ্বিষয়ে গবেষণা কার্য্য আরম্ভের আর কিছুমাত্র বিলম্ব করা দেশের পক্ষে মঙ্গল সূচক নহে। এই প্রকার গবেষণার ফলাফল যথারীতি প্রকাশিত ও প্রচারিত হইলে নিম্নশ্রেণীর কয়লার নানাবিধ ব্যবহারের প্রচার হইতে থাকিবে এবং সকল শ্রেণীর কয়লার সমুচিত ব্যবহারের ফলে দেশীয় খনিজ সম্পদের পরমায়ু সবিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিবে। ভারত সরকারের উপরোক্ত গবেষণাগার পৃথক ভাবে স্থাপনা করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহার অর্দ্ধেক Burrows Committee এর মতে কয়লার উপর শুল্ক দ্বারা সংগ্রহ করা হইবে। আমার মতে কয়লার উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়া এইরূপ পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করার কোনও প্রয়োজন নাই। বরং আমার উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে অতি অল্প ব্যয়ে নানাবিধ গবেষণা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে এবং ইহার ব্যয় সরকার সহজেই বহন করিতে

সমর্থ হইবেন ও কোনও শুল্কের আবশ্যক হইবে না।

Coal Grading Board এর কার্য্যপ্রণালী ও কয়লার শ্রেণী বিভাগ প্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। কারণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার ভস্মের পরিমাণ সামান্য কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই ইহা Selected Grade বা বিশিষ্টশ্রেণীর না হইয়া 1st Grade বা প্রথম শ্রেণীর কয়লা বলিয়া অভিহিত হয় এবং এই দুই শ্রেণীর কয়লার মধ্যে মূল্যেরও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অথচ গুণাবলীর ও ব্যবহারের তুলনা করিলে যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় তাহা নহে। এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ প্রণালী বর্ত্তমানে প্রবল থাকায় ভারতের বহু পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর কয়লার সদ্ব্যবহার হইতেছে না ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। এ বিষয়ে ভারতবাসী ও পরিষদের সদস্যগণ মনোযোগ দিলে কিছু সুফল লাভ হইতে পারে।

উচ্চশ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লার অপব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টায় অনেকে এই শ্রেণীর কয়লা কেবল ধাতু নিষ্কাষণের জন্য ব্যবহারের আইন বিধিবদ্ধ করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে এইরূপ প্রতি পদে পদে শিল্প বাণিজ্যের আসরে অতি মাত্রায় আইনের প্রভাব বিস্তার করা উচিত নহে। বর্ত্তমান যুগে রাসায়নিক গবেষণার ফলে নিম্নশ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লা হইতে অধিকতর উচ্চশ্রেণীর কোক উৎপাদন করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং এই সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্রমোন্নতি সাধিত হইলে কোক কয়লা সমস্যার সম্যক সমাধান হইবে। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার উপযুক্ত ব্যবহারই কয়লা সম্পদের পরমায়ু বৃদ্ধির অন্যতম মুখ্য কারণ এবং গবেষণার দ্বারা ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ চিরকালই পরিষ্কার থাকিবে এরূপ আশা করা যায়। উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে খনন ও উত্তোলন কার্য্যের প্রণালী সুচারু ও সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ভূগর্ভনিহিত কয়লা সম্পদ যুগে যুগে মানবের উপকার সাধন করিতে থাকিবে। এই সমস্ত উপায়ের উপর আমাদের কয়লা সম্পদের পরমায়ু বা স্থায়িত্ব সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে।

গৃহস্থোপযোগী কোক কয়লা বা পোড়া কয়লার প্রস্তুত প্রণালী সংশোধিত করাও একান্ত কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। কোক কয়লা ব্যবহার প্রণালীর ও গৃহস্থের চুল্লীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমি গত ভবানীপুর উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখায় কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রকৃতি—৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৩৩৭ সাল) ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

কয়লা সম্পদের নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধানে **Nationalisation** বা খনিগুলি সরকারের পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন ও সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কয়লা খনন ও উত্তোলন প্রণালীর আশু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ও কয়লার ব্যবহার বিধি যথাযথ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে কয়েকজন পণ্ডিতের (সুশীল চন্দ্র ঘোষ*, নাগ ও কৃষ্ণান্**, সুহৃদ রায়***) মতে ভারতের সমস্ত কয়লা সম্পদ ও খনি সমূহ সরকারের নিজ আয়ত্ত্বাধীন হওয়া উচিত। উক্ত পণ্ডিতগণের মতে বর্ত্তমানের সত্ত্বাধিকারীদের নিকট সমস্ত কয়লা খনি ও খনিজ সম্পদ ভারতসরকার উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া লইবেন। এবং সরকার সমস্ত কয়লা সম্পদ বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নত উপায়ে খনন ও উত্তোলন কার্য্য সম্পন্ন করিবার ও বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা যথাযথ ব্যবহার করিবার সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা পাইবেন। এই উপায়ে কয়লা সম্পদের প্রকৃত সংরক্ষণ ও তাহার জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে।

এই প্রকার বিধি ব্যবস্থা দেশের খনিজ রত্ন সম্পদের পূর্ণ উদ্ধার ও প্রকৃত ব্যবহারের পক্ষে অবশ্য বিশেষ উপযুক্ত বা প্রশস্ত এবং আদর্শমূলক এবং এই প্রকার খনিজ সম্পদের কার্য্যে সরকারকে কোনও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে না। কিন্তু এই আদর্শমূলক প্রস্তাব বর্ত্তমান সরকারের আর্থিক অবস্থায় বা ভারতের কয়লা শিল্প ও বাণিজ্যের জটিল অবস্থায় কতদূর সহজসাধ্য হইবে সে বিষয়ে আমার নিজের প্রভূত সন্দেহ আছে। তবে যদি এই ব্যবস্থা বা প্রস্তাব অনতি-বিলম্বে সত্যে বা কার্য্যে পরিণত হয় তবে জাতীয় সম্পদের ভবিষ্যৎ যে কঠিন ভিত্তির উপর স্থাপনা করা হইবে সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। এবং যদি এই ব্যবস্থা কয়লা সম্পদ সম্বন্ধে প্রযোজিত হইয়া সুফল প্রদান করে তবে অপরাপর খনিজ পদার্থ সম্বন্ধেও এই প্রকার বিধিব্যবস্থার প্রয়োগ সম্ভবপর কিনা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। দেশের কয়লা সম্পদের **nationalisation** প্রসঙ্গে নাগ ও কৃষ্ণান্ যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

---

* Geological, Mining and Metallurgical Society of India, Bulletin No. 1 p, 15 (1937)

** Report of Coal mining Committee, 1937: p. 203.

*** Geological, Mining and Metallurgical Society of India, Bulletin No. 1. p. 1. (1937).

পরিশিষ্ট

(কয়লা সম্পদের পরিমাণ ও পরমায়ু)

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে ভারতের ভূগর্ভে মোট ২০০ কোটী টন উচ্চশ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লা (metallurgical coal) ২৫০ কোটী টন উচ্চশ্রেণীর কোক অনুৎপাদনকারী কয়লা (non-caking coal) এবং ন্যূনপক্ষে ১৫০০ কোটী টন নিম্নশ্রেণীর কয়লা মজুত আছে। যদি উন্নত খনন প্রণালী ও "বালুকাপূরণ (Sand-Stowing) প্রথানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হয় তবে উপরিউক্ত কয়লার শতকরা ৭৫ ভাগ উত্তোলন করিয়া মানবের কার্য্যকরী হইবে অর্থাৎ ১৫০ কোটী টন উচ্চশ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লা, ১৮০ কোটী টন উচ্চশ্রেণীর কোক অনুৎপাদনকারী কয়লা ও ১০০০ কোটী টন নিম্নশ্রেণীর কয়লা আমাদের হস্তগত হইতে পারিবে। বর্ত্তমান সময়ের কয়লার বাৎসরিক উৎপাদনের হিসাব নিকাশ হইতে দেখা যায় যে--

১। বাৎসরিক ৯৩০ লক্ষ টন ব্যবহারের ফলে উচ্চশ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লার পরমায় হইবে ৯৯৫ বৎসর।

২। বাৎসরিক ৯০ লক্ষ টন ব্যবহারের ফলে উচ্চশ্রেণীর কোক অনুৎপাদনকারী কয়লার স্থায়িত্ব হইবে ২০০ বৎসর।

৩। নিম্নশ্রেণীর কয়লার অফুরন্ত পরমায়ু বলিয়াই মনে হয় (বহু শত বৎসর)।

যদি নানারূপ গবেষণার চেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর কয়লা অধিকতর কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারা যায় এবং নানাপ্রকার ব্যবহারবিধি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তবে উচ্চশ্রেণীর কয়লার পরমায়ু আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি কোক উৎপাদনকারী কয়লা কেবল ধাতু নিষ্কাষণের জন্য ব্যবহৃত করিতে পারা যায় (গড়ে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টন) তবে এই শ্রেণীর কয়লার পরমায়ু হইবে প্রায় ৫০০ বৎসর।

এই সমস্ত আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে নানাপ্রকার উন্নত খনন প্রণালীর প্রয়োগে কয়লার পূর্ণ উদ্ধার হইবে ও খনি দুর্ঘটনার লাঘব হইবে এবং কয়লার সদ্ব্যবহারের কল্যাণে ও সরকারের চেষ্টা ও সহায়তায় এবং বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে আমরা দেশের কয়লা সম্পদের

যথারীতি বা সম্যক সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইব। এবং যদি আমার প্রস্তাবিত এই সমস্ত কার্য্যপ্রণালী অচিরে ফলবতী হয় তবে ভারতের কয়লা সম্পদের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল ও গৌরবময় হইবে সেরূপ আশা করা যাইতে পারে।

বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

ঘনপল্লবিত আম্রকুঞ্জের নব মঞ্জরীসৌরভে অঞ্চল ভরিয়া নদীয়ার শ্যামল বনচ্ছায়ায় ফাল্গুন যে আসন পাতিয়াছে, তাহারই আমন্ত্রণে বাণীপুত্রগণ আজ সমাগত। আজ স্বতঃই মনে হইতেছে, বঙ্গের নালন্দা, গৌড়ের বেদগানমুখরিত নৈমিষারণ্য, সেই বাণীতীর্থ নদীয়া বুঝি অতীতের যবনিকা ভেদ করিয়া আবার সেই গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার প্রাচীন বিদগ্ধজনের সাধনার ক্ষেত্র সেই নদীয়া যেন আজ সত্যই নবপ্রাণস্পর্শে প্রাণবন্ত। ঋষি বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিজেন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বাংলার যে সকল মহারথ স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই অশরীরি আত্মা তাঁহাদের দুর্লভ আশিসধারা বর্ষণ করিবার জন্য সকলেই যেন আজ এ মহামিলনক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাংলার সেই মহিমোজ্জ্বল সংস্কৃত ও সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

মানব-মনের মনীষার বা তাহার স্বয়ম্প্রকাশ চৈতন্যের যে সৃজনমুখী অভিব্যক্তি তাহাই সাহিত্যের প্রাণবস্তু বলিয়া অভিহিত। এই অভিব্যক্তির ধারা প্রকৃতি অংশত চিরন্তন ও সার্ব্বজনীন হইলেও দেশকাল ও পাত্রদ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত—ইহা অবিসংবাদী। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানবজাতি সমূহের সাহিত্যের বাহ্যরূপ ও ধারাও বিভিন্নরূপে দেখা দিয়াছে। একমূল বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন যান-বাহন, কলকারখানা, আলোকবর্ত্তিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের ভিতর দিয়া আপনাকে আপাতবিভিন্নরূপে প্রকাশ করে, মানব-মনের মনীষা তথা তাহার স্বয়ম্প্রকাশ চৈতন্যও তেমনি মূলতঃ এক হইলেও

স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাহার আত্মপ্রকাশ ভঙ্গি ও ধারাও ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। জাতীয় মনের মনীষা বা জাতীয় চৈতন্যের এই বিচিত্র আত্মপ্রকাশধারার সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য হইতেছে জাতি বিশেষের সংস্কৃতি বা জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। ইংরাজী ভাষায় ইহারই নাম 'কাল্চার' (culture)। জাতির এই সংস্কৃতি বা কাল্চারের বাঙ্ময়রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহার সাহিত্যে। এই কারণে সাহিত্যকে জাতীয় সংস্কৃতির বাহনও বলা যায়।

মানব সভ্যতার আদিম ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, দেশকাল ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবহেতু এক একটি মানবগোষ্ঠির (Race) মধ্যে এই স্বয়ম্প্রকাশ জাতীয় চৈতন্য এক একটি নিয়ামক শক্তি বা ধর্ম্মরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল এবং মানব-মনের মনীষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জাতির মনীষার বিচিত্র বিকাশ যেন এক একটি বিশিষ্টরূপ লইয়া দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালে জাতীয় মনীষার এই বিশিষ্ট বিকাশভঙ্গি ও ধারা মূর্ত্ত হইয়া অক্ষয়রূপ লাভ করে তাহার সাহিত্যের মধ্যে; তাই যে জাতির মনীষা যে ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে তাহার সাহিত্যও সেই ভাবে গঠিত হইয়াছে।

এমনি ভাবে সাহিত্য আবহমান কাল ধরিয়া একদিকে যেমন মানব জীবনের সনাতন সত্য ও মানবমনের চিরন্তন ভাবগুলিকে বক্ষে বহন করিয়া আসিতেছে, অপর দিকে তেমনি জাতি বিশেষের শিক্ষা, দীক্ষা, দর্শন, ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, সভ্যতা-ভব্যতা, এবং রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনধারা প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতি বা কাল্চার বলিতে যাহা বুঝায় তৎসমুদায়ই আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া জাতীয় সংস্কৃতির বাহনরূপে চলিয়া আসিতেছে।

সাহিত্যে সনাতনতা ও সার্ব্বজনীনতার মূল্য যত অধিকই হউক না কেন, সাহিত্য যে জাতীয় সংস্কৃতির বাঙ্ময়রূপ একথা কোনরূপেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্যে জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বা প্রকাশ একেবারেই থাকিবে না এরূপ ব্যবস্থা করিবার অথবা তাহার সার্ব্বজনীনতা ক্ষুন্ন হইবে বলিয়া সাহিত্য হইতে তাহা বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিল অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা দুরূহ নহে। জগতের কোন সাহিত্য সম্পর্কে এমন কথা কোন দিন উঠিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ রাষ্ট্রিক কারণেই হউক বা সামাজিক কারেণেই হউক অথবা অন্য কোন পারিপার্শ্বিক কারণেই হউক, সাহিত্যকে জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা তাহার

ধ্বংস সাধনের নামান্তর মাত্র। জগতের প্রত্যেক জাতির সাহিত্যই সেই সেই জাতির সংস্কৃতি বা কাল্চারের বাঙ্ময়রূপ। এই জন্যই যে জাতির সাহিত্য কালজয়ী হইয়া আজিও টিকিয়া আছে, সে জাতি কালবশে ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইলেও তাহার সংস্কৃতি বা কাল্চার তাহার সাহিত্যের মধ্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, এবং এই নিখিল মানবের বিরাট বিপণীতে অপর কোন জাতি হয়ত সেই সংস্কৃতির মূলধন খাটাইয়া আপনাকে সমৃদ্ধ করিতেছে—ইহা কোন প্রত্নতত্ত্ব বা বিচার—গবেষণার কথা নহে, জগতের ইতিহাসই ইহার প্রমাণ।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে আজ বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্য হইতে জাতীয় সংস্কৃতির অভিব্যক্তি মূলক বিষয়বস্তু সমূহ বর্জ্জন করিবার কথা সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলে যে সকল কারণ বর্ত্তমান সেও জাতির দুর্ভাগ্যেরই কথা। সকল দেশের সাহিত্যেই জাতি বিশেষের সংস্কৃতির এক অখণ্ডরূপ প্রতিভাত দেখা যায়: কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, অধুনা শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি নাকি দ্বিধাবিভক্ত এবং পরস্পর বিভিন্নমুখী। এই সংস্কৃতি বিভিন্নতার কথা বর্ত্তমানে এরূপ অতিকায় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে যে, এদেশের সম্প্রদায় বিশেষ তাহাদের সংস্কৃতি অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় ভাবধারা বাঙ্গালী জাতির সনাতন সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—ইহাই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছে। কাজেই স্মরণাতীত যুগ হইতে বঙ্গসাহিত্য যে সংস্কৃতির বাহনরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা যে তাহাদের তথাকথিত সংস্কৃতির পরিপন্থী এবং বঙ্গসাহিত্যকে শোধন করিয়া না লইলে তদ্দ্বারা যে তাহাদের জাতীয় সংস্কৃতি অদূর ভবিষ্যতে অভিভূত হইয়া পড়িতে পারে তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্যকে বিশুদ্ধ করিয়া তাহাদের অধুনা পরিকল্পিত সংস্কৃতির অনুকূল করিয়া লইবার জন্য একটা বিরাট অভিযান চলিয়াছে। এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হইতেছে, সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরব ও সান্ত্বনার বস্তু তাহার ভাষা ও সাহিত্য।

জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আসে, যখন রাজনীতির পেষণদণ্ড তাহার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। আজ বাঙ্গালীর সেই দুর্দ্দিন। সেই স্মরণাতীত যুগ হইতে যে, সংস্কৃতির প্রাণরসে সঞ্জীবিত ও পরিপুস্ট হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বর্ত্তমানে মধুবর্ষীফলপুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া সমগ্র জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই ভাষা, সেই সাহিত্য সেই বঙ্গদেশের সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম সংস্কারের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষিত হইতেছে এবং তাহার আমূল

পরিবর্ত্তনের জন্য নানাপ্রকার হিংস্র প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহা শুধু বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের দুর্দ্দিন নহে, ইহা বাঙ্গালী জাতির মহাদুর্দ্দিনের সূচনা।

বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মসংস্কারের অনুকূল করিয়া লইবার অজুহাতে যে যুযুৎসু অভিযান চলিয়াছে তাহার নায়কবৃন্দের শ্যেনদৃষ্টি নিরন্তর ফিরিতেছে, বাংলা সাহিত্যের কোথায়, কি ভাবে হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রকাশ বা গন্ধ রহিয়াছে, তাহা বাহির করিবার জন্য। শুধু তাহাই নহে, বঙ্গসাহিত্য ও ভাষা হইতে সেই পৌত্তলিকতার ভাব নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এমন এক সম্প্রদায় যাহারা রাজশক্তির ছায়াতলে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে মনে করিতেছেন, নিরঙ্কুশ ও সর্ব্বময় কর্ত্তা। কিন্তু কে বুঝাইবে তাহাদের যে, আইন করিয়া বা গায়ের জোরে আর যাহাই করা সম্ভব হউক, সাহিত্য সৃষ্টি করা বা ধ্বংশ করা সম্ভব হয়না। জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

যে আদিম অজগর বর্ব্বরতা তাহার বিকট নখদংষ্ট্রায়ুধ বিস্তার করিয়া মানুষের বিচারবুদ্ধিকে গ্রাস করিবার জন্য যুগে যুগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে, ইহাও যে তাহারই তাণ্ডবলীলা, একথা বুঝিতে, বোধ করি, সূক্ষ্ম দার্শনিক বুদ্ধির প্রয়োজন হইবে না। আর মানবমনের মনীষা যে এই অতিকায় বর্ব্বরতাকে দলিত করিয়া চিরদিনই জয়যুক্ত হইয়া আসিতেছে, জাতির সাহিত্যইত তাহার সাক্ষী। এই সাহিত্যের মধ্যেই মানুষ লাভ করিয়াছে, তাহার যুগ যুগান্তর সাধনার সার্থকতা, কল্প কল্পান্তরের বিজয় বার্ত্তা; এই সাহিত্যই স্মরণাতীত কাল হইতে বহন করিয়া আসিতেছে তাহার জয়ধ্বজা।

কিছুদিন পূর্ব্বে শোনা গিয়াছিল, বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দমঠের' বহ্নি-সৎকার করা হইয়াছে এবং তাঁহার আরও দুই একখানি উপন্যাসের বহিষ্করণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিংশ শতাব্দিতে ইহা অপেক্ষা বীভৎস বর্ব্বরতা আর কি হইতে পারে কল্পনা করাও অসম্ভব। দুই-চারিখানি কাগজ অগ্নিসাৎ করিলেই যদি অমর কবির সৃষ্টি ধ্বংস করা যাইত, তাহা হইলে, দীর্ঘকাল বিদেশী ও বিধর্ম্মীর উদ্যত শাসনদণ্ডের তলে বাস করিয়া হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর পুরাণোতিহাস, হিন্দুর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আজিও অটুট থাকিতে পারিত না। অথবা আয়ার্লণ্ডের জাতীয় সাহিত্য ধরাবক্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন না হইয়া থাকিতে পারিত না।

সাহিত্য কি, ভাষা কি এবং সাহিত্য ও ভাষার সৃষ্টি হয় কিরূপে —এই

প্রাথমিক জ্ঞানটুকু যাহাদের আছে, তাহারা কখনও এই বর্ব্বরতার ষোড়শোপচারে পূজা করিবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতির এক অখণ্ড বাঙ্ময়রূপ। সাহিত্য যখন গড়িয়া উঠে, তখন সে জাতির কোন অঙ্গ বা সম্প্রদায়কে বাদ দেয় না, বাদ দিতে পারে না। বৃক্ষ যেমন শাখা-পল্লব, কাণ্ড-মূল, প্রভৃতি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাহায্যেই তাহার প্রাণরস সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, সাহিত্যও তদ্রূপ জাতির সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতেই তাহার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। জাতির শাখা বিশেষের জীবনধারার কোথায় কোন পৌত্তলিকতার ভাব বা কোথায় কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান আছে, সাহিত্য তাহা বাছ-বিচার করে না, সাহিত্যের কাজও তাহা নহে। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে সাহিত্যের এমন অখণ্ডরূপ আমরা দেখিতে পাইতাম না, দেখিতে পাইতাম, কতকগুলি অসংবদ্ধ, বিকলাঙ্গ খণ্ড খণ্ড অপ বা উপসাহিত্য। বিষাদসিন্ধু বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে বলিয়া যে বঙ্গসাহিত্য দুষ্ট হইয়াছে এরূপ কথাত কোন বাঙ্গালীর মুখে আজ পর্য্যন্ত শোনা যায়নি এবং বিষাদসিন্ধু নিছক মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত নানা ঐতিহ্য ও কাহিনীতে পূর্ণ বলিয়া তাহা কোন অমুসলমান বাঙ্গালী যে পাঠ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করে নাই একথাত তর্কের খাতিরেও বলা চলে না, অথবা একথাও কখনো কাহারও মনে উঠে নাই যে, বিষাদসিন্ধু পাঠ করিলে কোন অমুসলমান বাঙ্গালীর ধর্ম্মবুদ্ধি বা সংস্কারে আঘাত লাগিবে। বিষাদসিন্ধুর আখ্যানবস্তু যাহাই হউক, বিষাদসিন্ধু যে বাঙ্গলা সাহিত্যের নিজস্ব ও বাংলাভাষা ভাণ্ডারের রত্ন বিশেষ হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য বোধ করি কোন রাজনৈতিক বৈঠক বা বিতর্কের আবশ্যক হয় নাই।

সত্যকারের সাহিত্যিক তাহার সাহিত্য-সৃজন কালে যে কাল্পনিক পটভূমি সৃষ্টি করেন এবং তাহাতে যে নায়ক-নায়িকার অভিনয় দেখান তাহাতে তিনি যে কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা জাতিধর্ম্মবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া করেন না, কেবল একটা রসসৃষ্টি, একটা আনন্দঘন রসবোধের অপূর্ব্ব রূপায়নই যে তাহার একমাত্র লক্ষ্য থাকে—এই সাধারণ কথাটাও যদি আলোচনা করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলে সত্যসত্যই "অরাসকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ" —এই মহাজন বাক্য পালন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সে দিন কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যে সাহিত্যরস সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহারা শুধু বাংলা

সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাত নহে; তাহাতে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অনিষ্ট সাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কাজেই কেবল "মা লিখ, মা লিখ" বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকাত নিরাপদ নহে। কারণ আজ তাহারা যে কারণে, যে মনোভাব লইয়া 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের অবমাননা করলেন, কাল হয়তো সেই কারণে, সেই মনোভাব লইয়াই 'ভারতবর্ষ' গঙ্গানদী, ব্রহ্মপুত্র, সরস্বতী প্রভৃতি নাম পরিবর্ত্তনের রায় দিয়া বসিবেন, কারণ ওগুলি সবই হিন্দু-শাস্ত্র পুরাণান্তর্গত বলিয়া পৌত্তলিকতা গন্ধী। এমনি করিয়া যদি জাতির সাহিত্যিক মনকে নিয়ত নানাবিধ রাষ্ট্রনায়ক ও জননায়কদের বিধি-নিষেধ ও আদেশ মান্য করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হইবে এবং অচিরকাল মধ্যে তাহাকে গতিহীন ও ক্ষীণজীবী হইতেই হইবে। যে সংস্কৃতির প্রাণরসে জাতির সাহিত্যিক মন সঞ্জীবিত, সেই সংস্কৃতির মধ্যে যদি তাহার গতি ও বৃদ্ধি অবাধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিকৃতি অনিবার্য্য। সাহিত্যিক-মনের উপর যদি "ড্যামোক্লিসের" তরবারির মত নিরন্তর ঝুলিতে থাকে, 'একথা বলিলে পৌত্তলিকতা আসিবে, ওকথা লিখিলে পৌত্তলিকা প্রকাশ পাইবে,' তাহা হইলে তাহার অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে।

তারপর একথা, অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং অস্বীকার করিয়া লাভও নাই যে, বাংলা সাহিত্য হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের তথা হিন্দু সংস্কৃতির বনিয়াদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্য বলিতে 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীদাস, গীতগোবিন্দ, শ্রীমন্তমশান, বেহুলা, মেঘনাদ বধ কাব্য, বৃত্র সংহার, বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতির কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলে না; কারণ বাংলা সাহিত্য অধুনা নব নব ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইলেও তাহার নাড়ীর যোগ রহিয়াছে ঐ সকল প্রাচীন সাহিত্য, ও পুরাণেতিহাস প্রভৃতির সহিত এবং যে ভাষা এই সাহিত্যের বাহন তাহার অর্থ প্রতীতি ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু জাতির সংস্কৃতি সূচক; কারণ সমুদায় সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ এবং বহুসংখ্যক তদ্ভব শব্দের অর্থ পৌত্তলিকতাগন্ধী; কাজেই 'বাগর্থ' দুইই পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শ দোষ হইতে বঙ্গভাষাকে মুক্ত রাখা সম্ভব হইবে না। এই মারাত্মক আলোচনা ও আন্দোলনের ফলে আজকাল প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে যে সকল সাহিত্য পাঠ্য পুস্তক লিখিত হইতেছে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সেগুলি বাংলা ভাষায় কি, কোন অভিনব ভাষায় লিখিত তাহা স্থির করা সুকঠিন। এইরূপভাষার সাহায্যে যদি

সুকুমারমতি বালকদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা তথা বাংলা সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সত্যই চিন্তার বিষয়। অথচ যে ভাবে শিক্ষায়তনগুলিকে রাষ্ট্রশাসনের কবলে আনিবার প্রবল চেষ্টা ও তোড়জোড় চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, অচিরকাল মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়তনগুলিতে এমন সকল পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত হইবে, যাহাতে শুদ্ধ যে অবাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ সৃষ্টি হইবে তাহা নহে, বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের সামগ্রী এই সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যেরও দারুন অনিষ্ট সাধিত হইবে, কাজেই বঙ্গ সাহিত্যের শুভাকাঙ্খীমাত্রেরই এ বিষয়ে সময় থাকিতে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য, মনে করি।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কাব্য, উপন্যাস, কাহিনী, আখ্যান-উপাখ্যান প্রভৃতি সাধারণতঃ সাহিত্য বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহা যে ধর্ম্মগ্রন্থ নহে বা কোন ভগবান বা ভগবান প্রেরিত দেবদূতের মুখনিঃসৃত বাণী নহে, একথা, বোধ করি, সকলেই জানেন। অথচ সাহিত্যকে যে ভাবে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতির জটিলাবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া আনা হইতেছে তাহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইহার পশ্চাতে একটি মারাত্মক অভিসন্ধি রহিয়াছে। মহাকবি সেক্সপীয়র তাৎকালীন ইহুদি জাতি সম্পর্কে নানা আপত্তিজনক কথা তাঁহার নাট্য গ্রন্থে বলিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া ইহুদিরা সেক্সপীয়রের ঐ সকল গ্রন্থ কোন দিন অগ্নিসাৎ করিয়া বা ইহুদি জাতির মধ্যে সেক্সপীয়র পাঠ নিষেধ করিয়া সাহিত্যরস গ্রহণ সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয় নাই।

বাংলায় ইংরাজী ছন্দ

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চলিতে পারে এবং চলে। কিন্তু ইংরাজী ছন্দের মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করিলে এই মত যথার্থ বলিয়া মনে হয় না।

বাংলা ছন্দ quantitative বা মাত্রাগত; অক্ষরের দৈর্ঘ্য বা মাত্রা যে বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইংরাজী ছন্দ qualitative অর্থাৎ অক্ষরের গুণগত। Accentর উপরই ইহার ভিত্তি। কতকগুলি সমধর্ম্মী foot বা গণের সমাবেশে ইংরাজী ছন্দের এক একটি চরণ গঠিত হয়। এইরূপ foot বা গণের পরিচয় তাহার মোট মাত্রা সংখ্যার উপর নির্ভর করে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে বাংলা ছন্দে অনেক সময় যে স্বরাঘাত পাওয়া যায়, তাহাই ইংরাজী ছন্দের accent এর প্রতিনিধি স্থানীয়। কিন্তু এই ধারণাও সঙ্গত নহে। ইংরাজী accent শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুসরণ করে; বাংলা স্বরাঘাত সাধারণ উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা ঝোঁক। বাংলায় স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হ্রস্ব; কিন্তু ইংরাজীতে accentর দরুণ অক্ষরের দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় না, বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই প্রায়শঃ accent পড়ে এবং অনেক সময় হ্রস্ব অক্ষর ও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়। স্বরাঘাত প্রধান ছন্দোবন্ধে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের যেরূপ গঠনরীতি, ইংরাজী ছন্দের foot এর গঠন ঠিক তাহার অনুরূপ নহে। স্বরাঘাতের সংখ্যা, অবস্থান, ছেদের সংস্থান ইত্যাদির নিয়ম তুলনা করিলেও দেখা যাইবে যে বাংলা স্বরাঘাত প্রধান ছন্দোবন্ধের সহিত ইংরাজী ছন্দের যথার্থ কোন সাদৃশ্য নাই। যথার্থ blank verse ইংরাজী ছন্দে বেশ লেখা যায়, কিন্তু বাংলা স্বরাঘাত বহুল ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা blank verse লেখা চলে না।

আধুনিক বাংলা মাত্রাচ্ছন্দে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ করা যায় এরূপ মত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা মাত্রাচ্ছন্দের সহিত ও ইংরাজী ছন্দের বাস্তবিক মূলগত ঐক্য নাই। প্রথমতঃ ইংরাজী accented অক্ষর ও বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ধ্বনির দিক্ দিয়া এক নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মাত্রাসমকত্ব বজায় রাখিয়া স্বেচ্ছামত পর্ব্বের ছাঁচ বদ্‌লানো বাংলায় সম্ভব, কিন্তু ইংরাজীতে সম্ভব নহে। আবার ইংরাজীতে যেরূপ সমজাতীয় foot বা গণের পরস্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, বাংলায় তাহা সম্ভব নহে।

ইংরাজীতে যে সমস্ত কবিতা ছন্দোমাধুর্য্যের জন্য সুবিদিত, ঠিক তাহাদের ছাঁচ রাখিয়া বাংলায় পদ্য রচনা করিতে গেলে অনেক সময়ই ছন্দোভঙ্গ হইবে। বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁহারা কেহ ইংরাজী ছন্দেই বাংলা কবিতা লেখেন নাই বা লেখার প্রয়াস করেন নাই। এমন কি বাংলা কবিতায় যেখানে যেখানে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার হইয়াছে সেখানে তাহারাই জাতি হারাইয়া বাংলা ছন্দের রীতির অনুসরণ করিয়াছে।

অবশ্য মাঝে মাঝে ইংরাজী ছন্দের লক্ষণ বা আভাস কোন কোন পদ্যে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু এই সাদৃশ্য আপাত আকস্মিক, মূলতঃ কোন ঐক্যের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে।

দ্বিজেন্দ্রলালের "হাসির গান"

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকটি গ্রন্থ classicsএর গৌরব বা সাহিত্যিক অমরতা অর্জ্জন করিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের "হাসির গান" যে তাহাদের অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হাস্যরসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করার মত হাস্যকর প্রয়াস খুব কম আছে। বহু বিচিত্ররূপে এই হাস্যরস মানব জীবনে সংক্রমিত হইয়া জীবনকে সঞ্জীবিত করিতেছে। যে মনোভাব লইয়া আমরা ব্যাখ্যার প্রয়াস করি, হাস্যরস তাহারই প্রতিবাদ। হাস্যরস স্বভাবের বা প্রকৃতির নিয়মানুগ নহে, তাহার কাজই হইল প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা প্রকট করা। কবির ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলা যায়, "হাস্যে তোমার মুক্তির রূপ, হাস্যে তোমার মায়া, বিশ্বতণুতে অণুতে অণুতে কাঁপে হাস্যের ছায়া"।

এই 'হাসির গান'গুলি সাহিত্যের দিক্ দিয়া খাঁটি উচ্চাঙ্গের lyric; lyricএর যত লক্ষণ ও গুণ, বিশেষতঃ তাহার গভীর ব্যঞ্জনা শক্তি, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান্।

প্রথম অল্প বয়সে যখন 'হাসির গান' পড়িয়াছি, তখন ইহার স্থূল রসটা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। 'হাসির গানের' মধ্যে সূক্ষ্মতর উপাদান থাকিলেও, ইহার মধ্যে যে টুকু রং তামাসা, ভাষা ও কল্পনার চটুলতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রহসন, মস্করা, এমন কি সঙ ও ভাঁড়ামির উপাদান আছে, তাহা সহজেই আমাদের লক্ষ্য আকর্ষণ করে। ইহাতে যে একটা বেপরোয়া ভাব, একটা অসঙ্কুচিত, প্রাণবন্ত স্ফূর্ত্তির রস আছে, তাহা তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর এমন করিয়া প্রাণভরা মজার কাব্য কেহ লিখিতে সাহস করেন নাই, কিরূপে সহজ ও সরস আমোদ জীবনে পাইতে হয় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। এই সমস্ত মজার গানে কুত্রাপি ইতরতার আভাস নাই। তাঁহার ন্যায় নিপুণ শিল্পীর হাতে পড়িয়া এগুলি উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার উপাদানীভূত হইয়াছে; Lambএর প্রবন্ধেও এইভাবে স্থূল রসিকতার উপাদান সূক্ষ্ম শিল্পকলার অবলম্বন হইয়াছে।

তাহার পরে, এই 'হাসির গান'গুলির মধ্যে যে মহৎ, উদার, নির্ভীক্ আদর্শ আছে তাহাই বেশীরকম আকৃষ্ট করিত। সমাজে ও চরিত্রে যেখানে যে গলদ্ আছে, যে ন্যাকামি ও ভণ্ডামি সত্যের মুখোস্ পরিয়া সত্যের অপলাপ করিতেছে, যে মোহ ও আত্মবঞ্চনা একান্তভাবে আমাদের চিত্তকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই দ্বিজেন্দ্রলালের উজ্জ্বল হাস্যে প্রকট হইয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শুধু অধুনাতন বাঙালী সমাজের দুর্ব্বলতা নয়, সময়ে সময়ে মানব মাত্রের মজ্জাগত দুর্ব্বলতাও এই হাসির গানে ধরা পড়িয়াছে। শুধু বিদ্রূপের কশাঘাত নহে, উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য স্রষ্টার অন্তর্দ্দৃষ্টি ও শিল্প এখানে আছে, মানব হৃদয় ও জীবনের একটা অতি মহান্ লক্ষ্য সমস্ত বিদ্রূপ ও সমালোচনার ভিতর দিয়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে, সেই দুর্লক্ষ্য লক্ষ্যের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, তাহার অভাবের জন্য বিষাদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই জন্য অনেক সময় বিদ্রূপের সহিত একটা সহানুভূতি, প্রশ্রয়শীলতা, সহিষ্ণুতা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়াও সুগভীর আদর্শপ্রীতি প্রচারিত হইতেছে।

তাহার পর মাঝে মাঝে মনে হইত যেন এই হাসির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছে, কণ্ঠ বাষ্পনিরুদ্ধ হইতেছে। তখন মনে হইল এগুলি হাসির গান, না, কান্নার গান? তখন দেখিলাম এই হাসির তাৎপর্য্য অতি করুণ ও গভীর ট্র্যাজেডি। বিদ্রূপের বাণ আমার, প্রতি মানবের বক্ষে আসিয়া বিদ্ধ হইতেছে। দেখিলাম ভণ্ডামি ও বোকামির পিছনে রহিয়াছে চিরন্তন মানবাত্মা; সে আত্মা শিশুর মত অসহায় ও সরল, এতটুকু সত্য বা কৃত্রিম আনন্দ, সৌন্দর্য্য, উল্লাস দিয়া খেলাঘর সাজাইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেই খেলাঘর বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া যাইতেছে, সেইজন্য মানুষের চিরন্তন ক্রন্দন।

অনেক আর্টিষ্ট এইখানে আসিয়া থামিয়া যান। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যে আরও অন্য জিনিষ আছে। শেষে দেখিলাম যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে হাসি আর কান্না পরস্পর জড়িত, একই জিনিষের এ পিঠ আর ও পিঠ; যাহা করুণ তাহাই হাস্যাস্পদ, তাহাই আবার মানব-সুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া অনেক দার্শনিক ও সাহিত্যিকের মতন দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারে দুঃখবাদী, কিম্বা অবিশ্বাসী হইয়া যান নাই। হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে এই ভাবে মানুষ চিরদিন চলিয়াছে ও চলিবে, তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। উঠিতে পড়িতে আঘাত খাইয়া ভুল করিতে করিতে চলাই মানব জীবনে একমাত্র সম্ভব। এইজন্য জীবনযাত্রার রীতিতে তিনি একটা উৎকট ও আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন, ওমর খৈয়ামের

মত সব ভাঙিয়া চূরিয়া হৃদয়ের ছাঁচে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী নহেন। বরং অনেক হিসাবে তিনি রক্ষণশীল, আপোসে কাজ করার পক্ষপাতী। অবশ্য সিদ্ধপুরুষের যে উৎসাহদীপ্ত বাণী 'Onward to the city of God' তাহা হয়ত 'হাসির গানে' নাই। কয়জন শিল্পী বা সাহিত্যিক তাহা বলিতে পারেন? দ্বিজেন্দ্রলালের অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে করিয়াছিল দুজ্ঞেয়বাদী। জীবনটা তাঁহার কাছে "শুধু একটা উঃ আর একটা আঃ, নহিলে জীবনটা কিছু নাঃ"। এই জন্য তাঁহার মধ্যে পাই Higher Epicureanism, তাঁহার বাণী অনেক সময় Ecclesiastesর ধ্বনির মত শুনায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস তাঁহার সুগোপন ব্যথা ও নৈরাশ্যকে রূপায়িত করিয়া বিশুদ্ধ রঙ্গরসে পরিণত করিয়াছে। এই রসানুভূতি আমাদের সুখ দুঃখ ও আশা আকাঙ্ক্ষার বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়, একটা অহৈতুক রসের আস্বাদ দেয়, মনোজগৎ হইতে বুদ্ধিজগতে আমাদের উন্নয়ন করে; বৈষম্য ও অসঙ্গতি দেখিলেই তাহার উপর অট্টহাস্যের বাণবর্ষণ করিতে শিক্ষা দেয়, হউক্ না সেই বৈষম্য ও অসঙ্গতি আমাদের জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত।

কখন কখন আবার এই "শুদ্ধা" রসিকতা জীবন ও সৃষ্টির অসঙ্গতির মধ্যেই আনন্দ পায়। কখনও কখনও আবার নূতন নূতন অসম্ভব, অকল্পিতপূর্ব্ব এবং আমাদের হিসাবে অসঙ্গত অবস্থা সমাবেশ কল্পনা করিয়া সৃষ্টিছাড়া একটা নূতন রসলোক সৃষ্টি করে। এইখানেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসিকতার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি।

"হাসির গানে" দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ, ভাষা ও রচনারীতির মধ্যেও একটা নিজস্ব গৌরব ও শক্তিমত্তার প্রকাশ দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার সহিত তাঁহার হাস্যরসিকতার সম্পর্ক নিগূঢ়। এইখানেই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। 'হাসির গান' পর্য্যালোচনা করিলে বোঝা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা কত বড় ছিল, তাঁহার দেশকে ও যুগকে তিনি কত বড় জিনিষ দিতে চাহিয়াছেলেন কিন্তু তাহারা নিতে পাবে নাই।

ধূমকেতু

শ্রীতারকেশচন্দ্র চৌধুরী

ক

হেলি প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কয়েকটী ধূমকেতু আবিষ্কার এবং তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের দৃষ্টান্তে এখনও বহু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ধূমকেতু আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন।

কিন্তু; এ দেশীয় কোন জ্যোতির্ব্বিৎ এ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে সেরূপ কোন চেষ্টা বা আলোচনা করেন নাই অথবা হিন্দু জ্যোতিষে উহার কোন আলোচনা আছে কিনা, তাহাও অনুসন্ধান করেন নাই।

যাহা হউক, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষে ধূমকেতু সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তথ্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ও কার্য্যকর।

উহাতে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আপাততঃ সেরূপ আলোচনার স্থান না থাকায় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা গেল।

খ

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষ ১০০০ এক হাজার ধূমকেতুর অস্তিত্ব স্বীকার করে।

এই ১০০০ ধূমকেতুর প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ নাম, লক্ষণ, আকৃতি, গতি এবং প্রকৃতি আছে।

ইহাদের কতকগুলির পুচ্ছ আছে, কতকগুলির পুচ্ছ নাই এবং কতকগুলির কখনও পুচ্ছ থাকে, কখনও থাকে না।

ইহাদের আবির্ভাবের সাধারণ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকিলেও, লক্ষণ অনুযায়ী যেটী যে নামে অভিহিত, সেইটী একবার আবির্ভূত হওয়ার ঠিক নির্দ্দিষ্ট কাল পর পুনরায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। এইরূপভাবে সর্ব্বনিম্ন ৬০ বৎসর এবং সর্ব্বোচ্চ ৩০০০ বৎসর পর পর এক একটির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

কিন্তু, স্মরণ রাখিতে হইবে, যেটী ৬০ বৎসরে আবর্ত্তন করে, সেইটী প্রতি

৬০ বৎসর পর পর দৃশ্যমান হইয়া থাকে এবং যেটী ৩০০০ বৎসরে আবর্ত্তিত হয়, সেইটী প্রতি ৩০০০ বৎসর পর পর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

গ

এই সমস্ত ধূমকেতুর দুই প্রকার নাম আছে। ১ প্রকার সাধারণ নাম এবং ২ প্রকার বিশেষ নাম। সাধারণ নামে কতকগুলির ধূমকেতুর সমষ্টি বুঝায় এবং বিশেষ নামে উক্ত সমষ্টির প্রত্যেকটীকে পৃথক্‌ভাবে বুঝাইয়া থাকে। যেমন, "রবিজ" বলিলে ২৫টী ধূমকেতুর সমষ্টি বুঝাইয়া দেয় এবং "কিরণ" বলিলে ঐ "রবিজ" ধূমকেতুগণের কোন একটীকে নির্দ্দেশ করে।

এইরূপভাবে চন্দ্রসুত, ভৌমপুত্র, বুধপুত্র, প্রজাপতিসুত এবং ব্রহ্মজ প্রভৃতি নামে কতকগুলি ধূমকেতুর এক একটী শ্রেণীবিভাগ সূচিত করে। উপরোক্ত ১০০০ ধূমকেতু এইরূপে ১৯ ভাগে বিভক্ত। ইহা ভিন্ন উহাদের অনেকগুলি উপবিভাগ আছে।

কথিত ১০০০ ধূমকেতুর যে ১৯টী বিভাগ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

১। রবিজ	২৫	৬। ব্রহ্মপুত্র	১	১১। ভৌমপুত্র	৬০	১৬। ব্রহ্মজ	২০৪
২। অগ্নিপুত্র	২৫	৭। শুক্রপুত্র	৮৪	১২। রাহুপুত্র	৩৩	১৭। বরুণপুত্র	৩২
৩। মৃত্যুসুত	২৫	৮। শনিপুত্র	৬০	১৩। বহ্নিপুত্র	১২০	১৮। কালপুত্র	৯৬
৪। ভূপুত্র	২২	৯। গুরুপুত্র	৬৫	১৪। বায়ুপুত্র	৭৭	১৯। বিদিক্‌পুত্র	৯
৫। চন্দ্রসুত	৩	১০। বুধপুত্র	৫১	১৫। প্রজাপতিসুত	৮		
	১০০ +		২৬১ +		২৯৮ +		৩৪১ = ১০০০

উহাদের শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী যে যে বিশেষ নাম আছে, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা—কিরণ, ধূম, কবন্ধ, ত্রিশিখ, শিখী, শূল, কাল, তামস এবং অরুণ।

যে সমস্ত উপবিভাগ আছে, তাহাদের মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—বসা, অস্থি, শাস্ত্র, কপাল, রৌদ্র, কাল, শ্বেত, রশ্মি এবং ধ্রুব।

ঘ

"কেতু" শব্দের অর্থ চিহ্ন। ধূমকেতু বলিলে বুঝা যায় যে, বিশেষ চিহ্নটী ধূমের মত সহসা দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া থাকে।

এই আকস্মিক আবির্ভাব এবং তিরোভাব হওয়ার জন্যই ইহারা ধূমকেতু নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা যে স্থায়ী এবং নির্দ্দিষ্ট গতিবিশিষ্ট, তাহা ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কাল পরপর পুনরাবর্ত্তন দ্বারা প্রমাণিত হয়।

হিন্দু জ্যোতিষ মতে কেতু ও ধূমকেতু অভিন্ন বস্তু। কেবল সাময়িক পরিবর্ত্তন সূচিত করে মাত্র। ইহাদের কোন্‌টী কোন্‌দিকে, কোন্ ঋতুতে, কোন্ মাসে বা কোন্ নক্ষত্রে উদিত হইলে কিরূপ ফল দান করে, তাহা হিন্দু জ্যোতিষে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

ধূমকেতু উদয়ের সাধারণ ফল অশুভজনক। কোন কোন ধূমকেতু শুভফল দান করিয়া থাকে। ইহাদের কোন কোনটী যুগ পরিবর্ত্তন, যুগারম্ভ, মন্বন্তর এবং প্রলয় সূচিত করে।

ঙ

এখন প্রশ্ন এই যে, ইহারা কোথায়, কিভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকে ?—প্রকৃতপ্রস্তাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত কেহই করিতে সক্ষম হন নাই।

কারণ, সূক্ষ্মগণিত সাহায্যে ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না কিংবা অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও ইহাদের গতিবিধি বা অবস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করা যায় না।

সেইজন্য প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"কেতোর্দর্শনমস্তময়ো বা ন গণিতবিধিনাস্য শক্যতে জ্ঞাতুম্।"

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণও তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

সুতরাং সাধারণভাবে বা সহজ উপায়ে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু, আমার মনে হয়, যে নীহারিকা (Nebula) মণ্ডল সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে রহস্যজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, সেই নীহারিকা মণ্ডলেই ইহারা সম্ভবতঃ আত্মগোপন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহাও হইতে পারে যে, যাহাকে আমরা নীহারিকা বলিতেছি, তাহাই হয়ত ঐ ধূমকেতুর সমষ্টি হইতে পারে।

ফলতঃ যে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা, অনুশীলন এবং পর্য্যবেক্ষণ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদের প্রকৃত তথ্য নির্দ্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার পথ নাই।

চ

আর্য্যঋষিগণ ধূমকেতু সমূহের যেরূপ নাম করণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ সমস্ত গ্রহের এবং বিশিষ্ট কয়েকটি নক্ষত্রের উপগ্রহরূপে উহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সুতরাং ধারণা করা যাইতে পারে যে, অধুনা যে সমস্ত উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, উহারা সকলেই আর্য্যঋষিগণ বর্ণিত কেতু বা ধূমকেতু। সেই জন্য ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ সমস্ত উপগ্রহই হয়ত সময়ে সময়ে

বিশেষ বিশেষ গতি ও অবস্থা লাভ করিয়া ধূমকেতুরূপে লোকচক্ষুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ও যথারীতি অনুশীলন একান্ত আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। ইহাদের স্বরূপ ও পরিচয় সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা সম্ভবপর হইলে পৃথিবীর এবং সৃষ্টিরহস্যের অনেকখানি আবরণ উন্মোচিত হওয়া সম্ভব।

এ বিষয়ের আলোচনা ও অনুশীলন করিতে হইলে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলির সাহায্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন। যথা ১। গর্গ সংহিতা ২। পরাশর সংহিতা ৩। অমিত সংহিতা, ৪। দেবল সংহিতা, ৫। নারদ সংহিতা, ৬। কশ্যপ-সংহিতা, ৭। সংহিতাবৃত্তি এবং ৮। সময়ামৃত।

পদাবলী

যে পদাবলীকীর্ত্তন আজ বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে. তাহার প্রচারকর্ত্তা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই পদাবলী কীর্ত্তনের মধুর ঝঙ্কারে তাঁহার প্রিয় লীলাভূমি নবদ্বীপ বা নদীয়াকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আজ তাঁহার সেই প্রিয় লীলাভূমিতে এই পদাবলী কীর্ত্তনের উৎপত্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালেও ইহা ভারতে বর্ত্তমান ছিল বটে; কিন্তু তাহার ব্যাপক প্রচার ছিল না বলিলে অত্যুক্তি না হওয়াই সম্ভব।

পশ্চিম প্রদেশের ভজনগানের প্রভাব যতখানি, বঙ্গদেশে কীর্ত্তনগানের প্রভাব তাহা অপেক্ষা অনেকখানি বেশী।

এই ভজন ও কীর্ত্তনের মূল উৎস এক এবং তাহার উৎপত্তি পৌরাণিক যুগে। কিন্তু. শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় আমরা কীর্ত্তনগান লাভ করিয়াছি, তাহা আধুনিক হইলেও তাহার প্রাণশক্তি প্রাচীন পদাবলী অপেক্ষা কম নয়।

পৌরাণিক যুগে যে পদাবলী প্রচলিত ছিল, তাহা সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করা বর্ত্তমানে নিতান্ত কষ্টসাধ্য। বিশেষতঃ তাহা সংস্কৃতে রচিত থাকায় বর্ত্তমানে তাহার আদর একান্ত সীমাবদ্ধ।

তথাপি বলিতে হইবে যে, উহারই অনুসরণে জয়দেব যে "গীতগোবিন্দ" রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী কালের পদাবলী কীর্ত্তনের মূল।

"গীতগোবিন্দ" সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় জনসমাজে প্রকৃত আদর লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু, তাহার অনুকরণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণবকবিগণের বাংলা বা মিশ্রবাংলা ভাষায় রচিত পদাবলী সমূহ বঙ্গসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং বাংলার প্রতিগৃহ তাহার মধুস্রোতে ভরিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, পৌরাণিক যুগে যে পদাবলী প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানে তাহার সহিত বঙ্গীয় জনসমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছু নাই। সেইজন্য আজ একটী পৌরাণিক পদাবলী সুধীসমাজে উপস্থাপিত করিলাম।

এই পদাবলীটী বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে। পদাবলীটী আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও পৌরাণিক যুগের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ, "বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ" প্রাচীন পুরাণ সমূহের অন্যতম। নিম্নে পদাবলীটী উদ্ধৃত হইল।

"কেশব কমলমুখীমুখকমলম্,
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্ ॥৮৮॥
সুরুচিরহেমলতানবলম্বা তরুণতরুং ভগবন্তম্।
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমনুকলয়তি সা তু ভবন্তম্ ॥ ৮৯ ॥"

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ১৪ অঃ।

মধুরের ভাব

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী এম, এ, কাব্যতীর্থ

সাধক কবি শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর গাহিয়াছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি-মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

ব্রহ্মসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

একমাত্র আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণদেবের আরাধনায় জগৎ সর্বদা নিযুক্ত, তাঁহারই সেবায় মানব আত্মবিস্মৃত, একান্ত বিহ্বল। গোপাল-তাপনী বলিয়াছেন "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্, গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তদ (অখিলম্) জ্ঞাতম্ ভবতি"। শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দদেবের নিকট মৃত্যুও ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে না। তাঁহার জ্ঞান হইলে অখিল বিশ্বের জ্ঞান স্বতঃই প্রকাশিত হয়। একক তিনি বহুধা বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, "একোবশী সর্বগঃ কৃষ্ণঈড্যঃ" একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি॥ (গোঃ তাঃ)

তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় ভক্তি। "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি।" ভক্তি—লক্ষণ বিষয়ে গোপাল তাপনীতে উক্ত আছে -

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনৈবামুষ্মিন মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্॥"

ভক্তিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনের উপায়; ইহাতে ইহলোক বা পরলোক সম্বন্ধে কোনও বাসনা থাকে না। মন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে একান্ত তন্ময় হইয়া যায়। ইহাই প্রেম, ইহাই নিষ্কাম ধর্ম। নারদ পঞ্চ রাত্রে উক্ত আছে—

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত তৎ পরত্বেন নির্মলম্।

হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ফলতঃ কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ পরিশীলনই ভক্তি। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ হ্লাদিনী সম্বিৎসারাত্মিকা ভক্তিই স্বীকার করেন। সেই ভক্তিতেই শ্রীভগবান স্বয়ং বশীভূত হন। এই ভগবৎস্বরূপ বিশেষভূতা ভক্তি ভগবান হইতে অপৃথক

হইয়াও ভগবান ও ভক্ত—উভয়েরই আনন্দের কারণ হন। শ্রীভগবান হইতে ভক্তির পার্থক্য নাই। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রাত্বয়িনোগুণবর্জিতে॥"

শ্রীভগবানই পরমাশ্রয়। তাঁহাতে ত্রিবৃত্তিকা একাভিন্না শক্তি বর্ত্তমান। হ্লাদিনী শক্তিই শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান বিজ্ঞানমানন্দব্রহ্ম। হ্লাদিনী শক্তিই দ্বারাই 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময়, এবং জীবসমূহকে স্ব-স্বাং-মুখ্য করিয়া আনন্দ প্রদান করেন। কবিকর্ণপূর ভক্তিদেবীর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"ইয়মেব ভক্তিদেবী। তথাহি—

অন্তঃপ্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়াণি
মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।
সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈক-জীবা—
নানন্দসিন্ধু-বিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী॥"

প্রেমরসভক্তিই শ্রেষ্ঠ। মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে বটে, তবে তাহা গৌণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া মাধুর্য্য ভাবকে পরিপুষ্ট করে।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ—ভক্তের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

আমরা দেখিতে পাই—

"তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ।"

কায়মনোবাক্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে রত, তদ্ভিন্ন জ্ঞান যাঁহাদের নাই তাঁহারাই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত। সেই ভক্তগণ আবার দ্বিবিধ—সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে অথচ সম্যক্‌রূপে বিঘ্নাদি নিবৃত্ত হয় নাই তাঁহারা সাধকভক্ত। আর যাঁহারা—

"অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতাপ্রিয়াঃ।" তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। তাঁহাদের ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে হয় না, তাঁহারা আপনার যাহা কিছু সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম আস্বাদ করেন। সিদ্ধগণ আবার দ্বিবিধ-সংপ্রাপ্ত-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধগণ শ্রীকৃষ্ণবৎ নিত্য এবং তত্তুল্যগুণশালী। শ্রীকৃষ্ণ সহ নিত্যবৈকুণ্ঠে সর্বদা বিরাজমান। ইঁহাদের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ।

কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ স্বেন পূর্ণোঽপি পার্ষদেরেব পূর্য্যতে।"

শ্রীভগবান্ যখন যেস্থানে অবস্থিতি থাকেন, নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তত্তৎ স্থানে অবস্থিতি করেন। গোপ গোপীগণ এই শ্রেণীর ভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা—"সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা (পদ্মপুরাণ)" শ্রীরাধাই ভগবানের পরা শক্তি, তিনিই শ্রেষ্ঠভক্ত। ভগবান এই সকল নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের সহিত অনন্তকাল ধরিয়া লীলা করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত পৃথক করিয়া ভগবান্‌কে কল্পনা করা যায় না।

এক্ষণে দেখা গেল ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠপথ। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু ভক্তির প্রবর্ত্তক কে? যুগধর্মের প্রবর্ত্তন সামান্য মানবের সাধ্যের অতীত। শ্রীভগবান নির্গুণ নিত্যবস্তু, তাঁহার নিজের কোনও কর্ত্তব্য নাই, তথাপি লোকশিক্ষার্থ তাঁহার ভূতলে অবতরণের আবশ্যক হয়। স্বয়ং ধর্ম আচরণ না করিলে জগৎকে শিখান যায় না। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥"

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণের অতীত হইলেও লোকশিক্ষা ও সৃষ্টিরক্ষার্থ গুণময় রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বহুবিধ গুণময়ী লীলা প্রকাশ করেন। গীতায় শ্রীমুখে স্বয়ং বলিয়াছেন—

"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্"

তিনি যদি কর্ম না করেন তবে লোক ধর্মলোপহেতু বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। সেই জন্যই তাঁহাকে অবতারত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই কলিযুগের পাপের ভার দূর করিয়া, কলিযুগের প্রধান ধর্ম ব্রজপ্রেমদান, ও নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ভিন্ন ব্রজপ্রেম দান করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। লঘুভাগবতামৃতে আছে—

"সন্ত্ববতারাঃ বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥"

কলিতে ধর্ম একপাদ; তাহার ও যখন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল, বর্ণাশ্রম ধর্ম লুপ্ত হইল, আচার বিচার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, জগৎ যখন সাধু বিগর্হিত কর্মাদিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন মুষ্টিমেয় সাধু ভক্ত কাতর স্বরে শ্রীভগবানের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "হে দয়াল প্রভু, হে শ্রীকৃষ্ণ, রক্ষা কর, তুমি না হইলে জগৎকে উদ্ধার করিবে, কেই বা পথের প্রবর্ত্তক হইবে।" শ্রীভগবান এই করুণ

আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ধরাধামে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীরূপগোস্বামীপাদ ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছেন—

"অনর্পিত-চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

মধুর উজ্জ্বল-রসমিশ্রা ভক্তির প্রচার মানসেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ শ্রীগৌরহরি কলির জীবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। নিজে প্রেমরস আস্বাদন না করিলে অপরকে আস্বাদন করান যায় না। প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ধরাধামে আসিলেন।—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্রীরাধার প্রেম-স্বরূপ কিরূপ, মাধুর্যরসে কিরূপ অমৃতত্ব আছে, শ্রীরাধা কিরূপ আনন্দলাভ করেন, এই বিষয়ত্রয়ে লোভনিবন্ধই "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তৎসঙ্গে তদীয় পরিকর মণ্ডলও আসিলেন। দেশে প্রেমের বন্যা আসিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং বন্যায় ভাসিয়া অপরকেও প্লাবিত করিলেন।

কলিতে ভক্তির পন্থা শ্রেষ্ঠ। সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ নিহিত আছে। ইহা জ্ঞান বা কর্মের অপেক্ষা রাখে না। যুক্তি তর্ক ভাসিয়া যায়, মাত্র বিশ্বাসেই শ্রীভগবানের করুণা লাভ করা যায়। অন্য কোনও কামনা মনোমধ্যে স্থান পায় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভোগ মোক্ষাদির বাসনা পরিহার করিয়া জ্ঞান ও কর্মাদির পথ ত্যাগ করিয়া মাত্র শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হয়—তাহাই উত্তমা ভক্তি। শ্রীনরোত্তমঠাকুরও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞানকর্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥”

যিনি যে ভাবে পারেন সেই পরমদেবের আরাধনা করুক। গীতায় শ্রীভগবানও যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের একটী আশ্রয় করিয়া ভক্তগণ শ্রীভগবানের আরাধনা করেন। শান্ত ও দাস্য রসে ঐশ্বর্য্যের সংস্পর্শ আছে—ভক্তের হৃদয়ে কিছু প্রার্থনা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও সর্বোপরি মধুররসে ঐশ্বর্য্যের নামগন্ধ নাই, প্রার্থনাও নাই। তাই শ্রীভগবানও সর্ববিধ ঐশ্বর্য্য, বিভূতি ত্যাগ করিয়া সখা, বন্ধু ও নিতান্ত আত্মীয় ভাবে ভক্তের কাছে ধরা দেন। ইহাতে কেবল সেবা—সেবায় ভক্ত পরিতৃপ্ত, আর কিছু কামনা তাহার নাই। তাহার মধ্যে আবার মধুর রসই শ্রেষ্ঠ। এই রসে জগৎ মত্ত হইয়া উঠে। উদ্দাম আবেগ ও বিশ্বব্যাপী আনন্দের বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়া তোলে। ভক্ত ও ভগবান উভয়েই আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়ে। ভক্তের প্রার্থনার অবসর থাকে না —শ্রীভগবানের কিছুই দিবার ও থাকেনা উভয়েই আনন্দরসে নিমজ্জিত। চরিতামৃত গাহিয়াছেন—

“পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে” ॥ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ, মমতাধিক্য ও নিজ অঙ্গাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবন, এই পঞ্চবিধ মধুর রসের গুণ। “এই পঞ্চগুণ হৈতে মধুর পুষ্ট হয়। পঞ্চভাবে মিলি কৃষ্ণরস আস্বাদয় ॥” এই মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও ভক্ত প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণ কান্ত এবং ভক্ত কান্তা। ইহারই অপর নাম “গোপীভজন।”

কলিতে শ্রীনাম ভজন ও কীর্ত্তন ভিন্ন জীবের উদ্ধারের অন্য পথ নাই। ভক্ত প্রহ্লাদ জগতের মঙ্গল-তরে ঘোষণা করিয়াছেন—

“জপতো হরিনামানি শ্রুতেঃ শতগুণাধিকঃ। আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন শ্রোতৃন্ পুনাতি চ ॥”

আমরাও উচ্চকণ্ঠে শ্রীহরি ধ্বনি করিয়া ভবসাগরের তরণী আশ্রয় করিলাম।

আনন্দ ও অনুভূতি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ চাহিয়া আসিতেছে—"সুখংমে ভূয়াৎ" দুঃখকে তাই বড় হইতে না দিয়া সুখকেই ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যুগে যুগে মানব নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত জগত্‌ও চাহিতেছে—শুধু সুখ, শুধু আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দ লাভের বিভিন্ন প্রণালী যে ভাবে বিংশ শতাব্দীয় সভ্য মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

কাজের মধ্য দিয়া ক্লান্তিকে অপনোদনের চেষ্টা আজ নূতন নয়। প্রাচীন রোম, মিশর, গ্রীস্‌ প্রভৃতি দেশেও এই মধু ব্রত উদযাপন করিয়াছে পৃথিবীর নানা সভ্য মানব।

উপনিষদ ও এই আনন্দ সত্তার সন্ধান দিয়াই বলিয়াছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"

এই আনন্দের প্রেরণায় শিল্পীর শিল্প, কবির কাব্য, সাহিত্যিকের রচনা, বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। অজন্তার, চারুশিল্প ও ভারতের এক বিপর্য্যয়ের দিনে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজ সমগ্র ভারতে নিপুণতম সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। রাষ্ট্রের পরাধীনতা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ আধুনিক মানুষের অন্তরকে নিরানন্দ করিয়াছে। স্রষ্টার সৃষ্টি চতুর্দ্দিক দিয়া আবেষ্টনী ও পারিপার্শ্বিক আনন্দের অভাবে বাধার চাপে স্বতঃস্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। নিজেরা সৃষ্টি করিতে অসমর্থ তথাপি সমালোচনা করিতে হইবে ইহাই হইয়াছে বর্ত্তমান যুগাদর্শ।

অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন সাংসারিক সুখ সুবিধা মিটাইবার জন্য। অধিকতর আকাঙ্খা মানুষের শান্তিকে দুঃখাবহ করিতেছে। মহম্মদ জীবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"If ye have one pice only, buy bread of it
If two, one worth of bread and one worth of flower"

অর্থাৎ যদি একটী পয়সা জোটে প্রথমে দেহ রক্ষার জন্য খাদ্য কেনা প্রয়োজন। দুইটী জুটিলে চিত্তের খোরাক স্বরূপ সুগন্ধি পুষ্প কেনা সঙ্গত। প্রকৃতির ফলে ফুলে আলো ও বাতাসে যে প্রাণ প্রাচুর্য্য আমরা অহরহ পাইতেছি, সেইটাকে গ্রহণ করা ও উপভোগ করা জীবনের ধর্ম্ম। অন্তরের শুচিতা ও স্ফূর্ত্তি জীবনকে মধুর করে। এইরূপ পূর্ণাঙ্গ জীবনের সংস্পর্শে ও সঙ্গে অন্য জীবনও পরিপূর্ণ হয়। বিংশ শতাব্দীর যুগে Practical মানুষের জীবন উপভোগের ধারা অযথা বিড়ম্বিত। পরিণাম সুখাবহ আনন্দ Modern recreation এর আদর্শ নয়। তাই আর্টের নাম দিয়া মানুষের চিত্তে যে আনন্দের পরিবেশন করা হইতেছে, তাহাতে মাধুর্য্য বা মঙ্গল অভাব হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে চিরদিনই আনন্দের পিছনে জ্ঞানের Back-ground ছিল। আনন্দকে ফলবান্ করিতে হইলে তাহার Educative Value থাকা প্রয়োজন। আদিম জাতিদের উৎসব এবং আনন্দের মধ্যে ও (বীভৎসতার নামেও) দেহ মনের যথেষ্ট খোরাক ছিল।

অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের তাগিদ্‌কে আরও পরিচালিত করে অযথা ব্যয় বহুল পরিণামে উপার্জ্জনের দিকটা বৃদ্ধি পাইয়া মানুষের চিত্তকে এত বহিরঙ্গ করিয়া তোলে যে হরতালের দিনেও বণিকগণ গৃহের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাছেও নিশ্চিন্ত হইয়া দুদণ্ড বসিয়া থাকিতে পারেন না। ঘরকে ক্ষুদ্র করিয়া বাহিরের প্রতি স্বার্থবুদ্ধি ও মমত্ব বোধ তাই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে, অন্তর হইতেছে দৈন্য ও রিক্ততায় দুঃখ ম্লান।

দেহের স্নায়ুর চলাচল ও পেশীর কার্য্য যদি বন্ধ হইয়া যায় বাহির হইতে অক্সিজেন্ ভরিয়া মুমূর্ষুকে বাঁচাইয়া তুলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হইতে পারে? সৌখিনতা বাহিরের, অন্তর হইতে আনন্দ না আসিলে পরিপূর্ণ উপভোগ সম্ভব হয় না। কুৎসিৎকে সুন্দর করিবার চেষ্টা যেমন হাস্যকর, বহিরঙ্গকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া অন্তরের সহিত পাল্লা দেওয়াও সেইরূপ।

অবসর বিনোদন কিম্বা কৃত্রিমতার আড়ম্বর প্রদর্শন আজ বড় কথা নয়। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি স্থাপন ও আনন্দের সম্পর্কই হইতেছে সর্ব্ব যুগের চির প্রয়োজন।

ভাববাদকে অসার বলিয়া অনেকে ব্যঙ্গ করেন। কিন্তু মানুষকে বড় করিয়া তোলে এই ভাবপ্রাণতা। নিখিল বিশ্বে প্রতিদিন যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহা মানুষের মনকে লীলায়িত করিয়া বিরাটের সৎসত্তাকে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা

করিবার অবসর করিয়া দেয়, তখন মানুষ নিজের খণ্ডত্বোপলব্ধি করিয়া অখণ্ড স্বরূপকে ধারণা করে—তখন সে হয় সচেতন, সংসার বিরাগী। এই ভাবপ্রবণতা লালা বাবুকে সৎপথে টানিয়াছে, বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলকে প্রকৃত চিন্তামণির সন্ধান দিয়াছে, পাপী রত্নাকরকে কর্ম্মফলের আত্মজ্ঞান শিখাইয়া সাধু করিয়াছে। এই কারণে বাঙ্গালী বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী মাড়োয়ারী, ধনী শ্রেষ্ঠীর সহিত মণীষি গুণীর আদর্শ চিরদিনই বিভিন্ন। সাহিত্য চর্চ্চা, শিল্পজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি সৃজনশীল কর্ম্মে যাহারা অনুরাগী তাহাদের প্রাণসম্পদ প্রাচুর্য্যের আস্বাদনেও সৌন্দর্য্যের আনন্দে ভরপুর।

আজ পৃথিবীতে তাই দরকার হইয়াছে আনন্দ-স্বরূপের উদ্বোধন—"আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" মন্ত্রের কল্যাণ কামনা।

কবির ভাষায় বলিতে গেলে আজ প্রয়োজন—

কাব্য নয় চিত্র নয় প্রতিমূর্ত্তি নয়।
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয় হৃদয়॥

বর্ত্তমান ও অতীত

শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী

অন্ধকারে জন্মে ও তার মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অনেক কিছুই সেই অন্ধকারের মধ্যেও তার চোখে পড়ে; তার ভীষণতা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তখন তার আর থাকে না।

সেই অন্ধকারের বুকে একবার যদি তীব্রতম আলো এসে পড়ে, মানুষ সে আলোয় আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। অন্ধকারের মধ্যেও যে সামান্য অনুভূতি তার থাকে, সামান্য আলোর দীপ্তিতে সে অনুভূতিটুকুও বল সে হারিয়ে ফেলে। সে তখন তার যেটুকু শক্তি থাকে, তাও হারিয়ে ফেলে, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে হয় অজ্ঞ। যে অন্ধকার একদিন তার কাছে ভীষণ মনে হয় নি সেই অন্ধকারই তখন তার কাছে হয়ে ওঠে অতি ভীষণ; মরণ নিশ্চিত জেনেও তখন সে আলো খুঁজতে ছোটে। যে আলোয় চক্ষু অন্ধ হয়, যার স্পর্শে সকল শক্তি অন্তর্হিত হয়, জেনেশুনেও সেই আলোকে জড়িয়ে ধরে তারা কোন রকমে বেঁচে থাকতে চায়।

যে যুগ চলে গেছে তাকে আমরা আজ অন্ধকারময় লৌহযুগ বলে থাকি। ইতিহাস প্রমাণ করে সে যুগের মানুষেরা ছিল অসভ্য, বর্ব্বর, তারা শিক্ষা পায় নি--- জ্ঞান পায় নি, সভ্যতার আলো তারা পায় নি। বিজ্ঞানের সম্বন্ধে তারা কিছু জানে নি তাই চর্চ্চাও করে নি। যা কিছু স্বাভাবিক,—সব কিছুই একটা কোন অদৃশ্য শক্তির দান বলে মেনে নিত এবং সেই অদৃশ্য শক্তিকে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান নামকরণ করেছিল। পরে জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু এই অপরিহার্য্য নিয়মকেও দেবতার পূজার্চ্চনা দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত করতে চাইতো।

সে যুগের সঙ্গে বর্ত্তমানের আকাশ পাতাল পার্থক্য আজ আমরা সহজেই অনুভব করি। সে যুগে মানুষ যেমন একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বই মেনে নিত বর্ত্তমানের মানুষ তা করতে রাজি নয়। অজ্ঞাতকে সহজে মানতে সে চায় না। সে চায় সব কিছুরই প্রমাণ নিতে, সেই জন্যই তারা অনেক উপরে আসন দিয়েছে বিজ্ঞানকে, সে করছে বিজ্ঞানের আলোচনা। বর্ত্তমান যুগ সর্ব্বসম্মত বিজ্ঞানের যুগ, এবং এই যুগ প্রমাণ করেছে যা কিছু হতে পারে তা তার সাহায্যেই হওয়া সম্ভব। দেবতা যদি বলা যায়, বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানকেই মেনে নেবে।

আজ তাই বিজ্ঞানের জয় মানা চলে, মিথ্যার বুজরুকি চলে না, এবং এই সত্যকেই চরম বলে মেনে নেওয়া হয়। এ সত্যে পৌঁছানোর আগে আমরা ভেবে নেই —সেই লৌহময় যুগ—যাকে আমরা মিথ্যা বলি,—যা ছিল অন্ধকারে ঢাকা, তাই ভালো ছিল না এই আলোময় স্বর্ণ যুগ—যা আড়ম্বরময়, তাই শান্তিপ্রদ

বর্ত্তমানের সঙ্গের তুলনা করে আমরা দেখি—আমরা আলোর মধ্যে এসেছি, সভ্য শিক্ষিত এবং সংস্কৃত হয়েছি, আমাদের কেবল দৈহিক নয়—মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে—হচ্ছে, আরও হবে, সেই পরিমাণে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি বেড়েছে, আরও বাড়বে। আগেকার বর্ব্বর যুগের কথা ছেড়ে দিলেও মধ্যবর্ত্তী যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যা নিয়ে যে ভাবে দিন কাটিয়ে গেছেন, আমরা তা পারি নে।

আমাদের আহার বিহার, বসনভূষণ, ধর্ম্ম সাহিত্য সব কিছুরই সংস্কার হয়েছে। মধ্যবর্ত্তী যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যা নিয়ে খুসি হয়ে থাকতেন, আমরা আজ তা নিয়ে থাকতে পারি নে। বৈদেশিক শিক্ষা, সভ্যতা আচার বিচার আমরা নিজেদের সত্ত্ব ভুলে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি; আমাদের সাহিত্য বৈদেশিক আবহাওয়ায় প্রকট হয়ে উঠেছে,—মানুষের রুচি অনুযায়ী সাহিত্যের গতিও বদলে গেছে। বর্ত্তমানের সভ্যতা আমাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করেছে, এতটুকু ত্রুটী বিচ্যুতি তাই প্রতিপদেই চোখে পড়ে যায়, এতটুকু অনুষ্ঠানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কাও আমাদের বিহ্বল করে তোলে।

প্রতিপদে এই যে সাবধানতা অবলম্বন করা, সর্ব্বাংশে পরের অনুকরণ করে বর্ত্তমানের তালে পা ফেলে চলা, এ শিক্ষায় অভ্যস্ত হতে আমাদের অনেক চেষ্টা, অনেক যত্ন করতে হয়েছে, তবে আমরা কৃতকার্য্য হতে পেরেছি। একদিন ছিল যে দিন ক্ষেতের ধানের মোটা লাল চালে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হতো, তাঁতে বোনা মোটা কাপড় আমাদের লজ্জা নিবারণ হতো, কাষ্ঠ পাদুকা বা মুচির হাতের তৈরী জুতা চরণের কষ্ট দূর করতো। সেদিন যা ছিল বর্ত্তমানের চাকচিক্য এতটুকু জিনিষের জন্য মারামারি এতটুকু, ত্রুটির জন্য এতখানি সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয় সেদিন ছিল না। বিজ্ঞান প্রমাণের প্রাণপন চেষ্টা, অভিনব আবিষ্কারের নিত্য নব কৌশল। তবু সেদিনে একপ্রাণতা ছিল, প্রাচুর্য্য ছিল, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যে প্রীতিবন্ধন ছিল তাতে পাওয়া যেত প্রাণের সন্ধান, সহজ সরলভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন।

গ্রামের যে আবেষ্টনীর মধ্যে আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে, বর্ত্তমানে

আমরা সেই সব গ্রামের দৈন্যাবস্থা দেখতে পাই। যে সব গ্রাম একদিন ছিল সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শ্রীযুক্ত, সে সব গ্রামে আজ লোক নাই—। দেশের বুকে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, নারী নির্য্যাতন বেড়ে চলেছে, প্রতিবিধান করার ক্ষমতা দেশে যে কয়জন লোক বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের নাই কারণ তারা সংখ্যায় কম, নিত্য—অভাবে ব্যারামে তারা শক্তিহীন, ডাকলে তাদের সাড়া পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমানে সহরগুলি হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধিশালী, কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা সভ্যতায় উন্নত। বিজ্ঞান আজ দেখিয়েছে অর্থাগমের সহজ সরল পথ, যান্ত্রিক যুগের মানুষ আজ প্রচুর কস্ট করে হাতে কোন জিনিষ গড়তে চায় না; কারণ এতে কায়িক পরিশ্রম যথেস্ট এবং সময় ও যায় অনেক। মানুষ তাই দেবতাকে আজ ভুলে গেছে অথবা ভুলতে বসেছে। তারা বিজ্ঞানকে আজ অনেক উপরে স্থান দিয়েছে, তাই আজ যান্ত্রিক যুগের জয় জয়কার।

ঠিক এই কারণেই বর্ত্তমানের মানুষ ভুলে গেছে সমপ্রাণতা, সৌহার্দ্দ্য এসেছে একটুকু নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ, মারামারি, এসেছে সাম্প্রদায়িকতা, এসেছে ঈর্ষা—ছোট বড়র ভেদাভেদ, ঘৃণা কুৎসা ইত্যাদি।

আমরা সেই মানুষের অন্তর্ভুক্ত। বিরাট একটা জাতিকে যেখানে যা মেনে নিয়েছে, যুগের হাওয়া বর্ত্তমানে আমাদেরকেও তা মানতে বাধ্য করেছে। আজ আমরা আমাদের দেশে পাইনে যুধিষ্ঠিরের মত সত্যবাদী ধর্ম্মভীরু লোক, কর্ণের মত মহান দাতা, দধিচীর মত পরার্থপর পুরুষ, বুদ্ধ, চৈতন্যের মত ধর্ম্মপ্রাণ ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমরা পাইনে কুন্তী শচির মত আদর্শ জননী, সীতা সাবিত্রীর মত প্রতিপ্রাণা পত্নী, সংঘমিত্রা অরুন্ধতীর মত সর্ব্বত্যাগিনী তপস্বিনী। আমরা আজ চাই নূতন করে গীতা, উপনিষদ, দর্শন, বেদ, বেদান্ত,—কিন্তু কোথায় সে সব মহাপুরুষ যাঁরা রচনা করবেন। সেই বহু পূর্ব্বযুগে যা রচনা হয়ে গেছে, আজও তাই চলছে। আজ আমাদের সাহিত্য নূতন করে গড়ে উঠছে, তার পরে এসে পড়ছে বর্ত্তমানের হাল, চলছে কত আলোড়ন, বিলোড়ন; কত যাচ্ছে, কত থাকছে।

বিকৃত ইতিহাস পেয়ে বর্ত্তমানে আমরা খুসি হয়ে থাকতে পারিনে কারণ যুগের হাওয়া আমাদের বদলে দিয়েছে।

আমরা ভেসে চলেছি বর্ত্তমানের স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত, আমাদের কল্পনার রচিত সাহিত্যকে হাল্‌কা তুলার মত উড়িয়ে দিয়েছি বিস্তৃত আকাশের তলে, পরিণাম কি—বিশ্রাম লাভ করব কোথায়, তা আজও জানি না।

পশ্চিমের যে আলো, যে শিক্ষা, যে সভ্যতা আজ পূর্ব্বের ললাট চুম্বন করে রাঙিয়ে তুলেছে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়তো আছে। আমরা আজ শিক্ষায়, সভ্যতায় বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে ভাবি—সেই অন্ধকারময় লৌহযুগের মানুষেরা অসুখী ছিল, তারা কিছুই পায় নি, আমরা আলোপূর্ণ স্বর্ণযুগে জন্মেছি, আজও বর্ত্তমান আছি এবং অনেক পেয়েছি, এ জন্য নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি।

আমরা ভাবতে ভুলে যাই যে যুগটাকে আমরা বর্ব্বর যুগ বলে থাকি, যে যুগেও বিজ্ঞানের চর্চ্চা চলতো। আজ এরোপ্লেন সে যুগের পুষ্পরথের সভ্যতা নির্ণয় করে. মেঘের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ, অস্ত্রের মধ্যে ঝড়, বৃষ্টি, বিষাক্ত বাষ্পের সৃষ্টি। আজ পাশ্চাত্য যা নিয়ে এগিয়েছে যে জাতি যা নিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি নামে পরিচিত হয়েছে, আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখতে পাই তার আলোচনা আমাদের এ দেশে সেই অন্ধকারময় যুগেও হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের আলোচনা সে যুগে হলেও সাধারণের মধ্যে এর প্রচার ছিল না, সে জন্য ক্রমোন্নতি লাভ করতে পায় নি। পরিচালনার অভাবে উৎসাহ নষ্ট হয়েছিল এবং বিজ্ঞান জগতে অন্ধকার এসে পড়েছিল।

এদেশ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, পাশ্চাত্যে তখনই হল আলোর বিকাশ। অতিরিক্ত অন্ধকার হতে সেই অতিরিক্ত আলোয় এসে আমরা অন্ধ প্রায় হয়ে পড়েছি দিশাহারা হওয়ার ফলে চলার পথ হারিয়ে ফেলেছি এবং সেই জন্যই লক্ষ্য স্থলে আমরা পৌঁছাতে পারছি নে। আমাদের গৃহশিল্প বর্ত্তমানে যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় ধ্বংসোন্মুখ। দেড়শত বৎসর আগেও দেশের গ্রামগুলি ছিল সমৃদ্ধিসম্পন্ন। দেশের জমি ছিল উর্ব্বর, গ্রামের মাঠ ছিল লক্ষ্মীর সিংহাসনদেশের ঘরে ঘরে চরকা চলত, তাঁত চলতো; ভাত কাপড়ের জন্য দেশের লোককে কোন দিন পরের গলগ্রহ হতে হয় নি। আজ সেই দেশের গৃহশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে, মাঠ হয়েছে অনুর্ব্বর, যান্ত্রিক যুগের মানুষ জীবিকার্জ্জনের জন্য ছুটেছে কোলাহলপূর্ণ সহরে, তাকে ভাত কাপড়ের যোগাড় করতে হবে।

কিন্তু অভাব মিটবে কি করে? বর্ত্তমানের সভ্যতা আমাদের সামনে লক্ষ অভাব সৃষ্টি করেছে; একটা মিটতে না মিটতে আর একটা অভাব এগিয়ে আসে। আমরা আজ সভ্যতার অনুবর্ত্তী হয়ে পোযাক পরিচ্ছদের বাহুল্য বাড়িয়ে চলেছি, আহার বিহারে বাহুল্য অনেক বেড়ে গেছে, সংক্ষিপ্ত ভাবে জীবনযাপন অভদ্রতা

বলেই পরিগণিত হয়।

সাধারণ জীবন যাপন করতেও মিশেছে ভেজাল। আমরা কলে ছাঁটা সাদা চাল, কলের তৈল, ভেজিটেবিল ঘি প্রভৃতি অসঙ্কোচে আহার করি। পরিশ্রম আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে করে যেতে হয়, অথচ আমরা উপযুক্ত আহার্য্য পাইনে, ফলে আমাদের স্বাস্থ্য দুদিনে ভেঙ্গে যায়,—আমাদের ঘরে ঘরে তাই দেখা যায় বেরিবেরি, থাইসিস, টি, বি, প্রভৃতি।

প্রার্থনার একটী বাণী মনে পড়ে—অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল—। কিন্তু তীব্রতম আলো আমাদের সহ্য হবে কিনা তা আমরা কোন দিন ভেবে দেখিনি। নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার মিলন আমরা করে নিতে চাই, কিন্তু মাঝখানে দাঁড়ায় নিত্যকার লক্ষ অভাব। যতক্ষণ আমরা ফেলে আসা ঘরের পানে না ফিরব ততক্ষণ আমাদের এমনই ভাবে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করতেই হবে।

আমাদের যে শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে, এখনও যাচ্ছে সেই শিল্প আবার বাঁচিয়ে তোলা আবশ্যক। আমাদের অভাব যেমন সহস্রগুণ বেড়ে উঠেছে, সেই অভাব মিটানোর ভার নিজেদেরই হাতে না নেওয়া ছাড়া উপায় নাই। সেই প্রচেষ্টা এবং তার কৃতকার্য্যতাই হবে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার পরিচয় ও পুরস্কার।

এ কথা সত্য বর্ত্তমানের প্রভাব কেউই এড়াতে পারে না, কোন যুগে কেউ পারবে না। আজ পশ্চিমের যে শিক্ষা ও সভ্যতা স্রোতের বেগে পূর্ব্বের উপর এসে পড়েছে তাকে গ্রহণ করতেই হবে, জাতীয় জীবন গড়তে পেছিয়ে থাকা চলবে না। বর্ত্তমানের শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি আমাদের পরে প্রভাব বিস্তার করবে—তবু আমরা তার মধ্যেও বজায় রাখতে চাই জাতীয়তা আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি, "আমরা আছি" এই পরম সত্যকে বজায় রাখতে। আসল দিকে কেবল মেকি বা ফাঁকি নিয়ে ভুলে থাকার সময় বা দিন আর নাই। এই যান্ত্রিক যুগের প্রথম মুহূর্ত্তে যে বিহ্বলতা এসেছিল, প্রতিদিনকার হাজার অভাবের নিষ্পীড়নে দলিত পেষিত হয়ে আমাদের এখন সে ভুল সে মোহ দূর করবার সময় এসেছে; আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, আমরা পেয়েছি আলো, শিক্ষা সভ্যতা বহিজ্ঞ্যান, কিন্তু সেই সঙ্গে হারিয়েছি আমাদের আহার্য্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস ও উদ্যমশীলতা।

আমরা জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করব সেই দিন, যে দিন অনেক পেয়েছি ভেবে বৃথা গর্ব্বিত হয়ে উঠব না, সঙ্গে সঙ্গে হারানোর কথাটাও ভাবব। আমরা যা নেব, নেওয়ার আগে দেখব তা আমাদের পক্ষে কতখানি উপযুক্ত হবে।

মানুষকে বাঁচতে হলে মানুষ হয়েই বাঁচতে হবে, নিবিড়তম অন্ধকারে বা তার আলোকে আপনার অস্তিত্ব বিলীন করে নয়। অন্ধের মত হাতড়ে পথ নির্দ্দেশ করতে গেলে আছাড় খেয়ে পড়বার সম্ভাবনা যে কোন মুহূর্ত্তে, সেইজন্য নিজেদের চলার পথ নিজেদেরই নির্ব্বাচন করে নেওয়া দরকার।

আমরা বাঁচব--এই হোক আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিজেদের ইতিহাস ভুলে গিয়ে নয়, স্রোতের মুখে ভেসে গিয়ে নয়--নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে--নিজেদের কৃষ্টি সভ্যতার পরিচয় দিয়ে, মানুষ হয়ে আমরা বাঁচব, এই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে। বর্ত্তমানের এই ইতিহাস প্রস্তুত হয়ে থাকবে উত্তরকালে যারা আসবে তাদের জন্য, এবং ইতিহাসই তাদের গড়ে তুলবে মানুষ করে, তাদের বুকে দেবে শক্তি, সাহস, দেবে কর্ম্মে প্রেরণা।

অতীতের কিছুটা নিয়ে বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ গড়ব--এই হোক আমাদের বর্ত্তমান সাধনা--একমাত্র লক্ষ্যপথ।

রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল প্রভাব

মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম-এ

বাউল শব্দটার অর্থ লইয়া গোলমাল দেখিতেছি। ডক্টর সুনীতি কুমার বাতুল শব্দটা হইতে বাউল শব্দের নিষ্পত্তি করিতেছেন। [Vide Origin of Bengali Language Vol.—I P P 342, 423, 513] অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। [Vide Viswa Bharati Quarterly journal January, 1929] শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বসু মহাশয় ইহা—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত বৌদ্ধগানে ধৃত "বাজুল" শব্দ উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। বাজুল শব্দটার অর্থ বজ্রধর অথবা গুরু। [Vide Viswa Bharati Quarterly journal April, 1926 P 2] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বলেন "বাহিল" সম্ভবতঃ বাউল শব্দেরই অপভ্রংশ।

কানুপাকে বাউল বলা হইয়াছে। [দ্রস্টব্য সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা পৃ-৪] বন্ধুবর ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক সাহেব তাঁহার "বঙ্গে সূফীপ্রভাব" (পৃ ১৮৭-২১৫) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইহা "আউলিয়া" শব্দ হইতে ধ্বন্যাত্মক ভাবে জন্মিয়াছে। [দ্রস্টব্য—হারামণি পৃ-১] বাউল শব্দটা প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। অথচ ইহার প্রাচীন ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার ব্যবহার সুস্পষ্ট এবং সুপ্রচুর। চৈতন্য চরিতামৃতের বিখ্যাত উক্তি সকলের নিকট সুপরিচিত। বাউল শব্দ এই স্থানে বৈষ্ণব আচার্য্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বাউল শব্দটার প্রায় সকল অর্থই বাউলকে গুরু হিসাবে পরিচয় করিয়া দিতেছে। সামাজিক এবং বাহ্যব্যাপারে তাঁহারা নিতান্ত উদাসীন; সম্ভবতঃ এই জন্য তাঁহারা বাতুল, উন্মাদ বলিয়া জনসমাজে চিহ্নিত হয়। এই শব্দের একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে ইহা মুসলমানী, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় মধ্যযুগীয় সাধুদের, সুফীদের এবং ফ্রিয়ারদের একধর্ম্মী অর্থ প্রকাশক। প্রাথমিক যুগের সুফীদেরও এই জাতীয় লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান ছিল এবং সুফী শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিভেদ পরিলক্ষিত হয়।

বেদ বহির্ভূত এবং বেদপূর্ব্ব এই বাউলেরা বেদের ঈশ্বর ধারণা এবং উপাসনার সঙ্গে এই শব্দের আদৌ মিল নাই। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইহাদিগকে বৈদিক ব্রাহ্ম শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন। ভারতবর্ষের পূজায় ঈশ্বরোপলব্ধির ইঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া আমার মনে হয়। বেদপূর্ব্ব এবং বেদবহির্ভূত ভারতীয় সাধনা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণা হয় নাই; এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুসংবদ্ধ কোন পুস্তকাদি রচিত হয় নাই। বাউলদের প্রকৃতি অদ্ভুত; অনেকটা শিবের আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আহার বিহার, আচার বিচার, পোষাক পরিচ্ছদ, সুখ দুঃখ কোন দিকেই ইঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। জগতের প্রতি এমন একটী বলিষ্ঠ নিরাশক্তি এবং আনন্দপূর্ণ সংযোগ আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। বাউলেরা ভয়ঙ্কর আত্মবিশ্বাসী—একেবারে চাঁদসদাগরের জাতীয়—অটল, অচল এবং নির্ভীক। জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি মোহ নাই —না শিক্ষার প্রতি, না ধর্ম্মার্চ্চনার প্রতি। না দেবস্থানের প্রতি না কোন দেবদেবীর মূর্ত্তির প্রতি। পৌত্তলিক ভারতবর্ষে এমন একটা সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকা আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। কেন না, নির্ম্মম একেশ্বরবাদী শেষ পর্য্যন্ত অংশতঃ পৌত্তলিকতাশ্রয়ী হইয়া পড়ে, যেমন বৌদ্ধেরা, মুসলমানেরা, এবং ব্রাহ্মরা হইয়াছেন। মানুষের ব্যক্তিগত সাধনার উপর ইহারা বড় বেশী জোর দিয়াছে। কোন প্রকার শৃঙ্খলকে ইহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। ইহাদের কথাই হইতেছে—'তোরই মধ্যে অতল সাগর।"

বাউলদিগকে কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মের এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মীদের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে চাহেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে একথা অস্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এবং আচার বিচার বিদ্রোহী সামাজিক নীতির মধ্যে ইহারা একটা বড় মানসিক আশ্রয়স্থল পাইয়াছিল, এমন কি কেহ কেহ ইহাদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কাহাকে কাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল।

কিন্তু কথা হইতেছে ইহাদের কোনও শাস্ত্র নাই; শাস্ত্র ইহারা স্বীকার করে না। ইহাদের কোনও উপাস্য দেবদেবী নাই। কোন ধর্ম্ম উৎসব নাই ইহাদের গুরুর সংখ্যা নাই—অতিথ গুরু পথিক গুরু—। তাহা হইলে কঠোর বৈষ্ণব পর্য্যায় ইহারা কি প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে? আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাংলাদেশ ব্যতিরেকে অন্যত্র বাউলের সাক্ষাৎ মিলা দুষ্কর।

থাকিলেও এই নামে তাহারা পরিচিত নয়। বাউল মতবাদ বাংলার বৈশিষ্ট্য। বাংলার মাটী, জল এবং অন্ন লইয়া ইহারা জন্মিয়াছে।

বাউলেরা অশিক্ষিত এবং শাস্ত্রহীন হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত এবং শাস্ত্রীয় বাঙ্গালীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একদিকে পারস্য মরমবাদ ও অন্যদিকে বাউল মরমবাদ যুগপৎ ভাবে বাঙ্গালীর মানস জগতে কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হইয়াছিল। আধুনিক কালে বাউল প্রভাব বিশেষতঃ ইহার সাঙ্গিতীক সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলামের উপর আশাতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রভাব বিস্তার বিস্ময়ের বিষয় নহে কেন না যে পারিবারিক ও উদার আবহাওয়ায় প্রতিপালিত এবং বর্দ্ধিত সেখানে সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তা এবং চমৎকার সৌন্দর্য্য ও রসবোধ বিশেষ অন্তরের সঙ্গে চর্চ্চা করা হইত। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র কুড়ি বৎসর [রবীন্দ্র জীবনী দ্রষ্টব্য] তখন তিনি "ভারতী"তে বাউল গান নামক একখানি গ্রাম্য গান সংগ্রহ গ্রন্থের সমালোচনা কালে এই বিষয়ে তাঁহার অনুরক্তি এবং আকর্ষণের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শিলাইদহে অবস্থানকালে তিনি লালন ফকীর প্রভৃতির বহু গান প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। [দ্রষ্টব্য —ধানের মঞ্জুরী] শুধু তাহাই নহে শিলাইদহের গ্রাম্য সৌন্দর্য্য, পদ্মার বিশ্বমোহন গাম্ভীর্য্য ও চাঞ্চল্য এবং পদ্মার চরের সরল মাধুর্য্যপূর্ণ গ্রাম্য জীবনধারা রবীন্দ্রনাথের মানস জগতে অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রবীন্দ্র-নাথকে নূতন রংয়ে রঞ্জিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের অন্ত নাই, তাই তিনি নিজে জমিদার হইয়াও, অভিজাত পরিবারের সন্তান হইয়াও তাঁহার গ্রাম্য প্রজাদের দ্বারা অবহেলিত সামাজিক জীবনে অস্পৃশ্য নিতান্ত দরিদ্র এবং নিরীহ এই বাউলদের সঙ্গে একটী উদার আগ্রহ লইয়া মিশিতেন—শুধু তাহাই নহে তাহাদের গান সংগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের বাণী ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজে নির্ভীক হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন,—"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখেছেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাই-দহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ অলোচনা হত। আমার আনন্দ গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল

সুরের মিল ঘটেছে। ওর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স—শিলাইদহ অঞ্চলেরই কোন এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

—কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে ?
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে

[দ্রষ্টব্য হারামণি পৃ /০]

এই বাউলদের সঙ্গে মিলিবার কথা ও স্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী নামক গল্পের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বৈষ্ণবীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ছিল নাম সর্ব্বক্ষেপী। সর্ব্বক্ষেপী ব্যতীত শিলাইদহ ডাকঘরের ডাকপিয়ন গগনের গানে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যখন তিনি প্রথম এই "মনের মানুষ" গান শুনলেন তখন তাঁর হৃদয় সুগভীর ভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল [Profoundly stirred my mind Vide Creative Unity—Tagore P. 78] গগনের বয়স বেশী ছিল না, মাত্র উনিশের কোঠায়। গগন ব্যতীত লালন ফকীরের সঙ্গে উঁহার জানা-শুনা ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। অবশ্য তিনি নিজে বা তাঁহার জীবনী লেখক প্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা কোথাও উল্লেখ করেন নাই। তবে পরলোকগত সুধী সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী মহাশয়ার মারফতে মৌখিক ভাবে শুনিয়াছি যে লালন মাঝে মাঝে শিলাইদহে বজরায় আসিতেন।

বাউলদের সম্বন্ধে এই যে আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে সৃষ্টি হইল তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ও জীবন্ত থাকিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বাউল প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 'ফাল্গুনী' নামক নাটকে আমরা অন্ধ বাউলের সাক্ষাৎ পাই। অরূপ রতন প্রভৃতি অন্যান্য নাটকেও দুই একটী বাউল চরিত্র পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত উপন্যাস "গোরার" গোড়ার দিকেই একটী বাউল গানের দুইটী ছত্রের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ছত্রটীই যেন কেন্দ্রগত ভাবটী সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের উপর বাউল প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং সুস্পষ্ট।

আমি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ নহি, কাজেই ধারাটির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে ; তবে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি বাউল এবং বাউল পর্য্যায়ের গান রচনা করিয়াছেন, তারিখ সহ তাহার একটী তালিকা তৈরী করিলে তাহার ঐতিহাসিক দিকটা বিচার করা সহজসাধ্য হইবে।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের বাউল গানগুলির প্রথম ছত্রের একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল। অন্য কেহ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক অপরাপর বাউল গানগুলি খুঁজিয়া প্রকাশ করেন তবে একটী ভাল কাজ করা হইবে। দেশে বাউল, ভাটিয়ালী, শারী, জারী প্রভৃতির সংগ্রহ, সমাদর এবং চর্চ্চার জন্য আমরা মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী।

তালিকা—

(১) তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।
(২) আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
(৩) আয় আয়রে পাগল, ভুল করি চল আপনাকে।
(৪) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রে ছায়ায় লুকোচুরি খেলা।
(৫) তোরা সবাই ভাল, আমাদের এই আঁধার ঘরে সই প্রদীপ জ্বাল।
(৬) আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
(৭) ও আমার দেশের মাটী।
(৮) নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।
(৯) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।
(১০) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মন।
(১১) মন কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে।
(১২) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
(১৩) ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটী।
(১৪) ঘরে মুখ মলিন দেখে বলিস নে ওরে ভাই।
(১৫) তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার দিয়েছ করিয়া সোজা।
(১৬) বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি, বল ভাই ধন্য হরি।
(১৭) আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।
(১৮) এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে।
(১৯) যদি তোর ভাবনা থাকে, করে নে না।

(২০) কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় এসো।
(২১) তুমি একবার লহো আমায় হে নাথ লহো।
(২২) ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ভরে।

শিক্ষায় বিভ্রাট

শ্রীসরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি, এ

আজ দেড়শত বৎসর ধরিয়া যে শিক্ষার কাজ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে সামান্যভাবেও সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই একথা বোধ করি এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। শিক্ষার যে দুইটী দিক্ ব্যবহার ও সংস্কৃতি তাহার কোনওটায় এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃতকর্ম্মা নহেন। এদেশের আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য দায়ী যাঁহারা ব্যর্থতার বিপুলতায় তাঁহাদের লজ্জা বা পরিতাপ আনিয়া দেয় না। শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালন করিবার উচ্চাধিকারের এমনি একটা উগ্র মাদকতা উহাতে আপন কার্য্যে বিড়ম্বনা সত্ত্বেও মানুষ আপনার প্রতি ভক্তিভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উহা ভূতগ্রস্তের আবেশ, ভক্তের নহে।

গলদ যেখানে অষ্টে-পৃষ্ঠে ললাটে সেখানে উহা লুকাইয়া নাই এবং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। শিক্ষার আদর্শ প্রণালী, পরিচালনা এবং করণ বা যন্ত্র ইহার প্রত্যেকটির ভিতর হইতে যথেষ্ট ত্রুটী বাহির হইয়া পড়ে, বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হয় না।

শিক্ষায় চতুর্ব্বর্গলাভ—ইহাকেই সত্য করিয়া তোলা উচিত। আচারকে ত্যাগ করিয়া যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা কখনই জীবন্ত হইয়া উঠে না, যেমন ভাষাকে ছাড়িয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের চর্চ্চা। ব্যাকরণে দিগ্‌গজ হইয়া উঠিলাম, কিন্তু

ভাষায় অধিকার জন্মিল না, জীবনের কার্য্যে ভাবের আদান-প্রদান বিষয়ে কোন সুবিধাই হইল না। ব্যাকরণ সার্থক সত্য না হইয়া নিরর্থক মিথ্যা হইয়া রহিল। আমাদের শিক্ষাও ব্যাকরণ চর্চ্চার ন্যায় পণ্ডশ্রম জীবনের হারাণো দিনের ইতিহাস বই আর কিছুই নহে। যাঁহারা এই শিক্ষার পরিচালক তাঁহারা আদর্শ আচারের কোন ধারই ধারেন না—সে বিষয়ে তাঁদের কোন বালাই নাই এবং সেই জন্যই শিক্ষা বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রবাদের কূপে আবদ্ধ থাকিয়া পচিয়া মরে।

এদেশে শিক্ষা তরণীর কর্ণধার যাঁহারা তাঁহারা বিদেশীয় আদর্শ রীতিনীতিতে অভ্যস্ত যাহাদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এদেশে শিক্ষার প্রচলন করিলেন তাঁহাদের সমাজ-সংস্কার-রীতিনীতি ও আদর্শের ধারার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিদেশীয় সভ্যতার প্রয়োজন বাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও পরিচালন করিতেছেন, সাধারণকে এই 'বুঝ, দিলেন ও নিজেরাও যথেস্ট গৌরব বৃদ্ধি অনুভব করিলেন।

পিতৃ পিতামহের সাধনা যে ধারায় চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে ঐরূপ শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এবং ঐরূপ আচার ও প্রণালী অবলম্বনে সাঙ্কর্য্যদোষ জন্মাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্ণসাঙ্কর্য্য শশ্বত জাতি ও কুলধর্ম্ম নাশের যেরূপ কারণ হয়, বিভিন্ন আদর্শমূলক আচার সংযম বর্জ্জিত শিক্ষার সাঙ্কর্য্যও সেইরূপ জাতির বা কুলের সাধনা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস ঘটাইয়া থাকে। কথাটা কেমন কেমন লাগিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাধনা ও সংস্কৃতির সমন্বয় তবে কি অসম্ভব?--তবে কি উভয়ে কখনও মিলিবে না? যে ইংরাজের মুখ হইতে "এই মিলন অসম্ভব" প্রথম উচ্চারিত হয় তিনি মানব জাতির ভিতর দ্বন্দ কলহের উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া আজিও অভিশপ্ত হইয়া থাকেন। আর যিনি জগতের পরস্পর বিসংবাদী বিবাদমান বিভিন্ন মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া জানাইয়াছিলেন—"হেথা সবাকারে হ'বে মিলিবারে আনত শিরে"—তিনি আজ জগতের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা কবি বলিয়া পূজা পাইতেছেন। ইংরাজ আপন আদর্শে অটল অক্ষুণ্ণ, তাই, ওকথা বলিয়াছিলেন; আর দ্রষ্টা কবি সুন্দরের উপাসক, সত্যে আস্থাবান ও শাশ্বত মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত, এই জন্যই মানব জাতির চরম পরিণামের আশ্বাসনী বাণী শুনাইয়াছেন। সত্যের মঙ্গলের ও সুন্দরের আদর্শই সমগ্র মানব জাতির আদর্শ। মোহের বশে যাঁহারা আজ তাহাকে স্বীকার করিতেছে না, তাহাকেই তাঁহাদের একদিন স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাদের গুরু হইবেন তাঁহারাই, যাঁহারা ঐ আদর্শের সাধনায় এক বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি গড়িয়া

তুলিয়াছেন। মনুষ্য জাতির মধ্যে যে সম্প্রদায় সত্য, শিব ও সুন্দরকে লাভ করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন তাঁহারাই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন—কর্ম্ম ও কৃষ্টিকে যথার্থ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবজীবনে কল্যাণের দ্বারা মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই আদর্শ ভ্রষ্ট হইবার ফলে আজ তাঁদের বংশধরগণের অধঃপতন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থান হেতু অতি প্রাচীনকালে জগতের অন্যান্য জাতির সহিত তাহার এখনকার মত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ ছিল না। সুতরাং আচার, ভাব ও আদর্শের সংঘর্ষ ঘটে নাই। পরে বিজয়ী বিদেশীয়দিগের সংস্পর্শে আচার, ভাব ও আদর্শের পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। সমাজ ও জাতির উপযুক্ত নায়কের অভাবে যেরূপ পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে আদর্শ অক্ষুণ্ণ নাই। শাশ্বত মঙ্গলের বৃহৎ আদর্শ জাতির ভাগ্যকে যে রূপ দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল আজ কালমাহাত্ম্যে সে রূপ আর নাই। জাতির জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কারণ আদর্শলাভের উপায়রূপে যে কর্ম্ম ও আচার প্রচলিত হইয়াছিল, সেই স্থলে বিভিন্নরূপ কর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে যে আদর্শও প্রবর্ত্তিত হইতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে যে যুগে বিজাতীয় আচার ও ভাবধারার ঢেউ লাগিয়া সত্য ও মঙ্গলের আদর্শ ক্ষুন্ধ হইয়াছে সেই সেই কালে দেশের মনীষিগণের সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে তখনই দাঁড়াইয়াছেন, যখনই ঐ বাদ জাতির আদর্শকে ক্ষুন্ধ ও লুপ্ত করিতে বসিয়াছে। স্বয়ম্প্রকাশ সত্য যে চাপা পড়িয়া থাকে না এই সকল সতর্ক বাণীই তাহার প্রমাণ। কালক্রমে মানবের আচার ও কর্ম্মের পরিবর্ত্তন গতিশীল সমাজ ও জীবনের ধর্ম্ম ঐ আচার ও কর্ম্ম আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। যে দেশ সত্য শিব ও সুন্দরকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বহুযুগ ধরিয়া তাহারই সাধনা করিয়া আসিয়াছে, বৈদেশিক সংস্পর্শে যখন সেই দেশের আচার ও কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয় তখনই আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। অবশ্য সমগ্র মানব জাতীর সত্যাদর্শের উপলব্ধি, আশঙ্কা ও লাভ যুগপৎ ঘটিতে পারে না। এইরূপ কৃষ্টিগত সমীকরণ বাস্তবতা বিরোধী। কারণ, বাস্তবতার প্রাণই হইতেছে ভেদমূলক, উহা বহুত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কথা হইতেছে মানব সমাজের সত্য আদর্শে গিয়া পৌছান নহে, কিন্তু ঐ আদর্শকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না দেওয়া ও ঐ আদর্শের প্রতি মানুষের অন্তরের টানকে জাগাইয়া তোলা। প্রাচীন ভারতের গৌরব এই যে সে তাহার বিশেষ সাধনাজাত কৃষ্টিপ্রভাবে এই কার্য্যেই করিতে প্রয়াস

পাইয়াছিল। তাই, সত্যাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার প্রতি মানবের অন্তরের আগ্রহকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা যখনই যে জাতির জাগিয়া উঠিবে তখনই সেই জাতি সভ্যতাধারা সমূহের মহাসঙ্গম পূণ্যতীর্থ এই ভারতবর্ষের সাধনা ও কৃষ্টির সহিত যুক্ত হইবে। ভারতীয় সাধনা ও কৃষ্টির ইহাই প্রকৃতি। এই বিশ্বজনীন ভাবের উপর ভারতীয় অদর্শের প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষার আদর্শ যদি মানুষকে প্রয়োজন বাদের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়া জীবন সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত করে তাহা হইলে সে সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ সৌভাগ্যক্রমে প্রয়োজন নিবৃত্তির ভিতর দিয়াই প্রয়োজনের নূতন মুর্ত্তি ফুটিয়া ওঠে। সুতরাং সেরূপে শিক্ষার আদর্শ জীবনকে বাদ বেস্টনী হইতে মুক্তি দিতে পারে না—মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলে। যুদ্ধে বহুলোকের প্রাণ সংহার জাতীয় শক্তিকে ফুটাইয়া তোলে। তখন স্বাধীনতার বিজয় পতাকা জাতির মাথার উপরে যশও গৌরবকে প্রদীপ্ত করিয়া তোলে। বর্ত্তমান সভ্যতার দোসর এই স্বাধীনতা মন্ত্রে নাকি জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। আর সেই জাতীয়তা নাকি মানুষকে মুক্তি আনিয়া দেয়। বর্ত্তমান শিক্ষা এই সংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিধির বিড়ম্বনা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? যে স্বাধীনতাবোধ জাতীর ভেদ বুদ্ধিকে এতই উদ্দীপিত করিয়া তোলে সে তাহার প্রেরনার এক জাতি নৃশংস অমানুষিক কার্য্য করিয়া অপর জাতিকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা মানুষকে মুক্তি আনিয়া দেওয়া দূরে থাকুক তাহার মুক্তি পথের বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে বর্ত্তমান সভ্যতার দোসর এই স্বাধীনতাবোধ সেই সভ্যতা মানুষকে কিরূপ পরিণামের পথে চালাইয়া লইতেছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মিলনের ক্ষেত্রে যাহারা আসিয়া পৌছাইয়াছে, সংস্কার ও কৃষ্টির প্রভাবে তাহারা সমস্ত ভেদবিরোধ বৈষম্য দ্বন্দ্বের বাধাকে অতিক্রম করিয়া সার্ব্বজনীন মানবতা-বোধের মূল তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছে, তাহারাই সভ্য জাতি। আর যাহারা সভ্যতার দাবীকে জগৎ সমক্ষে তরবারী লইয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাস তাহাদের সম্বন্ধে যে কথাই বলুক না কেন, তাহারা সভ্য জাতি নহে। কারণ, সভ্যতা যে অস্ত্রচালনায় আপন বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করে উহা বর্ব্বরতার তরবারী নহে, উহা জ্ঞান-ভক্তি প্রেমের স্পর্শমণি, উহা শক্রকে পর ভাবিয়া অস্ত্রাঘাতে ধ্বংস করে না বা বিনাশের ভয় দেখাইয়া আপনার অধীন করিয়া রাখে না—আপন করিয়া লইয়া সকল ভেদ দ্বন্দ বিরোধ-বিসম্বাদের মধ্যে যে রহস্যময়ী মহাশক্তি ক্ষুব্ধা হইয়া

উঠিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রসন্ন করিতে চায়। সভ্যতার মহা অভিযানের ইহাই উদ্দেশ্য এবং কার্য্য প্রণালী।

প্রয়োজনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষা তাহার আদর্শ মানুষকে এই সভ্যতার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে না। কারণ, বর্ত্তমান শিক্ষা ও সাধনা জীবনযাত্রার সৌকর্য্য ও সুষ্ঠুতা সাধনা একান্ত তৎপর, জীবনযাত্রার বৈষম্য বোধই তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মকে চালাইয়া লইয়া যায়। যে জ্ঞান, প্রেম ও আচার ঐ বৈষম্য বোধকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া দিয়া সমভাব জাগাইয়া বিশ্ব-মানবকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে তাহার কিছুই বর্ত্তমান শিক্ষার দান নহে—। বর্ত্তমান শিক্ষা আচারের এই দৈন্য কিরূপভাবে বর্ত্তমান সভ্যতাকে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল করিয়া তুলিয়াছে তাহার প্রমাণ আন্তর্জ্জাতিক মহাসমিতির প্রতিষ্ঠানই দিতেছে। মানুষের মন যেখানে মানুষের দুর্দ্দশায় উল্লসিত সেখানে মোহ আসিয়া মুক্তির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে—দুষ্প্রবৃত্তির পলিমাটীতে সে সভ্যতাধারার মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ কি আছে! মহাকালের ক্ষেত্রে সে শুষ্ক ক্ষীণ ও লুপ্ত হইয়া যাইবে।

শিক্ষার শাশ্বত মূর্ত্তিকে যুগোপযোগী আচার অনুষ্ঠানের মণ্ডনে মণ্ডিত করিলে সহজেই উহার প্রচলন ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে এবং এইরূপ শিক্ষাই আধুনিকগণের সম্মত বলিয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাতরণীর কর্ণধারগণ তাহাকে সেই পথে চালাইয়াছেন। একথা হিসাব করিয়া দেখেন নাই যে শিক্ষা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সভ্যতার ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া মানুষকে কল্যাণের দ্বারে লইয়া যাইবে, সেই আদর্শের কোন বিশেষ সাধনার অপেক্ষা আছে কিনা! লোকরঞ্জনী শিক্ষার বিস্তার সহজ হইলেও তাহাতে সভ্যতার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যক্তির ও জাতির মুক্তির পথ সুগম করিয়া তোলে কিনা। ধর্ম্মবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র সুবিধাবাদের চুক্তি যেখানে খাড়া হইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা এবং নীতির পথপ্রদর্শক রূপে আপনাকে ঘোষণা করে, সেখানে সভ্যতা রোগগ্রস্ত ও তাহার ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মবুদ্ধি একদিন তাহার স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে মানুষকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে আজ মানুষের উদ্ভাবিত সুবিধাবাদের জালে আবদ্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছে। মৃৎশিল্পী সাবয়ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আমাদের বিস্ময় ও প্রশংসা আকর্ষণ করে কিন্তু সেই সকল মূর্ত্তির প্রাণী জগতে কোন স্থান নাই, সেইরূপ যে সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত ধর্ম্মবুদ্ধির প্রাণস্পর্শ ঘটে নাই তাহা মানবের জীবনের অঙ্গীভূত হইতে

পারে না। উহা বাহিরের চুক্তি রক্ষার দমে চালিত হইয়া মানবের সাময়িক বিলাস বিনোদ জন্মাইয়া থাকে। ধর্ম্মবুদ্ধির স্বাভাবিক প্রেরণায় যে সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া ওঠে তাহা মানুষের মাতৃস্থানীয়া। কর্ত্তৃত্বের মোহে মানুষ যখন সেই ধর্ম্মবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করে তখন সভ্যতা ও কৃষ্টিকে হত্যা করা হয় এবং তখনই মানব সেই মাতৃহত্যার পাপকে লুকাইবার জন্য এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে সভ্যতা ও কৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে।

প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টি যে সামাজিক জীবনের সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহার যে আদর্শ ও সাধন প্রণালী ছিল তাহা সত্য ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর বর্ত্তমানে নূতন সভ্যতা ও কৃষ্টির নামে যে অপূর্ব্ব পদার্থের প্রচলন হইতেছে, তাহা বস্তুতন্ত্রতার দিক্ দিয়া কেবলমাত্র সুবিধাবাদের উপর স্থাপিত। বিশ্বপ্রকৃতির নাড়ীর ভিতর দিয়া সত্যের যে জীবন্ত ধারা প্রবাহিত, প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টি সেই অমৃতধারায় পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, ও যেমন সদ্যোলব্ধ গাভী দুগ্ধের পুষ্টি আর নব-সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রাণের যোগান দিতেছে যেন জাহাজে আমদানী করা রসায়নাগারের উৎপন্ন টিন কৌটা ভরা লেবেল মারা ভিটেমিন্ খাদ্য প্রাণপূর্ণ ফুড্ মানব মনে করে যাহা সে আপন বুদ্ধি কৌশলে প্রকৃতির প্রাণের গোপন ভাণ্ডার হইতে লুট করিয়া আনিয়াছে। অর্থাৎ মানব সমাজের চরম উন্নতি লাভে যাঁহারা অতিমাত্র ব্যগ্র তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া ক্রমবিবর্ত্তনবাদকে আমল না দিয়া একেবারেই মানবের চরমোৎকর্ষে যাইবার সহজ রাস্তা তৈয়ারী করিয়া নূতন সভ্যতা কৃষ্টি নামে তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। সত্য শিব ও সুন্দরকে আশ্রয় করিয়া যাহা গড়িয়া ওঠে তাহা মানবের ভিতর যাহা কিছু ভ্রান্ত অসত্য ও জরামরণশীল তাহাকেই জয় করিবার জন্য। মানব জীবন গতিশীল। উহাকে সত্যে পৌঁছাইয়া দিতে হইলে এমন একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহার মধ্যে সকল বেগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে—যাহা পরিপূর্ণ অখণ্ড, অদ্বিতীয় ও নিত্য। মানুষের জীবনের ভিতর দিয়া সত্য যতখানি ফুটিয়া বাহির হয় জীবনের ততটাই সার্থক হইয়া ওঠে। মুকুটে হীরা বসানো থাকে তাহাতে মুকুটের মূল্য বাড়িয়া যায় কিন্তু তাই বলিয়া মুকুটের সবটাই হীরা হয় না। ক্রমশঃ মানবকে স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ সত্যের আধার করিয়া তোলাই কৃষ্টি ও সভ্যতার সার্থকতা। সুতরাং মানব জীবনের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি সাধনা সাপেক্ষ। সাধন-রত মানবের এই কঠোর সাধনায় কিরূপে যে নিষ্ঠা জন্মে তাহা দুর্জ্ঞেয়। ভাগবতেরা তাই তাহাকে ভগবৎ-কৃপা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই নিষ্ঠা অলৌকিক পদার্থ, ইহাই মানুষের সাধন পথের প্রধান পরিচালক। ইহা মানব জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, ইহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। মানুষের পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জ্ঞান ইহার সূক্ষ্ম কার্য্যসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রাণ হইতেছে এই অপূর্ব্ব পদার্থ নিষ্ঠা। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠার যে কতখানি মূল্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে যাঁহারা মানুষ হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের ভিতর এই নিষ্ঠার পরিচয় আমরা কতটা পাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে, প্রতি বৎসর বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কৃতিত্ব লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা সভ্যতার প্রতীক। ইঁহাদের অনেকেই বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তৎসঙ্গে ব্যবহার শাস্ত্রও পাঠ করেন, কিন্তু বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন জীবনে ঐগুলি আলোচনা করিবার জন্য নহে—ঐ সকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও যোগ্যতা পত্র সংগ্রহ করাই তাঁহাদের শাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য (সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির উপভোগ) সফল করিয়া তুলিবে। 'ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া টিকিয়া থাকাই' মুখ্য উদ্দেশ্য এই যুক্তি দ্বারা ঐরূপ কার্য্যের সমর্থন সত্যের অপলাপ করা বই কিছুই নয়। অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি উপভোগ করাই যদি বর্ত্তমান শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় তবে তাহার প্রকৃষ্ট সাধনোপায় অবলম্বন না করিয়া সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ কেন? ব্রাহ্মণের সংস্কার লাভের ওরূপ উৎকট চেষ্টায় জীবনের অমূল্য অংশ ব্যয় করিয়া পরে বৈশ্য বা শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন—'ধোবিকা কুত্তা নেই ঘরকা নেই ঘাটকা'। আমাদের ইতঃভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ এই কারণেই ঘটিতেছে।

বস্তুতঃ শিক্ষা বলিতে যে কেবল কৃষ্টি বা সংস্কৃতি মূলক শিক্ষাই বুঝায় তাহা নহে, উহার ব্যবহারের দিকও আছে। উহার বহিরঙ্গ ধর্ম্মার্থকাম ও অন্তরঙ্গ মোক্ষ বা মুক্তি। জাগতিক পরিস্থিতির মধ্যে মানবের দেহ মন উভয়েরই বহির্জগতের সঙ্গে অনবরত কারবার চালিয়াছে। ঐ কারবার বজায় রাখিয়া মানুষকে চলিতে হয়, উহাই তাহার সাংসারিক জীবন। এই জীবনের ব্যাপার সকলের মধ্যে ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন। তাহাই ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গের সাধনের বিষয়। এইগুলি শিক্ষার বহিরঙ্গ, আর যেটী উহার সংস্কৃতির দিক তাহা উহার অন্তরঙ্গ। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দুইটী দিকের প্রতিই যথোচিত লক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ মানুষের মধ্যে যেটি পরম সম্পদ তাহা দেহেন্দ্রিয় মন আকাঙ্খা এইগুলির

অতীত পদার্থ হইলেও মানুষের মধ্যেই তাহা বাস করে। দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ক্রমবিবর্ত্তনের বিভিন্নরূপ আদর্শ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া চলিতে দিতে হয়, কিন্তু সকল আদর্শ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া সেই পরম সম্পদের ইঙ্গিত পরিশেষে মানুষকে ত্রিবর্গ সাধনের ভোগবতী পার করাইয়া কল্পলোকের উপকূলে পৌঁছাইয়া দেয়। কামক্ষুব্ধ যে মানব জগৎকে বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত দেখিয়া তাহার সম্ভোগে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, সে কোন এক মুহূর্ত্তে কামকে স্বীয় অদৃষ্ট বা কর্ম্মরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিবের তৃতীয় নেত্রের এই দৃষ্টি কামনাকে দগ্ধ করিয়া মদন মোহনের অপূর্ব্ব রূপশ্রীতে ডুবিয়া যায়। মানব জীবনের এই যে আদর্শ ইহা শিক্ষা সংস্কারমূলক। বুদ্ধির অভিমানে অভিমানী মানব বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতির এই আদর্শের উপর তাই দাবী করিয়া থাকে, অথচ তাহার আচারের সহিত ঐরূপ শিক্ষাদর্শের কোন মিল নাই। শিক্ষা ব্যবস্থা মানবের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য ও কৃত্রিমতা জাগাইয়া তুলিয়া অনধিকারি-গণকে সংস্কৃতির মিথ্যা মোহের পাকে ফেলিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছে। জাতির প্রাণ-শক্তিক্ষয়ের এই শিক্ষা বিভ্রাটই প্রধান কারণ।

দিন আসিয়াছে—যখন দেশের অকৃতকর্ম্মা, ব্যর্থজীবন শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখীন হইয়া জানিতে চাহিবে তাদের জীবনের এই ভরা নৌকা ডুবির কারণ কি? অপরিণতবুদ্ধি তরুণের দলকে কে প্রলুব্ধ করিয়া সংস্কৃতি-মূলক শিক্ষার মোহে অবিচারিত ভাবে টানিয়া আনিয়া তাদের জীবনে সাধনার অমূল্য দিনগুলি লইয়া ছিনিমিনি খেলা করিয়াছে? কাহার পাপে আজ তাহারা অসহায়, সামর্থ্যহীন, কৃপাভিখারী পঙ্গুর ন্যায় সংসারের পথপার্শ্বে পড়িয়া হাঁকিতেছে—"ভিখ্ দেও, ময় ভুঁখা হুঁ"।

নদীয়ার কবি গিরিজানাথ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

বঙ্গ সাহিত্যে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত যে কয়জন কবি আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভাষা জননীর ভাণ্ডার গরিমাময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন নদীয়ার কবি গিরিজানাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

১২৭৬ সালের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কবি গিরিজানাথ রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা "ধাত্রীশিক্ষা" "সরল শরীর পালন" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেকালের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। অতি শৈশবেই কবি গিরিজানাথের কাব্য প্রতিভার বিকাশ হয়। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি "কবিতা লহরী" নামক এক কাব্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ যদুনাথ সেই পুস্তকে তাঁহার পুত্রকে "আশীর্ব্বচনের" একস্থলে লিখিয়াছিলেন "তোমার বয়স আজও ষোল বছর পূরে নাই, এরই মধ্যেই তুমি কবিতা লিখিতে শিখিয়াছ। শুধু এতেই আমার আহ্লাদের সীমা না থাকিবার কথা।" কবির এই শৈশবের লিখিত কবিতা আজকাল বহু পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

"ওরে রে নিঠুর কাল দুরাচার!
পাষাণে গঠিত হৃদয় তোর,
সাধিস্ তাহাই যা করিস্ মনে,
তুইরে অমূল্য রতন চোর॥

শৈশবে রচিত এই সকল কবিতা হইতেই আমরা তাঁহার অশেষ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রতিভাশালী কবিরূপে সাহিত্যিক সমাজে সুপারিচিত হইয়া উঠেন। রাণাঘাট পি, সি, এইচ্, ই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স ও কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঠ্য জীবন শেষ করেন এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত "সমাজ ও সাহিত্য" নামক পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন।

১২৯৫ কি ১২৯৬ সালে পলাশী যুদ্ধের কবি নবীন চন্দ্র রাণাঘাট মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই সময় কবির সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি কবি গিরিজানাথের প্রদত্ত উপহার কবিতার সুখ্যাতি

করিয়া লিখিয়াছিলেন "I have had many such presnents in my life but none so good, so sweet and so poetical."

১৩০২ সালে কবির অপূর্ব্ব গীতি কাব্য "পরিমল" প্রকাশিত হইয়া বাংলা কাব্য সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছিল। "পরিমলের" কবি ছিলেন নিঃস্পৃহ। তাই তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"নীরব মরণ যাচি'
রাখি' মাথা বিস্মৃতির কোলে
দুখের অশ্রুটী লয়ে
বিদায় লইয়া যাব চলে—।"

সমালোচকাগ্রগণ্য স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই সকল কবিতা পাঠে লিখিয়াছিলেন—"প্রেমের এত উচ্চতা, এত গভীরতা এবং উদারতা আমি বাংলা সাহিত্যে অতি কমই দেখিয়াছি।"

"পরিমল" প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে কবির মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং ইহার অনতিকাল পরেই তাঁহার অন্যতম গীতিকাব্য "বেলা" প্রকাশিত হয়। মাতৃ হারা কবি এই কাব্য গ্রন্থের প্রথম কবিতায় বলিতেছেন—

"মা আমার সর্ব্বঘটে মা আমার চিত্তপটে
অন্তরে বাহিরে মা ব্যাপিয়া সংসার।"

কবির এই মাতৃ-স্মরণে কবিকেশরী ভক্ত রামপ্রসাদের আরাধ্যা মার সুর নিহিত।

"বেলা" প্রকাশিত হইবার অনতিকাল পরেই কবির পত্নী বিয়োগ ঘটে। এই সময় হইতেই তাঁহার কাব্যে দার্শনিক ভাবের বিকাশ হয়। তাই কবি প্রেমের সরূপ চিনিতে পারিয়া গাহিয়াছিলেন—

"শিরায় শোণিত প্রেম, নিঃশ্বাসে পবন,
দর্শনে আলোক হয়ে জাগে,
পরশে পরশ মণি, দুখে অশ্রুজল,
পুষ্প অর্ঘ্য দেবতার আগে!"

বাণীর সেবাই কবির জীবনের চরম লক্ষ্য। ধন সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া কবি কাব্যরসে ভরপুর। শত দুঃখ কষ্টও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই উদাত্ত কণ্ঠে কাব্যকে উপলক্ষ করিয়া গাহিলেন—

"তোমারে হৃদয়ে ধরি', - লোকে যাহা চায়,
চাহি নাই সেই খর্ব্ব সুখ ;
দিয়েছ যে প্রেমমন্ত্র—পূর্ণ মহিমায়,
সেই গর্ব্বে ভরিয়াছে বুক !
চাহি না সে খণ্ড-ক্ষুদ্র সংসারের দান,
নহি আমি ভিক্ষুক তাহার ;
তব দ্বারে উপবাসী—সেই মোর মান,
তাই মানি শ্রেয়ঃ শতবার !"

কবি মিলন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, কিন্তু কবি-প্রিয়া তখন পরপার যাত্রা করিয়াছেন। তাই বলিয়া কবি ব্যথিত নহেন ; তিনি জানেন মিলন চিরশাশ্বত। তাই গাহিলেন—

"আছে জন্ম, আছে ক্ষয়, এক জন্মে শেষ নয়,
কাল চির—অনন্ত জগৎ
জগতের তীরে তীরে কত জন্ম যাব ফিরে,
কত জন্ম গেছে এ যাবৎ !
ভরা প্রেম-রাশি নিয়া মোর আগে গেছে প্রিয়া
কোন্ স্বর্গে রচিয়াছে নীড় ;
সেথা,—মোর মনে হয়— পুরাতন পরিচয়
প্রেম-পাশে বাঁধিবে নিবিড়।"

সুখ দুঃখের আবর্ত্তনে কবি জীবন সন্ধ্যার উপকূলে আসিয়া গাহিলেন—

"আমার মর্ম্মের গীত নীরবে গুমরি
লভিবে মরণ !
জীবন সন্ধ্যায় তাই দেবতারে স্মরি'
করিনু অর্পণ।"

কবির এই "অর্পণ"ই শেষ গ্রন্থ। কবি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাসী। তিনি বলিয়াছেন—

"শৈশব বার্দ্ধক্য পূরে,
কর্ম্মফল লয়ে জন্ম জন্মান্তর ঘুরে।
সুখ দুঃখ আবর্ত্তন,
ঘুরে জন্ম-মৃত্যু ধারা উত্থান, পতন।

সুরে-রে সৃষ্টি নাশ,
হ্রাস বৃদ্ধি, বৃদ্ধি হ্রাস,
মহাকাল ঘন দেয় ডাক,—
দে পাক—দে পাক।"

প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের মিলন কে কবে দেখিতে পাইয়াছে? কিন্তু কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

"প্রভাত দেখে না—দীপ্ত মধ্যাহ্নের রবি,
মধ্যাহ্ন দেখে না—ম্লান অপরাহ্ন ছবি।
তিনের মিলন-ক্ষেত্র—
কে দেখেছে, কোন্ নেত্র?
আমি পিতামহ, পুত্র, পৌত্র—তিন জন
দেখি সে—প্রভাত, দিবা সায়াহ্ন মিলন।"

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" সম্রাট্ সাজাহানের 'তাজমহলের' মত, পত্নী শোকের মর্ম্মর স্তম্ভ। কবি গিরিজানাথের "অর্পণে" সন্নিবেশিত কতকগুলি কবিতাও তদনুরূপ। "ব্যর্থ প্রভাতে" কবি বলিতেছেন—

উঠে গেছে বেলা নাহি তার দেখা
উঠানে এসেছে রোদ;
তার প্রিয় ফুল সব গেছে ফুটে,—
নাহি তার বেলা বোধ!
ঘাসের মুকুতা আলোকে জ্বলিয়া
কখন্ গিয়াছে মরি'
সমীর পরশে ফুলের শিশির
কখন্ গিয়াছে ঝরি'।

* * * * *

পড়ে নাই ঝাঁট উঠানে এখনো,
দুয়ারে কে দিবে জল?
গৃহ-দেবতার পানে চাহি' মোর
আঁখি করে ছল-ছল!

আবার কবি ব্যর্থ সন্ধ্যায় ব্যথিত চিত্তে গাহিলেন—

"তুলসীর তলে জ্বলে নাই দীপ,
কুটীরে কে দিবে আলো?

একা বসে আছি, বয়ে গেল সাঁঝ,
একি ব্যবহার ভালো !
গৃহে গৃহে ওই বেজে গেলে শাঁখ,
আজি কেন তার দেরী ?
আমার শয়ন পরিপাটী করি
পাতিতে, আজি না হেরী !

কবি ব্যথার অশ্রু আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই জীবন সন্ধ্যায় ভবের খেয়া ঘাটে আসিয়া গাহিলেন—

"জীবন দিনের প্রভাহীন রবি
অই বসিয়াছে পাটে,
পারে যাইবার কড়ি নাহি মোর,
ভাবিতেছি খেয়া ঘাটে।
তুফান দেখিয়া আতঙ্কে মরি
কোথা কাণ্ডারী, লহ পার করি,
যত কিছু বোঝা ছিল গুরুভার—
ফেলিয়া এসেছি পাটে।
এসেছি একাকী, দাও এতটুকু
চরণোপ্রান্তে স্থান,
ও পদ পরশে ধন্য হইব
যাপিব হৃদয় প্রাণ।"

কবি বাণীর চরণে "অর্পণ" নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র তারা দিয়ে যায় তিমির সাগরে
স্তিমিত কিরণ,
চাহে তার পানে ?
আঁধার হরণ।"

ভাবের সহিত ভাষার উচ্চতা, ছন্দের সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া যিনি লিখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবি যশোভোগী। কবি গিরিজানাথ ছিলেন এই দুইটী সদ্‌গুণেরই অধিকারী।

বাঙ্গালার জীবন, বাঙ্গালার ভাব-ধারা ও বাংলার রূপ বর্ণনায় কবি গিরিজানাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নদীয়ার এই কবিকে বাঙ্গালী ভুলিলেও বাংলা কবির নিকট চির-ঋণী রহিবে।

গত ১৩৪১ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ আজন্ম সাহিত্যসেবী কবি গিরিজানাথ ৬৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

স্বর্গতত্ত্ব

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

শব্দ নিরাকার; নিরাকার আকাশ ও বায়ুর মত নিরাকার শব্দেরও একটী কল্পিত রূপ আছে। অবশ্য শব্দের ওরূপ রূপটী আমাদের মানস প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য (Mental form)। কেননা শব্দের এমন একটী অনির্বচনীয় শক্তি আছে যাহার প্রভাবে অবস্তুবাচক শব্দটীও উচ্চারিত বা শ্রুত হইলে উচ্চারক বা শ্রোতার মনে উচ্চারণ ও শ্রবণ সমকালে একটি ভাবময় পদার্থের স্ফূর্তি ঘটে। দর্শনশাস্ত্রে এই তত্ত্বটীকে নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "অত্যন্তাসত্যপি হ্যর্থে জ্ঞানং শব্দঃ করোতি হি।" অর্থাৎ বস্তুগত্যা বস্তুটী একেবারে না থাকিলেও শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র উহাদ্বারা একটী জ্ঞান জন্মে। বিখ্যাত মহাকাব্য রঘুবংশের ১।২৭ শ্লোকে ইহার একটী চমৎকার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। মহাকবি কালিদাস মহারাজ দিলীপের কুশাসন বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ইহাঁর রাজ্যে চৌর্য্য এই শব্দটী কেবল শুনা যাইত, অর্থাৎ কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইত না। "শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা" বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ বুঝাইয়াছেন, "কেবল শব্দে স্ফূর্ত্তি পাইত, শ্রবণ গোচর হইত, কিন্তু স্বরূপত ছিল না," অর্থাৎ না বলিয়া পরের দ্রব্য লইতে কাহাকেও দেখা যাইত না এই তত্ত্বটী সুবিখ্যাত বৈদান্তিক প্রকরণ গ্রন্থ পঞ্চদশীর ২য় অঃ,৬৩ সংখ্যক প্রমাণের সাহায্যে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঐ প্রমাণে বুঝান হইয়াছে "মায়াশক্তি আকাশের কল্পনা সৃষ্টি করিয়া থাকে. "যা শক্তি কল্পয়েদ্ ব্যোম।" বলা বাহুল্য আমি এই মায়াশক্তিকেই অনির্বচনীয় শব্দে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে বুঝা গেল যে, অনর্থক শব্দেরও এমন একটি শক্তি আছে যে উহা উচ্চারণ করিলেই কাণে একটি বস্তুর ভাবময় ছবি ভাসিয়া উঠে। এই নিয়মে কেহ স্বর্গশব্দ বলিলে বা শুনিলে সাধারণতঃ সুদীর্ঘকালের সংস্কারের বলে মনে একটি বস্তুর সুস্পষ্ট ছাপ (Impression) পড়ে। ঐ ছাপটীর ভাব নিরবচ্ছিন্ন সুখময় ধাম বা পরমানন্দ ঘন

অবস্থা। এমতে স্বর্গ স্থায়ী স্বারাজ্য বা সুখের চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য। ইহার সমস্ত বৃক্ষ পারিজাত। সকল বন নন্দন কানন। সমস্ত ফল সুগন্ধি-হীন রসময়। সমস্ত নদী মন্দাকিনী। সমস্ত মানব অমর। সমস্ত মানবী অপ্সরা। মুসলমানের ধারণায়, উহা সতত স্বচ্ছশীতল সলিলবিধৌত, সবদা ও সর্বদা সুপরিপক্ক ও সুমিষ্ট দ্রাক্ষাফল-পরিপূর্ণ দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত, পর্যাপ্ত চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভোজ্য ভোগ্য পরিপূর্ণ এবং রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্বশী হইতেও রূপসী রমণীরাজি বিরাজিত। ফলতঃ সেই স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের অপরিবর্তিত বা অত্যল্প পরিবর্তিত মনের চেহারার মত সুখধাম বা সুরধাম স্বর্গের প্রাচীন আকারের উল্লেখযোগ্য কোনও প্রকারান্তর ঘটে নাই। প্রাচীন বেদসংহিতানিচয় হিন্দুর স্বর্গসংক্রান্ত এইরূপ ধারণার মূল। কারণ ঐগুলি যাগযজ্ঞবহুল কর্মকাণ্ডে ভরপূর। এবং ঐ সকল বৈদিক কর্মের ফলরূপে স্বর্গই সর্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। "স্বর্গ-কামো যজেত" এইটীই যেন সমগ্র বেদ সংহিতার মূল কথা (Keynote) ঐকালে স্বর্গের ঐরূপ ধারণা এত প্রবল ছিল যে, কালিদাসের ন্যায় মহাকবি তাঁর মহাকাব্য কুমারসম্ভবের ২য় সর্গের ১২শ শ্লোকে ব্রহ্মস্তুতি-প্রসঙ্গে সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য কর্মযজ্ঞ এবং যজ্ঞের ফল স্বর্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ম্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গঃ।" অবশ্য সুধীপ্রবর মল্লিনাথ ঐ শ্লোকস্থিত কর্ম ও স্বর্গপদে উপলক্ষণ ধরিয়া ব্রহ্ম ও মুক্তি পর্যান্ত অর্থ টানিয়াছেন। এরূপ কল্পনা "গরজ বড় বালাই" র বড় ভাই। কারণ শব্দশাস্ত্রে সমর্থ পক্ষে যৌগিক অর্থ ছাড়িয়া লক্ষণার লেজুর ধরাকে জঘন্যই বলা হইয়াছে। ঐ যুগে আনন্দধাম স্বর্গের জনপ্রিয়তা এতই চরমে উঠিয়াছিল যে, বহুল প্রচারিত প্রাচীন কঠোপনিষদের ১ম অঃ ১ম বল্লীতে ঋষি বালক নচিকেতা, 'হে মৃত্যো, আপনি এই প্রকার গুণবিশিষ্ট স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ অগ্নিবিষয়ক অনুষ্ঠান জানেন। সুতরাং আমায় বলুন" বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্॥" ১৩। উত্তরে যমরাজ জিজ্ঞাসু বালককে অগ্নিপ্রধান যজ্ঞ ও উহার ফল স্বর্গের তত্ত্ব সবিস্তারে বুঝাইয়া পরে উহার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়াছেন। বস্তুতঃ বেদান্তাভিধেয় শ্রুতিশীর্ষ উপনিষদেও সুখময় স্বর্গের চিত্র অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। আমার প্রথম আলোচ্য ও বোদ্ধব্য বর্ণিতপ্রকার স্বর্গ দেশ কাল অবচ্ছিন্ন স্থান, কিংবা সাধনার পরিপাকে লব্ধ জীবের পরম ও উত্তম অবস্থা বিশেষ। এই প্রশ্নের প্রথমপক্ষের সমর্থক উত্তরবাদীর দল বেশ পুরু বলিয়া মনে হয়। কারণ স্বর্গনামক আনন্দ-রাজ্যের নাম শুনিলে কেবল হিন্দু নহেন, মুসলমান, খৃষ্টান,

পাশী, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকগণের জিহ্বাগ্রে লালা-স্রাবের উপক্রম হয়। এমন কি এই মরজগতেও কোনও সমধিক সুখময় স্থান থাকিলে উহাকেও স্বর্গ নামে অভিহিত করা হয়, যেমন "ভূঃস্বর্গ কাশ্মীর", "শিশুর স্বর্গ জাপান"—"The Paradise of children" কিন্তু দীন লেখকের সান্তর বিশ্বাস, স্বর্গ বলিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা দেশ নাই। কেননা, স্বর্গশব্দে যে মহান্ ভাবের উপলব্ধি হয়, ঐটী দেশকাল সীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলে অনিত্য ঘটপটাদির ন্যায় জন্য ও নশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল আদিসম্মত হিন্দু মুসলমানাদি সর্বজাতি প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় স্বর্গপদার্থটী আর যাহাই হউক, ঐরূপ ঠুন্‌কো (Brittle) জিনিস কখনই নহে। এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখিবার আছে। সংক্ষেপে সময়, সভা ও মাননীয় সভ্যবৃন্দের অনুমোদন সাপেক্ষে আমি প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে কিছু বিবরণ দিতেছি। প্রথমতঃ যুক্তি প্রমাণে দেখিলে বুঝা যায়, স্বর্গ যদি দেশ পরিচ্ছিন্ন (Limited by space) হয়, তাহা হইলে মূর্ত দ্রব্যের (Concrete Substance) মত আশ্রিত, অবয়বযুক্ত (সখণ্ড), অনিত্য (জন্মে ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়) এবং কৃত্রিম অর্থাৎ কুলালাদির কৃতিসাধ্য ঘটকলসাদির ন্যায় হইয়া পড়ে। অতএব স্বর্গ দেশপরিচ্ছিন্ন না হওয়ায় উহা গতির দ্বারা লভ্য হইতে পারে না। এইরূপ দার্শনিক বিচার ছাড়া, সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বাক্য শাস্ত্রশিরোমণি গীতার বহুস্থলে বহুভাবে অতিপ্রয়োজনীয় ও অবশ্য জ্ঞেয় স্বর্গের তত্ত্বটী বিচার মুখে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বোধে এস্থলে মাত্র দুইটী প্রমাণের উল্লেখ করিলাম। ১মটী ৮ম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক। পাঠকের বোধসৌকর্য্য ও প্রামাণ্যের জন্য দার্শনিক শিরোমণি স্বর্গীয় শশধর তর্কচূড়ামণির কৃত অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে অর্জুন, সমস্ত স্বর্গের উপরিস্থিত ব্রহ্মলোক অবধি (পর্য্যন্ত) সমস্ত ভোগলোকই অনিত্য এবং পুনঃ পুনঃ আবর্তনশীল, অতএব মরণান্তর ইহার যে কোন লোকে গমন করে, তাহাতেই তাহার পতন হইয়া পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু যাহারা আমাকে (পরমাত্মাকে) লাভ করে, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়, হে কৌন্তেয়, তাহাদের আর পুনর্জন্ম নাই। ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত ভোগস্বর্গকে যে অনিত্য বলিলাম তাহার কারণ এই যে অনিত্যও বিনাশ আছে এবং উহারা এক এক সীমাবদ্ধ কালস্থায়ী। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ" ইত্যাদি ৮।১৬।২য়টী ১৩ অঃ ২১শ শ্লোক যে সকল ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত কামনাবশগ হইয়া যজ্ঞশেষ সোমপানপূর্বক নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহান

পবিত্র দেবলোক প্রাপ্তিপূর্বক স্বর্গরাজ্যে নানাপ্রকার দিব্য দেবভোগ করেন।" উদ্ধৃত ১ম শ্লোকে ভোগলোক (Sensual World) স্বর্গের নশ্বরত্ব এবং ২য়টীতে তথাকথিত স্বর্গের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এখন যাঁরা স্বর্গকে আদর্শ সুখের স্থান বা আধিভৌতিক (Physical World) বলেন, তাঁদের স্বীকৃত ঐরূপ স্বর্গের উৎকর্ষ কতখানি, তাহার কিছু প্রমাণ দিতেছি। সন্দর্ভের প্রারম্ভে স্বর্গকে কল্পিত বস্তু বলা হইয়াছে। উহা প্রকৃতপক্ষে কল্পিত হইলে উহার এতটুকু মূল্য নাই। কেননা পূজ্যাতিপূজ্য শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞানের খনি বিবেকচূড়ামণিতে ৪৬৩ সংখ্যক প্রমাণে বুঝাইয়াছেন,—"কল্পিত বস্তুর সত্তা নাই এবং উহার উৎপত্তিও হইতে পারে না"। তাৎপর্য্য মন্দান্ধকারে নিপতিত রজ্জুখণ্ডে কল্পিত সর্প কিংবা রৌদ্রালোকে দীপ্ত শুক্তিতে (ঝিণুকখণ্ডে) প্রতীয়মান রজতের প্রকৃত জন্ম নাই, উহা নিছক প্রতিভাস (Appearance) মাত্র। "অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বমসত্যস্য কুতো জনিঃ।" তারপর আদিমদর্শন সাংখ্যের বিখ্যাত, মনোমদ ও অতি প্রামাণিক সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে "দৃষ্টানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইত্যাদি ২য় কারিকাতে, যাগাদিতে পশুবধাদির জন্য পাপ হয়, সুতরাং দুঃখসংস্রব আছে, যাগাদির ফল স্বর্গাদি বিনশ্বর। সুতরাং কিছুকাল পরে দুঃখে পতিত হয়। স্বর্গাদি সুখে তারতম্য আছে। অতএব অধিক সুখ দেখিয়া অল্পসুখীর দুঃখ জন্মে, ইত্যাকার বিচারমুখী ব্যাখ্যায় ভোগলোক স্বর্গকে বিশেষভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। স্বনাম-প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীর ৪র্থ অঃ ৫৩ শ্লোকে ঐ উক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে পুনরুক্ত হইয়া ঐরূপ স্বর্গকে একান্ত হেয় বলা হইয়াছে। "ক্ষয়াতিশয়-দোষেণ স্বর্গো হেয়ঃ।" মহারাজ অজের বানপ্রস্থমূলক ধর্মজীবন বর্ণনপ্রসঙ্গে কবিসত্তম কালিদাস লিখিয়াছেন,—"পরিণতবয়সে মহারাজ অজ স্বর্গলোকে উপভোগ্য বিনাশশীল রূপরসাদি বিষয়েও নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। "বিষয়েষু বিনাশ-ধর্ম্মসু" ইত্যাদি রঘু, ৮।১০। উক্ত কবিপ্রবর স্বকৃত কুমারসম্ভবের ১৬শ, ৪৮ সংখ্যক কবিতায় তথালোচিত স্বর্গের বীভৎস ভাবটী কেমন সরস, মধুর ব্যঙ্গের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বুঝিয়া দেখুন, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রে পারদর্শী দুইজন রথী পরস্পর যুদ্ধে সম্মুখরণে গতপ্রাণ হওয়ায় স্বর্গলাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা স্বর্গে গিয়াও একটী পরমাসুন্দরী সুরাঙ্গনার জন্য ঘোরতর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। "অন্যোন্যং রথিনং কেচিদিত্যাদি। এ যে "ঢেকির স্বর্গে গিয়াও ধানভাঙ্গা" প্রবাদের অতি বড় দৃষ্টান্ত।

স্বর্গের ক্ষয়শীলত্ব ও নশ্বরত্ব সম্পর্কে শ্রুতির ন্যায় স্মৃতিও মুখর। স্মার্ত্ত

প্রমাণে দেখিতে পাই, "ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা" "পুণ্য ক্ষয়াদিহাগত্য পিতা সর্ব্বধর্ম্মবিৎ" ইত্যাদি। বলিতে কি স্বর্গের এই নিকৃষ্ট ধারণাটী কালক্রমে এত বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আদি কবি বাল্মীকির রচিতরূপে পরিচিত আমাদের নিত্য প্রাতঃপাঠ্য মনোহর গঙ্গাস্তবটীতে যখন গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধ কিন্নরবধূতুঙ্গস্তনা স্ফালিতম্"—বাক্যাংশটী আবৃত্তি করি; তখন গঙ্গাস্নানের ভাবী পুণ্যের ফলে স্বর্গগামী পারলৌকিক আত্মার ঐরূপ ভোগলালসার ঘৃণ্য কামনাটী ঋষিকবির রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তিতে কুলায় না। সুখের বিষয় স্তবাদির পাঠ কালে প্রায়ই আমরা এত ভক্তিনিষ্ঠ ও প্রগাঢ় মনোযোগী থাকি যে লেখকের মত অনেকেরই হয়ত অর্থবোধের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। যাহ'ক আলোচ্য স্বর্গ যে আদর্শ সুখধাম নহে বা হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র ধারণা ও স্বল্পজ্ঞানে সংক্ষেপে যতটুকু বলা যায় বলিলাম। এখন ২য় পক্ষে অর্থাৎ শাস্ত্র বর্ণিত আধ্যাত্মিক স্বর্গটী সাধনার পরিপাকে লব্ধ আনন্দঘন অবস্থাবিশেষ; এ বিষয়ে আমার শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি, প্রমাণ ও বিশ্বাস মতে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। প্রথমতঃ আমি পুরাণ-রাজাধিরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ, ১৯শ অঃ ৪২ সংখ্যক শ্লোকের ৪র্থ পাদটীর সিদ্ধান্তরূপে উল্লেখ করিতেছি। "স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ।" অর্থাৎ হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেকের নাম স্বর্গ। পাণ্ডিত্য ও সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ পূজ্যপাদটীকাকার শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন, "ন তু ইন্দ্র-লোকাদিঃ"। সাধারণের সুবিদিত ইন্দ্রলোকাদি প্রকৃত স্বর্গপদবাচ্য নহে। হেতুবাদটী পূর্ব্বেই যথাযথ প্রদত্ত হইয়াছে। এখন স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত উদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যাত উদ্ধৃত গম্ভীরার্থ স্বর্গের লক্ষণটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি বলিয়াছি পরমানন্দঘন অবস্থা বিশেষই স্বর্গ। এই শব্দের যৌগিক অর্থ—গতি—নিবৃত্তিমূলক কোনওরূপে স্থিতি বা থাকা। আমরা সাধারণতঃ কোনও দেশে, কালে ও ভাবে অবস্থান করি। দেশ ও কালের ন্যায় ভাবও অনন্ত। কিন্তু অনন্ত দেশকে যেমন আমরা ঋগ্‌বেদের পদ্ধতি মতে "দ্যাবাপৃথিবী" স্বর্গ ও পৃথিবীরূপে অনন্ত কালকে প্রধানতঃ দিবা ও রাত্রি মাত্র দুইটী ভাবে গ্রহণ করি, তেমনি অনন্ত ভাবকেও আমরা দুঃখ ও সুখ এই দুইটী প্রধান ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। বলিতে কি, মানবের অবস্থা বলিতে লোকতঃ ও ব্যবহারতঃ এই দুইটীই মোটামুটি বুঝাইয়া থাকে। কেননা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্য জগৎ ত্রিগুণের বিকার। ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র মহৎ প্রত্যেক বস্তুটী ত্রিগুণা রজ্জুর মত সুখদুঃখ মোহাত্মক তিনটী ভাবে

সর্ব্বদা বিজড়িত। এই জগতে বলীয়সী প্রকৃতির প্রভাবে কেহ কখনও সুখী, কেহ বা দুঃখী, আর কেহবা মুগ্ধ অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন। সহজ কথায় হয় কখনও আমরা হাসি, কখনও কাঁদি, আর কখনও বা জড় বা স্তব্ধ হইয়া অবস্থিতি করি। এই হাসি কান্না ও মোহ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের কার্য্য। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান জগতে বিশুদ্ধ সত্ত্বের কার্য্য প্রকৃত সুখের অপ্রাদৃত শুচি শুভ্র হাস্যের অবস্থাটী একরূপ নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। যাহা আছে, তাহা কেবল কাষ্ঠ বা দেঁতো হাসির (Forced Smile) নকল মাত্র। "হাসি সুখের রমণী। সুখের মরণে হাসির সহমরণ।" আদিম নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর এই মন্তব্য আজকাল বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যাক্ আমি বেদান্তসূত্রপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সুখের কথা ব্যাখ্যা করিতেছি। সুতরাং একথা বলা ভাল যে, আমার ব্যাখ্যা যথাস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত হওয়াই সঙ্গত। উক্ত মহাগ্রন্থে ঐ ১১শ স্কন্ধেই সুখের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। "সুখং দুঃখ সুখাত্যয়ঃ।" ১৯।৪১। অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা সাধকের মনে যে ব্রহ্মানন্দ বা ভাগবতানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়, উহারই নাম যথার্থ সুখ। আমার মতে এই প্রকার সুখই প্রকৃত স্বর্গসুখ। এখন উক্ত লক্ষণান্তর্গত "সত্ত্বগুণোদয়ঃ" কথাটার অর্থ ঐরূপ সত্ত্বগুণের (সত্ত্বগুণের ফল ব্যাখ্যাত প্রকার সুখের) উদয় বা আবির্ভাবের অবস্থাটার নাম স্বর্গ। উদয় শব্দটা সঙ্কেতে ঐ সুখের নিত্যত্ব বুঝাইতেছে তাৎপর্য্যার্থে সূর্য্যচন্দ্রের উদয় যেমন নিত্য। তবে যখন যে দেশের লোকের দৃষ্টিপথে উহাদের দর্শন ও অদর্শন ঘটে তখন যেমন সে দেশে (যেমন ভারতবর্ষে ও আমেরিকায়) উহাদের উদয়াস্ত ব্যবহার হয়, তেমনি পরমানন্দঘন স্বর্গসুখটা জীবহৃদয়ে নিত্যকাল অবস্থিত। রজস্তমের যবনিকায় সমাচ্ছন্ন থাকাতেও উহার উপলব্ধি হয় না। ঐ আবরণী কুয়াসা কাটিয়া যাইলেই সত্ত্বসূর্য্যের উদয়ে সাধকের হৃদয়াকাশে এই স্বর্গীয়সুখের পূর্ণশারদেন্দু স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে। এই প্রকার স্বর্গটী কখনই নাম রূপময় বৈষয়িক জগতের মত আধিভৌতিক, অনিত্য ও তুচ্ছ হইতে পারে না। ইহা নাম রূপাতীত অথবা সকল নামরূপের কেন্দ্র ভাবঘন, অখণ্ড রসময়ী সুখানুভূতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবপর। আমার মনে হয়, ধর্ম্ম জগতে প্রথম প্রবিষ্ট মানবের সুখময় আধিভৌতিক স্বর্গের আদিম ধারণাটী শিশুর শৈশবসুলভ ধূলিখেলার মত বয়োবৃদ্ধি-সংযুক্ত জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত রূপান্তরিত হইয়া পরিণামে সচ্চিদানন্দময় আধ্যাত্মিক স্বর্গে উপনীত হইয়াছে। এজন্য প্রাচ্য

দেশের প্রবাদে প্রচলিত সপ্তম বা অক্ষয় স্বর্গের অনুরূপ প্রতীচ্যদেশের নিবন্ধে ও "Heaven of Heavens" কথাটীও সুপ্রচলিত। ফলতঃ স্বর্গ আমাদের অন্তরে, উহা বাহিরের বস্তু নহে। সে জন্য স্বর্গ আমাদের একান্ত কাম্য, সেই সুখ সুখের আশ্রয়টী যত বড়, স্থায়ী ও নিত্য স্বর্গও তদনুপাতে তত বড়, স্থায়ী ও নিত্য। এমতে নামরূপময় পরিণামধর্ম্মী ও বিনাশী জাগতিক সুখটী সত্য-জ্ঞানানন্দময়, অনাগমাপায়ী, অসমোর্দ্ধ সুখ হইতে যে অতি হেয় ও তুচ্ছ ইহা একটা অতীব দুর্ব্বোধ তথ্য নহে। ব্যাখ্যাত-প্রকার স্বর্গ সম্বন্ধে আমার স্বর্গীয় আচার্য্য ভারতবিখ্যাত পাখোয়ার্জী মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক-কেশরী শ্রীরাম শিরোমণির নিকট যে সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত লক্ষণটী শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, এবং যাহা হইতে সেই সুদূরবর্ত্তী অধ্যয়নজীবনে স্বর্গতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু বুঝিবার ও আলোচনা করিবার বেগবতী প্রেরণা পাইয়াছিলাম, যাহার ফলে বঙ্গবাণীর বরেণ্য সন্তানমণ্ডলী গঠিত, সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যের আদি পীঠস্থান, পণ্ডিত কুলশেখর ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার হইতে রসসাগর কৃষ্ণকান্তের রসময়ী কবিতা মঞ্জরীর দিগন্তামোদী, চিরস্থায়ী, পরিমল সুরভি এই বিদ্বৎ পরিষদে আমার ন্যায় একজন অবিদ্বান্ স্থান মাহাত্ম্যে জড়পুত্তলিকার অপূর্ব্ব উপদেশময় উপাখ্যান—মালা বর্ণনের মত এত জটিল দুর্ব্বোধ ও গভীর বিষয়ে আলোচনায় দুঃসাহসী হইয়াছে; সেটী নিবেদন করিতেছি।

মুক্তাবলী পাঠকালে উক্ত আচার্য্যদেব স্বর্গতত্ত্ব বুঝাইতে তাঁর নিজস্ব এই সংজ্ঞাটী বলিয়াছিলেন, "দুঃখানবচ্ছেদকীভূত-শরীরাবচ্ছিন্ন-সুখং স্বর্গঃ।" সুখই স্বর্গ, এইটী স্বর্গের স্বরূপ লক্ষণ (অসাধারণ ধর্ম্ম)। পূর্ব্ববর্ত্তী অংশটী স্বর্গের তটস্থ লক্ষণ বা পরিচায়ক বিশেষণ। বাক্যটীর নির্গলিতার্থ এইরূপ। যে শরীরে কখনও দুঃখলেশের সংস্পর্শ হয় নাই এবং হইতে পারে না, এরূপ শরীরে অনুক্ষণ নবনবায়মানরূপে অনুভূয়মান সুখের নাম স্বর্গ। সত্য বলিতে কি, দেখি আর নাই দেখি, বুঝি আর নাই বুঝি, পাই আর নাই পাই, আস্তিকের বিশ্বাস দৃষ্টিতে শাস্ত্রনিবন্ধরাজিতে লোকব্যবহারে, তথা প্রবাদ ও রূপ কথায় পর্য্যন্ত যে স্বর্গ সকল ধর্ম্মের বিশেষ করিয়া বয়োবৃদ্ধ হিন্দু—ধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় ওতপ্রোত, তাঁহার আদর্শ এইরূপ উদার ও ব্যাপক হওয়াই সর্ব্ববাদি-সম্মত। খৃষ্টধর্ম শাস্ত্র বাইবেলও উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, "The Kingdom of Heaven is within you." এদেশের দেহ তত্ত্বগীতেও এই কথাই শুনি;—

আপনারে আপনি দেখ যেওনা মন কারো দোরে।
কত অমূল্যধন রতনমণি পড়ে আছে নাচ দোয়ারে ॥"

এখন এতকালের ধারণায় যে স্বর্গকে সুখময় ভৌম প্রদেশরূপে শুনিয়া জানিয়াও চিনিয়া রাখিয়াছি, হঠাৎ তাহাকে অগ্রাহ্য করি কেমন করিয়া, এরূপ সংশয় ও অবিশ্বাস লেখকের ন্যায় অনেকের হৃদয়ে উঁকি মারিতেছে, উহা নিরসনের উপায় কি ? উহার জন্য মানবের জন্মসহচর সন্দেহের নিরাকরণ প্রয়াসী সমন্বয়প্রিয় মীমাংসকাচার্য্যের স্বর্গ বিষয়িনী সুন্দর মীমাংসাটী এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। মীমাংসাদর্শনের সুপ্রসিদ্ধ পরিভাষা গ্রন্থ "অর্থ সংগ্রহে" অধিকারবিধি নির্ণয় প্রস্তাবে "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" এই বিধি বাক্যটীর ব্যাখ্যামুখে এযুগের বাচস্পতি কল্প—টীকাকার মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয় "স্বারাজ্যং স্বর্গরাজ্যং অত্র স্বঃপদং নিরবচ্ছিন্ন—সুখানুভবজনকস্থানপরং, নতু" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া নিম্নে মীমাংসা সম্মত স্বর্গের লক্ষণটী উদ্ধৃত কবিয়াছেন ; "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপণীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্ ॥"

ইহার পরে, "ইত্যুক্ত—সুখবিশেষপরম্। রাজস্বান্বয়ানুপপত্তেঃ" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত লভ্য কলিতার্থে বুঝা যায়, স্বর্গ এমন একটী স্থান যে স্থানে নিরন্তর অবিমিশ্রসুখের অনুভব হয়। ইঁহারা বলেন, শুদ্ধ—সুখকে স্বর্গ বলিলে প্রদর্শিত বিধিবাক্যে "স্বর্ স্বর্গ-সুখ" ধরিলে রাজ্য পদটী বিফল হইয়া যায়। বৈদিক পদের এরূপ ন্যূনতা স্বীকার সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। অতএব উদ্ধৃত প্রাচীন ও প্রামাণিক কারিকায়স্থিত "স্বঃ পদাস্পদম্" শব্দে "স্বর্ স্বর্গরূপ বস্তুর আস্পদ স্থান" এইরূপ স্পষ্টার্থে সুখের স্থান পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। এইটী অবশ্য মীমাংসকের মতই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার মনে হয়, পূর্ব্ব-প্রদর্শিত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত মতে যে অপূর্ব্ব শরীরে স্বর্গসুখ অনুভূত হয়, এরূপ শরীরের যেটী আবাসভূমি অর্থাৎ আধার সেটীও অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-দর্শন সম্মত অপ্রাকৃত বা চিন্ময় স্বীকার করিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। কারণ শরীরের নাম ভোগায়তন। শরীরেই সুখের ভোগ হইতে পারে। সুতরাং আলোচ্য স্বর্গসুখটি আধ্যাত্মিক হইবে ইহাতো স্বাভাবিক। শাস্ত্রে স্বর্গে ভোগ্য পদার্থগুলিকে সঙ্কল্পমূলক ও স্বর্গীয় শরীরকে মনোময় বলা হইয়াছে, মনোময়ানি স্বর্গলোকে শরীরাণি সঙ্কল্পমূলকাস্তত্র ভোগাঃ। ইতি। ফলতঃ যে নাস্তিকের শুষ্কতর্ক ক্ষয় বিচারের চক্ষে স্বয়ং ভগবান টিকেন না তাঁহাদের নিকট স্বর্গনরক ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা তুলা

তুষাবকগুন সদৃশ। পক্ষান্তরে যাঁরা প্রতিপদক্ষেপেও প্রতিপলকে পরলোকের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন তাঁদের নিকট অনিত্য আধিভৌতিক স্বর্গের যতখানি মূল্য নিত্য আধ্যাত্মিক স্বর্গের মূল্য ও ততোঽধিক নহে। বিচার বিতণ্ডা কেবল তোমার আমার মত রামাশ্যামার জন্য। তবে ব্যবহারিক জগতে আস্তিকের বিশ্বাসের মত নাস্তিকের যুক্তি বিচারেরও একটা উপযুক্ত মূল্য আছে। তত্বতঃ আস্তিক ও ও নাস্তিক বিশ্বাস ও বিচার যেমন কথার কথা স্বর্গ ও নরক ঠিক তেমনি কথার কথা মাত্র। আসল কথা বস্তু। কেননা মতামতগুলি মানব সৃষ্ট বস্তু বা সত্য ভগবৎসৃষ্ট। সত্য দ্রষ্টামাত্রেরই অভিজ্ঞতা,—"Theories are human, facts are Divine." রস নিরাকার আসল বস্তু। কিন্তু উহার ফলের খোসার রূপগুণ লইয়া বিচারে যেমন পণ্ডশ্রম সার, তেমন জগতের একমাত্র আসল বস্তু আনন্দ বা সুখ বাদ দিয়া স্বর্গ লইয়া নাড়াচাড়া শিব বাদ দিয়া শবের সেবার বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। প্রাচীন প্রায় সকল ধর্ম্মমতের গোড়ার দিকে যখন প্রকৃতি পূজা (Nature worship) পিতৃ পূজা (Ancestor worship) প্রভৃতির সমারোহ ছিল, তখন ধর্ম্মসাধনাব মধ্যযুগে বা কতকটা উচ্চস্তরে মানুষমাত্রেরই কাম্য সুখের আদর্শ স্বর্গ সম্বন্ধে যে ঐরূপ বৈমত্য থাকিবে, তাহাতে বিস্ময় নাই। আমি প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মেও ঠিক্ ঐরূপ স্বর্গের দুইটী ভাব (Two aspects) দেখিতে পাই বাইবেল (New Testament) হইতে ঐ দুইটীর প্রকরণ নির্দেশ পূর্ব্বক মর্ম্মানুবাদ দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এই দুইটি অনুশাসনে স্বর্গকে ঈশ্বরের বাসস্থান এবং পূতাত্মগণ তথায় সুখস্বাচ্ছন্দে বসবাস করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, বলা হইয়াছে। "The condition of those Souls Who share the life of Christ" "এবং আমাদিগকে উর্দ্ধে লইয়া গিয়া স্বর্গলোকে যিশুখৃষ্টের পার্শ্বে বসাইয়া দেন।" Ephesianas, chap 2.6. "স্বর্গে আমাদের আলাপ মিলাপ হইয়া থাকে, এবং তথা হইতে আমরা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশুখৃষ্টকে দেখিয়া থাকি।" Philiphianas chap 3.20. এ স্থলে স্মরণ করা ভাল যে সংস্কৃত স্বর্গশব্দে সুখময় স্থান ও আনন্দময় ঈশ্বরের মত ইংরাজী "Heaven" কথায় স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতা দুই ই বুঝাইয়া থাকে।

শরৎচন্দ্রের সাহচর্যে কয়েকদিন

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপে যখন কোনও বড় কবি বা সাহিত্যিক মারা যান তখন তাঁদের জীবনচরিত চিঠিপত্র—তাঁর সম্বন্ধে ছোট বড় সকল রকম জ্ঞাতব্য সংবাদ মোটা মোটা ভলুমে বার হতে দেখা যায়। কবিদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন—"কবিরে খুঁজিছ তাহার জীবন চরিতে?"—তবু একথা সত্য যে কবি বা সাহিত্যিক মাত্রেরই ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁদের সৃষ্ট কাব্য বা সাহিত্যের একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে। অবশ্য তাঁদের জীবনের অনেক দিন থাকতে পারে যার সঙ্গে কাব্যের কোনও সম্বন্ধ নেই—যা নিতান্ত বাইরের দিক। কিন্তু জীবনের ভিতর থেকে যখন কাব্য প্রতিফলিত হচ্ছে তখন ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যতই পরিচিত হওয়া যাবে ততই কবির অন্তরলোকের এমন সব রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে যা কাব্যের পূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অমূল্য। একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও প্রযুজ্য নয় কি? তাঁর জীবনস্মৃতি বা তাঁর ছিন্নপত্র প্রভৃতি থেকে আমরা কি তাঁর কবিমানসের পরিচয় পাই না? জীবনস্মৃতির প্রথম ভাগে প্রকৃতি পরিচয়ের যে গভীরতা ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতার সুরের যোগ আছে। আবার জীবনস্মৃতিতেই দেখি যে প্রকৃতির সহিত পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই কবির মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি পরিচয়ের এই গভীরতা প্রভাত-সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে তাঁর পরবর্তী সকল কাব্যে সুপরিস্ফুট।

শরৎচন্দ্র আজ পরলোকে। এই সভায় অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আছেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কাজেই তাঁরা যদি তাঁদের সমবেত চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের ছোট বড় ঘটনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে একটি জীবনী তৈরী করেন তা'হলে শরৎচন্দ্রকে বুঝবার যথেষ্ট সাহায্য হবে। বঙ্গদেশের পাঠক সমাজে শরৎচন্দ্র খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কাজেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের যোগসূত্রগুলি যদি তাঁর পাঠক সমাজকে পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে নানা ছোটখাট ঘটনার ভিতর থেকে শরৎচন্দ্রের অন্তরের প্রতিকৃতিটি যে ফুটে উঠবে

তাতে শরৎচন্দ্রের পাঠক সমাজ যে আনন্দিত হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক সাঁত ব্যভ্ (Sainte Beuve) ও ম্যাথু আর্ণোল্ড্ এই ধরণের সমালোচনা লিখে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন—এ আমরা জানি। ঐ দুইজন সমালোচক কবি ও ঔপন্যাসিকদের চিঠিপত্র ও নানাবিধ ছোটখাট ঘটনা থেকে ঐ সব কবি ও ঔপন্যাসিকদের অন্তর জগতের প্রতিকৃতিটি অঙ্কিত করে তুলতে পেরেছেন।

অল্প কয়েক সপ্তাহ শরৎচন্দ্রের সাহচর্যে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সাহিত্যিক জীবনের যে যোগসূত্রটি চোখে পড়েছিল সেইটিই আমার এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৯২৫ সাল। সেবারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল মুন্সীগঞ্জে। সেই অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করবার জন্য গিয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিক সেই সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় টেলিগ্রাম পেলাম যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতায় ফেরবার পূর্বে একবার ঢাকায় বেড়িয়ে যাবেন—এবং তিনি আমাদের বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য আসছেন। শুনে মন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। কারণ এতদিন কেবল যাঁর উপন্যাসের রস আস্বাদন করেছিলাম—যাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অভিনবত্ব সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাময়িক পত্রে দু'একটা সমালোচনা লিখেছিলাম মাত্র, সেই স্রষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হবার সম্ভাবনায় মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। সমস্ত আয়োজন ঠিক করে রাখলাম—নির্দিষ্ট দিনে তিনি এসে আমাদের বাড়ীতে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন কবি গিরিজাকুমার বসু। বাড়ীতে পৌঁছাবার পর থেকেই এত রকম হাসির গল্প আরম্ভ করে দিলেন তিনি যে, তাতে সহজেই বুঝতে পারলাম, শরৎচন্দ্র কি রকম কৌতুকপ্রিয়—কি রকম রসরসিকতা তাঁর ছিল। তাঁর উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার সমবেদনাপূর্ণ অন্তরের গভীরতার পরিচয় দিত এবং তাঁর অফুরন্ত হাস্যরস তাঁর সরলতা ও রসিকতার পরিচয় দিত। এক-একদিন রাত বারটা বেজে গেছে; তাঁর গল্প চলেছেই—তাতে তিনিও ক্লান্তি বোধ করতেন না—আমরা তো না-ই। এই গল্পের আসরে এসে যোগ দিতেন অনেক বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ—যেমন ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ, কবি গিরিজা কুমার বসু ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি—তা ছাড়া আমাদের পরিবারের প্রায় সকলেই

তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতাম। শরৎচন্দ্রের অফুরন্ত গল্প শুনলে মনে হ'ত তাঁর অভিজ্ঞতা কত! ভাবতাম, মানব-জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় কিরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন এবং সে সব বিষয়ে তিনি কত ভেবেছেন—কত রকম লোকজনের সঙ্গে তিনি মিশেছেন। সব চেয়ে অবাক্ হতাম এই দেখে যে তাঁর জীবনের সকল অভিজ্ঞতাকে তিনি কিরকম সরস-সুন্দর ভাবে অনর্গল বলে চলেছেন।

শরৎবাবু একদিন বিকালে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটকের (ইনি তখন ঢাকার এস্, ডি, ও ছিলেন) বাড়ীতে গিয়ে ছিলেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দের বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে তিনি এমনি গল্প জুড়ে বসেছিলেন যে সুরেশ বাবুরা ভুলেই গিয়েছিলেন যে রাত গভীর হয়েছে—শরৎচন্দ্রকে ছেড়ে দিতে হবে। শরৎবাবুরও খেয়াল ছিলনা—গল্পের নেশায় তিনি সেখানেই জমে গিয়েছিলেন। ওদিকে অপূর্ব্বকুমার চন্দের বাড়ী থেকে বারবার আমাদের বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করতে আসছেন—শরৎচন্দ্র ফিরেছেন কি না? শুনলাম রাত যখন প্রায় এগারোটা, তখন তিনি মিঃ চন্দের বাড়ীতে আসেন। তাও মিঃ চন্দ নিজে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন তাঁর বাড়ীতে, তবে। নইলে তিনি কখন উঠতেন কে জানে! এত গল্পপ্রিয় তিনি ছিলেন—এবং গল্পের নেশায় তাঁর স্নান খাওয়ার সময় বয়ে যায় একথা তাঁকে বললে তিনি বলতেন, "আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে লোকে যদি খুশী হয় তো আমি কেন তাদের এটুকু আনন্দ জোগাতে কৃপণতা করবো?" সে-রাত্রে প্রায় আড়াইটার সময়ে তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন। বাড়ী ফিরে আসার পরে বাবা তাঁকে বল্লেন, "শরৎ, সময় সম্বন্ধে তোমার একটু মনোযোগী হওয়া উচিত।" শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "আচ্ছা চারু*, মানুষ ঘড়ির দাসত্ব করবে এ আমি সহ্য করতে পারি না। তোমরা দাসত্ব প্রথাকে ঘৃণা কর—তবু আমাকে বলছো, ঘড়ির দাসত্ব করতে? ও আমি পারবো না"

শরৎচন্দ্র যে সকল প্রথার বাইরের মানুষ ছিল একথা তাঁর একখানি পত্র থেকে আপনারা বুঝ্তে পারবেন। তিনি ঢাকা থেকে কলকাতায় পৌঁছে পৌঁছানো খবর দেবার সময় লিখেছিলেন—

"প্রিয়বরেষু,

চারু, পৌঁছানো সংবাদ একটা দিতে হয়। প্রথা আছে। কিন্তু তোমরা

---

*শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তো জান যে আমি সকল প্রথার বাইরের মানুষ। তবু একখানি পত্র দিলাম—নইলে হয়ত ভাব্‌বে।"

পথের যত সব দেশী কুকুর—যাদের প্রতি কেউ কোন দরদ প্রকাশ করে না যারা নিরাশ্রয় যারা তাদের নিজেদের আহার্য্য নেজেরাই সন্ধান করে নেয়—তাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা বিশেষ আন্তরিক করুণা ছিল। তাঁর নিজেরও এইরকম একটি কুকুর ছিল তার নাম ছিল ভেলু। ভেলু মারা যাওয়াতে তিনি যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা বর্ত্তমান সংখ্যার উত্তরায়ণেই পাঠক পাঠিকাবর্গ দেখবেন। নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধুবিয়োগে মানুষ যেমনধারা শোকবিহ্বল হ'য়ে পড়ে ঠিক সেইরূপ শোকবিহ্বল তিনি হ'য়ে পড়েছিলেন যখন তাঁর অতি-প্রিয় সবক্ষণের সহচর ভেলু মারা গিয়েছিল।

ভেলুর মৃত্যুর পর তিনি যে সংক্ষিপ্ত চিঠিখানি লিখেছিলেন তাতে বলেছেন "......রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।" এই রাজা ভরতের উপাখ্যানটি তিনি তাঁর চন্দ্রনাথ উপন্যাসে সন্নিবেশিত করেছিলেন—সেখানে কথকের মুখে ঐ উপাখ্যান চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে এবং তা শুনে বৃদ্ধ কৈলাস খুড়ো তাঁর অতি স্নেহের বিশুকে হারাবার সম্ভাবনায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। শরৎচন্দ্র যে তাঁর ভেলুকে হারিয়ে রাজা ভরতের মত দুঃখ অনুভব করেছিলেন অথবা কৈলাস খুড়োর মত ব্যথিত হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র একবার রাঁচি গিয়েছিলেন। সে সময়েও এমনিধারা একটি পথের নিরাশ্রয় কুকুর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাকে তিনি যত্ন-আদর করতে ত্রুটি করেন নি। এ আখ্যায়িকা তিনি "অতিথ" নাম দিয়ে শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত "পাঠশালার" ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। রাঁচি থেকে ফিরে আস্‌বার সময়ে সেই সামান্য একটি কুকুরকে ছেড়ে আস্‌তে তিনি যে কি রকম ব্যাকুল হয়েছিলেন তা তাঁর ঐ "অতিথ" গল্পের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র যখন প্রথমবার ঢাকায় যান তখন তাঁর এই ভেলু জীবিত ছিল। তিনি তাঁর ভেলুর অনেক কাহিনীই আমাদের বল্‌তেন। আমাদের বাড়ীতেও তখন দুটি কুকুর ছিল। একটি দেশী, অপরটি বিলাতি। দেশী কুকুরটি খুব সবল এবং তেজী—তার প্রতাপে আমাদের বাড়ীর বাগানের মধ্যে গরুর বা ছাগলের প্রবেশ দুঃসাধ্য ছিল। একদিন দুপুরবেলা শরৎচন্দ্র আমাদের বাড়ীর বাগানের উপরকার বারান্দায় বসে আছেন, তাঁর কাছে বাবাও ছিলেন, সেই সময়ে

কোথা দিয়ে যেন একটা গরু হঠাৎ বাগানের মধ্যে এসে পড়ে। তাই দেখে সেই দেশী কুকুরটি চীৎকার ক'রে ডেকে ডেকে প্রথমে তার তীব্র আপত্তি জানালো। তারপর ছুটে গিয়ে গরুটাকে দিলে এক কামড় বসিয়ে। গরুটি তখন উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে তবে বাঁচলো। বিজয়গর্বে কুকুরটি যখন ফিরে এসে বারান্দায় উঠলো তখন বাবা কুকুরটাকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন "ভারী পাজি হয়েছে এটা।" কুকুরটি তার কান গুটিয়ে লেজ নাড়্তে লাগলো। শরৎচন্দ্র তখন কুকুটিকে কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রে বললেন, "চারু, তোমার ওকে বকা অত্যন্ত অন্যায়। ওই তো তোমার বাগান-রক্ষকের কাজ করছে!" বাবা বললেন, 'কিন্তু ও যে গরুটাকে কাম্‌ড়ে দিলে।" শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন; "তা অন্যায়ই বা কি করেছে—কাম্‌ড়ে একটু মাংস তুলে নেবার চেষ্টা করেছিল বৈতো নয়; আমার ভেলুর একদিনকার কীর্ত্তি শুন্‌বে, চারু!—একদিন কয়েকজন ভিখারী আমার বাড়ীর ভিতরে ভিক্ষার জন্য এসেছিল। প্রথমে ভেলু তীব্র চীৎকার ক'রে তার আপত্তি জানিয়েছিল। তারপরে সে অধৈর্য্য হ'য়ে লাফিয়ে গিয়ে একটা ভিখারীকে কামড়ে দিলে। ভিখারীদের হল্লা শুনে আমি সেখানে উপস্থিত হ'য়ে দেখলাম, ভেলু ভিখারীটিকে খুব এক কামড় বসিয়েছে। অন্যান্য ভিখারীরা কুকুরটার আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানালে আমার কাছে।—আচ্ছা চারু! ও সেই ভিখারীটার গা থেকে খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল বৈ তো নয়! এতে অন্যায়টা কি করেছিল? ভিখারীগুলো ভেলুর অপত্তি শুন্‌লো না বলেই না ভেলু তার বিক্রম প্রকাশ করলে। শেষকালে আমি পাঁচটি টাকা দিয়ে ভিখারীদের মুখ বন্ধ কর্‌লাম।"

দেশী কুকুরের প্রতি সবাই যেমন উদাসীন হন, আমরাও তেমনি উদাসীন ছিলাম আমাদের সেই দেশী কুকুরটির প্রতি। কারণ আভিজাত্যের গর্ব করবার মত তার কিছুই ছিল না তো! সে কুকুরটি সকলের ভুক্তাবশিষ্ট যা পেতো তাই খেতো—অথচ আমাদেরই সেই বিলাতি কুকুরটির কি আদর যত্নই না হ'ত! তাকে নিয়মিত স্নান করানো—সময়মত তার জন্য ভিন্ন পাত্রে খাদ্য পরিবেশন—এ-সবের ত্রুটি কখনো ঘটতো না।

শরৎচন্দ্র যে-কদিন ঢাকায় আমাদের বাড়ীতে ছিলেন সে কদিনই প্রত্যহ তিনি তাঁর খাওয়ায় পরে ভাত নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঐ দেশী কুকুরটির প্রতি তাঁর এত পক্ষ-পাতিত্ব কেন? তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "ওকে তো তোমরা কেউ দেখ না—ওর প্রতি তোমাদের যত্ন আর অবহেলা আছে বলেই

আমি ওকে ভালবাসি। বিলিতি কুকুরটাকে তো তোমরা যত্ন-আদর কর্ ছই। সে আদরের উপর আবার আদর কেন?”

একদিন আমাদের বাগানের মালিটি কি কারণে বিরক্ত হ'য়ে সেই দেশী কুকুরটাকে তার জল আনবার বাঁক দিয়ে এক ঘা মেরেছিল। শরৎচন্দ্র তা দেখতে পেয়ে মালিটিকে খুব তিরস্কার করেন এবং ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আস্‌বার সময়ে বাড়ীর অন্যান্য ভৃত্যদের বখশিস দিয়ে তিনি বিশেষ ভাবে মালীর উল্লেখ ক'রে বলেন, “ওকে আমি এক পয়সাও দেব না। কুকুরকে যে মারে তার প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি নেই।”

পথের ধারের দেশী কুকুরদের প্রতি তাঁর এইরকম মায়ার পরিচয় আরও একবার পেয়েছিলাম যখন তিনি দ্বিতীয়বার ঢাকায় যান ১৩৪৪ সালে। একদিন তিনি কোন একটা সভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে মোটরে উঠতে যাচ্ছেন। সঙ্গে আমিও যাবো। আমি তাঁর পিছনে যাচ্ছি। গাড়ীতে উঠবার ঠিক পূর্বে তিনি ড্রাইভারকে বল্‌লেন, “দেখ, যদি রাস্তায় কুকুর চাপা দাও তো আমি গাড়ী থেকে নেমে যাবো—সাবধানে চালিয়ো। কলকাতায় আমার ড্রাইভারকে আমি ব'লে দিয়েছি যে সে যদি কোন কুকুর চাপা দেয় তার চাকুরী যাবে।”

এইখানে আমরা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন থেকে মস্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা লাভ করি—তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি। যেখানে অবহেলা, শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি সেই খানে—এ জিনিসটি তাঁর সাহিত্যে ও ব্যক্তিগত জীবনে উভয়তঃই সমানভাবে বর্ত্তমান দেখতে পাওয়া গিয়াছে। অবজ্ঞাত ও নিরাশ্রয় যারা তাদের তিনি অতি আদরের সঙ্গে বুকে তুলে নিয়েছেন। ভবঘুরে শ্রীকান্ত, ডানপিটে ইন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন সতীশ, পতিতা রাজলক্ষ্মী, স্বামীত্যাগিনী অভয়া, কলঙ্কিতা অন্নদা দিদি বা দুশ্চরিত্র জীবানন্দ প্রভৃতিকে নিয়ে তাঁর সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে যার আভাস আমরা তাঁর আচরণে পেয়েছি তাঁর সাহিত্যেও ঠিক সেই জিনিসটি প্রতিফলিত দেখতে পাই। এতটুকু ব্যতিক্রম আছে কি?

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ধারাটি অনুশীলন করলে দেখা যায় যে সেই-সব উপন্যাসে অতি নিম্ন-শ্রেণীর জীবনযাত্রা অঙ্কিত হয়নি। কিন্তু সমাজের যারা অবহেলিত ও অবনমিত তাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা গভীর এবং আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। এই জন্যই তিনি সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রা—এমন কি সমাজে বহির্ভূত জীবনকে 'তাঁর কল্পনায়

স্থান দিয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অগ্রণী।

কি পশুজীবন—কি মানব জীবন—সর্বত্রই তাঁর অসীম সহানুভূতি ছিল তুচ্ছতমদের প্রতি। সেইজন্য তাঁর কল্পনা তুচ্ছতম ও অবহেলিত নর-নারীদের মহিমা উপলব্ধি করেছিল। তাঁর হৃদয়ের আবেগ এত বেশী ছিল যে, সকল কিছুকেই তিনি খুব বড় ক'রে দেখে গিয়েছেন। যা সামান্য ও সাধারণ তার মধ্যেই তিনি অসামান্যতা ও অসাধারণত্ব উপলব্ধি করতেন। নীলাম্বরের মত গাঁজাখোর পল্লীসন্তানের মধ্যেও রসের উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ধান করতে তাঁর সাহসের অভাব হয় নি। অথবা একদর্শী বৈরাগীর পাষাণ-হৃদয়ের একপাশে যে মহত্ত্ব নিহিত ছিল তা অঙ্কিত করতেও তিনি বিস্মৃত হন নি।

কোনো সাহিত্যদর্পণ কাব্যদর্পণ বা অলঙ্কারশাস্ত্র অনুশীলন ক'রে শরৎচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের বলা কয়েকটি কথা আজ মনে পড়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন, "যে জিনিস আমি নিজে কখনো ভাল ক'রে দেখিনি, তা আমার সাহিত্যে স্থান পায় নি! নিছক কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে আমার কোনো উপন্যাসই গড়ে ওঠেনি। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আমি দেখেছি—সে সবের কারণ আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি, তারপরে তাকে আমি উপন্যাসে রূপ দিয়েছি।" তাঁর এই কথাটি কতখানি সত্য তা শরৎ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই সহজে বুঝতে পারবেন। আমাদের তো মনে হয় যে মানুষের সুখ-দুঃখ যতটা তিনি দেখেছিলেন তার চেয়ে বেশী তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—এই উপলব্ধি করার মধ্যে তাঁর যে শক্তি ছিল তাই তাঁর কবিশক্তি। এই শক্তি ছিল বলেই তিনি তাঁর চোখে-দেখা চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন অত সফলতার সঙ্গে।

তিনি একদিন বাবাকে বলছিলেন, "চারু, আমার মত ক'রে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা, করতে হ'ত তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত হাড়ি-বাগদীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি—তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল ক'রে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তা ছাড়া, আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা। মানব জীবনের

সহিত পরিচয়ের এই গভীরতার জন্যই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলির মাধুর্য্য অত প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি তাঁর উপন্যাস সমূহে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন বলেই তাঁর উপন্যাসে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নেই—এই জন্যই তাঁর উপন্যাসের কাহিনীগুলি আমাদের হৃদয়কে অত গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট্ উপাধি গ্রহণ করবার আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার ঢাকায় যান। তখনও দেখছি তিনি কত বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ—কত গভীর জ্ঞান তাঁর! কত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বিভিন্ন লোলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা তিনি সমানে করে যেতেন। এতে তাঁর প্রায়ই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্যও প্রকাশ পেতো। দেখতাম তিনি ইতিহাস ভূগোল দর্শন ইংরেজি সাহিত্য প্রভৃতিও কি রকম গভীরভাবে পড়েছেন এবং সে সম্বন্ধে কত চিন্তা করেছেন। কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে তাঁর লাইব্রেরী দেখেছি! তাতে রবীন্দ্রনাথের বই ছাড়া সবই প্রায় দেখলাম সায়ান্সের বই। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিজের লাইব্রেরীতেও এই রকম দেখেছি—অধিকাংশ আলমারি বায়োলজি ও ভূগোল সম্বন্ধীয় বইয়ে ভরা। কলকাতায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যে দিন দেখা করতে যাই সে দিন তিনি উপরে তাঁর লাইব্রেরী বা পড়ার ঘরে ছিলেন। আমাকে তিনি উপরেই ডেকে নিলেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি একখানি Elements of Civics পড়ছেন—আমাকে দেখে বইখানি নামিয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র সাহিত্য তিনি খুব মনোযোগ দিয়েই পড়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ঢাকায় গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাতে তাঁর কলকাতা ফিরে আস্তে খুব বিলম্ব হয়ে যায়। সেই সময়ে দেখেছি—দু-একদিন জ্বরের ঘোরে অনর্গল তিনি "বলাকার" কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন—প্রত্যেকটি কবিতা তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ। এ ছাড়াও, কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করলে তিনি বড় ব্যথিত হতেন। তার চোখ-মুখ রাগে লাল হ'য়ে উঠতো। মাসিক মোহাম্মদীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিরুদ্ধ- সমালোচনা সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "আরে, ওরা সব ভুলে যায় যে, এই গাল দেবার—নিন্দা কর্‌বার ভাষাটাই বা ওদের কে শিখিয়েছেন!

শরৎচন্দ্র ঢাকার বহু সভা-সমিতিতে বল্‌তেন যে মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র

করে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করবেন। অবশ্য এ ধরণের উপন্যাস রচনা করবার জন্য অনেক পূর্ব থেকে তাঁর মনে একটা ইচ্ছা বর্তমান ছিল। তিনি বল্‌তেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুসলমানদের যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে আমার মন সব জায়গায় সায় দেয় না। কৃষ্ণকান্তের উইলে দানেশ খাঁ যখন নিশাকরের কথা শুণ্‌তে শুণ্‌তে আঙ্গুল গুণে "এক বাত্ হুয়া" "দো বাত হুয়া" বল্‌ছিল, তখন নিশাকর উত্তর দিয়েছিল—"ওস্তাদজি, শুয়ার গুণ্‌চো না কি ?"—এইরকম সব উক্তির দ্বারা অনর্থক তিনি মুসলমান সমাজকে ব্যথিত করেছেন। অথচ সহানুভূতির সঙ্গে মুসলমান সমাজের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে উপন্যাস রচনা করলে মুসলমানেরা ব্যথিত হতেন না হয়ত।" এইজন্য তিনি মুসলমান সমাজ ও জীবনকে নিয়ে একখানি উপন্যাস লেখবার সঙ্কল্প করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছেই শুনেছিলাম যে এ-সম্বন্ধে প্রথমে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, "এ দিকটা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু ভাবি নি, জানাও নেই বিশেষ কিছু। সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা খুব গভীর, তুমিই এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি।"

ঢাকায় গিয়ে তিনি সুসাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রভৃতিদের সঙ্গে তাঁর এই পরিকল্পনা নিয়ে স্নান-খাওয়া বিস্মৃত হয়ে তন্ময় হয়ে আলোচনা করতেন। তিনি তাঁদের বলতেন, "বাংলা দেশের মধ্যে মুসলমানসমাজ ও হিন্দুসমাজ। তার কেবল একটির প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব করলে সেটা শোভন হবে না। তাই আমি তোমাদের সমাজ ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে লিখবো ঠিক করেছি। কিন্তু দেখ,—তোমরা তোমাদের দোষ ত্রুটি দেখে আমার উপর চটে যাবে না তো ?" কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি বলতেন, "আপনি যে রকম সহানুভূতির সঙ্গে আপনার উপন্যাসের মধ্যে হিন্দু-সমাজ ও পল্লীসমাজের দোষ-গুণ দেখিয়েছেন, ঠিক সে রকম ভাবে যদি লেখেন তো আমরা খুসীই হবো, এবং তাতে আমাদের মুসলমান সমাজ উপকৃত হবে।" তখন শরৎচন্দ্র মুসলমান সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কত ব্যাপার নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। এই ভাবে তিনি মুসলমান সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতেন ; মাঝে মাঝে বলতেন, "একবার তোমাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমাকে ভাল করে দেখাতে পার।"

ঢাকাতে তাঁর অসুস্থতার সময়ে প্রায়ই তিনি চোখ বুজে বসে থাকতেন।

একদিন বিকালে বাবা ইউনিভার্সিটি থেকে ফির্‌তেই তিনি বাবাকে বললেন, "চারু, জ্বরের ঘোরে আজ দুপুরে ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছিলাম যে উপন্যাসখানি কিভাবে আরম্ভ করে কিভাবে সেটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবো। আজ সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখন আমার মনের মধ্যে একটা পরিষ্কার প্লট আমি গড়ে তুলেছি—তার আরম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।" বাবা তাঁকে বললেন, "তুমি না লিখলে এ বিষয়ে হাত দেবার ক্ষমতা বা প্রতিভা আর কার আছে? তুমি শীঘ্র সেরে উঠে আমাদের সাহিত্যের এই অভাবটিকে দূর করো, এই তো আমরা চাই।"

কিন্তু শরৎচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না! এ যে কত বড় দুর্ভাগ্য তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মুসলমান জীবন ও সমাজকে নিয়ে নূতন ধরণের উপন্যাস রচনার যে মহৎ এবং অভিনব পরিকল্পনা তাঁর ছিল তা সফল হল না। এতে বাংলা সাহিত্যের মস্ত একটা অভাব রয়ে গেল। তাঁর মত প্রতিভা ও সহানুভূতি দুর্লভ। কাজেই আর কোনও সাহিত্যিক এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হবেন কি না সন্দেহ।

সামাজিক জীবনের চিত্র এবং নর-নারীর অন্তরজগতের দ্বন্দ্ব ও বেদনাকে ভাষা দেন সাহিত্যিক। যে-সাহিত্যিক যত বেশী অনুভূতিশীল—যে সাহিত্যিক এই সব সামাজিক জীবনের চিত্র এবং অন্তরজগতের রহস্য ও দ্বন্দ্বকে সুপ্রকাশ করতে পারেন তিনি তত বড় সাহিত্যিক। শরৎচন্দ্র এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর লেখনী বরাবর সমাজের সুখ দুঃখ ও অনুভূতিকে রূপ দিয়ে এসেছিল। তাঁকে হারিয়ে আমাদের কেবল মনে হচ্ছে যে সহানুভূতির সঙ্গে সমাজের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে নর-নারীর অন্তরের পুঞ্জীভূত হাসি-অশ্রুকে তেমন দরদ দিয়ে ভাষায় রূপান্তরিত করবেন কে?

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট (এও)

বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলন একবিংশ অধিবেশনের আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়		ব্যয়	
১। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের নিকট প্রাপ্ত—	১৪৪১৲	১। বিবিধ খরচ —	৫১৸৵১০
২। সাধারণ চাঁদা সংগ্রহ—	৩০৬৸৵১০	২। ডাক খরচ —	১০৫৸/১৫
৩। প্রতিনিধিগণের ফি —	১৭৮৲	৩। গাড়িভাড়া ও যাতায়াত খরচ—	২৬৮॥৶০
৪। দর্শকের ফি—	২২৪৲	৪। আহারাদি খরচ—	৭৫৯৵১৫
৫। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট প্রাপ্ত—	৩০০৲	৫। উৎসব খরচ —	৫০৲
		৬। সভামণ্ডপ খরচ	২৮৯।৵১৭
		৭। উপলক্ষণ প্রস্তুত খরচ —	১৩৯১০৲
		৮। প্রদর্শনী খরচ	১৮॥/০
		৯। ছাপা খরচ -	৮০৯৸৵৫
		মোট খরচ ...	২৩৬৬৸৵১০
		কোষাধ্যক্ষের নিকট উদ্বৃত্ত মজুত—	৫০৲
	২৪১৬৸৵১০		২৪১৬৸৵১০

মোট দুই হাজার চারিশত ষোল টাকা পনের আনা দুই পয়সা মাত্র।

মঃ দুই হাজার চারিশত ষোল টাকা পনের আনা দুই পয়সা মাত্র।